রাঙা মাটির ইতিকথা

উদয়পুর

বিমান ধর

রাঙা মাটির ইতিকথা

উদয়পুর

বিমান ধর
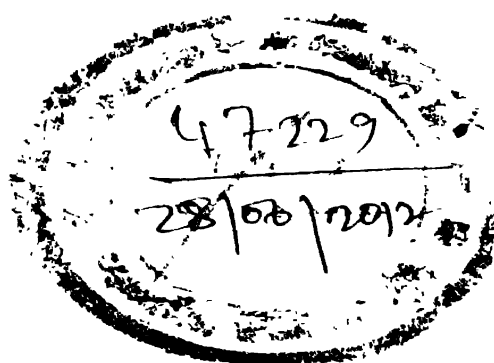
ত্রিপুরা দর্পণ

উৎসর্গ

মা, সৌদামিনী

আমাকে উদয়পুরের আত্মার সন্ধান দিয়েছিলেন;

এবং বন্ধু

কুমুদ কুন্ডু চৌধুরী,

তাঁর শব্দিত পদ সঞ্চার এই বই-এ।

সূচীপত্র

ভূমিকা

৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে যুঝার ফা " লিকা" দের রাজ্য রাঙামাটি জয় করে ছাম্বুল থেকে রাজধানী সরিয়ে এনে গোমতীর পূর্ব পাড়ে রাজধানী স্থাপন করলেন। রাঙামাটি নামটি "যুঝার ফা"র খুব পছন্দ। তিন রাজধানীর নামও রাখলেন " রাঙামাটি'। ৯৯৫ বছর পর গোপী নাথ নিজ জামাতা অনন্ত মাণিক্যকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করলেন। তিনি ভিন্ন বংশের হয়েও " মাণিক্য" উপাধি নামের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, আর নিজের নামটা পাল্টে দিলেন। হলেন "উদয়" রাঙামাটি নাম পাল্টে রাজধানীর নামে "উদয়পুর" করে দিলেন। পরের ১৭৫ বছর উদয়পুর নামেই রাজধানী এবং এখনো এই নাম। ফলে সর্বমোট ১১৭০ বৎসর উদয়পুরই ছিলো ত্রিপুর রাজবংশের রাজধানী। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উদয় মাণিক্যকে হত্যা করে মূল রাজ বংশের হাতেই রাজত্ব চলে এসেছিলো।

১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্গত দক্ষিণ শিকের জমিদার সমসের গাজীর তাড়া খেয়ে কৃষ্ণ মাণিক্য উদয়পুর থেকে, নদী পাহাড়ের প্রাকৃতিক নিরাপত্তা ছেড়ে, সমতলে রাজধানী নিয়ে গেলেন। অতীতেও একাধিক বার তাঁর পূর্ব সূরীরা শত্রুর আক্রমনে উদয়পুর ত্যাগ করেছিলেন। তা ছিলো সাময়িক, বিপদমুক্ত হয়ে সকলেই ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ মাণিক্য আর ফিরলেন না। অথচ না ফেরার কোন কারণ ছিলো না। ১৭৬০ - এ মীরকাসেম এর কাছে পরাস্থ সমসেরকে হত্যা করা হয়। মীর কাসেম কৃষ্ণ মাণিক্যকে ত্রিপুরার রাজা হিসেবে মান্যতা দেন। সুতরাং কৃষ্ণমাণিক্যও শত্রু মুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর উদয়পুরে ফিরে না আসার কারণ সম্ভবতঃ মীর কাসেমের নিরাপত্তা নিশ্চয়তার সান্নিধ্য।

উদয়পুর ফের জাগতে শুরু করে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর প্রসাশন বিকেন্দ্রীকরণ করে দক্ষিণ বিভাগ তথা উদয়পুর বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। তখনো সোনামুড়াতেই প্রশাসন কেন্দ্র নিয়ে যেতে হয়, উদয়পুর অস্বাস্থ্যকর বিবেচনায়। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে প্রশাসন কেন্দ্র উদয়পুরের খিলপাড়ায় পরে মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্যের নির্দেশে জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ে প্রশাসন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তখন থেকে এখনো পর্যন্ত উদয়পুরের ধারাবাহিক উত্থান। থানা, তহশীল কাছারী, কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ১৯০৪ -এ উদয়পুরের বর্তমান রাজার এবং ঐ সময়ের উদয়পুরের নাম রাধা কিশোর পুর ইত্যাদি বিবর্তন সূচিত হয়। বর্তমানে রাধা কিশোর পুর একটি মৌজার নাম। পরে তহশীল অফিস শালগড়া ও কাকড়াবনেও চালু হল।

১৯৫৪ -৫৫ সালে তৃতীয় পর্যায়ের উল্লম্ফন শুরু হলো। হাকিম বিপিন দত্ত বর্তমান অফিস স্থল শঙ্কর টিলা এবং পার্শ্ববর্তী বিশাল জায়গা অধিগ্রহণের উদ্যোগ নেন। হাসপাতাল প্রশাসন কেন্দ্র শঙ্কর টিলায় চলে এলো। এবং এর পরিপার্শ্বে রোশনা বাদে (আলোক উজ্জ্বল) পরিণত হলো। উদয়পুর রাজাধানীর গৌরব ফিরে পেলো না বটে কিন্তু দক্ষিণ জেলার প্রশাসন কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ হয়েই রইলো।

উদয়পুরে রাজধানী পুনঃ নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহারাজ কাশী মাণিক্য। উদয়পুর সম্পর্কে তিনি এতটাই নষ্টালজিক ও আপ্লুত ছিলেন যে তিনি উদয়পুরেই দেহ রক্ষা করেন। আবার রাধা কিশোর মাণিক্য ও আক্ষেপ করেছিলেন, " আগে উদয়পুরে এলে, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ আগরতলায় নয়, উদয়পুরেই করতাম।" তাঁর এই আক্ষেপের কথা আমরা বীব বিক্রমের উদয়পুর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পেয়েছি। বীরবিক্রম নিজেও গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদ, যুঝার কর্তৃক রাজধানীর স্থান

নির্বাচন নিয়ে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছিলেন। শঙ্কর টিলা, বর্তমান অফিস টিলায় একটি অস্থায়ী রাজ অবরোধ নির্মাণের রাজকীয় বাসনার কথা আমরা উদয়পুরের প্রথম প্রশাসনিক কর্তা ব্রজেন্দ্র দত্তের " উদয়পুর বিবরণ"-এ পেয়েছি। তবে কৃষ্ণ মাণিক্যের ভাবনাকে পরবর্তী বাজারা বর্জন করতে পারেন নি। ততদিনে স্বাধীন থেকে খানিকটা বৃটিশ নির্ভরতা ত্রিপুরার রাজ বংশে ছায়া ফেলে রেখেছিলো।

ত্রিপুর রাজবংশের ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করেছেন। গবেষকরা তথ্য দিয়েছেন ১৪৩৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে এই রাজবংশের সূচনা ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর, ত্রিপুরার ভারত ভূক্তির সময় পর্যন্ত সময়টা দাঁড়ায় ৩৩৮৬ বৎসর। গড়ে ১৮ বছরে এক পুরুষ ধরে দীর্ঘ সময় কোন একটি রাজ বংশ নিরবচ্ছিন্ন রাজত্ব করেছে এমন উদাহরণ বিশ্বে নেই। এর মধ্যে ৫৯০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত ১১৭০ বছর উদয়পুরেই রাজত্ব করেছেন।

শরদিন্দু বন্দোপাধ্যায় ''অমিতাভ' গল্পে গুপ্ত যুগের রাজ অবরোধের ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ভালোবাসার কাহিনীকে উন্মোচন করেছেন একটি ভগ্ন মৃৎ পাত্রের অবশেষকে সামনে রেখে। আর উদয়পুরে ১১৭০ বছরে রাজত্বের অসংখ্য অবশেষ বিক্ষিপ্ত বিন্যস্ত রয়েছে যার থেকে, একটি রাজবংশ নয়, একটি সভ্যতা কেন্দ্রের উত্থান পতনের মহাভারত রচনা সম্ভব। কেবল উদয়পুর শহরে নয়, বিস্তীর্ণ ভূভাগে তা ছড়ানো। উদয়পুর নিয়ে বিস্তর লিখেছেন অনাদি চরণ ভট্টাচার্য মশাই। লিখেছেন — " ধন্য মাণিক্য, কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য রাজাদের পাদস্পর্শে ধন্য উদয়পুরের মাটি। উদয়পুরে ছড়িয়ে আছে পঞ্চাশটিরও বেশী মঠ, মন্দির, রাজন্য যুগের স্মৃতি। ঐ সব স্থাপত্যে রয়েছে ত্রিপুরার নিজস্ব ত্রিবেগ শৈলী। রয়েছে অসংখ্য লোক গাঁথা, হর্ষ ও বিষাদের গল্প কাহিনী, অভিজ্ঞ চোখ আর বিজ্ঞান গবেষণায় এর থেকে সঠিক ইতিহাস লেখা সম্ভব। উপাদান রয়েছে; কিন্তু কাজটা করা বাকী। বলতে দ্বিধা নেই ইতিহাস রচয়িতারা " পান্ডব বর্জিত' দেশ বলে আর্য অহমিকায় সম্ভবতঃ এই মন্ডলের .. অমনোযোগী। অথচ একটি রাজবংশ ৩৩৮৬ বৎর এর মধ্যে ১১৭০ বছর একই ভূখন্ডে একই রাজধানী উদয়পুরে থেকে রাজত্ব করেছেন ইতিহাস তাকে কি করে উপেক্ষা করে?

তবে আঞ্চলিক ইতিহাসের রূপকারেরা, যেমন ঢাকার ইতিহাস, শ্রীহট্টের ইতিহাস, বাঙলার ইতিহাস ইত্যাদি গবেষণা গ্রন্থে ত্রিপুরাকে বার বার উল্লেখ করেছেন। বহু তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। শীতল চক্রবর্তী তাঁর " ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থে লিখেছেন " রণ ভঙ্গের সময়েই মেহের কূল ও পাটিকারা ত্রিপুরা রাজ্যের অর্ন্তভূক্ত হয় (লক্ষ্মণ সেনের সময়ে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে)। ত্রিপুরার রাজাগণ এইরূপে ১২শ শতাব্দীতে সম্পূর্ণ ত্রিপুর দেশই আধিপত্য বিস্তার করেন। মেহের কূল ও পাটিকারা পূর্বে ''বঙ্গ" নামেই পরিচিত ছিলো। ত্রিপুরা কর্তৃক বিজিত হইলেই তাহা ত্রিপুরার অন্তর্ভূক্ত হইয়া ত্রিপুরা নামে পরিচিত হইতেছে। কেবল পূর্ব বঙ্গ কেন, বঙ্গ নামও যে এক সময়ে ত্রিপুরার সম্বন্ধ প্রযুক্ত হইত পরাতত্ত্ববিদ, পন্ডিত দিগের অবধারণ হইতে ইহাও জানিতে পারা যায়। (পৃঃ ১২৬)।" এই ব্যাপারে তিনি পন্ডিত বামন শিবরাম আপ্তে মহাশয়ের সংস্কৃত ইংরেজী অভিধানের " বঙ্গ" সম্বন্ধে লেখা " বঙ্গ' (also called সমতট or the plains) A name of Eastern Bengal (to be clearly distinguished from " গৌড়' or Northern Bengal) included also the sea coast of Bengal. It seems to have included one time Tipperah" অংশের উদ্ধৃতি উদ্ধার করেছেন।

তাঁর নিজস্ব অভিমত হলো — " ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনার দ্বারা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কেবল প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ পাইয়াছি তাহা নহে, পরন্তু একই বংশ ধারা যে, ত্রিপুরায়

রাজত্ব করিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। সমগ্র বঙ্গদেশ, কেবল বঙ্গ দেশ কেন সমগ্র ভারতবর্ষে একই রাজবংশ দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে অধিষ্ঠিত, ত্রিপুরা রাজ্যের ন্যায় দ্বিতীয় একটি রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ (পৃঃ ঐ)।"

দ্রুজ্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ অনার্য কিরাত জাতির মধ্যে আর্য সভ্যতার অঙ্কুর নিয়ে প্রথমে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। কিভাবে সভ্যতার অঙ্কুরটি সযত্নে পোষণ করে তাকে কিভাবে বর্ধিত করেছিলেন এবং ক্রমে অনার্য জাতির মধ্যে এর মূল প্রসারিত করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি। এর থেকে ভারতের পূর্ব সীমায় দ্রুজ্য বংশীয়গণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আর্য সভ্যতার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

আবার ধর্ম মাণিক্যের ভ্রাতঃস্পুত্র জগৎ মাণিক্য নিজে রাজা হবার জন্যে " With verious conditions made him completely subordinate to the Manghul power at Daeca" অথচ " The province of Tipperah from the time immemorial had been an independent kingdom" জগৎ মাণিক্য স্বাধীনতার রজ্জু মুঘলদের হাতে তুলে দিনেল। এর পরবর্তী অধ্যায়ও নানা ঘটনাবহুল। এবং সবই উদয়পুর কেন্দ্রীক। এই পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটে লক্ষ্মণ মাণিক্যের সময়ে যিনি উচ্চাকাঙ্খী সমসের গাজীর আজ্ঞাবহ উপগ্রহ হয়ে উদয়পুর থেকে রাজধানীটাই উৎখাত করে দিলেন।

এই বই এর প্রথম অংশে এই দিকে আলোকপাত করা হয়েছে। বই -এর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে উদয়পুরের আমার প্রত্যক্ষ করা বিবর্তনের রূপ। আমিও ১৯৪৭ / ৪৮ -এ কাতিঃ গ্রাম উদয়পুরকেই প্রত্যক্ষ করেছি। তখন বাস্তবিকই শহরের জলাশয়গুলিই ছিল পানীয় জলের উৎস। বিজলী আসে, অনেক পরে ১৯৬০ সালে। এস. ডি. ও নীহার সেন তখন বিজলী বাবু। জনসংখ্যাও স্বল্প। প্রকৃতি তখনো ধর্ষিতা নন। এবং নয়াবসতির মানুষগুলি পরস্পরের আত্মীয় এবং দারিদ্রকে ভাগ করে নিয়ে এক সুখী সমাজের বাসিন্দা। শ্রেণী সংঘর্ষের অমোঘতা শ্রেণী সহঅবস্থানকে সন্দেহ যুক্ত করে নি।

সময় যত এগুতে থাকে জনবিন্যাসের চরিত্র পাল্টাতে থাকে। সমতল দখলে এক নিঃশব্দ আগ্রাসন চলে এবং ঐ ধাক্কায় উপজাতিরা সমতল ছেড়ে গভীর জঙ্গলে পাহাড়ে সরতে থাকে। ১৯৬২ সালে এক বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হন মুসলমান প্রজারা। রাজ্যের একমাত্র জেলাশাসক বি. এন. রমন সন্দেহ ভাজন মুসলিম প্রজাদের পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানোর প্রশাসনিক সূচী নেন। এর পশ্চাৎ কারণ ছিলো " পাকিস্তানের ষড় যন্ত্র সন্দেহের" এক গোয়েন্দা রিপোর্ট। বিচার বিবেচনা ছাড়াই উচ্ছেদ ও বিতাড়ন চলে। সব চাইতে বেশী উচ্ছেদ হলেন অমরপুর থেকে। এই উচ্ছেদ পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসকারী হিন্দুদের জন্যে একটি সুযোগ এনে দেয়। ছিন্নমূল মুসলমানেরা এপাড়ে ফেলে যাওয়া সম্পত্তির বিনিময়ে ঐ দেশে জমির সন্ধান করে। চোর পুলিশের মিলন হলো। " পাওয়ার অব এটর্নী" মূলে দুই দেশের লোকেদের মধ্যে সম্পত্তি বিনিময় শুরু হল। ঐ সুযোগে ব্যাপক সংখ্যক হিন্দু এদেশের মুসলমানদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তির মালিক হলেনহগ বিনিময়ে তাদের ফেলে আসা সম্পত্তি এদেশ থেকে বিতাড়িতদের দিয়ে দিলেন। ১৯৪৬ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দুই দেশের সম্পত্তি বিনিময় বন্ধ করে দেন। আবার ১৯৬৪ সালে ঢাকা রায়টের পরেও ব্যাপক সংখ্যক হিন্দুর আগমন ঘটে ত্রিপুরায়। ছাতারিয়া, শালগড়া, আমতলী, গর্জনমুড়া, কুশামারা, গর্জি, চন্দ্রপুর, গঙ্গাছড়া, লক্ষ্মীপতি ফোঁটামাটি, পিত্রা নয়া বসতি স্থাপিত হয়। বিনিময়ের বাইরেও এসেছেন বহু সংখ্যক মানুষ।

বসতি বিন্যাসের প্রভাব পড়ে উপজাতি সমাজেও। এমন কী সমতলে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত

জমাতিয়া সম্প্রদায়কেও নড়ে চড়ে বসতে হয়। সমতলের জমাতিয়ারা নোয়বাড়ীতে গিয়ে বসতির সীমা টানলেন। নোয়াবাড়ীর মলছুমরা বিতাড়িত হলেন দেয়ান ছড়া আগায়, গভীর, দুর্গম জঙ্গলে। গোমতীর এপাড়ে হদ্রাবাড়ী, তোতাবাড়ী, শিলঘাটি, বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো জেগে থাকলো। উদয়পুর শহরে সব চাইতে নিকটে গকুলপুর বাজার সংলগ্ন জায়গাও ছিলো জমাতিয়া বসতি। বাজার সংলগ্ন আগরতলা যাওয়ার পথে বা পার্শ্বে যে বিশাল জলাশয় ও আবাদী জমি তার মালিক ছিল কালানাজির (জমাতিয়া) ঐ জমি প্রথম হস্তান্তরিত হয় মুসলমানদের হাতে, ঐ পরিবার, প্রায় তিনশত কানি জমি বিনিময় করে চলে যান কুমিল্লায়। তেপান চৌধুরী (জমাতিয়া)র টেপানিয়া (টেপান চৌধুরীর নাম অনুসারে জায়গার নাম (টেপানিয়া) এক্ষেত্রে অনাদি চরণ ভট্টাচার্য যে লিখেছেন পাথর থেকে টেপানো জল থেকে টেপানিয়া তা ঠিক নয়। এখন টেপানিয়ার পাঁচ বর্গমাইলের মধ্যেও কোন উপজাতি পরিবার নেই। এ হলো বসতি সচলতা যার পশ্চাতে রয়েছে বেহিসেবী জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং ভূমি ক্ষুধা। রাজনগরে, গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদ চত্বরেও ১৯৮০ জুনের জাতি দাঙ্গার আগেও উপজাতি পরিবার ছিলো। এখন নেই।

প্রাচীন জনপদের মতোই উদয়পুর শহর থেকে হারিয়ে গেছে কিছু কিংবদন্তী ল্যান্ডমার্ক। জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পূর্ব কোনার প্রাচীন জাম গাছটি এখন নেই তার অবশেষ টিকে আছে নাম মাহাত্ম্যে "জামতলী"। অনুরূপ পূর্ব বাজারের বিশাল নিম গাছ। আর মহাদেব বাড়ী সংলগ্ন মুক্তমঞ্চের সামনে শতাব্দী প্রাচীন চালতা গাছ। এরাও এটিকে আছে নাম মাহাত্মেই" নিমতলী" আর "চালতাতলী" নামে। বিলুপ্ত হয়েছে ব্রহ্মাবাড়ীর সিজ গাছটি। সনাতন দে, নিশি মহারাজের ঠাকুরদার লাগানো। তবে ব্রহ্মাবাড়ী এখন সরকারী নথিতে জীবন্ত। সেখানে মৃন্ময় ব্রহ্মা মূর্তিটিও অদৃশ্য।

১৯৬১ সালে রাজ্যে প্রশাসন কেন্দ্রের পুর্নঃবিন্যাস হয়। তিনটি প্রশাসনিক অঞ্চল, তিনজন অঞ্চল শাসন কর্তা (Zonal S D.O) পদ সৃষ্টি হলো। উদয়পুর হলো দক্ষিণ অঞ্চলের সদর।পশ্চিমবঙ্গ ক্যাডারের পার্থ সারথী রায় (W.B.C.S) দায়িত্ব নিলেন। সদর এবং কৈলাশহরের দায়িত্বে বসানো হলো এস. আর. চক্রবর্তী এবং হিরন্ময় ঘোষকে। ১৯৭০ সালে ঐ অঞ্চলগুলি জেলায় উন্নীত হলো। দক্ষিণের প্রথম জেলা শাসক নিযুক্ত হলেন অশোক নাথ, আই. এ. এস। প্রথম এক বছর আগরতলা বটতলায় রমেশ ব্যানার্জীর বাড়ীতেই ছিলো দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের অফিস, পরিকাঠামোর অভাবে এমনই ব্যবস্থা ছিলো। ১৯৭১ সালে উদয়পুরে জেলা অফিস স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমান মহকুমা শাসকের অফিসের এক অংশে চলে এলো। কুলেশ চক্রবর্তী জেলা শাসক। জেলার মর্যাদা পাওয়ার পর সব দপ্তরেরই উচ্চ পদাধিকারীদের দপ্তর একে একে খুলে যায়। এখন উদয়পুর মহকুমাতে মাতাবাড়ী, কিল্লা, ও কাকড়াবন তিনটি ব্লক অফিস।

উদয়পুর যাকে আশৈশব থেকে দেখেছি,এর জল হাওয়ায় বড় হয়েছি, এখন জীবনের শেষ অধ্যায়ে, সেই আমার দেখা উদয়পুর নিয়ে লেখার ইচ্ছা বহু দিনের। দেহের খর্বতা শৈশবকে, বন্ধু বিরল করেছিলো। কিছুতেই আমি তাঁদের যোগ্য হয়ে উঠতামনা। ফলে সমান দ্রাঘিমার সুশীল দে (বর্তমানে নিশি মহারাজ) আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেলেন। আমার উদয়পুর দেখা কার্যত চার চোখ দিয়ে। বাড়তি দুটি চোখ সুশীলের। সুতরাং ইচ্ছাকে রূপ দিতে গিয়ে সর্বাগ্রে তাঁর স্মরণ নিয়েছি। বহু পুরনো বিষয় সে আমার সামনে ছবির মতো গুছিয়ে দিয়েছে। আমার একান্ত সুহৃদ গবেষক ভাষাবিদ সদ্য প্রয়াত কুমুদ কুন্ডু চৌধুরীর সক্রিয়তাও এতে যুক্ত। বহু জটিল বিষয় সরল করে দিয়েছেন তিনি। যোগান দিয়েছেন বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্যের। তাঁর অগ্রণী মেধার বিরল অভিভাবকত্ব সব সময়েই আমার উপর ছিলো। এরা দুজনেই এই বই- এ জুড়ে রয়েছেন।

বীর বিক্রম উদয়পুর এলেন

২৫ -১ ১৯২৫ ইং তারিখে মহারাজ বীর বিক্রম মাণিক্য তাঁর উদয়পুর ও সোনামুড়া বিভাগ পরিদর্শন শুরু করেছিলেন। ৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৯২৫ এ তাঁর ঐ দুই মহকুমা পরিভ্রমণ শেষ হয়। তিনি তার পরিদর্শন বৃত্তান্তের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তারিখ অনুযায়ী। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ঐ ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা পরিদর্শন বৃত্তান্তে উদয়পুর এবং সোনামুড়া মহকুমার তৎকালীন অবস্থার এক একটি খণ্ড চিত্র চিত্রিত হয়েছে। তাঁর পরিদর্শন গমন - পথ তাঁর জমিদারী চাকলে রোশনাবাদের অন্তর্গত বিখ্যাত শহর কুমিল্লা হয়ে। আখাউড়া থেকে কুমিল্লা, কুমিল্লা হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরা মূল রাজ্য খন্ড সোনামুড়া হয়ে তিনি উদয়পুরে প্রবেশ করেন। তাঁর পরিদর্শন সঙ্গী ছিল জনৈক মিঃ দাশ (Mr. Das) এবং কর্নেল পুলি। " আমার সোনামুড়া ও উদয়পুর বিভাগ পরিভ্রমণ ডায়েরী"র হুবহু উদ্ধৃতির প্রয়োজন যার দ্বারা তখনকাল উদয়পুর ও সোনামুড়ার প্রশাসনিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের প্রতি আলোকপাত বহুলাংশে না হলেও খণ্ডিত ভাবে হলেও পাওয়া সম্ভব। সুতরাং ডায়েরী পুরোটাই তুলে দিচ্ছি।

" ২৫ -১-২৫ ইং অদ্য ১০ - ৩০ মিনিটের সময় Mr. Das এবং কর্ণেল Pully সহ কুমিল্লা হইতে রওয়ানা হই এবং প্রায় ১১ টায় বি বির বাজার পৌছি। নৌকায় নদী পাড় হইয়া হাতিতে উঠি। এবং ১১ টায় সোনামুড়া পৌছি। হাতি হইতে নামিয়াই আমি দরবারে যাই। সোনামুড়ার জনসাধারণ এবং কর্মচারীবৃন্দের পক্ষ হইতে স্থানীয় একজন উকিল নিম্নলিখিত অভিনন্দন পাঠ করেন।

অভিনন্দন।

বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয় শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরঃ শ্রীকরকমলেষু। মহারাজ।

অদ্য সোনামুড়া বিভাগের জনসাধারণ ও রাজকর্মচারীবর্গের পরম সৌভাগ্য যে মহারাজ ত্রিপুর রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া সর্বাগ্রেই মফঃস্বলস্থ বিভাগসমূহের মধ্যে সোনামুড়াতে শুভাগমন করিলেন। মফঃস্বলস্থ বিভাগসমূহের মধ্যে সোনামুড়া অতি প্রাচীন। এক কালে উদয়পুর অমরপুর এবং বিলোনীয়া বিভাগ এই সোনামুড়া বিভাগেরই অন্তর্ভূক্ত ছিল।

শ্রী শ্রীযুত সর্বাগ্রে এই বিভাগ পদার্পণ করায় অত্রত্য জন সাধারণের অতিশয় আনন্দ ও গৌরবের বিষয় হইয়াছে। সোনামুড়া বিভাগের জনসাধারণ ও রাজকর্মচারীবৃন্দের পক্ষে আমরা শ্রী শ্রীযুতকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিতেছি।

ত্রিপুরার রাজবংশ বিদোৎসাহের জন্য চির প্রসিদ্ধ। মহারাজের কৃপায় এই স্থানে সম্প্রতি একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিদ্যালয় দ্বারা এই বিভাগের একটি স্থায়ী অভাব দুরীভূত হইয়াছে। মহারাজের দরিদ্র প্রজা ও রাজকর্মচারীবৃন্দের পক্ষে বালকগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া শিক্ষা প্রদান করা দুঃসাধ্য। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়াতে বালকগণ অল্প ব্যয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া মনুষত্ব লাভে সমর্থ হইবে। মহাবাজের কৃপা দৃষ্টিতে এই বিদ্যালয় ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

গোমতী নদীর জল প্লাবন হইতে সোনামুড়া টাউন ও গ্রাম রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়াছে। প্রতি বৎসরই এই জন্য বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া থাকে। এককালীন কিছু অধিক অর্থ ব্যয়ে গোমতী নদীর গতি পরিবর্তন করিয়া দিলে এই জন্য পুনঃ পুনঃ প্রতি বর্ষে অর্থ ব্যয় করা আবশ্যক হইবে না এবং জল প্লাবন আশঙ্কাও দূরীভূত হইবে।

কুমিল্লা শহর হইতে এই স্থানে যাহাতে শকটা রোহনে সহজে গমন করা যায় এবং ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয় এই উদ্দেশ্যে বহুকাল পূর্বে একটা রাজপথ নির্মিত হইয়াছিল। এই যাবৎকাল অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে। আশা করি মহারাজের কৃপায় এই রাস্তা অগৌনে সম্পূর্ণ হইয়া সোনামুড়ার গৌরব বৃদ্ধি করিবে। এতদ্বিষয়ে শ্রী শ্রীযুতের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে জনসাধারণ বিশেষ উপকৃত হইবে।

সর্বনিয়ন্তা মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি মহারাজ নিরাময় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া পরম সুখে রাজত্ব করিতে থাকুন এবং ত্রিপুর বংশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়া প্রজা সাধারণ ও রাজকর্মচারীবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করুন। ইতি

চিরাশ্রিত
সোনামুড়া বিভাগের রাজভক্ত
জনসাধারণ
ও
রাজকর্মচারীবৃন্দ।

ত্রিপুরা রাজ্য
সোনামুড়া বিভাগ
১২ই মাঘ, ১৩৩৪ খ্রিঃ

অভিনন্দন পাঠের পর আমি (মহারাজ) এই বক্তৃতাটি পাঠ করি ঃ—

আপনাদের আন্তরিক অভ্যর্থনা এবং রাজভক্তিপূর্ণ অভিনন্দন প্রাপ্ত হইয়া আমি অপার আনন্দলাভ করিয়াছি।

আপনারা সত্যই বলিয়াছেন যে, আমার প্রিয় প্রজা ও সহযোগীবৃন্দের সহিত ইহাই প্রকৃত প্রস্তাবে কার্যক্ষেত্রে আমার প্রথম সংশ্রব। এক সময়ে সোনামুড়া ত্রিপুরা রাজ্যের সিংহদ্বার স্বরূপ ছিল। সোনামুড়ার সহিত আমার পূর্বপুরুষগণের গৌরব -স্মৃতি অশেষ রূপে জড়িত। এই বিভাগই সেনাপতি চৈচাকের বীরত্বের লীলাভূমি। বর্তমান শাসন বিভাগগুলির মধ্যে সোনামুড়া মুখ্যস্থানীয়। এই বিভাগের সহিত আমার প্রথম পরিভ্রমণের সংযোগ সর্বময় যুক্তিযুক্ত হইয়াছে সন্দেহ নাই এবং অদ্যকার স্মৃতি চিরকাল আমার অন্তরে জাগরূক থাকিয়া আমাকে আপনাদিগের কল্যাণ কামনায় প্রবুদ্ধ করিবে, ইহা আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি।

প্রজার মঙ্গলেই রাজার মঙ্গল, এতএব রাজা সর্বদাই প্রজার মঙ্গল চিন্তা করিতে বাধ্য। আপনারা যে অতি সাধারণ আকারের অভাব অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সময় ও সুবিধামত অবশ্যই পূরণ হইবে আশা করি। আমি সর্বান্তকরণে সোনামুড়া বিদ্যালয়ের সফলতা কামনা করিতেছি।

এই বিপুল আয়োজন আপনাদের অকৃত্রিম প্রীতির পরিচায়ক। শ্রী ভগবান আপনাদের সর্বাঙ্গীন কুশল বিধান করুন!

আমার পাঠের পর নিয়মমত নজর দেওয়া হয় এবং দরবার শেষ করা হয়।

দরবার শেষ হইলে আমি সোনামুড়া ডাকবাঙ্গলায় কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া একটু জলযোগ করিয়া ছিলাম।

সোনামুড়া স্থানটি বড়ই সুন্দর। তথায় অল্প সময় ছিলাম। সুতরাং সোনামুড়া সম্পর্কে বিশেষ কিছু লিখতে পারিলাম না। সোনামুড়া হইতে হাতিতে ১২-১৫ মিনিটের সময় রওয়ানা হই এবং ২ঃ৩০ মিনিটে মেলাঘরে পৌছি। এ স্থান পর্যন্ত রাস্তাটি ভাল। মোটর চলিতে পারে। কিন্তু বর্ষাকালের কথা বলতে পারি না।

মেলাঘর এবং সোনামুড়া মধ্যে রুদিজলা নামে একটি জলা আছে। জলাটি প্রকান্ড। ইহা আবাদ করিতে পারিলে রাজ্যের আয় বৃদ্ধি হইবে। এই জলাটি আমার মনে হয় ২০০ /৩০০ দ্রোণ হইবে।

মেলাঘরে আমরা নামি এবং বিশ্রাম করি। আমাদের দুপুরের খাওয়াটা সেইখানেই হইয়াছিল। মেলাঘরে প্রায় আধঘন্টা ছিলাম। মেলাঘর হইতে কাঁকড়াবন ৬ মাইল। মেলাঘর হইতে কাঁকড়াবন আসিতে বিকাল ৫ টা বাজে। কাঁকড়াবনে আমাদের জন্য আগেই সব ঠিক ছিল। রাত্রে সেইখানে থাকি। কাঁকড়াবন জায়গাটি দেখতে বড়ই সুন্দর।

২৫-১-২৫ ইং

আজ ভোর ৪ টার সময় উঠিলাম। খাওয়া দাওয়া করিয়া ৫ টার সময় Mr. Das ও Colonel Pulley সহ শিকার করিবার জন্য হুরিজলার দিকে রওয়ানা হই। শিকার অনেক ছিল, আমরা দুইটি হরিণ মারতে পারিয়াছিলাম। হুরিজলা একটি বিস্তীর্ণ জলা। বর্ষাকালে জলের নীচে থাকে এবং শীতকালে সব জায়গায় জল থাকে না, এবং শিকারের জন্য খুব ভাল জায়গায়। এই জলাটি পূর্বে একজন তালুকদারের ছিল। ঐ তালুকদার ˇরাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময় সরকার হইতে বন্দোবস্ত লয়। কিন্তু গোমতীর জলে প্রত্যেক বৎসর ডোবাতে তালুকদার ঐ জলার অনেকটা ছাড়িয়া দেয় এবং আর একটি স্থান তৎপরিবর্তে লয়, জলাটি ২০০ / ৩০০ দ্রোণ। ইহাও আবাদ হইতে পারে।

উদয়পুরে D.O এবং তথাকার কয়েকজন তালুকদারের সহিত আলাপ করিয়া জানিতে পারিলাম, গোমতী নদীকে শিলঘাটির দিকে সরাইয়া দিলে ঐ জলা এবং আরো অনেক সমতল স্থান আবাদযোগ্য হইবে। তাছাড়া বলেন যে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিলেই নদীটিকে সরান যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় প্রায় দশ হাজার টাকা লাগিবে। তালুকদারগণও সাহায্য করিবে। সরকার হইতে ৫০০০ ও তালুকদারগণ হইতে ৫০০০ টাকা লইয়া এই কাজ করিলে সরকারের প্রায় ৫৫০ দ্রোণ জমি এবং তালুকদারদেরও ঐ পরিমাণ আবাদ হইবে বলিয়া আমার মনে হয়। শিকারের পর কাঁকড়বনেই থাকি।

২৭-১-২৫ ইং

সকাল ৯টার সময় কাঁকড়াবন হইতে রওয়ানা হই। প্রায় ১২ টার সময় জামজুড়ী পৌছি। জামজুড়ীর তালুকদার শ্রীযুক্ত দ্বারিক নাথ ব্যানার্জী এখন প্রায় জামজুড়ীতেই স্থায়ীভাবে বাস

করেন। তিনি একটি বাঙালী ভদ্র পল্লী স্থাপন করিয়াছেন এবং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জামজুড়ী স্থানটিকে সুন্দর করিয়াছেন। নিজের বাড়িটিও দু'তলা টীনের ঘর করিয়াছেন। তারপর প্রায় ১টায় উদয়পুর পৌছি। উদয়পুর পর্যন্ত রাস্তাটি ভাল। মোটর চলিতে পারে। উদয়পুরে আফিসগুলি জগন্নাথ দিঘির উত্তর পারে। জগন্নাথ দিঘিটি অত্যন্ত বৃহৎ। কুমিল্লার ধর্মসাগর হইতেও বড়। বলা বাহুল্য উদয়পুরে আমাদের জন্য আগেই সব ঠিক ছিল। বিকালে ৩ টায় দরবারে যাই এবং জনসাধারণ ও কর্মচারীর পক্ষ হইতে উদয়পুরে প্রধান উকীল নিম্নলিখিত অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করেন।

অভিনন্দন পত্র।

বি এম- সমর বিজয়া মহামহোদয় শ্রীশ্রী শ্রীশ্রী শ্রীযুক্ত মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর; — শ্রী কর কমলেষু।

মহারাজ।

সর্বাগ্রে পরমপিতা, অশেষ করুণা নিধান, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নিকট ভবদীয় নিরাময় ও কর্মময় সুদীর্ঘ জীবন প্রার্থনা করিয়া আমরা উদয়পুরবাসী ভবদীয় নিতান্ত অনুরক্ত রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ মহারাজকে সানন্দে অভিনন্দিত করিতেছি।

আজ উদয়পুরবাসীগণের গৌরব ও আনন্দের দিন। তাহাদের সৌভাগ্য বলে আজ রাজ্যেশ্বর উদয়পুর প্রথম পদার্পণ করিয়া তাঁহার চিরানুগত ও অকৃত্রিম রাজভক্তির দ্বারা অনুরঞ্জিত ও প্রকৃতিবর্গকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীন অবস্থা পরিদর্শনোদ্দেশ্যে রাজ্যেশ্বরের প্রথমেই উদয়পুর শুভ পদার্পণ উদয়পুরবাসীগণের শ্লাঘার বিষয় হইয়াছে।

এক সময় উদয়পুর ত্রিপুরা রাজবংশের স্বর্গত পূণ্যশ্লোকে নরপতি বর্গের প্রিয় রাজধানী ছিল। তখন উদয়পুর শিল্প বাণিজ্যের ভাস্কর্য ও স্থপতি বিদ্যার একটি প্রিয় নিকেতন ছিল। আজ পর্যন্ত স্বর্গত প্রজারঞ্জক ভূপালগণের অক্ষয় কীর্তি বক্ষে ধারণ করিয়া অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

আমাদের অচিন্ত পূর্ব সৌভাগ্যবশতঃ আজ রাজ্যেশ্বরকে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান দেখিয়া ধন্য হইয়াছি। এই সুবর্ণ সুযোগ আমাদের ভাগ্যে আবার কখন উদয় হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। এই সুযোগে স্থানীয় অভাব অভিযোগের বিবরণ শ্রী শ্রীযুতের সকাশে বিনীতভাবে গোচর করার আকাঙ্ক্ষা সম্বণ করিতে পারিতেছি না। ভবদীয় রাজভক্ত প্রজাগণের বিশ্বাস, শ্রী শ্রীযুতের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে এই সকল অভাব অচিরে দূরীভূত হইবে।

ব্যবসায় ও বাণিজ্যের সম্প্রসারণ উদ্দেশ্যে ও সর্ব সাধারণের গমনাগমনের সেই কার্যার্থে সোনামুড়া -উদয়পুর সড়কটিকে সুপ্রশস্ত যান-বাহনাদি চলিবার উপযুক্ত রাজবর্ত্মে পরিণত করা নিতান্তই আবশ্যক।

আগরতলার সহিত উদয়পুর সড়ক দ্বারা সংযোগের নিমিত্ত বিশালগড় দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করার আদেশ হইয়া চড়িলাম পর্যন্ত সড়ক প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ রাস্তা সম্পূর্ণ হইলে যাতায়াতের পথ সুগম হইবে।

পূণ্য শ্লেক স্বর্গীয় নরপতিগণের কীর্তি প্রজারঞ্জনের নিদর্শন দিঘিগুলি শুষ্ক ও কচুরী পানায়

পরিপূর্ণ হইয়া যাওয়ায় প্রজাগণের জলাভাব ঘটিয়াছে। তাহাদের দুই একটি খনিত হইয়া প্রজাগণের পানীয় জলের সংস্থান হওয়া আবশ্যক।

বর্তমানে এখানে একটি আউটডোর দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এর দ্বারা উদ্দেশ্য সম্যক সাধিত হইতেছে না। একটি উপযুক্ত ইনডোর হাসপাতালের অভাব প্রজাগণ বিশেষ করে অনুভব করিতেছে।

উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন মনুষ্যত্ব লাভ হয় না। উচ্চ শিক্ষাই সর্বাধিক উন্নতির মূল। আমরা দীনহীন প্রজাগণ দৈন্য প্রযুক্ত আমাদের সন্তানদের জন্য অন্যত্র উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেছি না। এখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের সন্তানগণের উচ্চ শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হইবে এবং শিক্ষার গুণে তাহারা উৎকৃষ্ট নাগরিকে পরিণত হইবে।

উদয়পুর পুরাতন রাজধানী, এ স্থানে একখানা রাজবাড়ী প্রস্তুত হইলে শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইবে এবং পুরাতন রাজধানী উদয়পুরে লুপ্ত গৌরব অন্ততঃ আংশিক ভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।

আমরা অতি দীন, মহামহিমান্বিত রাজ্যেশ্বরের উপযুক্ত সংম্বর্ধনা করিতে পারি এমত শক্তি ও সম্বল আমাদের নাই। দেবতা সমক্ষে সামান্য বনফুলও উপেক্ষিত হয় না। এই কারণেই দেবপ্রতীম মহারাজ সমীপে আমরা আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর অভিনন্দন পত্র সহ উপনীত হইতে সাহসী হইয়াছি।

উপসংহারে অনাদি নিধান মঙ্গলময় পরমেশ্বর সমীপে আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা যে, মহারাজ নিরাময় ও কর্মময় সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালনে রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে থাকুন।

চিরানুগত ও চিরাশ্রিত
উদয়পুরবাসী জনসাধারণ।

১৪ই মাঘ, ১৩৩৪ ত্রি পুরাব্দ।

অতঃপর আমি নিম্নলিখিত বক্তৃতাটি পাঠ করি ঃ—

আপনাদিগের সাদর অভ্যর্থনা এবং রাজভক্তি পূর্ণ অভিনন্দনে আমি অপার আনন্দলাভ করিয়াছি। বহুদিন হইতে ত্রিপুর রাজবংশের বীরত্বের লীলাক্ষেত্র পূণ্যভূমি উদয়পুর দর্শনের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। ভগবানের কৃপায় আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে।

স্বর্গীয় পিতামহ মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুর প্রথম উদয়পুর পরিভ্রমণের পর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, আগরতলা রাজধানী নির্মাণজনিত বিপুল অর্থ ব্যয়ের পূর্বে উদয়পুর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিলে নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ব পুরুষগণের গৌরব স্মৃতি মণ্ডিত এই রমনীয় স্থানে রাজধানী পুনঃস্থাপন করিতেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবেরও উদয়পুরের প্রতি গভীর প্রীতি ছিল। আমি এই স্থানে পদার্পণ মাত্রই পিতামহ ও পিতৃদেবের মানসিক অবস্থা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।

প্রকৃত প্রস্তাবে উদয়পুরের প্রতি ত্রিপুর রাজবংশের মজ্জাগত আকর্ষণ কিছুতেই মুছিবার নহে। আপনারা আমাকে আপনাদিগের মধ্যে উপস্থিত দেখিয়া যেরূপ প্রীত হইয়াছেন, আমিও তদপেক্ষা কম আনন্দলাভ করি নাই।

রাজ্যই রাজার গৃহস্থানীয়, রাজা গৃহস্বামী। প্রকৃতিপুঞ্জ রাজার নিজ পরিজন। রাজা প্রজার ইহাই চির সম্বন্ধ। একের মঙ্গলে উভয়েরই মঙ্গল। আপনাদিগের ইষ্ট চিন্তা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া আমি মনে করি।

আপনারা কয়েকটি অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। উহার বিস্তারিত সমালোচনা অনাবশ্যক। আপনাদিগের আকাঙ্ক্ষার সহিত আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সময় ও সুযোগানুসারে যাহাতে আপনাদিগের অভাবগুলি ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, তদ্বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টির অভাব হইবে না, ইহা আপনাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি।

সর্বনিয়ন্তা বিধাতা আপনাদের মঙ্গল করুন।

অতঃপর নিয়মিত নজর দেওয়া হয় এবং দরবার শেষ করা হয়। বিকালে পুরান মন্দির ইত্যাদি দেখিবার জন্য বাহির হই। মহাদেব বাড়ী, চতুর্দশ দেবতার বাড়ী, লুক পানানী ইত্যাদি অনেক মন্দির ও অনেক দালান দেখি। এই সব পুরান দালানের উপর এখন বড় বড় বটগাছ হইয়াছে, এখনও কিছু টাকা, বেশী নয়, ১০০০ টাকা ব্যয় করিলে এই সকল পুরান কীর্তিগুলি রক্ষা হইতে পারে।

২৮-০১-২৫ ইং

আজ সকাল ৯টায় ঁমাতা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবী দর্শন করিতে গমন করি। রাস্তায় অমর সাগর দিঘি দেখি। এতবড় দিঘি আমি কখনো দেখি নাই। আমার মনে হয় ইহা লম্বায় প্রায় ১ মাইল। এই দিঘির ভিতর ১৬দ৯. কানি জমি আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে ইহার অবস্থা শোচনীয়। এই দিঘিটিকে পুনরায় তাহার পূর্ব অবস্থায় আনিতে হইলে ৪০/৫০ হাজার টাকা দরকার। রাস্তায় সুখ-সাগর জলাও দেখি। এখন ইহার প্রায় সম্পূর্ণটাই আবাদ হইয়াছে। কিন্তু D.O- র নিকট শুনিতে পাইলাম যে গত ২ বৎসর থেকে বর্ষাকালে গোমতীর জল এই জলাটিকে ডুবায় এবং ধান নষ্ট করে। জল নাকি মরা নদী দিয়ে জলায় প্রবেশ করে, অতএব মরা গোমতী নদীটির সহিত যে স্থানে গোমতী নদীর যোগ হইয়াছে, সেই স্থানে একটি বাঁধ প্রস্তুত করা হইলে আর জল আসিতে পারিবে না। এবং জলাটি একটি প্রকাণ্ড ধান্য ক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

ঁমাতার মন্দির উদয়পুর হইতে প্রায় ২।। মাইল। বর্তমানে একটি রাস্তা আছে কিন্তু রাস্তাটি প্রশস্ত কম। ঁমাতার মন্দির ঁমহারাজ ধন্য মাণিক্যের কীর্তি। মা 'র দর্শন করিয়া তথাকার সরকারী ব্রাহ্মণকে পূজার অনুমতি দিয়া দক্ষিণ চন্দ্রপুরের দিকে রওয়ানা হই এবং তথায় চন্দ্রসাগর ও ছত্রসাগর নামে ২ টি দিঘি দেখি। দিঘিগুলির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ছত্র সাগরটি শুকিয়ে যাওয়ায় তথাকার দক্ষিণ চন্দ্রপুরের) লোকের বড়ই জল কষ্ট হইয়াছে। ইহা ছাড়াও জঙ্গলি হাতীর অত্যাচারে ঐ স্থানের লোকের ধান চাষ করা কষ্টসাধ্য হইয়াছে।

মাতার মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ঁমাতার নিকট বলি দেওয়া দেখি এবং বলির পর মাতার পূজা করি। পূজার পর কালী বাড়ির পুকুরে গজার মাছের মাংস খাওয়া দেখি। এই সকল মাছ লোককে মোটেই ভয় করে না। এবং পারের নিকট আসিয়া মাংস ইত্যাদি লইয়া যায়। ইহারা সর্বদাই যাত্রীদের নিকট হইতে খাদ্য পাইয়া থাকে।

ঁরাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুর এই মন্দিরটিকে মেরামত করিয়া যান। তাহার পর মন্দিরটি মেরামত করা হয় নাই। সুতরাং বর্তমানে ইহার অবস্থা একেবারে খারাপ না হইলেও ভাল না।

শ্রী শ্রী মাতা মহারানিগণ ইচ্ছা করিলে কিছু টাকা দান করিয়া এই মন্দিরটি মেরামত করিয়া দিতে পারেন।

উদয়পুর ফিরিতে প্রায় ১ টা বাজে। দুপুরে খাওয়ার পর ২।। টায় D.O অফিস পরিদর্শন করিতে Mr. Das and Pulley- র সহিত যাই। অফিস ঘরটি টিনের এবং বেশ বড়। ক্রমশঃ এই সকল অফিস দালান করিয়া ফেলিলে ভাল হয়।

বিকালে হাতীতে করে একটু বাহির হই এবং রাধা কিশোর বাজার ইত্যাদি দেখি। বাজারটি সুন্দর। মধ্যে একটি প্রকান্ড রাস্তা ও রাস্তাটি সোজা। দুই পাশে দোকান। বাজারটি লম্বায় আধ মাইলের উপর হইবে। বাজারের আয় ৪০০/৫০০ টাকা। একটি চান্দিয়ানা মহাল স্থাপিত হইলে আয় প্রায় ২০০্ বৃদ্ধি পাইবে।

উদয়পুর ডিভিশনে শালগড়া নামে আর একটি বাজার আছে তাহাতেও চান্দিয়ানা মহাল নাই। সেখানে চান্দিয়ানা মহাল হইলে ৪০০ টাকা আয় বৃদ্ধি হইবে।

২৯-০১-২৫ ইং

আজ সকালে ৯টায় ৺গোবিন্দ মাণিক্যের রাজবাড়ি দেখিতে যাই। রাজবাড়িটি একটি উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত ইহার পশ্চিমদিকে গোমতী নদী প্রবাহিত এবং অন্যদিকে খাল। ইচ্ছা করিলেই গোমতীর জলে খালটি পূর্ণ করা যায়। অতএব এই রাজবাড়ীতে শত্রু প্রবেশ করিতে সহজে পারে না। উদয়পুরে পুরান দালানের মধ্যে এই রাজবাড়িটি সকলের চেয়ে বড়। ইহার বর্তমান অবস্থা একেবারে খারাপ হয় নাই। এই রাজবাড়িটিকে রক্ষা করা উচিৎ মনে করি।

উদয়পুরে ফিরিতে ১টা বাজে। খাওয়া দাওয়ার পর Mr. Das এবং Col. Pulley- র সহিত অফিস পরিদর্শন করিতে যাই। Mr. Das inspection note লেখেন। বিকালে হাতিতে করে বেড়াতে বাহির হই।

৩১.০১.২৫ ইং

সকাল ৯ টা হইতে ১০টা পর্যন্ত স্থানীয় জমিদার এবং ভদ্রলোকের সহিত দেখা করি। এখানে অনেক জমিদার আছেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বাঙালী ভদ্রলোক। সুখের বিষয়, জমিদারদের মধ্যে অনেকেই এ রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হইয়াছেন। উদয়পুরে অনেক বাঙালী ভদ্রলোকও স্থায়ী বসত করিয়াছেন।

১০টা হইতে ১২ টা পর্যন্ত পার্বত্য প্রজা ও তাহাদের সর্দারদের সহিত দেখা করি। প্রায় তিন শত পার্বত্য প্রজা আসিয়াছিল। এই তিন শতের মধ্যে পুরান ত্রিপুরা ছিল না। রিয়াং, জমাতিয়া, রূপিনী, নোয়াতিয়া ইত্যাদির সংখ্যা বেশী ছিল। হালামদের মধ্যে প্রায় সকল দফার লোকই আসিয়াছিল। পার্বত্য প্রজাদের মধ্যে জমাতিয়া সবচাইতে উন্নত। তাঁহারা পাঁঠা, হরিণের মাংস ভিন্ন অন্য মাংস খায় না। তাহারা মাছ খায়। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই চাষ করে। তাহাদের সর্দারগণ একটি স্কুল প্রার্থনা করে। বর্তমানে উদয়পুরে একটি M.E স্কুল আছে। তাহা তাহাদের বসতি হইতে অনেক দূরে। সেইজন্য তাহাদের ছেলেরা উদয়পুর আসিয়া পড়িতে পারে না। তাহাদের জন্য একটি স্কুল তাহাদের বসতির নিকটে হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি।

জমাতিয়াদের মধ্যে অনেক ভেকধারী বৈরাগী হইয়াছে। এবং তাহারা জমাতিয়া জাতির উন্নতি না করিয়া অবনতি করিতেছে। তাহারা ৩ / ৪ টি বৈষ্ণবী রাখে, কিন্তু ঐ সকল বৈরাগীদের

সন্তানাদি হয় না। ইহা জমাতিয়াদের মধ্যে বৃদ্ধি পাইলে, তাহাদের লোকসংখ্যা ক্রমশঃ কমিয়া যাইবে। ইহা নিবারণ করিবার জন্য জমাতিয়া সর্দারগণ আমার নিকটে আবেদন করে।

সকল পার্বত্য প্রজার জন্য সরকার হইতে খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়। এবং তাহাদের সকলেই আগরতলার হসম্ ভোজনের মত এক সঙ্গে বসিয়া খায়। সুখের বিষয় তাহারা এখানে আগরতলার মত কোন বিষয়ে কম ইত্যাদি বিষয় লইয়া গোলযোগ করে নাই। অথচ এখানে অনেক লোক হইয়াছিল। এবং খাদ্যদ্রব্য আগরতলা হইতে কম ছিল। ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার মনে হয় ইহা আগরতলার বাতাসের দোষ।

Mr. Das এবং Col. Pulley- র সহিত বিকালে ২ টায় শালবনের দিকে রওয়ানা হইলাম। উদয়পুর হইতে শালবন প্রায় ৬ মাইল হইবে। শালবনে পৌছিতে প্রায় ৪টা বাজে। শালবনটি বড়। ফরেষ্ট অফিসারের নিকট জানিতে পারিলাম যে এই বনটি প্রায় ৬ মাইল লম্বা এবং প্রস্থে প্রায় ১ মাইল। বর্তমানে শালবনটি রিজার্ভ হইলেও গরু ইত্যাদি আসিয়া ছোট ছোট শালগাছ খায়। প্রায়ই আগুন লাগে। সুতরাং বেশি পরিমাণ গাছ জন্মিতে পারে না। এই সকল নিবারণ না হইলে নূতন শালগাছ বেশি পরিমাণে হইতে পারিবে না। এই শালবনে বড় গাছ আর নাই। সব কাটা হইয়া গিয়াছে। এবং প্রত্যেক বৎসর আয় কমিয়া যাইতেছে। গাছগুলি এমনভাবে কাটা উচিত যে সর্বদা আয় এক প্রকার থাকে। বন যেন নষ্ট না হয়। শালবন হইতে ফিরিতে প্রায় ৬ টা বাজে।

১.০২.২৬ ইং

আজ সকালে আমরা ১০টায় উদয়পুর হইতে রওয়ানা হইলাম। প্রায় ১টায় কাঁকড়াবন পৌছিলাম। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করিয়া বিকালে ৩ টায় কয়লার খনি দেখিতে হাতিতে রওয়ানা হইলাম। স্থানটি আমাদের ক্যাম্প হইতে ২।। মাইল হইবে। সেখানে পৌছিতে ৪ টা বাজে। কয়লার স্তরটি একটি লোঙ্গার ভিতর। সে স্থানে হাতি যায় না। সেখানকার নোয়াতিয়া প্রজাগণ আমাদের জন্য একটি টংঘর আগেই প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। বলাবাহুল্য, ওরা নানা রকম ফল, শিং ইত্যাদি অনেক জিনিষ নজর দিবার জন্য প্রস্তুত রাখিয়াছিল। আমরা সেস্থানে হাতি হইতে নামিলাম। আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, উহা এখনো সম্পূর্ণরূপে কয়লায় পরিণত হয় নাই। আমরা উপরে উঠিয়া কিছু জলযোগ করি। ক্যাম্পে ফিরিতে ৬টা বাজে। রাত্রে কাঁকড়াবনেই ছিলাম।

২-২-২৫ ইং

আজ সকাল ৭ টায় শিকার করিবার জন্য আমরা হরীজলায় গেলাম। Mr. Das আমাদের সঙ্গে আসিতে পারেন নাই। তাহার কলিকাতায় কাজ ছিল। তাই তিনি কুমিল্লায় চলিয়া গিয়াছিলেন। শিকারে একটি হরিণ পাইয়াছিলাম। শিকার হইতে ফিরিতে ১ টা বাজে। বিকালে হাতি করিয়া বেড়াইতে বাহির হই।

৩ - ২ - ২৫ ইং

আজ সকালে খাওয়া - দাওয়া করে বেলা ১২ টার সময় কাঁকড়াবন হইতে রওয়ানা হই এবং প্রায় ২টায় মেলাঘর পৌছি। সে স্থানে D.O সোনামুড়ার আমাদিগকে সুন্দররূপে অভ্যর্থনা করেন এবং প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য রাখেন। আধ ঘন্টা বিশ্রাম করি। তারপর

সোনামুড়ার দিকে রওয়ানা হই। সোনামুড়া পৌঁছিতে ৪ ।। টা হয়। আমরা সোনামুড়া না থামিয়া একেবারে বিবির বাজার আসি। এবং মোটর যোগে কুমিল্লায় ৫। / ৫।। টায় পৌঁছি।

এই বলিতে চাই যে সব স্থানেই প্রজার অগাধ রাজভক্তি দেখি। এবং তাহারা ভালরূপে সব স্থানেই অভ্যর্থনা করে। কর্মচারীবৃন্দও আমাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্বদা সব স্থানে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এজন্য আমি প্রজা সাধারণ ও কর্মচারীবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি;

ইতি

শ্রী বীরবিক্রম মাণিক্য।

মহারাজ বীর বিক্রমের ভ্রমণপঞ্জীতে দেখা যাচ্ছে ৩১ শে জানুয়ারি, ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি উদয়পুর শহরে। ঐদিন সকাল ৯ টা থেকে ১০ টা, এক ঘন্টা '' স্থানীয় জমিদার এবং ভদ্রলোকদের সঙ্গে'' দেখা করেন বা সাক্ষাৎ দেন। তার কথায় '' এখানে অনেক জমিদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ বাঙালী ভদ্রলোক।'' এবং তিনি সন্তোষ ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে ''সুখের বিষয়, জমিদারদের মধ্যে অনেকেই এই রাজ্যের বাসিন্দা হইয়াছেন। উদয়পুর অনেক বাঙালী ভদ্রলোকও স্থায়ী বসতি করিয়াছেন''। অর্থাৎ বসতি বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে। উপজাতি সমাজের পাশাপাশি বাঙালী বসতি ও উদয়পুরে গড়ে উঠেছে। ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে স্বাধীন ত্রিপুরার সখ্যতা হেতু নাগরিকদের দুই রাষ্ট্রে যদৃচ্ছ যাতায়াতের কোন বাধা নেই। এমনটি এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্যরাষ্ট্রে সম্পত্তি ক্রয়েও বাধা নেই। তবে এরা সকলেই বৃটিশ ভূখন্ডের হলেও, মহারাজের জমিদারী থাকলে রোশনাবাদের অধিবাসী সুতরাং তার প্রজা। এবং তথ্য প্রমাণ এটাই বলে যে উদয়পুরের তৎকালীন বাঙালী বাসিন্দা অধিকাংশই কুমিল্লা ও ঢাকা থেকে আগত। কাজেই যাতায়াতের সহজগম্যতায় মহারাজ প্রতিবন্ধক হন নি। বরং তাঁর বক্তব্য থেকে পরিষ্কার যে এই বাঙালী নব্য বসতিকে তিনি স্বাগতই জানাচ্ছেন। এবং তারা বিশেষ মর্যাদায়.এবং গুরুত্বপূর্ণ ও মাননীয় নাগরিক মান্যতায় তাদের সঙ্গে সবিশেষ গুরুত্ব দিয়েই তিনি দরবারে আহ্বান করেছেন। উদয়পুরে তাঁর প্রথম আগমন উপলক্ষ্যে স্থানীয় নাগরিকদের পক্ষ থেকে যে মানপত্র পাঠ করা হয় ঐ মানপত্রের রচয়িতা ও পাঠক, অনুমানে অসুবিধা নেই, বাঙালী। এর ভাষাও বাংলা। এবং বেশ মাধুর্যময় সাবলীল ও পরিবেশ উপযোগী শব্দ সমন্বয়ে রচিত সেই মানপত্র। মহারাজ নিজেও প্রত্যুত্তরে বাংলা ভাষাই ব্যবহার করেছেন।

তিনি উদয়পুরে নাগরিক শ্রেণির মধ্যে যে বিত্তবান অংশের সাক্ষাৎ পেয়েছেন অর্থাৎ ভূস্বামী, জমিদার, তালুকদার তারাও বাঙালী। মহারাজের ভ্রমণপঞ্জীতে তাদের নামোল্লেখ নেই। তবে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এদের কেউ কেউ ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরের লোক। কিন্তু জমিদারী টা ত্রিপুরা রাজ্যের ভেতরে। তবে অধিকাংশই ত্রিপুরাকে ভালবেসে ত্রিপুরায় স্থায়ী বাসে থিতু হয়েছে। অর্থাৎ জনবিন্যাসের নিরীখে উদয়পুর নূতনভাবে গড়ে উঠছে।

মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য — ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগতভাবে কোন একজন বা জমিদার গুচ্ছের নাম করেন নি। তবে ২৭ শে জানুয়ারি ১৯২৫ তারিখে কাঁকড়াবন থেকে উদয়পুরের পথে জামজুড়ীতে দুপুর ১২ টায় পৌঁছান এবং খানিক বিশ্রাম নেন। সেদিনের

বিবরণে জামজুরীর তৎকালীন তালুকদারের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। তার ডায়েরীতে লিখা হয়েছে জামজুরীর তালুকদার শ্রীযুক্ত দ্বারিক ব্যানার্জী (ত্রিপুরা প্রশাসনে বর্তমানে উচ্চপদাসীন সৌমিত্র ব্যানার্জী, তার পিতা সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী, খুল্লতাত অর্কপ্রভা ইন্দুপ্রভ ব্যানার্জী এরা নিকট অতীতে প্রশাসনের উচ্চপদাধিকারী — এদের পূর্বপুরুষ হলেন দ্বারিকানাথ) এখন প্রায় জামজুরীতেই স্থায়ীভাবে বাস করেন। তিনি একটি বাঙালী ভদ্রপল্লী স্থাপন করিয়াছেন এবং জামজুড়ী স্থানটিকে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সুন্দর করিয়াছেন এবং নিজের বাড়িটিও দু-তলা টিনের ঘর করিয়াছেন।"

দ্বারিকানাথবাবুর নামোল্লেখের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। রাজা খুশি হওয়ার কারণ হল দ্বারিকানাথ বাবুর মধ্য দিয়ে রাজাদের একটি লক্ষ্য পূরণ হচ্ছিল। পার্বত্য ত্রিপুরাকে আবাদ করা জনবহুল করার লক্ষ্য সেটি। দ্বারিক নাথ উদ্যোগ নিয়ে বসতি নূতন স্থাপনে তৎপর হয়েছে, এটাই বিশেষ উল্লেখের কারণ নিশ্চই। অধিকন্তু আবাদের উদ্যোগ।

১৯২৫ সালে বীর বিক্রম উদয়পুরে। উদয়পুরে বসতি বিস্তার বাঙালীদের দ্বারা তার আরো আগে। বীর বিক্রমের ঐ ভ্রমণপঞ্জীতে এর উল্লেখ রয়েছে। রাধা কিশোর মাণিক্যের সময়ে বন্দোবস্ত প্রাপ্ত এক তালুকদারের কথা উল্লেখ করেছেন। কাঁকড়াবনের হুরিজলা তাঁর তালুকের অংশ ছিল। লিখেছেন " জলাটি পূর্বে একজন তালুকদারের ছিল, ঐ তালুকদার রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময় সরকার হইতে বন্দোবস্ত লয়। কিন্তু গোমতীর জলে প্রত্যেক বছর ডোবাতে তালুকদার ঐ জলার অনেকটা ছঁড়িয়া দেয় এবং আরেকটি স্থান তৎপরিবর্তে লয়, জলাটি ২০০ / ৩০০ দ্রোণ। ইহাও আবাদ হইতে পারে।" জনবসতি, নূতন বাঙালী জনবসতি, উদয়পুর শহরের ব্যাপ্তি ছড়িয়ে বিশালতা পাচ্ছে। এ একেবারে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। ন্যূনপক্ষে বীর বিক্রমের উদয়পুর সফরের ২৫ বছর আগের কথা। আজ থেকে ১১০ বছরের আগের।

বীর বিক্রম উদয়পুরে ১৯২৫ সনের গোড়ায় জানুয়ারী মাসে, যে সব ভদ্র সমাজ এবং জমিদার তালুকদারের দরবারে আহ্বান করেছিলেন পূর্বেই উল্লেখ করেছি তাদের নাম তিনি উল্লেখ করেন নি। ১৯২৫ - এর পাঁচ বছর পরে ১৯৩০ -এ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মশাইয়ের উদয়পুর বিবরণ-এ এদের কতিপয়ের নামোল্লেখ রয়েছে। তাঁর তালিকায় উদয়পুর বিভাগের ১৭ জন ভূম্যাধিকারীর নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ রয়েছে। এরা হলেন ঃ—

১। কালীকিশোর চৌধুরী, তালুকদার। (সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রী সভার অর্থমন্ত্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী এবং বিশিষ্ট চিকিৎসক হিমাদ্রী চৌধুরীদের পরিবার)। কাঁকড়াবন গং স্থানের ১ নং তালুক। জমির পরিমাণ ২৮২ দ্রোণ, জমা মং ১৮৭১ টাকা। ১৩০৮ ত্রিং, সনে। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে এই কায়েমী তালুক মঞ্জুর হইয়াছে। ইনি কুমিল্লা বাস করেন।

২। মহেন্দ্র চৌধুরী, বি. এল- আমতলী গং স্থানের কায়েমী তালুক। জমির পরিমাণ ২০০ দ্রোণ, জমা মং ১৬০২ টাকা।

৩। দীনেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় গং — বার ভাইয়া প্রভৃতি স্থানে ৩ নং কায়েমী তালুক। জমি ১০৫ দ্রোণ, জমা ১৩৪৬ টাকা। মৃত যশোদা কুমার বন্দোপাধ্যায় নামে বন্দোবস্ত ছিল। এদের বাসস্থান ঢাকা জিলায়।

৪। দ্বারকানাথ বন্দোপাধ্যায় ও প্যারী কিশোর দাস গুপ্ত ৪নং কায়েমী তালুক জমির পরিমাণ ১০৪ দ্রোণ, জমা মং ৭৬৯৲ প্যারী কিশোর দাস গুপ্তের মৃত্যু হইয়াছে। তাহার ওয়ারিশগণ কুমিল্লায় বাস করেন। দ্বারিকা নাথ বন্দোপাধ্যায় তালুক মধ্যে জামজুড়ি নামক স্থানে বাসাবাড়ি প্রস্তুত করিয়াছেন; অধিকাংশ সময় এখানেই থাকেন। ইনি ওকালতী করতেন। কুমিল্লায় ও বাসাবাড়ী আছে। ১৯২৫ - এ মহারাজ বীর বিক্রম লিখেছেন স্থায়ীভাবে জামজুড়ী থাকেন। (মনে হয় যে উকীল বীর বিক্রমের উদ্দেশ্যে উদয়পুরবাসীর পক্ষে মান পত্র রচনা ও পাঠ করেছিলেন তিনি দ্বারিকা নাথই হবেন। মহারাজ উল্লিখিত দ্বারিকা নাথই ব্রজেন্দ্র দত্ত উল্লিখিত দ্বারকা নাথ। উভয়েই এক ব্যক্তি)।

৫। দ্বারকা নাথ বন্দোপাধ্যায়, প্যারী কিশোর দাস গুপ্ত এবং মিঃ দ্বিজদাস দত্ত এক যোগে পালাটানা গং স্থানের ৫ নং কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত নিয়াছিলেন। মিঃ দ্বিজদাস বিলাত প্রত্যাগত কৃষি তত্ত্ববিদ্। এই স্থানে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিক্ষেত্র করা তাঁহার অভিপ্রায় ছিল, কিন্তু তাহার অংশ বিক্রয় করায়, এখন এই তালুকের দ্বারকানাথ বন্দোপাধ্যায়। জমির পরিমাণ ২১০ দ্রোণ, জমা ১৩২৮৲।

৬। উপেন্দ্র নাথ বসু গং, মির্জা গং স্থানের জমিদার। ভূমির পরিমাণ ৫৫৪ দ্রোণ, জমা ২৯৪৫ টাকা। পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ গং সহিত এই কায়েমী জমিদারী, হুরিজলা গং স্থানে মঞ্জুর হইয়াছিল। পরে স্থানের এওয়াজ পরির্বতন (কারণ বীর বিক্রম উল্লেখ করেছেন, গোমতীর জলে বন্যা) ও ভূম্যধিকারীর পরির্তন হইয়া বর্তমান অবস্থায় আছে। ইহাই এই রাজ্যে একমাত্র জমিদারী। দীর্ঘকাল যাবত শালবন ও খাস মহালের সহিত ইহার সীমান' ্র্কে চলিতেছে। উক্ত জমিদারগণ ভিন্ন রাজ্যবাসী। ১৩১৩ ত্রিং সন, ১৯০৩ ইং সনে এই জমিদারী মঞ্জুর হইয়াছে।

৭। কর্ণেল মহিম চন্দ্র দেববর্মা নামীয় বগাবাসা গং স্থানের ৭ নং কায়েমী তালুক। ১৩১৫ ত্রিং ১৯০৫ ইং সনে সূর্যদাস ঠাকুর নামে মঞ্জুর হইয়াছিল। জমির পরিমাণ ৮৩ দ্রোণ, জমা ৮৮৭৲ টাকা।

৮। রজনী কান্ত ভট্টাচার্য — ইনি উদয়পুরের একজন উকিল। এই রাজ্যে স্থায়ীভাবে বাস করার সর্তাদিতে ১৩১৭ ত্রিং ১৯০৭ ইং সনে এই কায়েমী তালুক প্রাপ্ত হইয়াছেন। জমির পরিমাণ ২৭ দ্রোণ, জমা ১৭৬৲ টাকা।

৯। শশাঙ্ক মোহন ঘোষাল — উদয়পুর স্কুলে পন্ডিতের কার্য করিতেন। এখন ভিন্ন রাজ্যবাসী। স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য মোঃ ।। (অর্দ্ধ) কানি জামি ৪। (চার টাকা চার আনা) জমায় কায়েমী বন্দোবস্ত প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন। এই স্থান বিজয় সাগরের (মহাদেব দিঘি) এক পার্শ্বে। ব্রাহ্মণ ও ভদ্রশ্রেণির স্থায়ী প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এই বন্দোবস্ত দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু কার্যতঃ তাহা সিদ্ধ হয় নাই।

১০। হরিভক্ত সিংহ গং — ইহারা নেপালী ক্ষত্রিয়। ফুল কুমারী মৌজায় ঐ কায়েমী তালুক। জমির পরিমাণ ৭৬ দ্রোণ, জমা ৪৮৮ টাকা। ১৫ নং কায়েমী তালুকও তাহাদের।

১১। দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস ও বসন্ত কুমার সেন — ইহারা দুই জনই স্থানীয় উকীল। দ্বারকা নাথ রায় গং সহিত এই কায়েমী তালুক বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ইহা মাতাবাড়ী মৌজায়। জমি ১১ দ্রোণ, জমা ৭১ টাকা। বাঙালী হিন্দু প্রজার উদ্দেশ্যে এই তালুক মঞ্জুর হইয়াছিল।

১২। বসন্ত কুমার সেন — ১২ নং কায়েমী তালুক ইহার নিজ নামে বন্দোবস্ত। জমি ১০ দ্রোণ, জমা ১৩১ টাকা টাউনের সন্নিকটে ছনবন নামক স্থানে এই তালুক।

১৩। প্রভাস চন্দ্র রায় — ইনিও স্থানীয় উকিল। স্থায়ীভাবে তালুক মধ্যেই বাস করিতেছেন। জমির পরিমাণ ২ দ্রোণ, জমা ২৪ টাকা।

১৪। রমেশ চন্দ্র ভদ্র গং — বিভাগীয় অফিসের সেরেস্তাদার কৈলাস চন্দ্র ভদ্র মহাশয় স্থায়ী ভাবে বাসের উদ্দেশ্যে এই কায়েমী বন্দোবস্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জমি ২ দ্রোণ, জমা ১৭।

১৫। নন্দ কুমার চক্রবর্তী গং — কমলা সাগর দিঘির পার্শ্ববর্তী এই স্থান। ব্রাহ্মণেরা স্থায়ীভাবে বাসস্থানের জন্য এই কায়েমী বন্দোবস্ত লইয়াছিল। জমি ১০ দ্রোণ, জমা ১০৭ টাকা। বাকি রাজস্বের দায়ে নীলাম হইলে ৮ নং তালুকের মালিক রজনীকান্ত ভট্টাচার্য বিশেষ সর্তাদি স্বীকারে খরিদক্রমে বর্তমান দখলদার হইয়াছেন।

১৬। ঈশ্বরচন্দ্র চৌধুরী — ইনি বীরগঞ্জ থানার দারোগা এবং স্বনাম খ্যাত রিয়াং সর্দার তৈথিলা চৌধুরীর পুত্র। ফুল কুমারী মৌজায় স্থায়ী বাসস্থান আছে। জমি ৩৯ দ্রোণ, জমা বার্ষিক ৪৯৭ টাকা।

১৭। নীল কৃষ্ণ সাহা — উদয়পুরে এদের তিল কার্পাস ইত্যাদির কারবার আছে। ১৭ নং কায়েমী তালুক পিত্রায় অবস্থিত। জমির পরিমাণ ১৩ দ্রোণ, জমা ১৪৫ টাকা।

পূর্বোক্ত তালুক ছাড়াও ব্রজেন্দ্র দত্ত উল্লেখ করেছেন আরো তখসিসি তালুকও আছে। একটি নীল কণ্ঠ সেন, কুমিল্লার এক উকীলের নামে অপরটি রজনী কান্ত ভট্টাচার্যের নামে।

লক্ষণীয় বাঙালী বসতি বিন্যাস সোনামুড়া থেকে উদয়পুর শহরের দিকে বিস্তার ঘটছে। রাজারাও চাইছেন বাঙালী প্রজা বৃদ্ধি হোক। ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ রাজ্যে আসুক। বন্দোবস্তের সর্তের মধ্যেই ঐ উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। বাঙালী নেতৃস্থানীয়রাও চাইছেন সোনামুড়া থেকে উদয়পুর পর্যন্ত সড়ক পথে উন্নতি ঘটানো হোক। যান চলাচলের উপযুক্ত হোক। উদয়পুরে মহারাজ বীর বিক্রমের উদ্দেশ্যে দেওয়া মান পত্রে সকল দাবীই উল্লেখ করা হয়েছে। তার অন্যতম ছিল ঐ সড়কের উন্নতি। ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণ এবং যাতায়াত স্বচ্ছন্দ করার জন্যেই এর উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় বসতি বিন্যাসে রাজাদের পছন্দ ও লক্ষ্য নির্দিষ্ট রয়েছে যার পশ্চাতে রয়েছে উৎকর্ষতা ভাবনা।

বৈরাগী অর্জুন দাস ঃ

এই নব জনবসতির বয়স ৩০ /৩৫ বছর পূর্বে শুরু। বড় জোর ৪০ বছর। অর্থাৎ ১৯২৫ থেকে ৪০ বছর পশ্চাতের। তবে কি প্রাচীন রাজধানী উদয়পুর চিরকালই অরণ্যাবৃত জনবর্জিত অপকর্ষের মালিন্যে অনুল্লেখ্য ছিল? ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে কৃষ্ণ মাণিক্যের সময়ে উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৭২৪ সালে আসামের তৎকালীন রাজা স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের প্রতিনিধি রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস রৈবাগী "ত্রিপুরা বু. কুঞ্জী" [illegible] ভাষায় "ত্রিপুরা দেশের কথা" পুস্তকে তাঁদের ত্রিপুরা ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন। ১৭০৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এঁরা তিনবার ত্রিপুরার রাজ দরবারে আসেন ও রাজ্য পরিদর্শন করেন। তাঁদের সফর ছিল মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্য (১৭১২ -১৪ খ্রিঃ) এবং মহারাজ দ্বিতীয়

ধর্ম মাণিক্যের (১৭১৪ - ২৯ খ্রিঃ) রাজত্বকালে। তারা রাজ্যের ও রাজধানীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। ঐ বর্ণনাতে খুঁটিনাটি বিষয়ও বাদ যায় নি। ঐ বর্ণনা থেকে রাজ্যের বলিষ্ঠতা ও সম্পদের পরিমাপ করতেও অসুবিধা হয় না। রাজবাড়ির বর্ণনাটি সংক্ষিপ্ত এবং নিম্নরূপ ঃ—

" ত্রিপুর রাজার বাড়ির চারিদিকে ইষ্টক নির্মিত ঘর। ইহার উচ্চতা ৬ হাত সমান হইবে। পরিধি হিসাবে স্বর্গদেবের (আসামের রাজা) রংপুরের ভিতরের দুর্গটির সমান হইবে। এই দুর্গটির সম্মুখে ঐ ইটের তৈয়ারী গড়ের সঙ্গে লাগাইয়া মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে; ইহার উচ্চতাও পূর্ব কথিত গড়টির মতন হইবে। উভয় গড়েের দূরত্ব আমাদের দারিকিয়াল দুয়ার হইতে বড় চরার মাথায় রাস্তার দূরত্বের অনুমান অর্দ্ধেক হইবে। এই একটি দুর্গ। এই দুর্গের দুয়ার দক্ষিণ মুখী ইহাতে পূবে পশ্চিমে লম্বা একটি কুঁজিঘর আছে। এই ঘরের দুইদিকে ইষ্টক নির্মিত ভিটা আছে। ইহা উচ্চতায় অনুমান ৫ হাত হইবে। মাঝখানে রাস্তা। এই রাস্তা দিয়া জোড়া হাতি যাইতে পারে। এই ঘরের কোন দুয়ার নাই। সারাদিন খোলা থাকে।

এই ঘরে তীর, ধনুক, গাদা বন্দুক, ঢাল, তরোয়াল লইয়া ৪০ জন লোক সহ একজন হাজারী থাকে। এই ঘরটিকে রূপার দুয়ারী ঘর বলে। পূর্বের এই ঘরের দুয়ারে রূপার পাত মারা ছিল এবং উপরে রূপার ঘট ছিল। এই জন্যে ইহাকে লোকে রূপার দুয়ারী ঘর বলে। রত্নমাণিক্য রাজার পিতা রাম মাণিক্য রাজার সময়ে এই ঘরটি পুড়িয়া যাওয়ার পর হইতে আর উহাতে রূপার ঘট বা দুয়ার নাই।

এই ঘরের পূর্ব দিকে অনুমান এক বাঁও (৪ হাত) ভিতরের দিকে ইষ্টক নির্মিত ভিটার উপরে একটি চৌচালা ঘর আছে; তাহাতে রাজা দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন। এই ঘরের নিকটে অনুমান ৩০ হাত উচুঁ একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে দোলযাত্রা উৎসব হয়। এই মন্দিরের উপরিভাগে ছন ও বাঁশ দিয়া চারিচালা ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। পশ্চিম দিকে ইটের তৈয়ারী বিষ্ণুর ও শিবের দুইটি মন্দির আছে। ঐগুলিও উচ্চতায় প্রায় ২০ হাত হইবে। এই দুই মন্দিরের সম্মুখে ইটের ভিটার উপর ছন বাঁশের ছাউনী দেওয়া একটি চৌচালা ঘর আছে। সেই ঘরের ভিটা হইতে এক হাত অনুমান উঁচু করিয়া মানুষ আরাম করিয়া বসিবার জন্য বাঁধিয়া দিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিদিকে চারিটি চাল দিয়াছে, কিন্তু তাহাতে বেড়া নাই। এই ঘরে ৮ জন ব্রাহ্মণ দিন রাত অবিরাম পালাকীর্তন গান করে। বিষ্ণু মন্দিরে পাথরের তৈরি লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে গোপীনাথ নামে বিষ্ণুর মূর্তি আছে; এই বিগ্রহ ব্রাহ্মণ পূজা করে। শিবের মন্দিরে পাথরের তৈরি গণেশ ও কার্তিকের সঙ্গে বৃষ আরোহনে শিবের মূর্তি আছে, সেখানেও ব্রাহ্মণে পূজা করে। এই দুই জায়গার নির্মাল্য প্রতিদিন রাজাকে দেওয়া হয়।

রূপার দুয়ারী ঘর হইতে কিছু দূর গিয়া আড়াআড়িভাবে কাঠ ও বাঁশের তৈরি একটি কুঁজি ঘর আছে ঐ ঘরে শাল কাঠের খুঁটি দিয়া তাহাতে কলকা কাটিয়া শির তুলিয়া দিয়াছে, বাহিরের দুই মাথায় ঠাকুরার মুখ কাটিয়া ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের কাঠি, কাইম, রুয়া, পাট, বেত সমস্তই ঘোর রক্তবর্ণ করিয়া রং করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাইমের উপরে লম্বা শীতল পাটি বিছাইয়া দেওয়া হইয়াছে, উহার উপরে ছন দিয়া ছাওয়া হইয়াছে। সেই ঘরের উপরে একটি সোনার ঘট দেওয়া হইয়াছে। এই ঘরের মধ্য দিয়া রাস্তা। রাস্তার দুই

ধারে আট হাত পরিমাণ উঁচু ইটের ভিটা। ইহাকে সোনামুখী দুয়ারী বলে। এই ঘরের দুই ধারে ভিটার উপরে পাটী বিছায়, পাটের উপরে গালিচা পাতে। এই গালিচায় বসিয়া বড় লোকেরা কথাবার্তা বলেন।"

রত্ন কন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগী দৃষ্ট " ত্রিপুরা রাজার দেশের বড়লোক ও পাত্র -মন্ত্রীদের" বর্ণনা ক্রমঃপর্যায়ে নিম্নরূপ ঃ রাজবংশীয় যুবরাজ একজন, রাজবংশীয় বড় ঠাকুর একজন। রাজ বৃত্তের বাইরে উজীর একজন, নাজীর একজন, নেমুজীর একজন ও কোতোয়াল মুছিব একজন। এছাড়া রয়েছেন দেওয়ান একজন। দূতদ্বয়ের বর্ণনায় জানা যায় ঐ দেওয়ান ছিলেন বাঙালী; এরা তাঁকে হিন্দু বলে উল্লেখ করেছেন। এরা ভূ-সম্পত্তি বন্দোবস্ত পেতেন। এদের সকলেই রাজার সচিবালয়ের পদাধিকারী। সোনার দুয়ারী ঘরে বসে এরা কাজ করতেন। সোনার দুয়ারী ঘরটিই ছিল রাজার সচিবালয়। এঁরা বলেছেন রাজা ঐ বসতেন না।

সোনার দুয়ারী ঘরের পূর্ব পার্শ্বে ছিল রাজার হাতিশালা। রাজার চড়ার জন্য নির্দিষ্ট দুটি দাঁতাল হাতি ছিল। তৎ সঙ্গে একটি কুনকী হাতি দুটিও। পশ্চিম দিকে ঘোড়াশালা, রত্ন কন্দলীরা অনুমান করেছেন ঘোড়াশালে আনুমানিক ১০০ (একশত) হাতি ছিল।

সোনার দুয়ারী ঘর থেকে খানিক দূরে ভিতরে, দুর্গের ইটের ঘরের লাগোয়া বাঁশ কাঠের একটি ঘর ছিল। ভিট ইটের। উচ্চতায় ৭ হাত, দেয়াল ইটের। প্রথম তিন কোঠার পর রাস্তার উপর আড়াআড়ি ভাবে ইটের দেয়াল; ভিতরে আরো দুটি কোঠা। ভেতরের দুই কোঠায় রাজার সেবকদের ছাড়া অন্যের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবলমাত্র রাজার অনুমতিতেই ভিন্ন ব্যক্তির প্রবেশাধিক ছিল। ঘরের ভিতর দিকে রাজার অন্দর থেকেযাতায়াতের জন্য একটি রাস্তা ছিল। ভেতরের দুটি ঘর ছিল রাজার বসার ঘর। সেই ঘরে খাট পাতা। উপরে রঙিন পাটি বিছানো। তার উপর গালিচা পাতা। তার উপর হাতির দাঁতের সিংহাসন। সিংহাসনের উপর পাট কাপড়ের গদি; তার উপরে বনাত পাতা, ঐ বনাতের চার ধার সোনার ঝালর দেওয়া। সিংহাসনের উপরে কিংখাব কাপড়ের তৈরি বালিশ। রাজা সেই সিংহাসনে বসেন। ঐ ঘরের তিন কোঠা জুড়ে একটি কার্পাস সুতার তৈরি চান্দোয়া খাটানো। ঘরের খুঁটিগুলি কার্মজের কাপড় দিয়ে মোড়ান। চান্দোয়ার মধ্যবর্তী গোলাকৃত অংশে সোনার কাজ করা। ঘরটিকে সিংহাসন ঘরও বলা হত। কারণ সহজবোধ্য।

রত্নকন্দলী শর্মার দৃষ্টি আরো দূরে প্রসারিত ছিল। তিনি লিখছেন " ঘরের ভিতর দিকে দুইটি কোঠায় রাজার জন্য সুপারী কাটা হয় এবং রাজার সেবকেরা থাকে। ভেতরে যাকে রাজা ডাকে কেবল সেই যাইতে পারে। এই ঘরের পশ্চিম দিকে অনুমান তিন বাঁও (বার হাত) দূরে একটি দুয়ার আছে। তাকে লোকে খিড়কি দুয়ার বলে। তার উপরে কোন ঘর নাই (মনে হয় কোন আচ্ছাদন না থাকার কথা বলছেন)। দুই ধারে দুটি খুঁটা বসাইয়া তাহার উপরে একটি পাট পাকায়া একচালা বানান হইয়াছে। নীচে গড়খাতের ভূমির সামনে প্রধান দুয়ার অবস্থিত। সেই দুয়ারের পশ্চিম দিকে গড়ের কিনারায় একটি ঘোড়াশাল আছে। সেখানে রাজা চড়িবার জন্য দুইটি তুর্কী, দুইটি তাজী এবং দুইটি মেখ্‌লী রাজার আনা টাঙ্গন ঘোড়া, মোট ছয়টি ঘোড়া আছে।

সেই দুয়ার হইতে অনুমান ৪ বাঁও ষোল হাত দূরে একটি চৌচালা ঘর আছে। সমস্ত ঘর

জুড়িয়া একটি কার্পাস তুলার সুতার তৈরি একটি চান্দোয়া খাটানো আছে। সমস্ত ঘরে ধারী পাতা, তার উপরে লাল পাটি, তার উপরে গালিচা। তার উপরে সুজনি পাতিয়া রাজা বসেন। রাজার সুজনিটি একটি টুকরা কাপড়ের উপর অল্প করিয়া তুলা দিয়া ফুল বানাইয়া তৈরি করা হইয়াছে। সুজনিটির চারিধারে পানের আকৃতিতে বনাত দিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে স্বর্ণ খচিত আছে। ঐ সুজনির উপর ছোট বালিশ চারটি এবং একটি বড় বালিশ আছে। কোন কোন সময় রাজা ইহার উপর বসেন। একদিন আমাদিগকে ঐ জায়গায় ডাকিয়া লইয়া যাওয়া হইয়া ছিল। রাজা এই ঘরে আসিবার জন্য একটি ইটের তৈরি রাস্তা আছে। সেই ঘরে ঈশান কোণে ইটের তৈরি একটি মন্দির আছে। সেই মন্দিরে রাজা পূজা আর্চা করেন।"

উদয়পুরে পুরাণ রাজবাড়ি, যা গোবিন্দ মাণিক্যের রাজবাড়ি বলে খ্যাত, তা গোমতীর দক্ষিণ পাড়ে। তবে অর্জুন দাস ও রত্নকন্দলী শর্মার বর্ণনা মতো রাজধানী শহর গোমতীর উভয় পার্শ্বেই বিস্তার লাভ করেছিল। উভয় পাড়ের ছবিই তাদের বর্ণনায় রয়েছে। ঐ বর্ণনায় যাওয়ার আগে আমরা মূল রাজবাড়ির আরো পার্শ্বে পরিক্রমা ও তাদের ব্রাহ্মণ করে নিতে পারি।

"সিংহাসনের ঘর হইতে লম্বায় ইটের গড় আছে। সেই গড় গিয়া পিছন দিকের গড়ের সঙ্গে লাগিয়াছে। সেই গড়ের ভিতরে রাজা থাকিবার জন্য ইটের ও ছনবাঁশের ঘর আছে। ভিতরের দুর্গের ঘর খাতের কিনারায় তা ল ও নারিকেল গাছ আছে। দুর্গের বাহিরে পূর্ব দিকে সোনার, রূপার ও অন্যান্য দ্রব্যের ভান্ডার আছে। রাজার পাটেশ্বরীর ভান্ডার আছে ও ছনবাঁশের তৈরি ১০ টি গড় আছে। ঐ সমস্ত ঘরে জিনিসপত্রও আছে। ঐ জায়গার পূর্ব দিকে অনুমান ১০০ শত বাঁও (চার শত হাত) দূরে দুইটি ইটের তৈরি মধুরী আছে। ঐগুলিতে গোলাবারুদ রাখা হইয়াছে। দুর্গের পূর্বের ও উত্তর দিকে ঢপলীয়া পর্বত সেখানে ত্রিপুরাদের ঘর বাড়ি আছে। তাহাদের বাড়িতে আম, কাঁঠাল, বেল, নারিকেল, তাল, সুপারি ইত্যাদি জন্মে। দুই দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত। এই পর্বতের মাঝে মাঝে ত্রিপুররা বাস করে। সেখানে আদা, তরমুজ, ধান, কার্পাস, কচু, কুমড়া, আলু, কাওন ইত্যাদি জন্মে।

এ ছিল তাঁদের রাজ-অন্দর বীক্ষণের বিবরণ। এবার চার বাড়ির বহির্চত্বরের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। তারও আনুপূর্বিক বিবরণ যেন চলমান তথ্য চিত্র অর্জুন দাস, রত্নকন্দলীরা দিয়ে যাচ্ছেন ঃ—

"দুর্গের পশ্চিম দিকে দুর্গের ঘরের কিছু দূরে গোমতী নদী বহিয়া যাইতেছে। দক্ষিণ দিকে রাজার বাড়ির দরশার সামনে একটি হাট আছে। এই হাটকে লোকে রাজহাট বলে। এই হাটে তামা, পিতল, হিং, লবঙ্গ, জাতিফল, কাপড়, কার্পাস, নুন, চিনি, বাতাসা, দুধ, ক্ষীর, ঘৃত, হলুদ গুঁড়া ইত্যাদি সকল দ্রব্য আসে।

এই হাটের মধ্য দিয়ে রাজপথ গিয়াছে। পথের দুই ধারে বণিক, ব্যাপারী এবং অন্য যাহারা বাজারে কেনা বেচা করে তাহাদের হাট উপযোগী লাগালাগি ঘর আছে। রংপুরের বড় দুয়ারের সম্মুখ হইতে জেরেঙ্গার পুকুর যতদূর অনুমান ততদূর ব্যাপী এরূপ লাগালাগি হাট উপযোগী ঘর রাস্তার দুই ধারে আছে। এই রাস্তার মধ্যে মধ্যে বাজার আছে। রাস্তার মধ্যস্থল হইতে অগ্নি কোণের দিকে অপর একটি রাস্তা গিয়েছে। এই রাস্তার দুই দিকে কেনাবেচা করার লোকেদের ঘর আছে, বাজারও আছে।

এই রাস্তার মাথায় ইটের ভিটার উপরে কাঠ ও বাঁশের তৈরি দুটি চৌচালা ঘর আছে। সেই দুই ঘরে চতুর্দশ দেবতার মূর্তি আছে। এই মূর্তির পূজা বছরে এক দফে হয়। দোমতায়া (চান্‌তাই, বা চন্তাই) নামে একদল লোক আছে তাহারা এই দেবতার পূজা করে। মহিষ, গবয়, শুকর, মুর্গী, হাঁস, কবুতর, পাঁঠা, হরিণ, মাছ, কচ্ছপ ও মদ দিয়া পূজা হয়। পূজায় রাজাও আসেন।''

এবার রাজধানীর জনবসতি তাদের জীবিকা ও ঐশ্বর্যের আঁচ পেতে হলে নির্ভর করতে হবে একমাত্র রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাসের উপরেই।

চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের পরেই গোমতী নদী ঘুরিয়া গিয়াছে। নদীর অপর পাড়ে (দক্ষিণ পাড়ে) জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত। সেখানে ত্রিপুরারা বসবাস করে। তাহাছাড়া মগদেশ বিজয় করিয়া যে সব লোক আনিয়াছে তাহাদিগকেও সেখানে বসান হইয়াছে। তাহারা ধান, কার্পাস ইত্যাদি শস্য উৎপাদন করে। রাস্তার পূর্বপার্শ্বে ঢপলীয়া পর্বত (গোমতীর দক্ষিণ পাড়ের অনুচ্চ পর্বত শ্রেণি, এখন এদের টীলা ভূমিই বলা হয়) তাহাতে ত্রিপুরারা বাস করে। ঐ পর্বতের কাছ হইতে দুর্গের কিনারা পর্যন্ত ত্রিপুরাদের ও বড়লোকদের বাড়ি আছে (এতে স্পাই হয় বর্তমানের রাজনগর, পূর্ব গকুলপুরে সম্পন্ন ব্যক্তিরাও বসবাস করতেন।) দুর্গের পশ্চিম দিকে বড় ঠাকুরের বাড়ি আছে।

গোমতীর অপর পার্শ্বে (বর্তমান উদয়পুর শহর) পূর্বে পশ্চিমে লম্বা একটি রাজপথ আছে (মনে হয় বর্তমান সেন্ট্রাল রোড) সেই রাস্তার উপরে নদীর ধারে একটি বন্দর আছে (বর্তমানের বড় ঘরের পেছন, সেখানে চল্লিশ বছর আগেও বর্ষায় ঢাকা থেকে বড় গয়না নৌকা এসে উদয়পুর -কুমিল্লার মধ্যে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ করত)। এই বন্দরে তামা, পিতল, কার্পাস, কাপড়, লবণ, তৈল, ঘৃত ও অন্যান্য জিনিস আসে। সেখানে লোকেরা তাদের ঘরে ধান, চাউল, ডাইল, সরিষা, তামাক পাতা সাজাইয়া রাখে এবং বেচা কেনা করে। প্রতিদিন রাত্রি প্রভাত হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্যন্ত লোকে সেখানে কেনাবেচা করে। রাস্তার উত্তর দিকে নদীর পাড়ে দুর্জয় সিং যুবরাজের বাড়ি আছে। তাহার বাড়ির চারিদিকে ইটের তৈরি গড় আছে। সেই গড়ের বাহিরে ইটের ভিটার উপর একটি চৌচালা ঘর আছে। সেখানে বসিয়া তিনি লোকজনের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সেই ঘরের উত্তর পশ্চিম দিকে বাঙ্গালী লোকদের বাড়ি আছে। হাটে যাহারা বেচা কেনা করে তাহাদের বাড়ি আছে। নগরের লোকদেরও বাড়ি আছে।

রাস্তার দক্ষিণ দিকে চম্পকরায় যুবরাজের একটি পুকুর আছে। (তালতলীর দিঘি, দিঘিটি বর্তমান শহরের মধ্যস্থলে এখন ব্যস্ত বাণিজ্যিক এলাকা এবং ঘন বসতি)। এই পুকুরের পশ্চিম দিকে একটি ইটের তৈরি দালান আছে। পুকুরের জলের মাঝখানে আট কোনা ইটের ভিটার উপরে আট কোনায় আটটি খুটা বসাইয়া তাহাতে কাঁসার পাত মারিয়া আট কোনা তামার দোলমঞ্চ তৈয়ার করা হইয়াছে। এই দোলমঞ্চে রাজা রত্নমাণিক্য কালিয় দমন অভিনয় করিয়া বসিয়া ছিলেন। পুকুরের চারি পাড় ইট দিয়া পাকা করা ছিল। ইহার পাড়ে ফুল, নারিকেল, বেল, ডালিম এই সকল গাছ ছিল।

রাস্তার উত্তর ধারে অনুমান আধপুরা জায়গা ঘেরাটি করিয়া পাথর দিয়া একটি গড়

বানানো হইয়াছে। উচ্চতা অনুমান পাঁচ হাত। গড়ের ভিতরটি পাথর দিয়া পাকা। ভিতরে পূর্বদিকে পাথরের তৈরি একটি মন্দির আছে। উচ্চতা অনুমান ২০ হাত। মন্দিরের পাথরের চতুর্ভূজ বিষ্ণু মূর্তি আরো উত্তরে অনুমান ১৮ হাত উচ্চতায় আরো একটি মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে বৃষভবাহন শিবের মূর্তি। ঐ জায়গায় পাথরের তৈরি একটি কুঁজি ঘর আছে সেখানে পাথরের দুর্গার দশভূজা মূর্তি আছে। তিন জায়গায় প্রতিদিন ব্রাহ্মণে পূজা করিয়া রাজাকে নির্মাল্য দেয়।

রাস্তার দক্ষিণ দিকে অমর সাগর নামে একটি দিঘি আছে। দিঘির পূর্ব পাড়ে ইট, কাঠ ও বাঁশ দিয়া তৈরি রাজবংশীয় দুইজন ঠাকুরের বাড়ি আছে। দুই জনের সঙ্গে নিশান লইয়া লোক যায়। নাগারা বাদ্য বাজাইয়া যায়। তাহাদের বাড়িতে প্রহরী পাহাড় দেয়।

এই দিঘির (অমর সাগর) চতুর্দিকের পাড়ে নগরের লোকেরা তাঁতী, স্বর্ণকার, কামার, কুমাড়, চামার, সূত্রধর, ধোপা, বাড়ই এই সকল লোকের বাড়ি আছে। ইহার পশ্চিম দিকে কিছু দূরে আরো একটি দিঘি আছে, এই দিঘির নাম বিজয় সাগর। ইহা বিজয় মাণিক্য রাজা কাটাইয়া ছিলেন। ইহার চারিপাড়ে নগরের লোকেদের বাড়ি আছে।

উক্ত দুই দিঘির মধ্যখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দৈবজ্ঞ, মালী এই সকলের বাড়ি আছে। এই দিঘির উত্তর পাড়ে চম্পক রায় যুবরাজের তৈরি ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে। তাহার পশ্চিমে রাম মাণিক্য রাজার কাটানো একটি নদী আছে, তাহার নাম রাম সাগর (খিলাড়া গ্রাম। রাম সাগর বিজয় সাগর অপেক্ষা ছোট।

রাম সাগরের দক্ষিণ পাড়ে রাজার পুরোহিত (বিজয় চক্রবর্তীর, জয় কুমার চক্রবর্তীর উর্ধ্বতন পুরুষ) সভাপন্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বাড়ি আছে। এই দিঘির দক্ষিণে ও পশ্চিমে দুই দিকে এক প্রহরের রাস্তা পর্যন্ত উন্নত গ্রাম (বর্তমান খিলপাড়া)। সেখানে লোকেরা চাষবাস করে। বাড়ি-খেরীও করে এবং গরু মহিষও রাখে। তাহার দক্ষিণ দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত।

রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগীর দেখা অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় রাজধানী উদয়পুর শহরের রূপটা ছিল এই রকমই। শহর ছিল গোমতীর দুই পাড়ে। দক্ষিণ পাড়ে রাজবাড়িকে ঘিরে একই ধারে বসতি বিন্যাস। সেখানে রাজ পুরুষ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের বাস। আর যাকে বলে আম জনতা, পেশাধারী মধ্যবিত্তরা বসতি করেছে গোমতীর বাম পাড়ে। বর্তমান বদরমোকাম থেকে খিল পাড়া পর্যন্ত ঐ বিস্তার। তবে শহরের প্রাণ কেন্দ্র কিন্তু অমর সাগর আর বিজয় সাগর (মহাদেব দিঘির) চারপাড়ে। বীর বিক্রম ১৯২৫ সালে যেমন তাঁর যাত্রা পথে দেখেছেন উদয়পুরের পথে কাকড়াবন জামজুড়ীতে নয়া ভদ্র পল্লী গড়ে উঠেছে। বাঙালী বৃত্তিধারীরা জীবিকার সন্ধানে ঐ সব জায়গায় নয়া বসতি গড়ছে, এবং ঐ জনপদে ভূমি বন্দোবস্তের ব্যাপকতার মধ্যেই রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্যম চলছে, ১৭১২ থেকে ১৭১৫ ইং সময়ের মধ্যে তেমনই উদ্যমী জনবসতি মধ্যবিত্তের নির্যাস নিয়ে মূল শহরে প্রত্যক্ষ করেছেন। জামজুড়ী কাকড়াবন রাজধানীর মূল পরিমন্ডল থেকে বেশ দূরে। যাতায়াতের ব্যবস্থাও অপ্রতুল ফলে শর্মা আর বৈরাগীর পদপাত এবং দৃষ্টিসীমা এতদূর যায় নি। তবে তখনো ঐ সব জায়গায় জনবসতি যে প্রায় ছিল না তা বুঝা যায় " পশ্চিম দিকে গ্রামের সীমানা হইতে অনুমান ছয় দন্ডের রাস্তা গেলে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত পাওয়া যায়। সেই পর্বতের মাথার উপরিভাগে উত্তর দক্ষিণে লম্বা

করিয়া মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে। উহা উচ্চতায় ছয় হাত হইবে। ঐ গড়টি লম্বায় কত বড় তাহা বলিতে পারিব না। গোমতী নদী এই গড়ের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের নদীর সঙ্গে মিশিয়াছে। লোকে এই ঘরের নাম চন্ডীগড় বলে।

ঐ গড়ের পরে ছয় দন্ডের পথ পর্যন্ত জঙ্গলের মধ্য দিয়া রাস্তা গিয়াছে। ঐ জঙ্গলে জনবসতির কোন সংবাদ এরা পাননি। এর উল্লেখও ওরা করেন নি। আরো একটি আশ্চর্যের বিষয় জগন্নাথ দিঘির চার পাড়ের বসতিরও কোন উল্লেখ এদের লেখায় নেই। কিন্তু জগন্নাথ দিঘিও পুরনো জলাশয়। বৃহৎ এবং মনোরম। গোবিন্দ মাণিক্যের অনুজ জগন্নাথ দেবের নাম অনুসারে এর নাম। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী তাঁর '' ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর'' পুস্তকে এর খনন কাল ১৬৬১ -৭৩ খ্রিঃ মধ্যে বলে উল্লেখ করেছেন। এর চারপাড়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বাস ছিল বলেও উল্লেখ করেছেন। বরং দিঘির সীমানা ছাড়িয়ে এক / দেড় মাইল দূরে খিলপাড়ার সমৃদ্ধ ও উন্নত বসতির বিবরণ রয়েছে যে গ্রামে অন্যদের সঙ্গে রাজপুরোহিত ও সভাপন্ডিতেরা থাকতেন। ঐ মহল্লার সমৃদ্ধির কথাও বর্ণনা করেছেন। খিলপাড়া রাজ-দাক্ষিণ্যের কৌলিন্য হারিয়েও ধারাবাহিকভাবে এখনো সমৃদ্ধ গ্রাম। পরবর্তীকালে জগন্নাথ দিঘির পাড়েই কিন্তু গড়ে উঠে নয়া বসতি, ধনাঢ্য ও এলিটরা, উকিল মোক্তার, শিক্ষকেরা নয়া সমাজ গড়ে তুলে তার কারণ সহজ বোধ্য। পরবর্তী রাজাদের আমলে উদয়পুরে শহর যখন বিভাগীয় প্রশাসন কেন্দ্র গড়ে উঠে তা জগন্নাথ দিঘির পাড়েই। উত্তর পাড়ে বিভাগীয় অফিস, বালিকা বিদ্যালয়, দক্ষিণ পাড়ে মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয় (M.E) সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়, জেলখানা দুইই পূর্ব পাড়ে। সংলগ্ন স্থানে তহশীল কাছাড়ি, থানা এবং বাজার। আসলে রাঙামাটি বা উদয়পুরে রাজধানী থাকার সময়ে ভূখন্ডে বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ গড়ে উঠেছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুর বিভাগ পত্তনের সময় থেকে ঐ একই জায়গায় শহরের মূল কেন্দ্র গড়ে উঠে। বরং সমাজের সার অংশ সেই কালে অনুল্লেখ্য জগন্নাথ দিঘির চারপাশেই গড়ে উঠে। কারণও রয়েছে ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে উদয়পুর বিভাগের শাসন কেন্দ্র জগন্নাথ দিঘির উত্তর পাড়ে স্থাপিত হয় (বিভাগীয় অফিস)। কাজেই উকিল মোক্তাব, সরকারী কর্মচারীরা এই স্থানই পছন্দ করেন। সরকারি কর্মচারীদের সরকারি বাসস্থান ও সেখানেই নির্দিষ্ট হয়। ১৯০২ খ্রিঃ থেকে একমাত্র সরকারি পাঠাগার (Library) টিও এখানেই। কাজেই প্রশাসন স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কেন্দ্রের আবর্তেই ভদ্রপল্লী থিতু হবে তাই স্বাভাবিক। অবশ্য মায়ের বাড়ি শালগড়া, হদ্রা, কাকড়াবন ও মির্জায় পাঁচটি পাঠশালা ছিল। অনুমিত হয় জনবসতি কেন্দ্রের বিপ্রতাপে সম্প্রসারিত হচ্ছে। পূর্বত রাজাদের সময়ে খিলপাড়া বসতিপ্রাপ্তরা বেশির ভাগই রাজাদের খয়রাতী জমি প্রাপক। বিনিময়ে এরা ছিলেন রাজ সেবক।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এই প্রশাসন কেন্দ্র পরিদর্শনেই বীর বিক্রম আসেন। উদয়পুর পরিদর্শন কালে বীর বিক্রমের একটি মন্তব্য থেকে বুঝা যায় গোটা রাজ পরিবার উদয়পুর সম্পর্কে বরাবর স্মৃতি জড়িত আবেগ রজুতে বাঁধা ছিলেন। বীর বিক্রম তাঁর পরিদর্শন নোটে উল্লেখ করেছেন যে তিনি উদয়পুরবাসীর সম্বর্ধনার উত্তরে বলেছিলেন যে ''বহু দিন হইতে ত্রিপুর রাজ বংশের বীরত্বের লীলাক্ষেত্র পূণ্যভূমি উদয়পুর দর্শনের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিতেছিলাম। আজ ভগবানের ইচ্ছায় আমার আশাপূর্ণ হইয়াছে। এবং এই পূণ্যভূমির প্রতি অনুরক্তি যে

কেবল তাঁর হৃদয়কেই আপ্লুত করে রেখেছে তাই নয় তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষদের হৃদয়ও ছিল আপ্লুত আবেগে বঞ্চিত। নোটে উল্লেখ রয়েছে "স্বর্গীয় পিতামহ মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুর প্রথম উদয়পুর পরিভ্রমণের পর ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া বলিয়া ছিলেন যে, আগরতলা রাজধানী নির্মাণজনিত বিপুল অর্থব্যয়ের পূর্বে উদয়পুর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিলে নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ব পুরুষগণের গৌরব স্মৃতিমন্ডিত এই রমনীয় স্থানে রাজধানী পুনঃস্থাপিত করিতেন। স্বর্গীয় পিতৃদেবেরও (বীরচন্দ্র মাণিক্য) উদয়পুরের প্রতি গভীর প্রীতি ছিল"।

লখীন্দরের বাসর ঃ

কেবল কী রমনীয় স্থানের জন্যই ঐ মোহগ্রস্থতা? একমাত্র এমনই; তা নয়। রাজধানীর নিরাপত্তা বিষয়টিও বিবেচ্য। ৭ম শতাব্দীতে যুঝার ফাঁ কর্তৃক রাঙামাটি জয় (রাজ্য) করে রাজধানী এখানেই স্থাপন করেন। রাজবাড়ির স্থান নির্বাচন এবং রাজধানীর স্থান নির্বাচনের সময়ে তাকে রাজধানীর নিরাপত্তার বিষয়ও তাঁকে মনে রাখতে হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন বীর বিক্রম প্রাক্তন রাজধানী উদয়পুরের পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ দেখেন তখন রাজবাড়ির অবস্থান নির্বাচন বিচক্ষণতার কথাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন " রাজবাড়িটি একটি উচ্চ পাহাড়ে অবস্থিত, ইহার পশ্চিম দিকে গোমতী প্রবাহিত এবং অন্য দিকে একটি খাল। ইচ্ছা করিলেই গোমতীর জলে খালটি পূর্ণ করা যায়। অতএব এই রাজবাড়ীতে শত্রু প্রবেশ করিতে সহজে পারিবে না। উচ্চ পাহাড় থেকে পর্যবেক্ষকের চোখে দূরের শত্রু বাহিনীও দৃষ্টি গোচর হবে। আবার পাহাড়, নদী ও খালের জলপূর্ণ প্রাকৃতিক ও মনুষ্য সৃষ্ট পরিখা শত্রুর গতিরোধে সাহায্য করবে। কাজেই রাজবাড়ীর একটি প্রাকৃতিক নিরাপত্তা বলয়ে অনেকটাই নিরাপদ ছিল। শুধু রাজবাড়ি কেন রাজাকে তো গোটা রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থাও করতে হয়। এর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সেনা ছাউনী নির্মাণ করতে হয়। রাজ্য ও রাজধানীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিন্যাসটি " ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর" পুস্তকে দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী এইভাবে এঁকেছেন "পার্বত্য ত্রিপুরার প্রায় মাঝখানে রাজধানী স্থাপন করে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাজধানী বাঁচাবার জন্য ত্রিপুর রাজাগণ নানাস্থানে দুর্গ ও সেনানিবাস স্থাপন করে রাজধানী সুরক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। শ্রী রাজমালা সম্পাদকের মতে রাজধানীর সন্নিহিত চতুঃস্পার্শে দুর্গগুলি অবস্থিত ছিল। সেকালে দুর্গকে গড় বলা হত। রাজমালাতে মেহেরকুল, চন্ডীগড়, কিল্লা গড়, গামারিয়া গড়, সংরাইমা গড়, কল্মি গড়, যশপুর গড়, তারপাদুম গড়, জামিরখান গড়, সোনামাটিয়া গড়, মহেশ পুষ্করিনী ইত্যাদির উল্লেখ আছে।"

গড় বা সেনাছাউনীসমূহের স্থানিক অবস্থান নির্ণীত হলে রাজধানী উদয়পুর ঘিরে যে সুরক্ষা বলয় বা নিরাপত্তা বেষ্টনী তার কার্যকারীতা বুঝা যাবে। সেই সঙ্গে রাজাদের বুদ্ধি বিবেচনা, বিচক্ষণতা ও সমর বিদ্যায় অধীন জ্ঞানেরও পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। কৈলাগড় ঃ উদয়পুর থেকে ৩০ কি.মি. দূরে আগরতলা থেকে ২৫ কি. মি দক্ষিণে কমলাসাগর। কমলা সাগরের বিগ্রহ মন্দিরটি ঐ দুর্গ মধ্যেই ছিল বলে ঐতিহাসিকদের অভিমত। কৈলাগড় কসবার প্রাচীন নাম। ধন্য মাণিক্যের সময়ে কৈলাগড় হৈতান খাঁর বাহিনীর হাতে ত্রিপুর সেনাপতি বায়কাচা গের পরাজয় ঘটে। রাজধর মাণিক্যের রাজত্বকালে এখানেই ত্রিপুর বাহিনী চন্দ্রদর্প নারায়ণের নেতৃত্বে গৌড় বাহিনী প্রতিহত করে। কল্যাণ মাণিক্যের মাতামহ

রণ দুর্লভ কৈলাগড় দুর্গাধিপতি ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের সময়ে কল্যাণদেব নিজেই দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। কল্যাণ মাণিক্য ১৬৫৮ খ্রিঃ শাহ সুজার বাহিনীকে এখানেই পরাস্থ করেন। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ থেকে এই স্থানের সামরিক অবস্থান ও গুরুত্ব বুঝা যায়।

২। বিশালগড় ঃ বর্তমানে ঐ একই নাম। এখানকার সেনাছাউনীর কথা রাজমালাতে উল্লেখ রয়েছে। ৫৯০ খ্রি জুঝাব ফা প্রথম বিশালগড় দখল করেন। জুঝাব ফা -ই লিকাদের প্রতিহত করে রাঙামাটি দখল করেন এবং বাংলাদেশের দিকে রাজ্য বিস্তারে অগ্রসর হন।

৩। জমির খাঁ গড় ঃ বর্তমান বাগমা, উদয়পুর থেকে সাত কিলোমিটার উত্তরে উদয়পুর আগরতলা সড়ক পথে। উদয়পুর মহকুমার অংশ। ধন্য মাণিক্যের সময়ে দুর্গাধিপতি ছিলেন খড়গ রায়।

৪। তারপাদুম ঃ উদয়পুর মহকুমায় কাকড়াবন তুলামুড়া পথের পার্শ্বে। এই গ্রামের প্রাচীন নাম ডোম ঘাটি। সমসের গাজী এই গ্রামের মধ্য দিয়েই উদয়পুর থেকে খন্ডল যাওয়ার পথ নির্মাণ করেছিলেন।

৫। গামারিয়া ঃ উদয়পুরের দক্ষিণে অবস্থিত। চম্পক বিজয় গ্রন্থে গামারিয়ার পরিচয় এভাবে দেওয়া আছে, মহারাজ নরেন্দ্র মাণিক্য তাঁর সেনাপতিকে বলেছেন ঃ

দক্ষিণ দিকে তুমি হইলা সেনাপতি।
দক্ষিণ গড় যত তোমার যাবতী।।
চৌদ্দ গ্রামের গড় ধরিয়া সাবহিতে।
ভাল যত্নে গড় যে রাখিবা মহামন্তে।।
কোন পাকে আসি যদি লয় সেই গড়
গামারিয়া গড়ে আজি উধিত্ত সত্বর।।
গামারিয়া গড়ের পথ বড়ই দুর্গম।
এক হাত পাশ পথ চলিতে বিষম।।

৬। কলমি গড় ঃ গড়টি খন্ডল গামী (খন্ডল নোয়াখালী) প্রাচীন রাস্তার পার্শ্বে নির্মিত হয়েছিল।

৭। মেহের কুল ঃ বর্তমান কুমিল্লার (বাংলাদেশ) মধ্যযুগীয় নাম। কুমিল্লার প্রাচীন নাম কমলাঙ্ক নগর। মেহেরকুল দুর্গকে ঘিরে বহু যুদ্ধ হয়েছে। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে হুসেন সাহ ত্রিপুর সেনাপতি রায় কাচাগ-কে পরাস্থ করে। পরে ত্রিপুর বাহিনী তাদের বিতাড়িত করে পুনরায় মেহেরকুল দখল করে। গৌর সেনাপতি হৈতান খাঁ ১৫১৪ সালে মেহের কুল দখলে গিয়ে ছিলেন কিন্তু কিছু পরে বিতাড়িত হন। মেহের কুল ত্রিপুর রাজার শাসনে আসে। উদয় মাণিক্যের রাজত্বকালে অমরদেব মেহের কুলের দুর্গাধিপতি ছিলেন। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে মির্জা নুরুল্লা মেহের কুল দখল করে সেখানে থেকে রাজধানী উদয়পুর আক্রমণ করে ও দখল করে। ১৬২৪ সালে মেহেরকুল ত্রিপুর রাজের হস্তচ্যুত হয় এবং চাকলা রোশানাবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারীতে পরিণত হয়। ব্রিটিশের সময়েও এই জমিদারী বজায় ছিল।

৮। সোনামাটিয়া ঃ বর্তমান সোনামুড়া শহরের উপকণ্ঠে গোমতীর উত্তর পাড়ে (রাজধানী)

উদয়পুর থেকে ২১ মাইল পশ্চিমে এই গড় নির্মিত হয়েছিল। এই দুর্গ দখল নিয়ে বহু যুদ্ধ বিগ্রহ হয়। সোনামাটিয়াগড়েই গোরাই মালিকের বাহিনীর সঙ্গে ত্রিপুর সেনাপতি রায়চানের যুদ্ধ হয়। রাজধানীর পথে পশ্চিম সীমান্তে এটি ছিল একমাত্র সীমান্ত দুর্গ।

৯। চণ্ডীগড় ঃ উদয়পুর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে চণ্ডীগড়। গোরাই মালিক, (১৫১৩ খ্রিঃ) মার্জানুরুল্লা (১৬২১ খ্রিঃ) নরেন্দ্র মানিক্য (১৬৭৬ খ্রিঃ) জগৎ মানিক্য (১৭২৯ খ্রিঃ) এবং সমসের গাজী (১৭৪৮-৬০ খ্রিঃ) অনেক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ এখানে সংঘটিত হয়েছিল।

১০। মহেশ পুষ্করিণী ঃ এখানেই সমসের গাজির সঙ্গে ত্রিপুর সৈন্যের যুদ্ধ হয়েছিল। এখানেই রাজার বাহিনীকে পরাস্থ করে সমসের গাজী রাজধানী উদয়পুরে প্রবেশ করে এবং রাজধানী দখল করে। গড়ের অবস্থান নির্ণয়ে অনুমান করা হয়েছে উদয়পুর-খণ্ডল পথের দক্ষিণাংশে এই গড় ছিল। ১৭৬০ খ্রিঃ সমসের গাজীর উদয়পুর আক্রমণ, দখল ও লুণ্ঠন। তখন সিংহাসনে কৃষ্ণ মানিক্য। পরে মীরকাসেমের সহায়তায় কৃষ্ণ মানিক্য রাজ্য ফিরে পান। সামসের গাজীকে কামানের গোলায় প্রাণ দিতে হয়। ১৭৬০ খ্রিঃ পর্যন্তই উদয়পুর রাজ্যের রাজধানী ছিল। তারপর কোন রাজাই আর উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেননি।

বর্তমান ত্রিপুরার রাজ্যসীমা এবং প্রাচীন ত্রিপুরার সীমানা বিবেচনায় প্রাকৃতিক সুরক্ষার দিক থেকে উদয়পুরই ছিল আদর্শ। মহারাজ বীর বিক্রমের চোখেও প্রথম দর্শনেই ঐ বিষয়টি ধরা পড়েছে। ঐ কারণেই তার আক্ষেপ মিশ্রিত অতীত চারণ। তখন আসাম ও কাছাড়ের রাজাদের দিক থেকে ত্রিপুরা অনেকটাই নিরাপদ ছিল। ভয় ছিল আরাকান এবং বাংলাদেশের দিক থেকে। সেদিক থেকে ঐ দুই প্রতিবেশী শত্রুর সীমানা থেকে দূরে অরণ্য বেষ্টনীতে অপেক্ষাকৃত দুর্গম অঞ্চলে উদয়পুর অনেকটাই শত্রুর নাগালের বাইরে ছিল। বীর বিক্রমেরও তাই মনে হয়েছে।

তবু শত্রুর আক্রমণ থেকে কিন্তু উদয়পুর রক্ষা পায় নি। উদয়পুর মগ ও মোঘলদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছে। দখল হয়েছে। উদয়পুর সর্বশেষ লুণ্ঠিত হয় ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর অবশ্য রাজধানীই উদয়পুর থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। এর কারণ হতে পারে পরাক্রমের তারতম্য, রণকৌশলের দুর্বলতা এবং সেনাপতিদের অযোগ্যতা। তবে শত্রুর সীমান্ত লাগোয়া সমতল ক্ষেত্রে রাজধানী অধিক নিরাপত্তাহীন এ নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশ নেই। বীর বিক্রমের বক্তব্যের মর্ম কথাটিও তাই। হয়তো আগরতলার অবস্থানের সঙ্গে তিনি বিষয়টির মনে মনে তুলনা করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী লিখেছেন " বারে বারে লুণ্ঠিত হয়েছে প্রাচীন রাজধানী। একবারের লুণ্ঠনের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে আবার পূর্ণ সমৃদ্ধ হয়ে উঠার আগেই এসে গেছে পরের লুঠেরারা। লুণ্ঠনে রিক্ত, হতমান নগরী রাজধানীর মর্যাদা হারাল। এই অবাধ লুণ্ঠনের মধ্য দিয়ে একটি চিত্র আমাদের কাছে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে, তা হল রাজধানীর প্রচুর ধন উৎপাদন ক্ষমতা। এই উৎপাদন ক্ষমতাই লুঠেরাদের বার বার আকর্ষণ করেছে। আরো একটি চিত্র পাশাপাশি ফুটে উঠে তা হল রাজধানী রক্ষার অক্ষমতা।" অথচ ব্যবস্থাপনার নিরীখে সৈন্য মোতায়েনের স্থান নির্বাচনে ত্রিপুর রাজাদের নির্বোধ বলা যাবে না। তবে রাজ্যের বন্ধুর যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগের সময় ব্যাপ্তি ইত্যাদি কারণে কেন্দ্রীয় নির্দেশ দ্রুততায় প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয়

সংবাদ আদান প্রদানে কালহরণ জনিত প্রতিবন্ধকতা সাফল্যকে বিঘ্নিত করে থাকবে।

যুঝার ফা রত্নমাণিক্য নাম নিয়ে রাঙামাটির সিংহাসনে বসেন। রাজধানীর নামও রাখেন রাঙামাটি। এইটিই উদয়পুর। তিনি লিকাদের বিতাড়িত করেন। রাজ্য দখল করেন। যেহেতু রাজ্য স্থাপনই তাঁর লক্ষ্য তিনি রাজধানী লুঠ করেন নি।

মহারাজ অমর মাণিক্যের রাজত্বকালে ১৬৮১ খ্রিঃ মগদের দ্বারা ত্রিপুরার রাজধানী প্রথম লুণ্ঠিত হয়। বিজিত মগ সৈন্য পনের দিন ধরে রাজধানী লুঠ করে। এরা কেবল রাজ ঐশ্বর্যই লুঠ করে নি রাজধানীর সাধারণ নাগরিকদের ধন রত্ন লুঠ করে নিয়ে যায়। লুণ্ঠনের দীর্ঘ সময় থেকে অনুমানে অসুবিধা হয় না যে ঐ সময়ে রাজার ঐশ্বর্য ও সাধারণ নাগরিকদের ধন সম্পদের পরিমাণ কত বিপুল ছিল। রাজগৃহে গোপন কুঠুরীতে সম্পদ লুকিয়ে রেখে অমর মাণিক্য সপরিবারে পালিয়ে যান কিন্তু মগ সেনাপতি দুই চতুর্দশ দেবতার সেবকদের ধরে ফেলে ঐ ঐশ্বর্যের সংবাদ পেয়ে যান ও লুঠ করেন। ত্রিপুরা সুন্দরীদেবীর মন্দিরের চূড়া মগের বিধ্বস্ত করে। কল্যাণ মাণিক্য পরবর্তীকালে মন্দিরের সংস্কার করেন।

১৬১৮ খ্রিস্টাব্দে ইস্পিন্দার খাঁ ও মির্জা নুরুল্লার নেতৃত্বে মোঘল সৈন্য রাজধানী উদয়পুর লুঠ করে। তখন সিংহাসনে ছিলেন যশোমাণিক্য। তিনি বিপুল ধন সম্পদসহ মোঘল বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। যশোমাণিক্যকে ওরা ছেড়ে দেয়। তিনি রাজধানী ত্যাগ করেন।

লুণ্ঠন উন্মাদনা ও ধন তৃষ্ণা মোঘল বাহিনীর মধ্যে এমন ছিল যে তাদের ধারণা হয়েছিল যে রাজা বহু সম্পদ অমর সাগর ও বিজয় সাগরের জলের তলায় লুকিয়ে গেছেন। তারা ঐ দুই বিশাল জলাশয়ের জল বেড় করে শুকিয়ে সম্পদের তল্লাসী করেন বাস্তবে তেমন কিছু ছিল না। উদয়পুর রাজধানী আড়াই বৎসর মোঘলদের দখলে ছিল। দিঘির জল শুকিয়ে ফেলায় পানীয় জলের অভাবে এরা নানাবিধ অসুখে পড়েন। রোগ তাড়নাতে তারা উদয়পুর ত্যাগ করেন। দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্যের রাজত্বকালে (১৭১৪-২৯ খ্রিঃ) মোঘলরা দ্বিতীয় বার উদয়পুর লুঠ করে ছিল।

রাজধানী উদয়পুর শেষ বারের মতন লুঠ করে সমসের গাজী মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজত্বকালে।

"উদয়পুরে রাজধন যতেক আছিল।

সমসের গাজীর সৈন্য সব লুঠি নিল।।"

ঐ আক্রমণের ফলে মহারাজ কৃষ্ণমাণিক্য ১৭৬০ খ্রিঃ স্থায়ীভাবে রাজধানী উদয়পুর থেকে আগরতলায় নিয়ে যান।

রাঙামাটি ঃ—

উদয়পুরের পূর্বতন নাম রাঙামাটি। রাঙামাটি ত্রিপুর রাজাদের বিজিত রাজ্য। পূর্বতন লিকা জনগোষ্ঠীদের বিতাড়িত করে ত্রিপুর রাজা হামতার ফা নামান্তরে জুঝার ফা ৭ম শতাব্দীতে রাঙামাটি দখল করে রাজধানীকেও রাঙামাটি নামে চিহ্নিত করেন। আসলে রাঙামাটি পূর্বে কোন নির্দিষ্ট স্থানের নাম ছিল না একটি গোটা শাসন এলাকার নামই ছিল রাঙামাটি। জুঝার ফা রাঙামাটি রাজ্য জয় করে তার শাসন কেন্দ্রের নামও রাখলেন রাঙামাটি। অর্থাৎ রাজধানীর

নামও রাঙামাটি। স্থানটি বর্তমান উদয়পুর। জুঝার ফা অর্থে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার নামকরণ ষোড়ষ শতাব্দীতে ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে লাল্টে দেন এক সিংহাসনের জবর দখলদার, গোপী প্রসাদ। তিনি তার জামাতা মাণিক্য বংশীয় নৃপতি অনন্ত মাণিক্য (১৫৬৫ - ৬৭ খ্রিঃ) কে হত্যা করে ত্রিপুরার সিংহাসন দখল করেন। উদয় মাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। এবং পার্শ্ববর্তী চন্দ্রপুরে রাজ্যপাট স্থানান্তরিত করেন।

উদয়মাণিক্য রাজা চন্দ্রপুরে গেল।
নিজগৃহ সিংহাসন সেখানে করিল।।
রাঙামাটি নাম উদয়পুর কৈল।
উদয় মাণিক্য রাজা উদয়পুরে মৈল।।

উদয়মাণিক্যের শাসসনকালে মোট ছয় বছর ১৫৬৭ থেকে ১৫৭৩ খ্রিঃ। তার সিংহাসন দখলের সময় ১৫৬৭ খ্রিঃ থেকে অনুমান করা হয় রাঙামাটির নাম পরিবর্তনের কাল। অর্থাৎ ১৫৬৭ খ্রি রাঙামাটি উদয়পুর হল। এবং অদ্যাবধিও এই নাম। তবে এই উদয়পুরের কিয়দংশের নাম মহারাজ ১ম রত্নমাণিক্য , যার সময় থেকে ত্রিপুরা রাজাদের মাণিক্য উপাধি গ্রহণ বা লাভ রত্নপুর রেখেছিলেন। আবার মহারাজ বীরেন্দ্রকিশোর মাণিক্য (১৯০৯ - ১৯২৩ খ্রিঃ) তাঁর পিতা রাধাকিশোর মাণিক্যের (১৮৯৩ খ্রিঃ - ১৯০৬ খ্রিঃ) স্মৃতিতে রত্নপুরের নাম পরিবর্তন করে রাধা কিশোরপুর রাখেন।

রাঙামাটি উদয়পুর হল। এই নামান্তরের ফলে রাঙামাটি ভূখন্ড বা রাজ্য সীমায়িত হল রাজধানী বেষ্টনীতে। আবার রত্নপুর আরো বামনত্ব প্রাপ্ত হয়ে রাজধানী রাঙামাটির এক অতিক্ষুদ্র অংশে গুনিয়ে নিল। ''ইহা উদয়পুর শহরের অংশ বিশেষ। এই স্থানে চতুর্দশ দেবতার প্রাচীন মন্দির, লক্ষ্মী নারায়াণের মন্দির ও মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান। এখানে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ (ত্রিপুরেশ্বরী) ভৈরব। প্রবাদ আছে এই শিবলিঙ্গটি আগরতলায় উঠাইয়া নেওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা করা হইয়াছিল। এমনকী হস্তী দ্বারা পর্যন্ত টানা হইয়াছে, তথাপি মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত অংশ তোলা যাইতে পারে নাই। এই টানাটানির দরুণ বিগ্রহটির উত্তর পশ্চিম কোনের দিকে কিঞ্চিৎ হেলিয়া রহিয়াছে।'' মহারাজ বিজয় মাণিক্যের শাসন কালে রত্নপুর মৌজায় বিজয় সাগর দিঘি (বর্তমান মহাদেব দিঘি) খনন করা হয়েছিল। এটি রত্নপুর মৌজার অংশে। মহারাজ বীরেন্দ্র কিশোর রত্নপুর মৌজার নাম পরিবর্তন করে তাঁর পিতার নামেই এই মৌজার নামকরণ করেন রাধা কিশোর পুর। বর্তমানে উদয়পুর শহর ও সন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে মৌজা গঠিত তার নাম রাধাকিশোর পুর মৌজা। এতে সাধারণ মানুষের মন থেকে একটি জিজ্ঞাসার অপসারণ ঘটে, প্রশ্ন ছিল, ঠিক কোন জায়গাটি রত্নপুর বা কোন জায়গাটি রাধাকিশোর পুর। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় এই দুটিই একটি মৌজার নাম বিবর্তন। মৌজা বহু নামে চিহ্নিত স্থান সমষ্টির একটি রাজস্ব পরিমন্ডল।

কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে, ১৭৬০ খ্রিঃ উদয়পুর থেকে মাণিক্য রাজাদের রাজধানী চলে গেলেও উদয়পুরকে যে মাণিক্য বংশের অধঃস্তনেরা ভুলতে পারে নি উদয়পুরের প্রতি যে তাঁরা সম্ভ্রমশীল ও আবেগ তাড়িত ছিলেন উদয়পুরের নাম বিবর্তন তার প্রমাণ। এর পশ্চাৎ মানসিকতায় রয়েছে প্রাক্তন রাজধানীর মর্যাদার প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা। এতে মনে হয় বীর বিক্রম এবং রাধা

কিশোর মাণিক্যের ক্ষোভের কথা উল্লেখ করেছেন, সেই ক্ষোভ হয়তো পারিপার্শ্বিক বাধ্যবাধকতার কারণেই রাজধানী উদয়পুরে প্রত্যাগমে প্রতিবন্ধক ছিল। তাঁর বক্তব্যে ঐ কথাটি অনুক্তই। রেগেই ক্ষোভের কথাটিই উল্লেখ করেছিলেন। ১৭৬০ খ্রিঃ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ, দীর্ঘ সময়। মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্যের নামে তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর কোন স্থানের নামকরণ করে খ্যাতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে এই বংশের প্রাচীন রাজধানী রাঙামাটি তথা উদয়পুরকেই বেছে নিলেন। রাজধানী সংলগ্ন বহু উল্লেখনীয় স্থানই তো ছিল। তবু উদয়পুর কেই বাঞ্ছা পূরণের জন্য উপযুক্ত মনে করলেন। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে উদয়পুরকে মাণিক্য রাজবংশ তাঁদের মনোজগতে চির জাগরুক রেখেছেন। এই উদয়পুরের প্রধান সরকারি বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় বীর বিক্রমের পুত্র কীরীট বিক্রমের নামে। এর কারণ বহু সংখ্যক রাজা উদয়পুরেই রাজত্ব করেছেন। প্রাক মাণিক্য যুগে, যুঝাফার ৫৯০ খ্রিঃ রাঙামাটি বা উদয়পুর অধিকারের সময় থেকে রত্নমাণিক্য পর্যন্ত প্রাক মাণিক্য যুগে ৮৭৫ বৎসর (১৪৬৫ খ্রিঃ পর্যন্ত) এবং ১৭৬০ খ্রিঃ কৃষ্ণ মাণিক্য সময়কাল ৩০০ বৎসর মোট ১১৭৫ বৎসর উদয়পুরই ছিল রাজধানী।

রত্ন ফা নাম তার পিতায়ে রাখি ছিল।
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল।
তদবধি মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরেশে।।

এই উপাধি তাদের অর্জিত। ফা শব্দের অর্থ পিতা। তবে কি পিতৃত্ব ছেড়ে ঐশ্বর্য-জ্ঞাপনকেই রাজারা বিজ্ঞাপিত করতে চাইলেন? শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর " ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থে ঐতিহাসিক আনন্দ নাথ রায়ের " বার ভূঞা" পুস্তকে উল্লিখিত একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করেছেন। " প্রবাদ অনুসারে এক সময়ে ত্রিপুরার রাজা দিল্লিতে উপস্থিত হইয়া বাদ্শাকে কতগুলি রত্ন উপহার প্রদান করায়, বাদ্শাহ তাঁহাকে "লাল" উপাধি প্রদান করেন। পারস্য ভাষায় মাণিক্যকে লাল বলিয়া থাকে। রাজারা এই " লাল" উপাধি পারস্য শব্দ বলিয়া তৎপরিবর্তে সংস্কৃতিমুলক মাণিক্য উপাধিতে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন (পৃষ্ঠা - ৭৯)।" অবশ্য ভিন্ন কাহিনিও আছে —সেই " ভেকের মাথার মণির গল্প" যা অবান্তর বলেই গণ্য হবার যোগ্য।

১৫৮৫ খ্রিঃ (৯৯৫ ত্রিং) সেনাপতি গোপীপ্রসাদ নিজ জামাতাকে হত্যা করে রাজা হলেন রাজ্য দখল করে রাঙামাটিকে তো উদয়পুরে রূপান্তরিত করলেন। এবার রাঙামাটির অধিকার কাহিনিতে চোখ রাখতে হয়। এর জন্যে অধ্যাপক শীতল চন্দ্র চক্রবর্তীর দ্বারস্থ হতে হয়। " প্রভাতের অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ হামতারফা কর্তৃক রাঙামাটি বিজিত হয়। রাঙামাটি জয় ইতিহাসের বিশেষ গৌরবজনক ঘটনা। লিকা নামক জাতিই রাঙামাটির আধিবাসী ছিল। হামতারফা ত্রিপুর সৈন্য লইয়া রাঙামাটির দিকে অগ্রসর হইলে বন প্রদেশের পূর্বাংশে লিকা নামক পার্বত্য স্রোতের (ছড়া বা ছোট নদী) লিকাগণ আসিয়া তাহার সৈন্যের সম্মুখীন হইল। তখন তদীয় সৈন্য বিশেষ বীরত্বের সহিত তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পশ্চাদ্দিকে হঠাইয়া ছিল ঃ—

অরণ্যের পূর্বভাগে লিকা নামে ছড়া।
যত আছে ছড়াকূলে লিকা দফা পাড়া।।

ত্রিপুরার সৈন্য যুদ্ধ করে পরিপাটি।
ভঙ্গ দিয়া সব লিকা গেল রাঙামাটি।।

অতঃপর হামতারফা লিকা দিগের পাশ্চাদ্ধাবন করিয়া সৈন্যসহ রাঙামাটির দিকেই অগ্রসর হইলেন। তথায় (রাঙামাটি) লিকারাজ গড় করিয়া তাঁহাকে বাঁধা দিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু লিকা সৈন্যের প্রবল প্রতিরোধ সত্বেও হামতারফার সৈন্য জয়লাভ করিতে সমর্থ হইলেন ঃ—

দুই সৈন্যে মহাযুদ্ধ হইল বিস্তর।
অন্ধকার কেহ কার না হয়ে গোচর।
ভূমিকম্পমান হইল রাঙামাটি দেশে।
ত্রিপুরায়ে লৈল গড় লিকাভঙ্গ শেষে।

এখন হামতরাফা বিজয়ী হইয়া রাঙা মাটিতে আপনার রাজধানী স্থাপিত করিলেন ঃ—

এইমতে রাঙামাটি ত্রিপুরে লইল।
নৃপতি যুঝার পাট তথাতে করিল।।

যুঝার অর্থে যোদ্ধা। হামতারফা যুদ্ধ করে। যুঝার ফা উপাধি ধারণ করেন ও রাঙামাটিতেই রাজধানী স্থাপন করলেন। পরাজিত লিকা সৈন্যদের তিনি নিজ সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভূক্ত করেন। সে ৫৯০ খ্রিঃ। ঐ সময় থেকেই নিজের বিজয়কে চিরস্থায়ী করার জন্যে যুঝার ফা ত্রিপুরাব্দ চালু করেন। এর আগে ত্রিপুর রাজ বংশের রাজারা ত্রিবেগ, খলংমা, ছাম্বুল, এ রাজত্ব করেছিলেন। শ্রদ্ধেয় শীতল চক্রবর্তী মহাশয় এর একটি সম্ভাব্য তালিকা প্রস্তুত করেছেন এর জন্যে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন মহাভারত, পুরাণ ও রামায়ণের। তাঁর সৃষ্ট তালিকাটি নিম্নরূপ ঃ—

স্থান	সময়	পুরুষ সংখ্যা
মন্তব্য		
১। ত্রিবেগে রাজত্ব	১৪৬৪ খ্রিঃ পূর্বঃ	৪ পুরুষ
দক্ষিণেও কিছু সময়।		
	১৩০০ খ্রিঃ পূর্বঃ	
২। খলংমাতে রাজত্ব	১৩০০ খ্রিঃ পূর্বঃ	৫২ পুরুষ
বিমার পর্যন্ত।		
	১৫০ খ্রিঃ পূর্বঃ	(৪ পুরুষে শতাব্দী ধরে)
৩। ছাম্বুলে রাজত্ব	১৫০ খ্রিঃ পূঃ	১৩ পুরুষ
প্রতীত পর্যন্ত।		
	৫৯০ খ্রিস্টাব্দে	
৪। ত্রিপুরায় রাজত্ব	৫৯০ খ্রিস্টাব্দ হইতে	
	১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ।	

৫৯০ খ্রিস্টাব্দে যুঝাফার রাঙামাটি বিজয়ের সময় থেকে। ৫৯০ থেকে ১৭৬০ খ্রিঃ পর্যন্ত ত্রিপুর রাজাদের রাজধানী উদয়পুরেই ছিল।

কারোর মতে রাঙামাটি ত্রিপুরার করদ রাজ্য ছিল। যুঝা ফা এর পূর্ণ অধিকার নিলেন।

রাঙামাটি কোথায়? প্রশ্ন রয়েছে লিকা কারা? কি তাদের পরিচয়?

রাঙামাটি একটি দেশ। বিশ্বকোষের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রদ্ধেয় শীতল চক্রবর্তী লিখেছেন " মহাভাষ্য ও পুরাণের মতে অর্যাবর্তের পূর্বে আদর্শ ও কিরাত নামক জনপদ। গ্রীক ঐতিহাসিক টলেমী আদইসগা (Adeisaga) নামে একটি নগরের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা রড়ামকোর্ট (Rhodamarkotta) নামক স্থানের একটি নগর। সেন্টমার্টিন এই স্থানের বর্তমান নাম রাঙামাটি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। এই স্থানের নিকটে আদইসগ নগর। এই আদইসগ মহা ভাষোক্ত আদর্শ বলিয়া বোধ হয় উহা বর্তমান চট্টগ্রাম সীমান্তে অবস্থিত ছিল। এই উদ্ধৃতি দিয়ে চক্রবর্তী মহোদয় সিদ্ধান্তে এসেছেন যে " বর্তমান ত্রিপুরার দক্ষিণাংশ নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের পশ্চিমাংশ লইয়া রাঙামাটি দেশ বিস্তৃত ছিল (পৃষ্ঠা - ৪৮ -৪৯)।

এবার অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তীর ব্যাখ্যা " ত্রিপুরার দক্ষিণ পূর্বাংশে "খন্ডল" নামে একটি পরগণা আছে তাহা এখনো ত্রিপুরার মহারাজের রোশনাবাদ জমিদারীর অন্তর্গত। আদিম অনার্য খন্ড জাতির বাস হইতেই উহার নাম " খন্ডল" হইয়াছে বলিয়া আমাদের নিকট বোধ হয়। লিকাগণ ঐ খন্ডদিগেরই কোন শ্রেণি বিশেষ হওয়াই বিশেষ সম্ভবপর। খন্ডলের নিচ শ্রেণির হিন্দুদিগকে আমরা আর্য সমাজভুক্ত 'খন্ড' জাতির বংশধর বলিয়াই মনে করিতে পারি। বোম্বে প্রেসিডেন্সিতেও খোন্দ্ বা গোন্ড জাতির নামাঙ্কিত "খন্ডল"নামক একটি স্থান আছে (পৃষ্ঠা - ঐ ৪৯)।

রাজমালা দ্বিতীয় লহরে "খন্ডলের " ভিন্ন পাঠ রয়েছে। বলা হয়েছে " প্রাচীন মতে মন্ডল শব্দের অর্থ "দ্বাদশ রাজকম্ (মেদিনী)। মন্ডল দ্বাদশ রাজক নামে অভিহিত ছিল। অর্থাৎ বার জন রাজার অধিকৃত স্থানকে মন্ডল এবং তাহার অধিপতিকে মন্ডলেশ্বর বলা হইত। মন্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্রভাগ "খন্ডল।" রাজমালায় বর্ণিত " ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান বিলোনীয়া বিভাগের পশ্চিমে। তবে কি "খন্ডল" খন্ডিত মন্ডল। নৃতাত্ত্বিকেরা এই অতিসরলীকরণ কষ্টকর ব্যাখ্যা মানবেন না। কারণ "খন্ডল" জন বৈশিষ্ট্যেও পৃথক পরিচিত বহন করে। কাজেই "খন্ডল" প্রশাসনিক উপবিভাগ এই মত মানা কষ্টকর । যদি এমনই হত তবে এই নামে অন্যত্রও কোন না কোন প্রশাসনিক খন্ড চৌহদ্দীর নাম পাওয়া যেত। বরং অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তী বোম্বে প্রেসিডেন্সীতে যে "খন্ডল" অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন তা খোন্দ বা গোন্ডজাতির অধ্যুষিত অঞ্চল। অর্থাৎ নৃতাত্ত্বিক পটভূমিতেই "খন্ডল" স্থানের নামকরণ করা হয়েছে সেটাই সম্ভব। এখানে নামের উৎস সন্ধান মুখ্য বিষয় নয়। অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান এবং এর রাঙামাটি নামক রাজত্বের অন্তর্ভূক্তিই মূখ্য। এর ফলে বুঝতে সুবিধা হল রাঙামাটির বিস্তার এবং প্রকৃতপক্ষে রাঙামাটি হিসেবে যুঝার ফা ঠিক কোন অঞ্চলের উপর অধিকার স্থাপন করেছিলেন এবং ঐ অঞ্চলের মূল অধিবাসী 'লিকারা' কোন অঞ্চলে বাস করত সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা নেওয়া। যুঝার ফাকে লেকা রাজা তাদের রাজ্য সীমার পূর্বভাগে, সীমান্তেই সসৈন্যে বাধা দিয়েছিল। যুদ্ধ জয় করেই লিকাদের রাজ্যে যুঝাফা কে পা-রাখতে হয়েছিল। এবং গোটা রাঙামাটি বিজয়ের অর্থ চট্টগ্রাম পর্যন্ত ভূখন্ডের উপর যুঝার আধিপত্য। এই রাঙামাটির সঙ্গেই তো উদয়পুর জড়িয়ে আছে। আর আজকের মানুষ সমুদ্র স্তনিত চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখন্ডকে আরসি থেকে মুছে ফেলে কেবল মন্দিরময়, দিঘিময় কম্প্যাক্ট চৌহদ্দীতেই স্মৃতির আঁচ বেঁধে রেখে

স্মৃতির নির্যাস অহং - এর উদ্গীর বজায় রাখছে। তবে পটভূমি খোদ যুঝার ফাই সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর রাজত্বের নাম ত্রিপুরা রাখলেন ত্রিপুর রাজাদের রাজ্য। তার রাজ্যপাটের স্থান, শাসন কেন্দ্রের নামটা বিজিত রাজ্য রাঙামাটির নামে "রাঙামাটি" রাখলেন। মাঝে এক বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি গোপীনাথ আত্মীয় সূত্রে রাজার শ্বশুর জামাইকে খুন করে ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে যুঝাফার বীরত্বের ফলকটি সরিয়ে বিশ্বাসঘাতকের কলঙ্ক ধ্বজা পাহাড় চূড়ার উড্ডীন করলেন। রাজাই বরং কিভাবে রাজা হলেন তা বিবেচ্য নয় — এর মধ্যেই রাজভক্তির পরম্পরা ও বাধ্যবাধকতা; ফলে গোপীনাথের উদয় মাণিক্য বনে যাওয়াকে রাজভক্ত প্রজারা ধর্তব্যেই আনে নি। গোপীনাথের "উদয়" হল কিন্তু রাজ বংশের উপাধি মাণিক্যকে তিনি চৌর্য চাতুরীতে নিজের নাম ফলকে জুড়ে দিলেন। মাণিক্য তো মূল রাজ বংশের অর্জিত উপাধি। রাজ বংশের বাইরে কোন সিংহাসনের জবর দখল কারী এই উপাধি ব্যবহারের যোগ্য নয়। কিন্তু এই অলৌকিক কাজটা গোপীনাথ করলেন।

এর দুটি কারণ থাকতে পারে। একটি হল এই উপাধির উপর তার লোভ ও দুর্বলতা, দ্বিতীয়টি হতে পারে প্রজা সাধারণের কাছে উপাধির যাদু; উপাধিতে ভুলিয়ে ময়ূর পুচ্ছ দাঁড় কাক জন সাধারণকে ফাঁকি দিয়ে অবৈধ প্রাপ্তিকে বৈধ করার দুষ্ট বুদ্ধি।

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী তাঁর " ত্রিপুর - রাজধানী উদয়পুর" পুস্তকে " রাঙামাটি হল উদয়পুর" অধ্যায়ে লিখেছেন "এই উদয়পুর নাম আজো চালু আছে, যদিও কিয়দংশ পরবর্তীকালে রাধাকিশোর পুর নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমান উদয়পুর রাঙামাটির কিয়দংশ মাত্র।" আসলে উদয়পুর শহরের কোন অংশের নামই রাধা কিশোরপুর নয়। রাধা কিশোর পুর একটি মৌজার নাম, বলা যায় উদয়পুর মহকুমার একটি প্রশাসনিক ও রাজস্ব উপ-বিভাগের নাম। উদয়পুর শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলোর সমাহার। যেমন তিনি বলেছেন উদয়পুর রাঙামাটির কিয়দংশের নাম তেমনই।

লিকাদের জাতি বিশিষ্ট কিঞ্চিৎ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তী তাদের বলেছে আর্য প্রভাবিত অর্দ্ধ সভ্য আদিম অধিবাসী। সভ্যতার উত্তরণের স্বপক্ষে সেই রাজমালাকাকেই তিনি সাক্ষী মেনেছেন—

রাঙামাটি দেশেতে যে লিকা রাজা ছিল।
সহস্রদেশকে সৈন্য তাহার আছিল।।
ধামাই জাতি পুরোহিত আছিল তাহার
অভক্ষ্য না খায়ে তারা সুভক্ষ্য ব্যভার।।
ধর্মেতে নিপুন তারা নামে লিকা জাতি।
রাঙামাটি পূর্ব স্থান তাহার বসতি।।

দশ সহস্র সেনা যার আছে তার সমর বল উপেক্ষনীয় নয়। এরা নিষ্ঠাবান, ধর্মপরায়ণ, সু-খাদ্য খায়। যা খুশি খাওয়া তাদের খাদ্য তালিকায় বর্জিত। কাজেই উন্নত জাতি এবং সমর বলে বলীয়ান সেই জাতিকে পরাস্থ করা প্রবল সমর শক্তির প্রয়োজন। যুঝার মানে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এই উপাধি তিনিই গ্রহণ করার যোগ্য যিনি অধিকতর সমর নিপুন, বীর যোদ্ধা। যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে যুঝার ফা সেই নৈপুন্য ও বীরত্বের পরিচয়ে উত্তীর্ণ।

যুঝার ফা এবং তার অধঃস্তন পুরুষেরাও হীনবল ছিলেন না। রাঙামাটি দখল করে আরো রাজ্য বিজয়ে তারা উদ্যোগ নেন ও সফল হন।

জাঙ্গে ফা নামেতে তার পুত্র হৈল রাজা।
নানা স্থানে গিয়া করে চৌদ্দ দেব পূজা।।
ফেনী নদী তীরে আর মোহবীর তীরে।
দেশের পশ্চিমে পূজে লক্ষ্মীপতি ধারে।।
পূর্ব দিকে পূজে আদ্যে অমর পুরেতে।
চতুর্দশদেব পূজে দৃঢ় ভক্তি মতে।।

এই সীমানা চৌহদ্দী তার বিজিত রাজ্য সীমা। এবং এর বাইরে এক সময়ে " বঙ্গদেশ আমল করিতে হৈল মতি' এবং ঐ লক্ষ্য পূরণে "বিশালগড় (বর্তমান বিশালগড়) আদি করি পর্বতীয় গ্রাম। কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম।।"

লক্ষ্মীপতি এবং অমরপুরের বিষয়ে অতীত সন্ধান প্রয়োজন। ভুল হতে পারে ঐ দুটি জায়গাই এই নামের পরিচিত জায়গা দুটি কি না? লক্ষ্মীপতি তো গোমতীর পাড়ে, উদয়পুর মহকুমায় গোমতীর পাড়ে মহারানী হীরাপুরের বিপরীত তীরে। এবং যুঝাফা এবং জাঙ্গেফার রাজধানী কেন্দ্র অধুনা পরিচিত রাজনগর এর সন্নিকটে। এই যদি হয় তবে আর রাজ্য বিজয় হল কৈ? এদের সঠিক অবস্থানের জন্য কালের আস্তরণ ভেদ করতে হয়। অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তী মহাশয়ের বিশ্লেষণে " পশ্চিমে লক্ষ্মীপতি ধারে" যে লিখিত হইয়াছে তাহাদের লক্ষ্মীপতি একটি নদীর নাম। একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, ইহা বর্তমান লক্ষ্যা বা লাক্ষ্যা নদীর নাম বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। "লাক্ষ্যা" বা "লক্ষ্যা" নামের কোন অর্থই পাওয়া যায় না। কিন্তু লক্ষ্মীপতি নামের সুন্দর অর্থই পাওয়া যায়। " লক্ষ্মীপতি' নামটি সংক্ষে প করিতে যাইয়া "পতি' শব্দটি ছাড়িয়া দেওয়াতেই নামটি "লক্ষ্মী" ও পরে "লাক্ষ্যা" ও "লক্ষ্যাতে" পরিণত হইয়া থাকিবে। ময়মনসিং জিলায় ব্রহ্মপুত্রেরই অনতিদূরে কালিগঞ্জের বরাবর ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদীর তীরে " রাঙামাটি' নামে একটি প্রাচীন স্থান ছিল ১৭৭৯ খ্রিঃ অঙ্কিত সার্ভেয়ার জেনারেল রেনালের ম্যাপ এই স্থানটি সন্নিবেশ দেখা যায়।

কেদার নাথ মজুমদারের "ময়মনসিংহের ইতিহাস" এ আছে "রাঙামাটি" স্থানটি ব্রহ্মপুত্রের তীরে আর রাঙামাটির নিকট ব্রহ্মপুত্র ও "রাঙামাটিয়া" নামে পরিচিত (পৃষ্ঠা-৩২)।

অমরপুর ও ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান অমরপুর নয়। ব্রহ্মদেশের রাজধানী অমরপুর। অমরপুর দুটি। আগের এবং পরের। যুঝাফা এবং তাঁর ছেলে জাঙ্গের ফার অনেক পরের রাজা হলেন অমর মাণিক্য যার নাম ত্রিপুরার বর্তমান অমরপুর মহকুমা। রাজমালায় উল্লিখিত "আদ্য" অর্থাৎ আগে বা আদিতে। তাহলে এটাই প্রমাণ হয় যে বর্তমান অমরপুরে আদিতে অমরপুর নামে আরো একটি জায়গা ছিল। ঐ জায়গার অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়েই গবেষকরা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে আদি অমরপুর ব্রহ্মদেশের তৎকালীন রাজধানী অমরপুরই হবে। অতএব সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে যুঝার পুত্র জাঙ্গেফার সময়ে ত্রিপুর রাজ্য সীমা ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই চট্টগ্রামে বর্তমানে যে রাঙামাটি রয়েছে ঐ রাঙামাটিও

জাঙ্গেফার অধিকৃত বর্ধিত রাজ্য সীমা। গবেষকদের এবং পন্ডিতদের এ ব্যাপারে যুক্তি হল ব্রহ্মের পরাক্রান্ত রাজাকে যে পরাস্থ করতে পারেন সে চট্টগ্রাম অধিকার করার শক্তি ধরে না, তা হতে পারে না। যুঝার ফা এবং জাঙ্গেফার উল্লিখিত রাজ্য সীমার মধ্যে যে একাধিক রাঙামাটি নামের স্থান তা ত্রিপুর রাজাদের "রাঙামাটি " এই প্রতিশব্দ বঙ্গের প্রতি অনুরাগ। পূর্বপুরুষের বিজয় গাথার প্রতি আসক্তি। ও অতীত গৌরবকে স্মরণ। গৌরব বোধ হবেই না বা কেন? তাদের পূর্ব পুরুষ যুঝারফা যে রাঙামাটির অধীশ্বর " নিক্ক কে, দশহাজার সুশিক্ষিত কুকী সৈন্যের পরাক্রম সত্ত্বেও যুদ্ধে গোহারা হারিয়ে দেন। তারপর সংলগ্ন বহু রাজ্যকে পরাস্থ কে রাজ্যের পরিধি বৃদ্ধি করেন। তবে ইতিহাস বলে বঙ্গ দেশ বিজয়ের সংকল্প যুঝার ফা বা তাঁর অধঃস্তনদের পূর্ণ হয় নি। যুঝার ফা বিশালগড় (বর্তমানেও একই নাম) দখল করেন রাজমালা তার সাখ্য দেয় " বিশালগড় আদি করি পর্বতীয় গ্রাম। কালক্রমে সেই স্থান হৈল ত্রিপুর ধাম।।" কিন্তু কুমিল্লা লালমাই, পাটিকারা তথা কমলাঙ্ক বা মেহেরকুলে ত্রিপুরার অধীন হওয়া সে অনেক পরের ঘটনা। তবে পরের ঘটনা নিরবচ্ছিন্ন জয়ের নয়। কখনো কখনো পরাজয়ের তিক্ত স্বাদও নিতে হয়েছে। মোঘলরা দুইবার রাজধানী দখল করে। রাজাকে বিতাড়িত করে লুন্ঠন করে।

ত্রিপুর রাজাদের রাঙামাটি জয়ের পর তাঁদের রাজ্য বিস্তারের ধারণা নেওয়া গেল। তবে এখানেই শেষ নয়, খোদ রাঙামাটির বিস্তৃতিই আরো বিশাল ছিল, বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে পাওয়া যায়। "গঙ্গার পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদের কাছে রাঙামাটি নামে একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানেরই কথা জানা যায়। "আমরা মনে করি যুঝার বা বীররাজ কর্তৃক বিজয়ের দ্বারাই তাঁহার পূর্ব বিজয়ের স্মৃতিতে বিজয় স্থানের নাম রাঙামাটি রাখা হইয়াছে। যখন ত্রিপুরারাজ বীররাজ কর্তৃক ভাগীরথীর পশ্চিমতার জয়ের কথা আছে এবং তথায় তাহার পূর্ব বিজিত রাঙামাটি দেশের নামে রাঙামাটি স্থানও পাওয়া যাইতেছে তখন তাহার সহিত ইহার কোনরূপ যোগ থাকতে পারে। ইহা সহজেই মনে হয় (ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা - ৬২)। পরেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের তাঁর " বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত " এ উল্লেখ করেছেন " মুরসিদাবাদ হইতে রংপুর এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ এই সমস্ত প্রদেশ এক সময়ে রাঙামাটি বলিয়া কথিত হইত (পৃঃ ১৪৫)।

অতীতে এই বিশাল অঞ্চলের উপর আধি পত্য বিস্তারকারী পূর্বপুরুষ রাজা মহারাজাদের ব্যাপারে; তাদের ঐশ্বর্য, মেধা, বীরত্ব ও আধিপত্যের ব্যাপারে; মহারাজ বীর বিক্রম তাঁর পিতামহ রাধাকিশোর মাণিক্য নস্টালজিকহবেন। স্মৃতি রোমন্থনে অতীতচারী হবেন স্বাভাবিক। এবং রাধাকিশোর মাণিক্য বলতেই পাবেন " আগরতলা রাজধানী নির্মাণজনিত বিপুল অর্থ ব্যয়ের পূর্বে উদয়পুর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিলে নিঃসন্দেহে তিনি পূর্ব পুরুষগণের গৌরব স্মৃতি এই রমনীয় স্থানে রাজধানী পুনঃ স্থাপিত করিতেন।

দীর্ঘ পথের অন্তনাহি হেরি ঃ—
এই নীড় ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন পাড় হতে কোন পাড়ে

ধ্বনিয়া উঠিছে নিত্য নিখিলের পাখির এ গানে
হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন খানে।

যযাতির ছলে দ্রুহ্য যযাতির সিংহাসনের অধিকারী হলেন না। ঐ সিংহাসনে বসেন যযাতির কনিষ্ঠ পুত্র পুরু। পরিত্যক্ত দ্রুহ্য পিতার সাম্রাজ্যের বাইরে পূব দিকে চলতে থাকেন। কিরাত ভূমিতে এসে কিরাত দেশ জয় করেন। এবং রাজ্য স্থাপন করেন। যযাতির রাজ্য ছিল প্রতিষ্ঠানপুরে। প্রতিষ্ঠান পুর কোথায় তা নিয়ে গবেষকরা দ্বিমত পোষণ করেন। পুরাণে " প্রায়াগ বা এলাহাবাদকেই প্রতিষ্ঠানপুরের অবস্থিতি নির্ণয় করেছে। অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তী বহু বিচার বিশ্লেষণের পর সিদ্ধান্তে এসেছেন মযামযতি (বেদে উল্লিখিত) ও দ্রুহ্য কখনো এলাহাবাদে ছিলেন না। যযাতির প্রতিষ্ঠানপুর ও তাহা হইলে এলাহাবাদে না খুঁজিয়া পাঞ্জাবের নিকটেই খুঁজিতে হইবে। প্রসিদ্ধ চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ তদীয় সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণ বৃত্তান্তে Fo-Li-Shi-sa-tang-na নামে একটি স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। মেজর ক্যানিংহাম এই নামটিকে Ortospana বলিয়া পাঠ করিয়াছেন।" ক্যানিংহামের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তটি " The position of ortospana I would identify with kabul it-self"

চৈনিক পরিব্রাজকের Fo - Li- shi-sa-tang-na -তে ভারতের প্রাচীন ভূগোলের সম্পাদক সুরেন্দ্র নাথ " প্রতিষ্ঠান" নামটির ধ্বনিই শুনতে পান (পৃষ্ঠা -১৬) ক্যানিংহাম তে " পর্টোস্পান" উচ্চারণের কথা লিখেছেন তাকেই সুরেন্দ্রনাথ " প্রতিষ্ঠান উচ্চারণের অধিক নিকটবর্তী বলে মনে করেছেন। এই প্রতিষ্ঠানেই খাতির গ্রাম রাজধানী। সুরেন্দ্র নাথ যমুনা ও গোদাবরী তীরে আরো দুটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। তবে গবেষকরা কাবুলের প্রতিষ্ঠানকেই যযাতির রাজধানী বলে নিশ্চিত হয়েছেন। ত্রিপুরা থেকে কাবুল পশ্চিমে। পিতৃ সিংহাসন বঞ্চিত দ্রুহ্য অতঃপর পূর্বদিকে স্থায়ীত্বের সন্ধানে বেরুলেন। এবং কিরাত দেশ জয় করে ' কোপাল" নদীর তীরে "ত্রিবেগে" শহর নির্মাণ করে রাজপাট স্থাপন করেন।

কোপাল বা কপিলা নদীর প্রবাহ ধরেই দ্রুহ্য বংশীয়গণ ঐ নদীর তীরে ত্রিবেগে এসে উপনীত হলেন। এই কোপাল নদী পুরাণে "কপিলা বা " কপিল গঙ্গা" নামে উল্লিখিত। কজ্জলাচলে'র (নীল পর্বত) পূর্ব দিকে শুভ্র নামে একটি পর্বত রয়েছে তার পূর্ব দিকে কপিলা নদী। কামাখ্যা স্থানের পূর্ব ও পূব উত্তরে ব্রহ্মবিল নামে একটি আবর্ত আছে।

দ্রুহ্য সন্তানেরা যুন্নান থেকে বর্তমান ব্রহ্মপুত্র খাতের নিম্নপথে কামাখ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন এবং পরে কপিল নদীর ধার ধরে দক্ষিণ দিকে " ত্রিবেগে" উপস্থিত হন। এটিই তাদের ভারতে প্রবেশ পথ।

" ত্রিবেগ" অর্থাৎ তিন স্রোত এখানে নদীর সঙ্গম। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা যতীন্দ্রমোহন রায়ের অনুসন্ধান হল "ব্রহ্মপুত্র" ধলেশ্বরী ও লক্ষ্যা এই তিন নদীর সঙ্গম স্থলই "ত্রিবেগ।" তিনি আরো বলেছেন " ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, ও লাক্ষ্যা নদ ও নদীত্রয়ের সঙ্গম স্থান ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। এই স্থান বর্তমান নারায়ণগঞ্জের বিপরীতে সোনারগাঁও পরগণায়।" বলেছেন —" যযাতির পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে মহাবল পরাক্রান্ত তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য কিরাত ভূ-পতিকে রণে পরাঙ্মুখ করিয়া কোপাল নদের তীরে ত্রিবেগ বা ত্রিবেণী নগর সংস্থাপন পূর্বকস্বীয় রাজধানী

প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন (ঢাকার ইতিহাস পৃঃ ৪৭২)।"

জনশ্রুতি যে মহারাজ দ্রুহ্যর অধঃস্তন মহারাজ জয়ধ্বজের সময়ে এই বিস্তৃত ভূ-ভাগের উপর সুবর্ণ বর্ষিত হয়েছিল। ঐ থেকে সুবর্ণ গ্রাম আখ্যা পায়, এর আগে ঐ অঞ্চলে কিরাতাধিকৃত দেশ বলে অভিহিত হত (ঢাকার ইতিহাস, পৃঃ ৯)। সুতরাং কিরাতদের পরাজিত করে দ্রুহ্য বংশীয়রা এই স্থান স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেছিল বা বলা যায় দ্রুহ্য বংশীয়রা স্থিতি পেল।

তাহলে গান্ধার থেকে পাঞ্জাব হয়ে ক্রমশঃ উত্তর পূর্বাভিমুখী দিশায় দক্ষিণ চিনের যুন্নান বাইউনান প্রদেশ এবং দক্ষিণ চিন থেকে ব্রহ্মপুত্রের রেখা ধরে কিরাতে স্থিতি। দীর্ঘ যাত্রা। কোন পাড় হতে কোন পাড়ে। তবু দীর্ঘ পথের অন্ত নাহি পাই! তাহলে ত্রিপুরা অভিমুখে অন্তিম যাত্রা কালে দ্রুহ্যদের অর্থাৎ ত্রিপুর রাজবংশের পূর্ব পুরুষদের বাসস্থান ছিল দক্ষিণ চিনে। মৎস্যপুরাণ মতে শকদের দেশেই দ্রুহ্যদের দেশ। আদি বাসস্থান। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানে শকদের আদি নিবাস চিন দেশেই নির্দিষ্ট " Their original home seems to have been in the south China" (Peoples of India by J.D. Anderson. page -29).

এই তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তী সিদ্ধান্তে এসেছেন "চিন দেশের দক্ষিণেই যখন শকদের আদি স্থানের স্থিতি তখন তৎসঙ্গে উল্লিখিত দ্রুহ্য দিগের উপনিবেশ অনায়াসেই দক্ষিণ চিনে অবস্থিত ছিল বলিয়া অনুমিত হইতে পারে।" আবার গান্ধারের কথা যে পূর্বে উল্লেখ হয়েছে, পুরাতত্ত্বের প্রমাণে জানা যায় যে চিন দেশের দক্ষিণ পূর্বভাগে ইউনান প্রদেশ আছে তা এক সময় গান্ধার নামে পরিচিত ছিল। বিজয় চন্দ্র মজুমদার তাঁর " প্রাচীন সভ্যতা" গ্রন্থে লিখেছেন " পার্বত্য সীমান্ত বলিয়া ভারতবর্ষের দেশ সংস্কৃতির অনুকরণে এই "যুন্নান" রাজ্য গান্ধার বলিয়া অভিহিত হইত। চিনের ইতিহাসে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে (পৃঃ ৮১ - ৮২)।

মৎস্য পুরাণে দ্রুহ্য বংশ বিস্তারের বিবরণ আছে। সেই বিবরণ অনুসারে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে " গান্ধার দেশ দ্রুহ্যর অধস্তন তৃতীয় পুরুষ 'গান্ধার' এর নাম অনুসারে। "সেই গান্ধার বংশীয় দিগের দ্বারা উপবিষ্ট হইয়াই যে আদি স্থানের স্মৃতি রক্ষার্থে চিনের "যুন্নান" প্রদেশ " গান্ধার" নামে অভিহিত হইয়া ছিল তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব বলিয়া মনে হয়। এই গান্ধার (উত্তর পশ্চিমে সীমান্তের) যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিগবর্তী গান্ধারেরই উপনিবেশ তাহা কর্ণেল জেরিনিও তদীয় প্রসিদ্ধ গবেষণামূলক " Researches on potolemy's Geography" গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন— " We find furthere north, in Yunnaw - a second Gandhara" P-121 – (ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-২০)।" দ্রুহ্যের দুই পুত্র সেতু ও কেতু। সেতুর পুত্র শরদ্বান। তার পুত্র গান্ধার। দ্রুহ্যরা উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গান্ধার থেকে উত্তর পূর্বে ইউনান প্রদেশে থিতু হয় সেখান থেকে কিরাত দেশে প্রবেশ করে এবং অতঃপর রাঙামাটি।

রাঙামাটিতে রাজ্যপাট স্থাপনের পূর্বে ত্রিপুরার রাজারা আরো তিন জায়গায় রাজত্ব করে শেষ বারের মতন রাঙামাটিতে আসেন। শুরুতে ত্রিবেগে। এর অবস্থান বিতর্ক ইতিপূর্বে হয়েছে। ত্রিবেগে চারজন রাজা রাজত্ব করেছেন। এরা হলেন — (১) দৈত্য, (২) ত্রিপুর; (৩)

ত্রিলোচন এবং (৪) দাক্ষিণ। ১৪৩৭ খ্রিষ্ট পূর্ব থেকে ১৩০০ খ্রিস্ট পূর্ব কাল পর্যন্ত চার পুরুষ ত্রিবেগে রাজত্ব করেছেন।

দাক্ষিণ এক সময়ে ত্রিবেগ থেকে রাজ্যপাট গুটিয়ে বরবক্র নদীর উজানে খলংমা নদীর পাড়ে রাজধানী স্থাপন করলেন। দাক্ষিণের হয়তো আরো উজানে যাবার পরিকল্পনা ছিল। মনে হয় হেড়ম্ব রাজ্যই ছিল লক্ষ্য। যুদ্ধে দাক্ষিণ পরাস্থ হন এবং খলংমাতে থেকে যেতে হয়।

এখানে একটি ভিন্ন কাহিনিও রয়েছে। ত্রিলোচন হেড়ম্ব বা কাছাড়ের রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিলেন। ঐ রানির গর্ভে বারোটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়। দাক্ষিণ যখন ত্রিবেগ ছেড়ে বরবক্রের উজানে কাছাড় জয়ের তথা হেড়ম্ব রাজ্য জয়ের জন্যে অগ্রসর হন তখন হেড়ম্ব বা কাছাড়ের রাজা ছিলেন দাক্ষিণের বড় ভাই। হেড়ম্বের পূর্ববর্তী রাজা অপুত্রক থাকায় দাক্ষিণের বড় ভাইকে দত্তক গ্রহণ করেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারী করেন। হেড়ম্ব রাজের মৃত্যুর পর দাক্ষিণের বড় ভাই হেড়ম্বের রাজা হয়ে জ্যেষ্ঠ্যত্বের অধিকারে দাক্ষিণের রাজ্য দাবি করেন। দাক্ষিণ জ্যেষ্ঠকে রাজ্য ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃত হলে হেড়ম্বরাজ বিশাল বাহিনী নিয়ে দাক্ষিনের রাজ্য আক্রমণ করেন এবং দাক্ষিণের বাহিনীকে কপিল নদীর তীর (ত্রিবেগ) থেকে বরবক্র নদীর তীরে তাড়িয়ে দেয়। রাজমালায় এর বিবরণ এইভাবে লিখা রয়েছে ঃ

" হস্তী ঘোড়া বহু সৈন্য হেড়ম্বের ঠাট্।
সপ্তদিন যুদ্ধে লৈল ত্রিপুরার পাট।।
কপিলা নদীর তীরে পাট ছাড়ি দিয়া।
একাদশ ভাই মিলি মন্ত্রণা করিলা।।
সৈন্য সেনাসমে রাজা স্থানান্তরে গেল।
বরবক্র উজানেতে খলংমা রহিল ।।

এই বরবক্র নদীই ত্রিপুরার (পূর্বতন) অভ্যান্তরে মেঘনা নামে পরিচিত। ত্রিপুর রাজ বংশ কপিল বা ব্রহ্মপুত্র তীর ছেড়ে মেঘনা বা বরবক্র প্রদেশে থিতু হল। এখানেই ত্রিপুর রাজাদের প্রথম কিরাত রাজত্বের শেষ। দাক্ষিণের পর তার ৫২ তম পুরুষ পর্যন্ত খলংমাতেই রাজত্ব করেন। কারণ হেড়ম্ব রাজার কাছে পরাজিত হয়ে " খলংমা করিল রাজ্য দাক্ষিণ ন্বপতি।"

দাক্ষিণ খলংমা থেকে অন্যত্র, কপিলের উজানে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু কালগতি প্রাপ্ত হওয়ার উদ্যোগ সফল হয় নি।

দাক্ষিণের পর তাঁর ৫৩ তম অধঃস্তন পুরুষ মহারাজ কুমার শেষ পর্যন্ত খলংমা থেকে রাজ-পাট গুটিয়ে নেন এবং বর্তমান ত্রিপুরার অভ্যন্তরে মনু নদীর পাড়ে "ছাম্বুলে" রাজধানী স্থানান্তরিত করেন।

ছাম্বুলে একটি প্রাচীন শিবলিঙ্গ ছিল। এই শিবলিঙ্গের প্রতি ভক্তি বসতঃই মহারাজ কুমার ছাম্বুলে রাজধানী স্থাপনে মনস্থ করেন বলে মনে করা হয়।

"কিরাত আলয়ে আছে ছম্বুল নগর।
সেই রাজ্যে গিয়াছিল শিব ভক্তি তর।।

এই শিবলিঙ্গ সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে সত্য যুগে এই নদীতীরেই মহারাজ মনু শিবের আরাধনা করেছিলেন। মহারাজ মনু নদী তীরে বসে শিবের আরাধনা করেছিলেন বলে ঐ

নদীরও নাম হয় 'মনু'। এটি পবিত্র নীদ হিসেবেও গণ্য হয়।

এবার স্থানের নাম "ছাম্বুল" এর পশ্চাতে ঐ শিবলিঙ্গ। ছাম্বুল শিবের 'শম্ভু' নামের অপভ্রংশ।

ছাম্বুলে ১৩ জন রাজা রাজত্ব করেছিলেন। ১৫০ খ্রিঃ থেকে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের রাজত্বকাল। কুমার থেকে প্রতীত পর্যন্ত।

অধ্যাপক শীতল চক্রবর্তী বিস্তারিত ইতিহাস ঘেটে দেখিয়েছেন ত্রিপুর রাজাদের "ছাম্বুল" ত্যাগের পশ্চাৎ কারণ ও সেই হেড়ম্ব বা কাছাড়ের রাজা। তিনি স্বপক্ষে যে তথ্য তুলে ধরেছেন তা হল " মহারাজ প্রতীত ছাম্বুলে রাজত্ব করিবার কালে, তাহার সহিত হেড়ম্ব রাজের যেমনই আশ্চর্য রূপে সন্ধি বন্ধন হয়, তেমনই আশ্চর্যরূপে সন্ধি ভঙ্গও হয়। হেড়ম্বরাজ যে ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই বংশধর। বোধ হয় সেই পুরাতন কথা স্মরণ করিয়াই তিনি ত্রিপুর মহারাজ প্রতীতকে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপে পরম সৌহার্দভাবে আলিঙ্গন করতঃ তাঁহার সহিত এইরূপ সন্ধিতে আবদ্ধ হইলেন যে তাহারা কেহই কাহারো রাজ্যসীমা লঙ্ঘন করিবেন না। কৃষ্ণবর্ণ কাক যদিও শ্বেতবর্ণ হয়, তথাপিও তাহাদের প্রতিজ্ঞার অন্যথা হইবে না।

কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা। শীঘ্রই এক অসামান্য রমনীর প্রলোভনে পড়িয়া উভয়ের সেই প্রগাঢ় ভ্রাতৃভাবে ঘোর বিচ্ছেদ উপস্থিত হইল। রমনী প্রতীতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকেই আত্মসমর্পণ করিল। ইহাতে হেড়ম্ব রাজ বলপূর্বক প্রতীতের হস্ত হইতে রমনীকে গ্রহণ করিবার জন্য ভীষণ যুদ্ধের আয়োজন করিলেন। ইহাতে ভীত হইয়া প্রতীত সেই রমনীরই পরামর্শে ছাম্বুল নগর পরিত্যাগপূর্বক পালাইয়া পুনর্বার খালংমাতেই আসিলেন। হেড়ম্বরাজ ছাম্বুলে আসিয়া তথায় প্রতীতকে দেখিতে না পাইয়া অনুতপ্ত হওতঃ ত্রিপুর রাজ্যের সীমানা অব্যাহত রাখিয়াই নিজরাজ্যে চলিয়া গেলেন।" কিন্তু প্রতীত আর কিরাত রাজ্যে বাস করলেন না। তিনি খলংমা থেকে বঙ্গে চলে যান (পৃঃ ৪৩)।

"বঙ্গ" নামে একটু চমক লাগতে পারে। বঙ্গ মানে অধুনা বঙ্গদেশ নয়। ঐবঙ্গের সংস্থান মনু প্রদেশ ও গোমতা প্রদেশ বা রাঙামাটির মধ্যবর্তী ছিল। এটাই ত্রিপুরার মূল স্থান।" " পুরাণাদিতে ভারতবর্ষের পূর্ব দক্ষিণে " প্রবঙ্গ" নামক একটি জনপদের উল্লেখ দেখা যায়। রাজ মালার এই " প্রবঙ্গ" নামটিই বঙ্গরূপে লিখিত হইয়াছে। বিশ্বকোষকার এই " প্রবঙ্গকে" ত্রিপুরারই অংশ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে। ওয়েবষ্টার প্রাচীন ত্রিপুরাকে " কুমিল্লার পূর্ব ও উত্তরবর্তী বলিয়া সে সম্ভাবনা ব্যক্ত করিয়াছেন" তাহাতে প্রাচীন ত্রিপুরার সংস্থান আমরা যে মনু ও গোমতীর মধ্যবর্তী বলিয়া মনে করিয়াছি তাহারই সহিত ঐক্য হয় (অধ্যাপক শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী ৫২-৫৩)।

অধ্যাপক চক্রবর্তী লেখেছেন বঙ্গে বা প্রবঙ্গে ত্রিপুরা রাজ বংশীয়দিগের আগমনের পর হইতেই আমরা রাজমালায় দেশ ও লোক বুঝাইতে ত্রিপুরা শব্দের বহুল প্রয়োগই দেখিতে পাই।" বঙ্গে আগমনের পরেই লিকা অভিযান হয়। লিকাদের বিতাড়িত করেই " রাঙামাটির" দখল। সে ৫৯০ খ্রিস্টাব্দে। ঐ জয়ের গৌরব পুরুষ যুঝার ফা। ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত এই রাঙামাটিতেই ত্রিপুর রাজাদের রাজধানী ছিল। এই রাঙামাটির নাম পরিবর্তন করে "উদয়পুর" রাখেন মহারাজ উদয় মাণিক্য ৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে (সূত্র কৈলাশ সিংহের রাজমালা, পৃষ্ঠা-৬৪)।

আর মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যের সময়ে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি উদয়পুর থেকে রাজধানী আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন। সমসের গাজীর তাড়ানাতেই, তার পরাক্রমের কাছে পরাভূত হয়ে কৃষ্ণ মাণিক্য উদয়পুর থেকে রাজধানী সরিয়ে নিতে বাধ্য হন। অতঃপর কিছু কাল পরিত্যক্ত রাজধানী উদয়পুরের অন্ধকার যুগ।

" ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাসে" অধ্যাপক শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী " ত্রিবেগ" "খলংমা" এবং ছাম্বুলের রাজাদের নাম উল্লেখ করেছেন। ঐ তালিকা অনুসারে ঃ—

ক) ত্রিবেগের রাজাগণ (১৪৩৭ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ১৩০০ খ্রিঃ পূঃ)

১। দৈত্য ২। ত্রিপুর ৩। ত্রিলোচন ৪। দাক্ষিণ।

খ) খালংমার রাজাগণ (১৩০০ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ১৫০ খ্রিঃ পর্যন্ত)

১) দাক্ষিণ ঃ দাক্ষিণ ত্রিবেগেও রাজত্ব করেছেন। দাক্ষিণকে বাদ দিলে খালংমায় ৫২ জন রাজা রাজত্ব করেছেন।

২) তৈদাক্ষিণ ; ৩) সুদাক্ষিণ; ৪) তরদাক্ষিণ; ৫) ধর্মতর ; ৬) ধর্মপাল ৭) সুধর্ম; ৮) তরবঙ্গ; ৯) দেবাঙ্গ; ১০) নরাঙ্গিত; ১১) ধর্মাঙ্গদ; ১২) রুক্সাঙ্গদ; ১৩) সুমাঙ্গ; ১৪) নৌগয়োগরায়; ১৫) তরজুঙ্গ; ১৬) তররাজ; ১৭) হামরাজ; ১৮) বীর রাজ; ১৯) শ্রীরাজ; ২০) শ্রীমন্ত; ২১) লক্ষ্মীতর; ২২) তরলক্ষ্মী; ২৩) মাইলক্ষ্মী; ২৪) নাগেশ্বর; ২৫) যোগেশ্বর; ২৬) ঈশ্বর ফা; ২৭) রংফাই; ২৮) ধনরাজফা; ২৯) মোচঙ্গ; ৩০) মাই চোঙ্গ; ৩১) তাভুরাজ; ৩২) তরফা লাইফা; ৩৩) সুমন্ত; ৩৪) রূপবন্ত, ৩৫) তরহাম; ৩৬) যাহাম; ৩৭) কত রফা; ৩৮) কালাতরফা, ৩৯) চন্দ্রফা, ৪০) গজেশ্বর; ৪১) বীর রাজ; ৪২) নাগপতি, ৪৩) শিক্ষ রাজ; ৪৪) দেবরাজ; ৪৫) দুরাশা; ৪৬) বিরাজ ৪৭) সাগরফা; ৪৮) মলয়জ চন্দ্র; ৪৯) সূর্য রায়; ৫০) আচুঙ্গ ফালাই; ৫১) চরাতর; ৫২) আচঙ্গ; ৫৩) বিমার।

গ) ছাম্বুলের রাজাগণ (১৫০ খ্রিঃ থেকে ৫৯০ খ্রিঃ পর্যন্ত)

১) কুমার ; ২) সুকুমার; ৩) তৈছরাও; ৪) রাজেশ্বর; ৫) তৈছুংফা (রাজেশ্বরের ভাই); ৬) নরেন্দ্র, ৭) বিমান; ৮) যশ রাজা, ৯) বঙ্গ;

১০)গঙ্গা রায়; ১১) ছাত্রুরায়।

"ফা" থেকে " মাণিক্য"

ছাম্বুল থেকে যুঝার ফা ৫৯০ খ্রিঃ রাঙামাটি জয় করেন। " লিকা" দের পরাস্ত করে এই জয়। যুঝার ফা প্রতীতের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। যুঝার ফা তাঁর নূতন রাজধানীর নামও রাখলেন রাঙামাটি। ধ্বনি মাহাত্মের প্রতি লুব্দতা। এই রাঙামাটিই উদয় মাণিক্যের সময়ে নাম পরিবর্তিত হয়। নূতন নাম হল উদয়পুর। ত্রিপুরাব্দের প্রচলনও করেন তিনি। প্রতীতের পুত্র (ছাম্বুল শেষ ত্রিপুর বংশীয় শেষ প্রসিদ্ধ রাজা) মিরিছিম, তৎপুত্র গগন তাঁহার পুত্র নওরায় বা নবরায়। তৎপুত্র যুঝার ফা (যুদ্ধ জয় রাজ বা হিমতিছ) ইনি রাঙামাটি জয় করতং তথায় এক নূতন রাজবাটী স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি নবদেশ বিজয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে আদি পুরুষের নাম অনুসারে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন করেন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে নবজিত রাজ্য "ত্রিপুরা" অভিধা প্রাপ্ত হয় (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত অচ্যুত চরণ চৌধুরী পৃঃ ৪৯)।"

" ফা" উপাধির সঙ্গে মমত্ব ও কর্তৃত্বের মিশ্রণ রয়েছে। মহারাজ দৈত্যের ২৯ শ পুরুষ " ঈশ্বর" নামক রাজার নামের সঙ্গে ফা উপাধি প্রথম যুক্ত দেখা যায় (বিশ্বকোষ)। রাজমালায় লেখা হয়েছে " ত্রিলোচন" এর অধস্তন ২৭শ পুরুষ "ঈশ্বর" ফা উপাধি গ্রহণ করেন প্রথম। অচ্যুত চরণ চৌধুরী তাঁর শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে লিখেছেন " ফা শব্দ অনার্যভাষা সম্ভুব বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন, শ্যান ও ব্রহ্ম দেশীয় নরপতিগণ "ফ্রা" উপাধি ধারণ করিতেন ফ্রা হইতেই ফা-র উদ্ভব। ফা প্রভু বাচক, ফা অর্থে পিতা আসামে অহোম নৃপতি গণও ফা উপাধি ধারণ করিতেন কিন্তু ত্রিপুর রাজবংশীয়গণ তৎপূর্ব হইতেই এই উপাধি ধারণ করিয়া আসিতেছেন (২য় ভাগ, প্রথম খন্ড, ৪র্থ অধ্যায় পৃঃ ৫৫) অতঃপর মাণিক্য উপাধি ধারণ শুরু হয় ডুঙ্গুর ফার ছেলে রত্নফার সময় থেকে। রত্ন ফা রত্নমাণিক্য হলেন।

রত্নফা নাম তার পিতায়ে রাখি ছিল।
রত্ন মাণিক্য খ্যাতি গৌড়েশ্বরে দিল।
(রাজমালা)

এই গৌড়েশ্বর হলেন তদানীন্তন সময়ের বাঙলার নবাব সুলতান মোবিস উদ্দীন তুঘল। রত্ন ফা নবাবকে একশত হাতী এবং অত্যুজ্বল একটি মণি উপহার দেন। তুষ্ট নবাব রত্ন ফা কে " মাণিক্য উপাধিতে ভূষিত করেন। শুরুতে ফা উপাধিও ত্রিপুর রাজাদের ছিল না। ঈশ্বর নামক রাজা থেকে ফা উপাধির প্রচলন। ১১৮ তম রাজা যুঝা ফার সময় থেকে " ফা" উপাধি; তার ২৭তম অধঃস্তন রত্ন ফা (১৪৫ তম রাজা) সময় থেকে মাণিক্য উপাধি চলে আসছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে রাঙামাটি বা উদয়পুরে "ফা" উপাধিধারী রাজার সংখ্যা ছিল ২৭ জন। আর মাণিক্য উপাধিধারী রাজা রাঙামাটি তথা উদয়পুর থেকে শাসন করেছেন ২৯ জন। রত্নমাণিক্য থেকে কৃষ্ণ মাণিক্য পর্যন্ত এর বিস্তার, ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণ মাণিক্য আসামের গাজীর কাছে পরাভূত হয়ে উদয়পুর থেকে রাজ্যপাট সরিয়ে নেন এবং আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করেন।

মাণিক্য উপাধি ধারণ বিষয়ে কৈলাশ সিংহের রাজমালায় উল্লেখ হল " কল্যাণ মাণিক্যের পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ কল্যাণ মাণিক্যের সময় থেকেই নিরবচ্ছিন্নভাবে মাণিক্য উপাধি ধারণ)

রাজপুত্র ও রাজ পরিবারস্থ অন্যান্য ব্যক্তিগণ 'ফা' উপাধিই গ্রহণ করতেন। " মাণিক্য" উপাধি অর্পণ বিষয়ে ভিন্নমত রয়েছে।" ঐতিহাসিক আনন্দ নাথ রায় তাঁর "বার ভূঞা" পুস্তকে এই সম্পর্কে একটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন " এক সময়ে ত্রিপুরার রাজা দিল্লিতে উপস্থিত হইয়া বাদশাকে কতগুলি রত্ন উপহার প্রদান করায় বাদশাহ্ তাঁকে " লাল" এই উপাধি প্রদান করেন। পারস্য ভাষায় মাণিক্যকে " লাল" বলিয়া থাকে। রাজারা এই লাল উপাধি পারস্য শব্দ বলিয়া তৎপরিবর্তে সংস্কৃতিমূলক " মাণিক্য" উপাধিতে পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছেন (ত্রিপুরার প্রধান ইতিহাস, শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃষ্ঠা-৭৯) সেই যাই হোক "ফা" এবং মাণিক্যদের সমাবেশেই রাঙামাটির ঔজ্জ্বল্য।

কত রাজপথ ; জনপথ ঃ

" দ্রুহ্য বংশীয়গণ প্রথমে পশ্চিম গান্ধার হইতে আরম্ভ করিয়া তথা হইতে উত্তর দিকে অগ্রসর হন এবং উত্তর দিক হইতে পূর্ব দিকে যাইয়া শেষে দক্ষিণ পূর্বদিকে উপস্থিত হন (ত্রিপুরার প্রধান ইতিহাস, শীতল চন্দ্র চক্রবর্তী, পৃঃ২৯) এই গান্ধার ইতিহাসের কণিষ্কের রাজধানী গান্ধার বর্তমান আফগানিস্থানে। আদি পুরুষ দ্রুহ্যর দুই ছেলে সেতু ও কেতু। কেতুর ছেলে শবদ্বান। তাঁর ছেলে গান্ধার। এই গান্ধারের নাম অনুসারেই সুবিশাল গান্ধার দেশ। আবার গান্ধারের ছেলে ধর্ম, তার ছেলে ঘৃত, তার ছেলে বিদুষ, তার ছেলে প্রচেতা। প্রচেতার আবার একশত ছেলে। এরা সকলেই রাজা হয়ে উত্তর দিক অধিকার করেন। এ হল পশ্চিম থেকে উত্তরে যাত্রা (মৎস্য পুরাণ ৩৮ শ অধ্যায়)। উত্তর থেকে ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এরা। " দ্রুহ্য বংশীয়গণ ক্রমে ক্রমে উত্তর দিক হইতে পূর্বদিকে চিনে প্রবেশ করেন। মৎস্য পুরাণের উদ্ধৃতস্থলটিকে শকদিগের দেশের সহিতই দ্রুহ্য দিগের দেশের উল্লেখ রহিয়াছে। পাশ্চাত্য প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুসন্ধানে শকদিগের আদি নিবাস চিন দেশেই নির্দেশিত হইয়াছে [Their original home .seems to have been in the south of China– Peoples of India by Anderson the cambridge manual of science and literature, page-29] এই উদ্ধৃতি শীতল চন্দ্র চক্রবর্তীর ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস থেকে। সেখান থেকে পূর্ব দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে এই জনগোষ্ঠী খ্রিষ্ট পূর্ব ১৪৬৭ অব্দে " ত্রিবেগে" এসে রাজত্ব বিস্তার করেন। কপিল বা ব্রহ্মপুত্রের তীরে ত্রিবেগ। তিন বেগ, ধারা বা স্রোতের মিলন স্থল। ঐ তিন ধারা চিহ্নিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যার ধারা।

এখানেও স্থিতি হল না। হেড়ম্ব রাজের তাড়া খেয়ে ত্রিবেগ থেকে তাদের সরে যেতে হয়। সেখান থেকে বরবক্রী নদী (মেঘনা)র পাড়ে খলংমাতে রাজধানী সরাতে হয়। রাজা দাক্ষিণ খলংমা থেকেও উজানে সরে যেতে চাইলেন, আসলে রাজ্য বিস্তারের বাসনা। দীর্ঘদিন খলংমাতেই তাদের থেকে যেতে হল। তার অধঃস্তন ৫২ তম পুরুষ পর্যন্ত। পরবর্তী রাজা মহারাজ কুমার চলে এলেন মনু নদীর পাড়ে ছাম্বুলে। ছাম্বুলে শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা প্রতীত। তার অধঃস্তন চতুর্থ পুরুষ হামতার ফা রাঙামাটি জয় করে রাঙামাটি তথা উদয়পুরে রাজধানী স্থাপন করেন। ভারতের পশ্চিমে গান্ধার থেকে চিনের মেঘনার পাড়, সেখান থেকে মনু নদীর পাড় এবং অতঃপর এবং সর্বশেষ গোমতীর পাড় উদয়পুর দেড় সহস্রাব্দের পথ যাত্রা। বহিঃদেশ

থেকে রাঙামাটি (উদয়পুর) আসার এ হল প্রথম পথ। আর এরাই তো রাজ্য রাজধানী, জনপদ গড়ে তুলেছেন দ্রুহ্য বংশের রাঙা মাটিতে থিতু হবার পর। উদয়পুর সরোবর নগরী নামে অধুনা খ্যাত। জনতা না থাকলে জলাশয় খননের প্রয়োজন হয় না। একাধিক বৃহৎ জলাশয় প্রমাণ করে রাজধানী স্থাপনের পর বহুতর জনবসতি এবং উত্তরোত্তর তার সংখ্যা বৃদ্ধি রাঙামাটিতে (উদয়পুরে) জনবাহুল্যের প্রমাণ। কীর্তি স্থাপনের জন্য জনশূন্য মরুভূমিতে কেউ জলাশয় খনন করে না।

আমরা রাঙামাটি বা উদয়পুরের দ্বিতীয় পথের সন্ধান পাই রত্নকন্দলী শর্মা আর অর্জুন দাসের (আসাম রাজার দূত) বিবরণ থেকে। হিড়ম্ব রাজ্যের সীমানা ছুঁইয়েই যুঝার ফা'র রাঙামাটিতে প্রবেশ করেন। রত্নকন্দলী শর্মা আর অর্জুন দাসও কাছাড় (পূর্বতন হিড়ম্ব রাজ্য) হয়েই ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেন। এবার আমরা তাঁদের পথের পদাতিক হব।

"কার্ত্তিক মাসের তিনদিন থাকিতে এক সোমবারে ত্রিপুরা দূতগণের সহিত আমরা ত্রিপুরা দেশ অভিমুখে রওয়ানা হইলাম। আমাদের ভাটীপাড়ার বাসা হইতে নাম ডাঙায় গিয়া নৌকায় উঠিয়া আমরা সাতদিনে রহায় পৌছিলাম। সেখান হইতে পাঁচ দিনে ডমেরায় পৌছিলাম। সেখান থেকে এগারদিনে খাছপুরে পৌছিলাম। খাছপুরে উনিশদিন থাকিবার পর খাছপুর হইতে অনুমান ছয় দন্ড কলের পথ গিয়া উদারবনে মুখরা নদীতে নৌকায় উঠিয়া সেই দিনেই আমরা বরাক নদীতে পড়িলাম। বরাক নদী পথে চারদিন উজাইয়া গিয়া লক্ষ্মীপুরে পৌছিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া পাঁচ দিনে কাছাড় ও ত্রিপুরা সীমানা রুপিনী নদীর মুখ পাইলাম। সেখানে কোন লোকবাস করে না। সেখান হইতে নদীর দুই ধারে পর্বত। রুপিনী নদীর মুখ হইতে তিন দিনে আসিয়া ত্রিপুরা রাজার অধীনস্ত রাংরুং -এ উপস্থিত হইলাম। সেখানে বরাক নদীর দুই ধারে পর্বত আছে। সেখানে কুকীদের বাস। অনুমান তিনশত কুকী বাস করে সেখানে। তাদের অস্ত্র তীর ধনুক, ঢাল এবং নাগা পঠি। সেই জায়গায় ত্রিপুর রাজার একজন লস্কর থাকে।

এইস্থানে পাওয়া যায় — গবয়, হাতির দাঁত, গোলমরিচ, সুপারী, পান, ধান, কাওন, তরমুজ, কুমড়া, কচু, আদা, ফুটি, করলা, বেগুন এবং তুলা। এখানে কাছাড় ও মেখলী দেশের লোক আসিয়া জিনিসপত্র কেনা বেচা করে। কাছাড়ী লোকেরা আনে — ছাগল, হাঁস, মুরগী, শুটকী, চাউল, লবণ, তৈল, গুড়, তামাক পাতা ও শুকনা সুপারী। মেখলী দেশ হইতে আসে — সোনা, কাঁসার থালা, কলস ও খেস্ কাপড়। রাজাকে দেওয়ার জন্য মেখলীরা যত্ন করিয়া ঘোড়া আনে। ত্রিপুরা দেশ হইতে আসে — পিতল, নূন, তৈল, গুড়, তামাক পাতা, শুকনা সুপারী এবং শুটকী। রাংরুঙীয়াদের ত্রিপুর রাজাকে প্রতি বৎসর দিতে হয় — ঘোড়া একটি, সোনা, হাতির দাঁত, থালা, গোলমরিচ, খাস্ কাপড়, কার্পাস ও গবয়। বেচা কেনা করার জন্য কাছাড়ী রাজাকে প্রতি বৎসর দিতে হয় — গবয় একটি।

রাংরুং হইতে রওয়ানা হইয়া চারদিনে রুপিনী পাড়ায় পৌছিলাম। রাংরুং হইতে ত্রিপুরার রাজধানী পর্যন্ত পর্বত রহিয়াছে। রুপিনী পাড়া হইতে চার দিনে ছারঠাং নদীর পাড়ে পৌছিলাম। সেখানে কুমজাং পাড়ায় আট দিন রহিলাম। সেখান হইতে ছয়দিনে ছাই রাং চুক -এ পৌছিলাম। রাংরুং হইতে ছাই রাং চুকের সীমানা পর্যন্ত যে সব লোক বাস করে তাদের কুকী বলে।

সেখানে আমরা বারো দিন রহিলাম। সেখানে দেও গাঙ (দেওনদী ?) নামে একটি নদী আছে। ঐ নদীতে বাঁশের ভেলা বাঁধিয়া তাহাতে উঠিয়া আমরা ভাটিতে নামিয়া আসিলাম এবং পরে মনু নদী দিয়া উজাইয়া এবং রাস্তায় এক রাত্রি বাস করিয়া আমরা কের্পায় উপস্থিত হইলাম। কের্পায় তেরদিন থাকিয়া দুই দিনে ছোট মরিছরাই, বড় খাকরাই নদীর ধারে পৌছিলাম। সেখান হইতে রাজধানী চারি দন্ডের রাস্তা।"

সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে রাজ্য সীমানা প্রহরা এবং সীমান্ত যোগাযোগের প্রশ্নে এবং রাজ্য বিস্তার ও শত্রুর আগমন প্রতিরোধের প্রয়োজনে চতুর্দিকে রাস্তার বিস্তার ঘটে। তেমন রাস্তার বিবরণ রাজমালায় রয়েছে গাজী নামায় এবং ঐতিহাসিকদের বর্ণনায়। তার কতিপয় হল —

" রত্ন ফা চলিল নিজ রাজ্য লইবারে।
কতদিনে আসিলেক জামির খাঁর গড়ে।।
গড় জিনে রাঙামাটি ছিনাইয়া লইল।
জঙ্গর ফার সৈন্য সব পর্বতেতে গেল।।

জামির খাঁর গড় বর্তমানের বাগমায়। এবং অনুমান করা হচ্ছে কৈলাগড় (বর্তমান কমলা সাগর) বিশালগড় এবং জামির খাঁর গড় - এই পথেই রত্নমাণিক্য রাজধানী উদয়পুরের দখল নিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হৈতান খাঁর কাছে পরাজিত ত্রিপুর বাহিনী কৈলাগড়, বিশালগড়, জামির খাঁর গড়, ছকড়িয়া গড়, যজাপুর হয়ে রাঙামাটি ফিরে আসে। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী তাঁর বইয়ে উল্লেখ করেছেন " ১৩৪০ ত্রিপুবাব্দে, অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই পুরাতন রাস্তার চিহ্ন ছিল। এর নাম নাজিবের জাঙ্গাল। এই পথেই ইস্পিন্দার খাঁর মুঘল বাহিনী ১৬২১ খ্রিস্টাব্দে উদয়পুরে উপস্থিত হয়েছিল। আবার ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের রাজত্ব কালেও রাজধানী লুণ্ঠনের জন্য এই পথই ব্যবহার করেছিলেন।

গাজীর জাঙ্গাল বা উদয়পুর মেহের কুল রাস্তা। ধন্য মাণিক্যের রাজত্বকালে গৌড় সেনাপতি গোরাই মালিক মেহের কুল দুর্গ জয় করে সোনামাটিয়া (বর্তমানে সোনা মুড়া) দখল করে চণ্ডীগড় পর্যন্ত পৌছেছিলেন। সামসের গাজী ও একবার এই পথে উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন। একটি রাস্তা ছিল " কুমিল্লা থেকে বিবির বাজার, ভোগজার, কটকবাজার বড় পাথর, চুন্দলবাড়ী, রানিবাড়ি, চান্দিনামুড়া হইয়া চন্দ্রপুর ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ি এবং উদয়পুর পর্যন্ত।

শ্রীহট্ট জেলার পশ্চিম সীমানা মনতলা দিয়ে সদর মহকুমার মোহনপুর তহশীলের ফকির মুড়া, তারানগর বিশালগড় হয়ে উদয়পুর পর্যন্ত একটি রাস্তা ছিল। যশোধর মাণিক্যের গোবিন্দ দেব সামরিক প্রয়োজনে উদয়পুর থেকে আচরঙ্গ পর্যন্ত একটি পথ নির্মাণ করেন।

বিলোনীয়ার দিক থেকে সামসের গাজী দুইবার উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন। খন্ডল পথের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ঘাঁটিটিই মহেশ পুষ্করিনী বলে অনুমান করা হয়। সমসের গাজীর প্রবেশ পথটি ছিল মহেশ পুষ্করিনী থেকে সোনাতলা পাথর, মুন্ডুমালা, গান্ডারী (গান্ধারী?) ও কিল্লা হয়ে উদয়পুর।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর উদয়পুর বিবরণ বই-এ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় অস্তিত্ব ছিল এবং

পুরাতন রাস্তার সংস্কার করা হয়েছিল যা উদয়পুর থেকে চারদিকে ছড়ানো তার উল্লেখ করেছেন।

(ক) উদয়পুর সোনামুড়া রাস্তা ১৩১১ ত্রিং সনে এই রাস্তা নির্মিত হয়।

(খ) গোয়ালিনী জাঙ্গাল। উদয়পুর থেকে গোয়াল গাঁও, টেপানিয়া, হদ্রা, শালগড়া, আমতলী, কাকড়াবন পর্যন্ত রাস্তা।

(গ) আমতলী হইতে তোতামুড়ার দিকে বিস্তৃত পুরাতন রাস্তা। তিনি সেই রাস্তার চিহ্ন দেখেছেন। ঐ পথে নলছড়, রুদিজলা হয়ে সোনামুড়া যাওয়া যেত।

(ঘ) অমরপুর নূতন বাজার রাস্তা। ১৩১৪ ত্রিং সনে অর্থাৎ ১৯০৪ খ্রিঃ জঙ্গল কেটে এই রাস্তা তৈরি হয়।

(ঙ) উদয়পুর অমরপুর রাস্তা। দেবতামুড়ার উপর দিয়ে ঐ রাস্তা ছিল।

(চ) ডম্বুরের রাস্তা (১৩১১ ত্রিঃ থেক ১৩১৪ ত্রিং অর্থাৎ ১৯০১ খ্রিঃ থেকে ১৯০৪ খ্রিঃ — এর মধ্যে এই রাস্তার জঙ্গল কাটা হয়।

গোমতীর পাড়ে রাজধানী উদয়পুর। স্বভাবতঃই নদীপথেও রাজধানী শত্রুপক্ষের আঘাত সীমায়। এই জন্যে ত্রিপুরার রাজাদেরও নদীপথে নিরাপদ রাখার জন্য নৌবহ গড়তে হয়ছিল। গৌড়ের রাজধানী পর্যন্ত নদীপথে পৌঁছে যাওয়া যেত এবং গৌড় থেকে উদয়পুরেও। দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্য নৌবহর নিয়েই পূর্ব বঙ্গ আক্রমণ করেছিলেন। গোরাই মালিক নদীপথ ব্যবহার করেছিলেন। যশোধর মাণিক্যের রাজত্বকালে মুঘল নৌসেনাপতি বাহাদুর খাঁ গোমতী পথে উদয়পুর আক্রমণ করার চেষ্টা করেন। ঐ যুদ্ধে ত্রিপুরার নৌবহর বিধ্বস্ত হয়। ত্রিপুরার নৌঘাঁঠি ছিল সুখ সাগরে।

তবে চলাচলের পথ হিসেবে গোমতী নদীর ব্যবহার খুব প্রাচীন নয়। ১৯২৫ সালে মহারাজ বীর বিক্রম যখন উদয়পুর পরিদর্শনে আসেন তাঁর রিপোর্টে নদী পথের উল্লেখ ছিল না। কিন্তু না থাকলেও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা বাণিজ্যে গোমতীর গুরুত্ব ছিল। উদয়পুরে গড়ে উদয়পুরেরই প্রশাসনিক সীমানায় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল শালগড়া কাকড়াবন। ব্যবহৃত পণ্যের অধিকাংশ আসত বাংলাদেশ তথা চাকলা রোশনাবাদ থেকে আর বনজ সম্পদ চালান যেত ত্রিপুরা থেকে । ছন, বাঁশ, কাঠ, তুলা, সরিষা ইত্যাদি স্বভাবতঃই ভাড়ে বা মাথায় করে হাঁটা পথে পণ্যের স্থানান্তর কিন্তু দূরবর্তী স্থলে এত শ্রমের মধ্যে না গিয়ে নৌকাই ছিল বাহন। তবে লোকসংখ্যা কম ছিল বলে গোমতী নদী পথের উন্নত পরিসেবার কথা কারোর মাথায় আসেনি। এর একটা কারণ হবে নৌবিদ্যায় পারদর্শী মানুষের অভাব। কালক্রমে সমতল ত্রিপুরা তথা চাকলা রোশনাবাদ থেকে এই বৃত্তির লোকেরা এসে পরিবহন বাণিজ্যকে একটা রূপ দেয়। ১৯০১ সালে উদয়পুর যখন প্রশাসনিক কেন্দ্র হল চাকুরিজীবীর প্রয়োজনীয়তা ও অন্যান্য বৃত্তিধারীরা বাঙলা মুলুক থেকে উদয়পুরমুখী হলেন। এছিল অপরিহার্য কারণ ত্রিপুরায় ঐ সব কর্মের চাহিদা মেটানোর লোক ছিল না। এরা কেউ স্থায়ী হলেন তবে শিকড় একেবাড়ে বাঙলাদেশ থেকে উপড়ে আনলেন না, কেউ উদয়পুরকে উপার্জনের উৎস করলেন কিন্তু এখানে স্থায়ী হলেন না তারা বাঙলাদেশেই রয়ে গেলেন। ফলে যাতায়াতের অপরিহার্য চাহিদা মেটাতে এবং আরাম দায়ক যাতায়াতের জন্য নৌকা যোগে গোমতীই হল এক মাত্র পথ। ঢাকা থেকে বর্ষার শুরুতে বড় নৌকা "গহনা" নিয়ে মাঝিরা চলে আসতেন। কুমিল্লা থেকে উদয়পুর তারা নিত্যযাত্রী

পরিবহন করতেন। সকাল ছয়টা রওয়ানা হয়ে সন্ধ্যায় কুমিল্লা পৌছে দিত যাত্রীদের। ফেরার পথে সময়টা লাগত দেড় দিন, পরের দিন দুপুর বা অপরাহ্ন পর্যন্ত। ১৯৫০ -৫১ সাল থেকে ১৯৫৫ -৫৮ সাল পর্যন্ত দেড় টাকা ভাড়ায় আমিও একজন যাত্রী ছিলাম। নৌকা ভ্রমণের আনন্দের সঙ্গে যোগ হত "ঢাকাইয়া মাঝিদের" ঝাল যুক্ত হাল্কা মুসুর ডালের অনির্বচনীয় স্বাদ। যা- এখনো জিভে লেগে রয়েছে। চালতা তলা, বড় ঘরের পেছন (কালাচাঁদ রায়ের তহবিল) বর্তমান বাঁশ বাজার ছিল উদয়পুরের "গহনা" বন্দর। শীতের শুরুতে তাঁরা আগামী বছরে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাত্রী-শখাদের কাছ থেকে বিদায় নিত। পরে এল কুমিল্লা থেকে উদয়পুর পল সাহেবের মোটর গাড়ি।

বহুযুগের ওপাড় হতে

যুঝার ফা রাঙামাটি রাজ্য জয় করলেন। লিকাদের কাছ থেকে তাদের রাজ্য রাজধানী কেড়ে নিলেন। প্রশ্ন হল ত্রিপুর রাজবংশ পার্বত্য ত্রিপুরায় আসার আগে যে জনগোষ্ঠী বাস করতেন, যাদের রাজমালায় "লিকা" বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেই লিকা কারা? রাজমালায় এদের গোষ্ঠী পরিচয় বা ঐ জাতির উদ্ভব বৈচিত্র নিয়ে স্পষ্ট কোন কথা নেই। তবে সাধারণতঃ তাদের "মগ" জাতির উত্তরাধিকার বা তাদেরই কোন শাখা হিসেবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে এই লিকাদের সর্বপ্রথম বসতি যে ত্রিপুরায় নয় তাও উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তাহলে তারা কোথা থেকে এলেন, ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করলেন, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন? যেহেতু তাদের মূল বাসস্থান রাঙামাটিতে নয় তাহলে রাঙামাটিতে তারা বহিরাগত। যেমন — ত্রিপুর রাজ বংশের স্থিতি বিপর্যয় বা রাজধানী পরিবর্তন রাজ্য সীমানার অদল বদল থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসা গেছে যে তারাও বহিরাগত তবে রাঙামাটি জয়ের পর নানা উত্থান পতন হয়েছে। সাম্রাজ্যের ভাঙাগড়া হয়েছে, রাজধানী বা শাসন কেন্দ্র পরিবর্তন হয়। রাজ্যের সীমা পরিবর্ধন ও সঙ্কোচন ঘটেছে কিন্তু রাঙামাটি রাজ্য চূড়ান্তভাবে ত্রিপুর রাজাদের কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে নি। তবে লিকাদের মূল সাম্রাজ্যের কোন দিশা নেই। রাঙামাটিতে তাদের প্রথম রাজ্য আবার রাঙামাটিই তাদের শেষ রাজ্য। তবে তাদের পূর্ব বসতির সন্ধান পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে পরবর্তী বসতির সন্ধানও। কিন্তু রাঙামাটির পূর্বে বা পরে তারা রাজ্য স্থাপন করেছেন এমন সন্ধান নেই। অন্ততঃ রাজমালাতে নেই। বা অন্য কোন গবেষক বা ঐতিহাসিকও তার সন্ধান দেন নি। তবে এই লিকারা যে গোষ্ঠী হিসেবে এক সময়ে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করেছিল এবং এতটাই যে তারা রাজ্য স্থাপনের মতনই শক্তি সঞ্চয় করেছিল তা ইতিহাস সিদ্ধ। তবে এর স্বপক্ষেও জোরালো এবং একমাত্র সাক্ষী রাজমালা। তবে আশ্চর্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর "কিরাত জনকৃতি"বিখ্যাত গ্রন্থে রাজমালাকে নিছকই রাজ রাজাদের গৌরব গাঁথা বলে খুব বেশি একটা প্রামান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসেবে মনে করেন নি। " We get the Bengali Rajmala as a Verse chronicle of Tripura. The historical value is not much for the period prior to the fifteenth century, the chronicles of Tripura king are full of romantic tales [kirata Jana kriti: page- 131] আবার হেমস্ লং সাহেব লিখেছেন " The Rajmala of the Tripura family which bears all the marks of antiquity is kept with great care, I have every reason to believe to be a genuine record of the Tripura family " Games Long : Analysis of Rajmala]

দুই পন্ডিত দুই বিপরীত মেরুতে থাকলেও আচার্য সুনীতি কুমারও রাজমালাকে অগ্রাহ্য করেন নি। " Much" কথাটির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে যা পূর্ণের খন্ডিত অংশের পরিমাণ নির্ধারিণ করে। সুতরাং " Much" মানে পূর্ণ অস্বীকৃতি নয়। অর্থাৎ সারবত্তা আছে। আর পঞ্চাদশ শতকের আগের রাজমালাতেও নিরবচ্ছিন্ন উত্থান সমাহার নয়। সে যাই হোক্ পন্ডিতেরা, যারা আনুবীক্ষনিক বিশ্লেষক, তাঁরা এর বিচার করবেন। তবে লিকাদের কাছ থেকে যুঝার ফা রাজ্য কেড়ে নেন সপ্তম শতাব্দীর এক্কেবারে শেষ ভাগে। রাঙামাটি জয়ের পর ত্রিপুর রাজবংশের রাঙামাটিতে স্থিতি তো ঐতিহাসিক ঘটনা। এবং ত্রিপুরার ইতিহাসে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদি লিকারা জয়ী হতেন, ত্রিপুরা বংশের রাজা পরাস্ত হতেন তখন ইতিহাস নিশ্চিত ভাবেই অন্য রকম হত। যেমন ত্রিপুর রাজাদের পূর্ব পুরুষদের দ্বারা কাছাড় বিজয়ের ব্যর্থতা (যদিও কীর্তি দ্রুহ্যর এক সন্তানের বংশই কাছাড়ের রাজ্য পাটে ছিল কিন্তু রাজবংশের মূল স্রোত কিরাত দেশে আধিপত্য বিস্তার সক্ষম হয় নি) এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসকে পাল্টে দিয়েছে।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। " রাজমালায়" উল্লিখিত "লিকা কারা?" নামক অনাদি ভট্টাচার্য মহোদয়ের এক গবেষণা মূলক প্রবন্ধের মধ্যে আমরা এই প্রশ্নে উত্তর অনুসন্ধান করতে পারি। রাজমালার টিকা অনুসারে আমাদের মনে হবে " লিকা" রা মগ জাতির একটি শাখা। অনাদি ভট্টাচার্য মহোদয় প্রশ্ন তুলেছেন যদি তাই হবে তবে " বর্তমানে মগ জাতির মধ্যে ঐ নামে কোন শাখার অস্তিত্ব নেই কেন?" এর পরেই তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন " তাহলে কি ধরে নিতে হবে" "লিকা" নামক এই মানব গোষ্ঠী কয়েক শতকের মধ্যেই ধরা পৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে? কোল, ভাল, সাঁওতাল, আন্দামানের জারোয়া, অষ্ট্রেলিয়ার মাওরি, আমেরিকার রেড ইন্ডিয়ানরা যদি আজো অধিকতর প্রতিকূল পরিবেশে বেঁচে থাকতে পারে, তবে " লিকাগণ" অবলুপ্ত হতে পারে কেন?

রাজমালা বলে দিয়েছে লিকাগণ মগ জাতির একটি শাখা। মগ জাতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে রাজমালাতে মগের প্রতি শব্দ লেখা হয়েছে "মগধ"

(১) মগধ নৃপতি আইল বনপথে।

(২) যে কালে মগধ সৈন্য আসিবে ময়দানে।

(৩) মগধে খেদাইয়া কাটে গড়ের সদনে [রাজমাল তৃতীয় লহর, পৃষ্ঠা-৩৪ -৩৬]

প্রসঙ্গত ত্রিপুর বংশাবলীর থেকেও তিনি উদ্ধৃতি নিয়েছেন। যেমন ঃ—

(ক) চট্টগ্রামে সদর ঘাটে এক বৃক্ষমূলে।

(খ) পূজায় আমাকে সদা মগধ সকলে।।

এবার এসেছেন বিশ্লেষণে " মগ" শব্দের প্রতিশদ " মগধ" শব্দ ভাবতে অবাক লাগে।

এই ধাঁধার উত্তর নিম্নলিখিত উদ্ধৃতি থেকে পারি ঃ—

" আরাকানের প্রাচীন নাম " রোসাঙ" বা " রোহাঙ"। সেখানকার অধিকাংশই আজ মুসলমান। তাদের "রোহাইঙ্গা মুসলমান" বলে অভিহিত করা হয়।

এদের পূর্ব পুরুষদিগের এক অংশ মগধ থেকে বিতাড়িত হীনযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোক। মুসলিম শাসনকালে এরা ধর্ম্মান্তরিত হয়। সেই বৌদ্ধ অধিবাসীরা মগধের অধিবাসী

ছিল বলিয়া এদের মগও বলা হয়। [রোহাইঙ্গা মুসলমান ঃ সালিদুই খাঁন। "সাপ্তাহিক রোব বার" ৩০-০১. ৮০ ইং]।

রোসঙ্গের (আরাকানের প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল "MROHANG" ভাষান্তরে MRUNG। এই নামে একটি উপজাতীয় ভাষার খোঁজ মেলে " The Tripura dialect which is known as " MRUNG" belongs of Asiatic (Tibeto - Burman) groups which comprises Koki- Chin Languages of Eastern India [Imperial Gazatter of India : Vol - I, chapter VII]

এই উপস্থাপনাকে সামনে রেখে অনাদি বাবু "লিকা" শব্দটিকে বিশ্লেষণ করেছেন। " লিকা" শব্দটি বিশ্লেষণ করলে আমরা পাই দুটি ধ্বনি "লি" এবং "কা"। তিনি বলেছেন আমার ধারণা "লি" শব্দটি চিন বংশজাত "৯" এই অর্থ দ্যোতনা করে।" তিনি উদাহরণ টেনেছেন " যেমন " লিন পিয়াও" "ল্যু শুন", " লিকুয়ান" এবং লিও শাও চি " প্রভৃতি। "তাঁর মতে "কা" শব্দটি "ক্লা" ধ্বনির বিবর্তিত রূপ। বর্মী ভাষায় " ক্লা" শব্দের অর্থ হচ্ছে বিদেশী। শব্দটি কালা শব্দ জাত। এই জন্যে অহমিয়া জনগণও বাঙালী দিগকে "কেলা" বলে।

দুটি ধ্বনির মর্ম বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় "চিন বংশ জাত বিদেশী।" আরাকানের মগগণ বর্মীদের চোখে " বিদেশী" কারণ আরাকানী মঙ্গোলিদের সঙ্গে মগধ থেকে বিতাড়িত, হীনযানী বৌদ্ধদের রক্ত মিশ্রণ বহু পূর্বে ঘটে থাকলেও উত্তর পুরুষদের আকারে প্রকারে দেহ বর্ণে পূর্ব পুরুষদের উপস্থিতি জাজ্বল্যমান। তাই স্বধর্মী অর্থাৎ বৌদ্ধ হওয়া সত্বেও মগেদের উপর অত্যাচার করত। বর্মীদের অত্যাচারে এবং জন সংখ্যার চাপে মগেরা ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরে আসতে থাকে। বর্তমান সাব্রুম, বিলোনীয়া প্রভৃতি অঞ্চলের পথ ধরে বর্তমানকালের উদয়পুর অঞ্চল পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে বসতি স্থাপন করে। পূর্ব স্মৃতিতে এই অঞ্চলের নাম রাখে তারা রাঙামাটি (রাঙামাটি, চট্টগ্রাম / রাঙামাটি) গার্দাং, লুং থুং প্রভৃতি স্থানের নাম নাকি এই সব স্মৃতি বহন করে। এদের কাছ থেকেই হিমতি ফা ওরফে যুঝা ফা' রাঙামাটি ছিনিয়ে নেয়।"

অনাদিবাবুর এই উজান পরিক্রমা থেকে এটা প্রতীয়মান হল যে এরা নৃতাত্বিক দিশায় বর্মীজদের সঙ্গে একাত্ম নয়। এরা আর্যবর্ত থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে আরাকানে থিতু হয়েছিলেন। সেখান থেকে ফের বিতাড়িত হয়ে পার্বত্য ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। তবে মগধেই তাদের শিকার প্রথম গ্রন্থী এটাই যে চূড়ান্ত সেই প্রশ্নের মীমাংসা? অনাদিবাবু উৎস মুখের সমীপবর্তী হয়েছেন। তাঁর যুক্তি জাল ভেদ না করা পর্যন্ত এমনটাই মানতে হবে। এবং মানতে হবে মগধ -ই 'লিকা' দের আদি বাসস্থান। হীন যান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরই একটি শাখা।

অনাদিবাবু ল্যাজের সন্ধান দিলেন। এবারে তাঁর পরিক্রমা মুড়োর দিকে।"পরাজিত লিকাগণের মধ্যে অনেকে "রাজ্য ছাড়ি দিয়া ক্ষুব্ধ লাজে" পালিয়ে গেল দূর বনে। অনেকে আবার যুঝার ফার হাতে বন্দি হল। সে সময়কার প্রথা অনুযায়ী যুঝার ফা বন্দিদের পাইকারীভাবে হত্যা (কোতলে আম) না করে সাহসী ও বীর যোদ্ধা দিগকে নিজ সৈন্য দলে স্থান দিলেন। ওরা ত্রিপুরা জনসমাজে একটি স্বতন্ত্র দফা হিসেবে স্বীকৃত হলো। বর্মীদের চোখে ওরা ছিল 'লিকা' আর ত্রিপুরা সমাজে ওরা হলো "রোহাঙ্গিয়া" বা "রোহাং"। কয়েক শতাব্দীর বিবর্তনের ফলে শব্দটি থেকে 'বিহাং' বা রিয়াং শব্দটি পাওয়া গেল। মহারাজ ধন্যমাণিক্যের কয়েক পুরুষ আগেই "লিকা" তথা "রোহাঙ্গিয়া" ত্রিপুরী সমাজে অন্যতম দফা রিয়াং বনে গেছে।

" এভাবে 'লিকা' দের ল্যাজ ও মুড়োর সন্ধান পাওয়া গেল।

লিকা সম্প্রদায় বিজিত হয়েও সকলে রাঙামাটি ছেড়ে গেলেন না। এর জন্য পরিবেশ তৈরি করে দিলেন বিজয়ী যুঝার ফা নিজে। অনাদিবাবুর কথায় " সে সময়কার প্রথা অনুযায়ী যুঝার ফা বন্দিদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা (কোতলে আম) না করে সাহসী ও বীর যোদ্ধাদিগকে নিজ সৈন্য দলে স্থান দিলেন।" রাজমালা ও অপরাপর গবেষকদের কাছ থেকেও এই তথ্যের সমর্থন মিলে। নিজ সৈন্যদলের এই সমাদর ও পুনর্বাসন সাধারণদেরও সাহসী ও উৎসাহিত করবে তা স্বাভাবিক। ফলে পূর্বতন বিজয়ী রাজ্য ছেড়ে যে অনেক " লিকা"ই রাঙামাটি ছেড়ে পালিয়ে যাননি এই সিদ্ধান্ত অমূলক নয়। এবং দীর্ঘ সহ অবস্থানে যা হয় ত্রিপুরীদের সঙ্গে সামাজিক, সাংস্কৃতিক নৈকট্য তৈরি হল। বৈবাহিক যোগাযোগও গড়ে উঠল। সংখ্যাগরিষ্ঠ ত্রিপুরীদের সাংস্কৃতিক প্রভাব তাদের উপর পড়তে শুরু করল। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংস্কৃতিক বিজয়কে নিরবে মেনে নেওয়া হল। সংখ্যাগরিষ্ঠের সাংস্কৃতিক বিজয়ের প্রভাব পড়ল ভাষায়। 'লিকা' দের আদি মাতৃভাষা "ম্রুং (MRUNG) শুধুমাত্র স্মৃতি ও শ্রুতিতে বেঁচে রইল। তাদের মাতৃভাষা হয়ে গেল " কৌ-ব্রৌ" অর্থাৎ ককবরক যা কিনা একান্তই ত্রি পুরী জনসমাজের মাতৃভাষা। ত্রিপুরা সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে প্রকাশিত " রিয়াং" গ্রন্থে উল্লেখ আছে " তারা ব্রহ্মদেশের শান রাজ্য থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে প্রথমতঃ চতুর্দশ শতকে প্রথম রত্নমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। জাতি হিসেবে রিয়াংদের কুকী বংশোদ্ভব বলা হলেও তিপ্রাদের সংস্পর্শে আসার ফলে রিয়াং ভাষা - তিপ্রা ভাষার সমশ্রেণিভুক্ত হয়ে পড়ে। জীবন যাত্রা ও সংস্কৃতির মধ্যেও তিপ্রাদের প্রভাব পড়েছে। অবশ্য রিয়াংদের সামাজিক কাঠামো, ধর্মাচরণ আর আচার আচরণে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র এখনো অক্ষুন্ন রয়েছে।" তবে শিক্ষা দপ্তরের বই-এ "লিকা" দের বা পরবর্তীকালে রিয়াংদের ল্যাজের খবর নেই।

যুঝার -ফার সৈন্য দলে "লিকা" সৈন্যবাহিনীর সাহসী ও যোদ্ধাদের পুনর্বাসনের বিষয়টি যে পরাজিত হয়ে পালিয়ে যাওয়া লিকাদেরও কতটা নির্ভয় করেছিল তা বুঝা যায় অনাদিবাবুর এই সিদ্ধান্ত থেকে "রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত "উচই সম্প্রদায়।" উচই শব্দটি " পরে আসার কথা ঘোষণা করে।" উল ছগুই ফাইখা" থেকে উচই শব্দটি জাত। " উল ছগুই ফাইখা" শব্দের বাংলা অর্থ হলো " পরবর্তীকালে এসেছে।" রিয়াংদের উৎপত্তি সম্বন্ধে পার্বত্য জন সমাজে যে 'কেরেং কথমাটি' প্রচলিত সেটি উপকথা মাত্র। উপকথার উক্তিগুলি যুক্তির ধোপে টেকে না" [ত্রিপুরা ও ত্রিপুরী; অনাদি ভট্টাচার্য, পৃষ্ঠা- ৩৮]।

পূর্বতন 'লিকা' রূপান্তরিত রিয়াং রা যে এই রাজ্য এবং জনসমাজকে নিজের করে নিয়ে দেশ সেবায় নিয়োজিত ছিল তার স্বপক্ষে একটি উজ্জ্বল উদাহরণ হল, পাঠান বিজয়ী মহারাজ ধন্য মাণিক্যের দুই বীর সেনাপতি "রায় কৌচাক' এবং রায় কসম। বাংলা করলে দাঁড়ায় "গৌরদেহী সর্দার এবং "কৃষ্ণদেহী সর্দার"। এই দুই ভাই রিয়াং সম্প্রদায় ভুক্ত। এই দুইভাই এর সহায়তায় মহারাজ ধন্যমাণিক্য রাজ পরিবারের একটি কুপ্রথাকে রদ করতে সক্ষম হন। মহারাজ ছেতুংফার সময়ে বিদেশী আক্রমণের সময় মহারানী ত্রিপুরেশ্বরী তাঁর ভাইকে নিয়ে বিদেশী সৈন্যদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেন এবং বিতাড়িত করেন। ঐ যুদ্ধে রানির ভাই অসীম সাহসের পরিচয় দেন। পুরস্কারস্বরূপ তাঁকে সেনাপতির পদ দেওয়া হয়। অতঃপর রানির

ভাইদের জন্য ঐ পদ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এর কুফল ছিল রাজপরিবারে গৃহযুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, অশান্তি ও রক্তপাত। ধন্য মাণিক্য রিয়াং ভ্রাতৃদ্বয়কে ঐ পদে বসিয়ে ঐ প্রথার যতি টানেন। ঐ প্রথম ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের বাইরে ভিন্ন সম্প্রদায় থেকে সেনাপতি পদে নিযুক্তি। এবং প্রথা নয় যোগ্যতার প্রাধান্য।

ধন্যমাণিক্যের রাজত্বকালে রায় কৌচাক ও রায় কসমের নেতৃত্বে ত্রিপুরার সেনাবাহিনী বিশেষ শক্তিশালী ও দুর্ধর্ষ হয়ে উঠে। এই দুধর্ষ বাহিনীকে ত্রিপুরী ভাষায় বলা হত ' সেনা কৌরাক' বা 'ছেনা ক্রাক' সংক্ষেপে 'ছেংক্রাক'।

এই দুই ভাইয়ের বীরত্ব জনজীবনে এক নূতন মাত্রা যোগ করল যা সংস্কৃতিকেও একটি ধারার জন্ম দিল। এই দুই ভাইয়ের বীরত্বের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য বিষুব সংক্রান্তির দিন থেকে সপ্তাহব্যাপী এক উৎসব পালনের প্রথা চালু করা হল। কালের বিবর্তনে ঐ উৎসবই 'গোরায়াইয়া' তথা 'গরইয়া' বা 'গরিয়া' উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে। অনাদিবাবু লিখেছেন " আদিতে বোধ হয় এই উৎসবের নাম ছিল " কালাইয়া - গোরায়াইয়া"। ত্রিপুরার কোন কোন অঞ্চলে পুরনো প্রথা অনুসারে এখনো "কালাইয়া" উৎসব পালনের রেওয়াজ আছে।

এতদ সত্বেও রিয়াংরা যে বৈষম্যের শিকার হয় নি তা নয়। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময়ে ঐ বৈষম্য রিয়াংদের মধ্যে বিদ্রোহের জন্ম দেয়। মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য ঐ প্রজা বিদ্রোহ দমনে এক অভিনব পন্থার আশ্রয় নিলেন। এক রিয়াং শিশুকে গোবিন্দ মাণিক্যের পাটরানি গুণবতী নিজ স্তন্য দুগ্ধ পান করিয়ে গোটা রিয়াং সমাজকে আবেগ তাড়িত এবং রাজ অনুগত করে ফেলেন। স্তন্য দুগ্ধ দানের মাধ্যমে রাজা -রানি রিয়াং সমাজের কাছে এই বার্তাই পৌঁছে দিলেন যে " রিয়াং রাও" রানির সন্তান তুল্য। গোবিন্দ মাণিক্যের কূটনীতি জয়ী হল। কিন্তু রিয়াংদের প্রতি বৈষম্যের যে অবসান হয় নি তার প্রমান তো বিংশ শতাব্দীর পরের দশকে রতনমুনি রিয়াং (নোয়াতিয়া) এর নেতৃত্বে রিয়াং বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তিতে। সেই বিদ্রোহের অবসান কূটনীতিতে নয়, গোবিন্দ মাণিক্যের অধঃস্তন এবং ত্রিপুরার সর্বশেষ রাজা বীর বিক্রম ঐ বিদ্রোহ দমন করেন রণাঙ্গনে এবং দলনেতা রতনমুনির হত্যায় তার পরিসমাপ্তি ঘটে। আর ভবিষ্যৎ রেষ কে বিষমুক্ত রাখার জন্য তাঁদের মাথা মুড়িয়ে ধর্মান্তরিত করা হল। 'লিকা' বা রিয়াংরা কখনই আর দেশান্তরী হয় নি। ধর্মান্তরিত হয়ে তাঁরা দেশান্তর ঠেকালেন। তবে ১৯৪২ -৪৩ খ্রিঃ দেশান্তরের পরিবেশও ছিল না; সুযোগও ছিল না।

বড়ো - কাছাড়ী গোষ্ঠীর এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী গোষ্ঠীপতি হিমতি ফা যিনি ত্রিপুর রাজবংশের অন্যতম অধঃস্তন পুরুষ, সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে, ভিন্ন মতে অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় রাজ্যবিস্তারের কারণে হোক বা ভাগ্যান্বেষণে সদলবলে রাঙামাটিতে হাজির হন। 'লিকা'দের হাত থেকে রাঙামাটি কেড়ে নেন। তাঁর মন্ত্র বা অনুগামীদের প্রতি অনুপ্রেরণার শ্লোগান ছিল 'হিমদি দ' অর্থাৎ এগিয়ে চল; চরবেতী। এই বীর পুরুষ রাঙামাটি জয় করলেন। নূতন অধিকৃত রাজ্যে রাজধানী স্থাপন করলেন, শাসন কেন্দ্রের নামও রাখলেন রাঙামাটি। কেবল তাই নয়, তাঁর অসাধারণ কূটনীতিতে ' লিকা' জাতিকেও জয় করলেন। রাঙামাটিতেই তাঁদের অভয় দিলেন; বসতি দিলেন। ক্রমশঃ সাংস্কৃতিক বিজয়ের দ্বারা লিকাদের ত্রিপুর জনগোষ্ঠীর অন্যতম এক সম্প্রদায় হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতির রাস্তাও খুলে দিলেন। 'লিকা' এখন কেবল গবেষকদের মস্তিষ্কে। কিন্তু রিয়াংরা জীবন্ত, প্রাণবন্ত এবং ত্রিপুরার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিপুত্র।

বড় ঘরের মানুষ

"নগায়ুঙ মা" (নক্ + হীয়ুঙ)। নক্ অর্থে ঘর এবং হীয়ুঙ অর্থে সর্ববৃহৎ, অর্থাৎ সর্ববৃহৎ ঘর। কত বড়? মা যোগ করে বোঝানো হল বৃহতের বিস্তৃতি। অনেক, অনেক বড় ঘর। সব চাইতে বড় ঘরে কে থাকেন? কে থাকবেন আর সব চাইতে বড় মানুষটি। ছত্র মাণিক্য বা নক্ষত্র মাণিক্য। রাজ্যের রাজা।

উদয়পুরে বদরমোকাম-এর বিপরীতে গোমতীর দক্ষিণ পাড় ঘেঁষে নাতি উচ্চ টিলার উপর এখন যে বৃহৎ ভগ্নাবশেষ এটিই সেই বৃহৎ বাড়ি। এর নির্মাণ নক্ষত্র মাণিক্য বা ছত্র মাণিক্যের হাতে, ১৬৬০ সালে। ১৭৬০ সালে এই প্রাসাদ থেকেই কৃষ্ণমণি বা কৃষ্ণ মাণিক্যের প্রস্থান। বৃহৎ বাড়িতে বৃহতেরই বাস। কারা সেই বৃহৎ মানুষ? এই প্রাসাদে বাস করেছেন মহারাজ নক্ষত্রমাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য , বিজয় মাণিক্য, জয় মাণিক্য, রাম মাণিক্য, দুর্গা ঠাকুর, দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য, মহেন্দ্র মাণিক্য, দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য, মুকুন্দ মাণিক্য, জগন্নাথ ঠাকুর, ইন্দ্র মাণিক্য এবং সর্বশেষ কৃষ্ণমণি। কৃষ্ণমণি এই প্রাসাদ থেকে ভাগ্যান্বেষণে বেড়িয়ে পড়েন সমসের গাজির তাড়া খেয়ে। তাঁর অধঃস্তন রাজা রাধাকিশোর মাণিক্য বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় আরো " বড় ঘর" নগায়ুঙ মা নির্মাণ করে ফেললেন।

এই বড় মানুষের উৎস কোথায়? কারা তাদের আদি পুরুষ? কোথায় তাদের আদিবাস, কোথায় তাদের সর্বশেষ বিস্তৃতি? মহারাজ যযাতি চো মহাভারত খ্যাত অতি বড় মানুষ, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সম্মানিত বান্ধব। যযাতির দ্বাদশ পুত্র । "বারোঘর সম্ভ্রান্ত ত্রিপুর" এই বারোর অন্যতম এক দ্রুহ্য তাঁরই সৃষ্টি রাজবংশের বংশ পরম্পরাতেই রয়েছেন এই বড় মানুষেরা। পশ্চিম দিগন্তের গান্ধার থেকে পূর্ব দিগন্তে বর্তমান ত্রিপুরা বিশাল ব্যাপ্ত মহাকাশ তলে তাদের বিচরণ। এই বংশ বিশ্বের প্রাচীনতম রাজ বংশ। দীর্ঘতম কাল রাজদণ্ডের অধিকারী, তারাই এই বিশাল আকাশকে আলোকিত করে থিতু হয়েছিলেন পূর্বের কিরাত দেশে। আর্য-অনার্যের মিশ্রণ ঘটিয়ে এরাই হলেন নব ভারতের পথ প্রদর্শক।

১৮৪ জন রাজা। সকলের কর্মকাণ্ডের জাবেদা সবিস্তারে নেই। আবার যে ভূখণ্ডে এদের সর্বশেষ স্থিতি সেই ভূবলয়ের ভূগোলও রূপ পাল্টেছে কালে-কালে। জানতে হবে ভূখণ্ডের রূপ বিবর্তন। জানতে হয় বড় ঘরের কতিপয় হৃদয়বান ও বীর্যবানের কথা। ত্রিপুরা ও তার পূর্ব সীমার কথা।

জনৈক গ্রীক বণিক-পর্যটকের বয়ান, টলেমীর ভাষ্যে "এই দেশ ভারতের পূর্ব সীমায়। কোপন বা কপিল নদীর অববাহিকায়"। অধুনা শ্রীহট্ট বাংলাদেশের ত্রিপুরার অঙ্গীভূত ছিল। পণ্ডিতেরা নিয়ে আসেন সমুদ্রগুপ্ত, গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজাকে, ত্রিপুরার প্রাচীনত্ব প্রমাণের সাক্ষী হিসেবে। পণ্ডিতেরা সমুদ্রগুপ্তের হিসেবের জাবেদা খাতা ঘেঁটে প্রমাণ বের করেছেন কিরাত দেশের রাজা সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন। এবং আরো সূত্র খুঁজে পান সমুদ্রগুপ্তের "লাট্" প্রস্তর লিপির বাইশতম পংক্তির মধ্যে যেখানে উল্লেখ রয়েছে সমতট (বঙ্গ), কামরূপ, নেপালক ও সঙ্গে তৃপুরাও। বঙ্গ, কামরূপ, নেপালের রাজাও সমুদ্রগুপ্তকে কর দিতেন যে।

আর কিরাত দেশটাই তৃপুরা। ভারতের পূর্ব প্রান্তের দেশ ত্রিপুরা। বিষ্ণু পুরাণেও কিরাত দেশ ভারতের " পূর্বদিগ্বর্তী"।

উক্ত গ্রীক বণিক্যের মূল পরিক্রমণ উদ্দেশ্য " বাণিজ্য'। পর্যটন তাঁর বাড়তি নেশা। ভাগ্যিস ওই নেশা ছিল তা না হলে সেই সময়ের ত্রিপুরার ব্যবসা বাণিজ্য বিষয়ে কীভাবে আমরা জানতাম। তিনি ত্রিপুরার একটি সীমান্তবর্তী স্থানে একটি বাণিজ্যিক মেলায় অংশ নিয়েছিলেন। ওই মেলার বাৎসরিক আয়োজন। বিদেশের বণিকরাও এদেশের পণ্য ক্রয়ের উদ্দেশে মেলায় অংশ নিতেন। বিদেশ মানে উত্তরের সুদূর চীন দেশও। রিরাট রেশমী বস্ত্রের বিক্রয় কেন্দ্র হয়ে উঠত তখন ওই মেলা।

কিরাত নামে এখন আর কোন দেশ নেই। অথচ কিরাত নামে দেশ ছিল। আবার ত্রিপুরাও একটি নামের বিবর্তিত পরিণতি। এই নাম পরিবর্তনের গতিটিও বিচিত্র। সমুদ্রগুপ্তের শিলা লিপিতে নামটি হল 'তৃপুরা'। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত পেয়েছেন "কর্ত্তৃপুরা" নামের হদিস। বিবর্তন থামল না। হল "কট্ ত্রিপুরা' এবং পরিশেষে 'ত্রিপুরা'। নামের সূত্র ধরে উৎসে পৌঁছানোর প্রয়োজন হয়েছিল যে ত্রিপুরা সর্বদাই উল্লেখ পেয়েছে স্বাধীন স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে – সেই ত্রিপুরার নাম সমুদ্রগুপ্তের কর আদায়ের লেজারে বাঁদিকের প্রাপ্তির ঘরে লিখা হয়ে গেল কী করে? ব্যাপারটা কেমন হল? পাণ্ডিতেরা এখানেই তাদের পাণ্ডিত্যের খাপ খুললেন। তাদের সিদ্ধান্ত হল কট্ ত্রিপুরা বা পাটিকারা রাজ্যই সমুদ্রগুপ্তের অধীন হওয়া সম্ভব। ত্রিপুরা স্বতন্ত্র রাজ্যই। কট্ ত্রিপুরা, ত্রিপুরা যে বিযুক্ত অংশ।

শীতল চক্রবর্তী একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন "পাটির সংস্কৃত 'কট্'-এর থেকে কট্ ত্রিপুরা অপভ্রংশ হয়ে হল কর্ত্তৃপুরা।" ওই পাটিকারা বা কর্ত্তৃপুরাই সমুদ্রগুপ্তের করদ রাজ্য ছিল। কিন্তু কিরাতভূমির রাজা নয়। মহভারতের সুক্ষ দেশ হল প্রাচীন কিরাত রাজ্য। এই দেশ বহুকাল অবধি ত্রিপুর রাজ বংশের শাসনাধীন ছিল। পরে ওই বংশের বিভিন্ন রাজাদের সময়ে রাজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে ওই রাজ্যই ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয় (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৭) । খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে সুক্ষ নামের বিলোপ হয়। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে প্রতীত ত্রিপুরায় অধিষ্ঠিত হন। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীতে সমস্ত রাজ্যই 'ত্রিপুরা' নাম প্রাপ্ত হয় (বাঙলার পুরাবৃত্ত)।

দ্বিতীয় কিরাত রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল শ্রীহট্টে। " এই দেশ বহু কালাবধি ত্রিপুর রাজ বংশের শাসনাধীন ছিল, পরে ঐ বংশীয় বিভিন্ন রাজাগণের সময়ে রাজ্য বৃদ্ধির সহিত এই রাজ্যই ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয়।" শ্রীহট্টের পরে " প্রবঙ্গে" ত্রিপুর রাজারা রাজ্য স্থাপন করেন। এই "প্রবঙ্গ ' বা ত্রিপুরা লইয়া একটি প্রদেশ 'সমতট' নামে পরিচিত ছিল।" বলা হয়েছে " যাহাকে আমরা উপবঙ্গ বলিয়াছি, বৌদ্ধ যুগে তাহারই নাম হয় সমতট। ইহা সমুদ্র হইতে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং সম্প্রসারিত হয়ে " ভাগীরথী হইতে পূর্বমুখে সমতট কমলাঙ্ক (কুমিল্লা) ও চট্টল (চট্টগ্রাম) পর্যন্ত হয়েছিল।"

গবেষকরা সাক্ষী মেনেছেন বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতার "আগ্নেয্যাং দিশি কোশল কলিঙ্গ বঙ্গোপবঙ্গ জবীরাঙ্গাঃ।।" এই শ্লোকের। এবার সামনে আনা হয়েছে রাজমালাকে রাজমালায়ও ত্রিপুরা অগ্নিকোণবর্ত্তী দেশ।" " উপবঙ্গ যেমন বিশেষ রূপে ত্রিপুরাকে বুঝায়

তেমনই সমতটকেও বিশেষরূপে ত্রিপুরাকে বুঝায়। ত্রিপুরাকে ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী বলিয়া ব্রহ্মপুত্র প্রদেশ বলাই সঙ্গত হয়। বস্তুতঃ সমতট নামের মূলানুসন্ধান করিলে ইহা যে " সমতট" না হইয়া " সমাতট' হওয়া উচিত। ব্রহ্মপুত্রের এক নাম 'সমা'। সুতরাং সমার তটবর্তী বলিয়াই সমাতট নাম হইয়াছিল। ইহাই সমতটের প্রকৃত ইতিহাস। ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ সমতটকে ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। (ত্রিপুরার প্রাচীন ইতিহাস, পৃঃ ৮৪)"

এবার সপ্তম শতাব্দীর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্-এর সাক্ষ্য। " তিনি সমতট নামে রাজ্য দেখে ছিলেন। তখন কমলাঙ্কের উত্তরে " তলোপত্তি" নামে স্বতন্ত্র রাজ্য বর্তমান ছিল। "ইহাই ত্রিপুরা বলিয়া অবধারিত হইয়াছে।"

এইরূপে প্রাচীন ত্রিপুরার বিস্তার বর্তমান ত্রিপুরা অপেক্ষা বরঞ্চ ব্রহ্মপুত্রের দিকেই অধিক বিস্তৃত ছিল। টলেমী বাংলা দেশের ভৌগোলিক বিবরণ ও তৎসঙ্গে একটি মানচিত্র উপস্থাপন করেছেন। ঐ মানচিত্রে " ত্রিগ্লিফন রেজিয়া" নামে একটি স্থান চিহ্নিত আছে। ত্রিগ্লিফন ত্রিপুরা নামেরই বিকৃতি, শীতল চক্রবর্তী এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। তার নিম্নভাগেই রয়েছে সমুদ্রউপকূলবর্তী "Baracura Emporium" নামে একটি বাণিজ্য স্থান। ঐটি ত্রিপুরার অন্তর্গত ছিল। এই সিদ্ধান্তের স্বপক্ষে ' বার্থেমা' নামীয় এক পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। বার্থেমা ঐ স্থানটিকে 'City of Banghella' বলে উল্লেখ করেছেন। বাঙ্ঘেলা ঐ Baracura এরই বিকৃতরূপ। বাঙ্ঘেলা যে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্ত তা পণ্ডিতেরা তথ্য প্রমাণে প্রতিপন্ন করেছেন।

এবার অধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মিত্রের 'যশোহর ও খুলনার ইতিহাস' থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির আশ্রয় নিতে হয়। " ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক অধিবেশন হয়। উহাতে খুলনার রেনী সাহেবের মধ্যমপুত্র H.J.Rainey সুন্দরবন ও প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তদনন্তর সভাপতি ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে সকলের মতামত জিজ্ঞাসা করিলে, রেভারেন্ড লং সাহেব বলিয়াছেন যে, ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যখন প্যারিস শহরে গিয়াছিলেন, তখন তথাকার বিখ্যাত রাজকীয় অনুসন্ধান পরিষদের এক প্রধান পণ্ডিত তাহাকে ভারতবর্ষের একখানি পর্তুগীজ মানচিত্র প্রদর্শন করেন। উহা তখন হইতে ২০০ বর্ষ পূর্ব অর্থাৎ মুঘল রাজত্বের মধ্যভাগে প্রস্তুত। ঐ মানচিত্রে সুন্দর বন সমুধর দেশ ও তাহাতে পাঁচটি নগরী প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যারোস (De Barrows) প্রণীত এশিয়ার ইতিবৃত্ত সংলগ্ন ম্যাপ এবং ভ্যানডেন ব্রুকের ম্যাপ হইতেও তাহাই প্রতিপন্ন হয়। এই সকল ম্যাপ হইতে জানা যায় যে সুন্দরবনের সমুদ্র উপকূলে প্যাকাকুলি, কুইপিটাভাজ, নলদী, ডাপরা এবং টিপারিয়া নামে পাঁচটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, তাহা এক্ষণে নাই।"

সুন্দরবনের উপরি উল্লিখিত শেষ বন্দরটির নাম " ত্রিপুরা" নামেরই অপভ্রংশ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।"

ইংরেজ রাজদূত রালফ্ ফিচ্-এর বিবরণে " **In the delta of the Ganges, on the verge of Tipperah District, he found the people not yet subducd by the Munghal emperors – Pioneers in India by Sir Harry Johnston, p,63."** তাহলে ত্রিপুরা রাজ্য গঙ্গার ব-দ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং প্রবল মুঘল সাম্রাজ্যের

প্রতিবেশী রাজ্য হলেও এমনকি মুঘলদের দ্বারা সতত উপদ্রুত হলেও, মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার না করে ত্রিপুরার স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতেও সমর্থ হয়েছিল। ত্রিপুরার বিস্তৃত ভূখণ্ডের হদিস এই দীর্ঘ পরিক্রমার ফলে জানা গেল। এবার বিশাল সাম্রাজ্যের উল্লেখযোগ্য কতিপয় অসাধারণ বীর্যবান রাজাদের উল্লেখ করতে হয়।

১৫৮৩ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ বিজয় মাণিক্যের দেহাবসান হয়। কৈলাশ সিংহ বিজয় মাণিক্যের সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যাচ্ছে আধুনিক ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার যেসব পরগনা রাজা তুডল মল্লের ওয়াসীল তোমর জমা ভুক্ত দেখানো হয়েছে তা "বিজয় মাণিক্যের শাসন নিয়ন্ত্রণে ছিল।" অধিকন্তু শ্রীহট্ট জেলার পূর্ব ও দক্ষিণ অংশও। তিনি লিখিছেন " আবুল ফজল ও রলফ্ ফিচের বর্ণনা দ্বারা ইহা বিশেষ রূপ নির্ণীত হইতেছে যে সমগ্র ত্রিপুরা নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের উত্তরাংশ এবং শ্রীহট্ট জেলার দক্ষিণাংশ মহারাজ বিজয় মাণিক্যের রাজচ্ছত্রের অধীন ছিল। চট্টগ্রামের দক্ষিণভাগ লইয়া মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বরের কলহ চলিতে ছিল। আমাদের বিবেচনায় রাজা তুডল মল্লের ওয়াসীল তোমর জমা সম্পূর্ণ প্রত্যয়যোগ্য নহে। বুকমান সাহেবও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিজয় মাণিক্যের শাসন কালে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল। ফলতঃ তাহাকেই বঙ্গ ও ব্রহ্মরাজ্যের মধ্যস্থিত সমগ্র সুক্ষ দেশের (শ্রীহট্টের) একমাত্র অধিপতি বলা যাইতে পারে।" সংক্ষিপ্ত রাজমালার লেখক বিজয় মাণিক্যের নামের সঙ্গে "সম্রাট" শব্দ যুক্ত করেছেন।

শক্তির উল্লেখ করে বলা হয়েছে বিজয় মাণিক্য তিনি লক্ষ লক্ষ পদাতিক ও এক সহস্র রণহস্তী রণক্ষেত্রে প্রেরণে সক্ষম ছিলেন। পাঠানদের দিয়ে অশ্বারোহী বাহিনীও গঠন করেছিলেন। আবুল ফজল তার আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখেছেন " এই রাজার (বিজয় মাণিক্য) দুই লক্ষ পদাতিক ও এক সহস্র হস্তী আছে, কিন্তু অশ্ব অতি বিরল।" বিজয় মাণিক্য সম্পর্কে আরো যা লেখা আছে আইন-ই-আকবরী গ্রন্থেই তা হল " ভাটি প্রদেশের (হুগলীর তীর থেকে মেঘনার তীর পর্যন্ত নিম্নভূমিকে মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা ভাটি নামে চিহ্নিত করেছেন। জেলা চব্বিশ পরগণা (অবিভক্ত) খুলনা, যশোহর, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ ও ঢাকা জেলার অংশবিশেষ ভাটি প্রদেশের অন্তভুক্ত) সংলগ্ন একটি স্বাধীন রাজ্য আছে। সেই রাজ্যের নাম তিপ্রা (ত্রিপুরা) আর তাহার নরপতির নাম বিজয় মাণিক্য।" এছাড়া বিজয় মাণিক্যের অনেকগুলি রণতরী ছিল। তিনি বঙ্গদেশ বিজয়ের জন্য " ২৬ সহস্র উৎকৃষ্ট পদাতিক, পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং ওলন্দাজদের দ্বারা গঠিত নৌবাহিনীর পাঁচ সহস্র নৌকা ঐ যুদ্ধে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি সোনার গাঁও -এ মুসলমানদের পরাজিত করেন। লাঙ্গা নদী অতিক্রম করে গঙ্গার পার পর্যন্ত এগিয়ে যান। ঐ যুদ্ধে তিনি পূর্ববঙ্গে বিজয়ী পতাকা উড্ডীন করেন। এর আগে তিনি চট্টগ্রামও পুনরুদ্ধার করেছিলেন। মুসলমানদের সঙ্গে সেখানে দীর্ঘ ৮ মাস তাঁর যুদ্ধ হয়েছিল। মুসলমান সেনাপতি মহম্মদ খাঁকে লোহার খাঁচায় বন্দী করে রাজধানী রাঙামাটিতে এনে তিনি চতুর্দ্দশ দেবতার থানে বলিদান করেছিলেন।

এই প্রবল পুরুষের সঙ্গেই স্থান পেয়েছেন ধন্য মাণিক্য। যিনি বঙ্গেব শাসনকর্তা হুসেন সাহকে তিন তিনবার পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সুযোগ্য সেনাপতির নাম ছিল রায়কাচাগ। ঐ সময়ে আরাকানরাও ত্রিপুরার কাছে পরাস্ত হয়ে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছিল।

তিনিও চট্টগ্রাম মুসলমান কবল মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। বরং আরাকানের কিছু অংশে ত্রিপুরার আধিপত্য কায়েম করেছিলেন। ইন্দ্র মাণিক্যও চট্টগ্রামকে স্বীয় শাসনাধিকারে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কল্যাণ মাণিক্যের সময়ে বাঙ্গলার মুঘল শাসন কর্তা সুজা ত্রিপুরা আক্রমণ করে কল্যাণ মাণিক্যের কাছে পরাস্ত হন।

ত্রিবেগ থেকে থেকে খলংমা, ছাম্বুল হয়ে ত্রিপুরার উপরের আকাশের বিস্তার কম নয়। পূর্ব পুরুষদের রাজত্ব স্থাপনের আগেও যে পরিক্রমণ সে গান্ধার থেকে দক্ষিণ চীন হয়ে ত্রিবেগ পর্যন্ত তার বিস্তার আরো বহুগুণ বেশি। যযাতি থেকে দ্রুহ্য, দাক্ষিণ থেকে বিমার, বিমার থেকে প্রতীত, প্রতীতের থেকে বুঝারফা বা হিমতি ১১৮ জন নৃপতির শৌর্য বীর্য ও পৌরুষে ঔজ্জ্বল্যে ত্রিপুরার আকাশ তখন ঝলমলে। তারপরেও বীরবিক্রম পর্যন্ত আরো ৬৭ জন নৃপতি পূর্বের বর্ণময় বিচ্ছুরণ রাঙামাটি ইত্যাকার নক্ষত্রের জ্যোতিও ত্রিপুর বংশের আকাশকে আরো বর্ণময় করেছে। প্রকৃতপক্ষে ১৮৪ জন নৃপতির আদি অন্তের হিসাবী একত্রে সন্নিবেশিত করলে ভারতের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় ত্রিপুরা আলোকিত করে রেখেছে। যার অতীত পরিক্রমা অতি প্রসস্থ রাজপথ ধরে এবং শেষ হয় বিংশ শতাব্দীতে ভারতের গণতান্ত্রিক বিকাশের উষালগ্নে, প্রসস্ততর পথের পদাতিক জয় যাত্রায়। ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি স্বেচ্ছায় হিমত ফা বা যুঝারফার পরবর্তী বীর্যবানদের অন্যতম হলেন বিজয় মাণিক্য আর ধন্য মাণিক্য। এজন্যেই তাদের বিশেষ উল্লেখ। এজন্যে প্রয়োজন তাদের কর্মকৃতি রাঙামাটি বা উদয়পুরকেও সংস্পৃক্ত করে রেখেছে গৌরবের আবরণের কাজেই উদয়পুরের ইতিহাসের পাতা উল্টালেই, পরতে পরতে এরা শুধু বীর্যরত্তার নয়, শাসন সংস্কার প্রজাহিতৈষী এবং ধর্মের শিকড়ে বারি সিঞ্চন কোথায় এরা নেই? এ হল এক ঐতিহ্যের পরম্পরা, অসংখ্য উত্থান-পতনের ফাঁক গলিয়ে পণ্ডিত্যেরা ত্রিপুরার অতীতকে এইভাবে উদ্ধার করেছেন ঃ

" ত্রিপুরার ইতিহাস পর্যালোচনার দ্বারা আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের কেবল প্রাচীনত্বেরই প্রমাণ পাইয়াছি, তাহা নহে, পরন্তু একই অবিচ্ছিন্ন বংশধারা যে, ত্রিপুরায় রাজত্ব করিয়াছে, তাহারও প্রমাণ পাইয়াছি। সমগ্র বঙ্গদেশে, কেবল বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই একই রাজ বংশের দ্বারা স্মরণাতীত কাল হইতে অধিষ্ঠিত দ্বিতীয় একটি রাজ্য দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। ত্রিপুরায় এইরূপে ঐতিহাসিক উপাদান যেরূপ অবিকৃত বা অল্প বিকৃতভাবে সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেরূপ বোধ হয় অপর কোথাও পায় নাই।

দ্রুহ্য বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ অনার্য কিরাত জাতির মধ্যে আর্য সভ্যতার অঙ্কুর লইয়া প্রথম উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কিরূপে এই সভ্যতার অঙ্কুরটিকে সযত্নে পোষণ করিয়া তাহারা উহাকে ক্রমে বর্ধিত করিয়াছিলেন এবং ক্রমে অনার্যজাতির মধ্যে ইহার মূল প্রসারিত করিয়াছিলেন তাহাই আমরা জানিতে পারি। ইহা হইতে ভারতের পূর্বসীমায় দ্রুহ্য বংশীয়গণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আর্য সভ্যতার একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাই প্রমাণ পাওয়া যায়।" মহারাজ ত্রিলোচনের দ্বারাই দ্রুহ্যগণের নব সংস্কার বা পুনর্বার আর্যদীক্ষা হয়। "ত্রিপুরা রাজাগণ অনার্য জাতির রাজারূপেই প্রথম অধিষ্ঠিত ছিলেন।"

ত্রিপুর রাজাগণ যখন ব্রহ্মপুত্রের তীরে রাজ্য স্থাপন করেন তখনো বঙ্গদেশ সমুদ্রগর্ভে। ত্রিপুরার পাহাড়ই বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ভূভাগ। হিউয়েন সাঙ যখন ভারত ভ্রমণে,

তিনি ত্রিপুরার অন্তর্গত কমলাঙ্ক বা কুমিল্লাকে সমুদ্রের পাড়েই দেখেছিলেন। ক্রমে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে বঙ্গদেশ। "নিম্নবঙ্গের বর্ষাকালের দৃশ্য আমাদিগকে বিশেষরূপে তৎস্থলের পূর্বকালের সাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রিপুরার রাজাদিগের রাজ্য পরিবর্তন, রাজ্য বিস্তার, রাজ্যে প্রজাস্থাপন প্রভৃতিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে ত্রিপুরার দেশ গঠনেরই সুন্দর আভাস পাওয়া যায়।"

ত্রিপুরা পূর্ববঙ্গের আদি ও প্রধান স্থান বলে পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ত্রিপুরাকেই বোঝাত। এভাবে এক সময়ে অর্ধেক রাজ্যই ত্রিপুরা নামে পরিচিত ছিল। এই জন্যেই পণ্ডিতেরা মনে করেন ত্রিপুরাকে ছেড়ে বঙ্গের ইতিহাস তা অর্ধেক ইতিহাস হবে।

বিশ্বকোষ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে শীতল চক্রবর্তী দেখিয়েছেন " ত্রিপুরার ইতিহাস কেবল অর্ধবঙ্গের ইতিহাস বলেই বঙ্গ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়া উচিত তাহা নহে, ত্রিপুরার ইতিহাসে বঙ্গের গৌরব করিবার যথেষ্ট বিষয় আছে বলিয়াও বঙ্গ ইতিহাসের অঙ্গীভূত হওয়ার জন্য ইহার বিশেষ দাবী করার কারণ আছে।

আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে বেদবিদ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া ধর্মের বিশেষ সংস্কার সাধন করেন বলিয়া, বঙ্গের ইতিহাস অক্ষয় যশ অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু তাহারও প্রায় শত বৎসর পূর্বে ত্রিপুরার রাজা মিথিলা হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া আপনার রাজ্যে কেবল যজ্ঞ সম্পাদন করেন নাই, পরন্তু তাহাদিগকে প্রচুর ভূসম্পত্তি দানপূর্বক নিজ রাজ্যে প্রতিষ্ঠিতও করিয়াছিলেন।"

বিশ্বকোষে এ ব্যাপারে লেখা হয়েছে " শশাঙ্কের সহিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাব কিছু দিনের জন্য অস্তমিত হইল তৎকালে এদেশে বেদবিৎ কর্মঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন না। তাই ত্রিপুরপতি ধর্মপাল (৫৩ তম রাজা) ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলা হইতে বেদবিৎ ব্রাহ্মণ আনাইতে হইয়াছিল।"

ত্রিপুরার ইতিহাস আর্য-অনার্য জাতীয় মিশ্রণের ইতিহাস। শীতল চক্রবর্তী মনে করেন " ত্রিপুরার ইতিহাসের পূর্ণতা সাধিত হইলে, তদ্দ্বারা বঙ্গ ইতিহাসের যেমন পূর্ণতা সাধিত হইবে, ভারত ইতিহাসের পূর্ণতাও যে তেমনি সাধিত হইবে।" তিনি আরো মনে করেন" বঙ্গের গৌরব করিবার এখনো যদি কিছু থাকে তবে ত্রিপুরা রাজ্যই আছে। প্রবল কালস্রোতে অপর সমস্ত রাজ্যই ভাসিয়া গিয়াছে। কেবল মাত্র ত্রিপুরা রাজ্যই কালকে পরাভূত করিয়া আপন স্বাধীন গর্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ত্রিপুরা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও, করপ্রদ হয় নাই, মিত্র রাজ্য হইয়াছে।"

রাজমালার বিশ্লেষক রেভারেন্ড লং -ও লিখেছেন "While in Bengal the tide of foreign in vasion has swept away almost all the Hindu royal lines. The families of Vishnupur and Tripura have alone remained, though now in the " sere and yellow leaf "– analysis of Rajmala."

গাছের পাতার রং তখনো হরিদ্রাভা ধরেনি। শুষ্কতা বহুদূর। সেই গৌরবোজ্জ্বল দিনের এক চৈত্রের প্রাক-মধ্যাহ্নে রত্নকন্দলী শর্মা আর অর্জুন দাস বৈরাগীরা রাজধানী উদয়পুরে পৌঁছে গেলেন। এরা আসামের রাজা 'স্বর্গদেবের' দূত। সঙ্গে সংবাদ সংগ্রাহক বা গোয়েন্দা। গোয়েন্দারা কাজে লেগে গেলেন তথ্য সংগ্রহে। প্রায় এক মাস অবধি রত্নকন্দলীদের দৃশ্যত

রাজধানীতে অলস জীবন। অতঃপর একদিন সময় হল। বৈশাখের পঞ্চ ম দিবসে" রাজকীয় অভ্যর্থনায় এরা রাজ অন্দরে পা রাখলেন। এবং প্রথম প্রাসাদ চত্বরে চোখ ফেললেন। সন ১৭০৯ খ্রিষ্টাব্দে, সিংহাসনে দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য তাঁর শিয়রে তখন শমন। এরা রাজকীয় আভিজাত্য দেখে গেলেন, প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের কুৎসিততা দর্শন করলেন, আগুন দেখলেন প্রাসাদ শীর্ষে। তবে প্রাসাদের বাঁধুনী তখনো দৃঢ়।

একদিন দেখলেন " রাজার ঘরে আগুন লাগিল।" সেদিনটা কেমন শুরু হয়েছিল মহারাজ মহেন্দ্র মাণিক্যের ? রত্নকন্দলীর বয়ানেই তা দেখি। এতকাল দূর-বীক্ষণে ঐতিহাসিকেরা অথবা আঁঠার মতন ল্যাপ্টে থাকা রাজ-স্তুতিকাররা আমাদের তথ্য দিয়েছেন। এবার প্রত্যক্ষ হাজিরে থাকা বিচক্ষণের জীবন্ত ধারা বিবরণী দেখা যাক্।

"রাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া বিষ্ণু মন্দিরের সম্মুখে চৌচালা ঘরে বসিলেন। সেদিন মহেন্দ্র মাণিক্য রাজার পরনে ছিল সোনালী কাজ করা গুজরাটি তসরের জামা। সোনালী কাজ করা জিরা। রূপালী গোছপেঁচ সোনালী পটুকা এবং কিংখাবের তৈরী ইজার। সাদা শাল একখানা তাঁর কাঁদের উপর রাখাছিল। পাগড়ির উপরে সোনার তলোয়ার দুইটি এবং হীরক খচিত কলগা দুইটি গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মুক্তার মালা দুই পেঁচ পাগড়ীর উপর পরিয়া ছিলেন। কানে মুক্তা, গলায় হীরা ও অন্য পাথর খচিত কণ্ঠাবরণ এবং দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা দুই পেঁচ গলা হইতে নাভি পর্যন্ত ঝুল ছিয়া পরিয়া ছিলেন। বাহুতে পাথর খচিত বাজুবন্দ, কোমরে সোনার হাতল যুক্ত ঋঞ্জর একটি এবং পীঠে সোনার চোখ বসানো ঢাল একটি লইয়াছিলেন। সোনার হাতল যুক্ত তরোয়াল একটি খাপ হইতে খুলিয়া লইয়া সাবধানে হাতে করিয়া বসিয়াছিলেন।"

রাজা মহেন্দ্র মাণিক্য সিংহাসনে বসলেন এমন সময় " হঠাৎ সোনার দুয়ারী ঘরের মাথায় আগুন লাগিল। রাজা ঐ আগুন নিবাইবার জন্য লোক পাঠাইলেন কিন্তু সেই আগুন নিবাইতে পারিল না।" অর্জুন দাস রত্ন কন্দলীদের বিবরণ অনুযায়ী " সেই সময়ে দরবারে নবনিযুক্ত পার্শ্বদ কর্মচারী ও বাংলাদেশ হইতে আগত এবং দেশের লোক মিলাইয়া প্রায় আঠার হাজার লোক- জমা হইয়াছিল।"

কীভাবে আগুন লেগেছিল তার সন্ধান এরা দেননি। আগুন লাগাকে অলৌকিক হিসেবেই দেখানো হয়েছে। মহেন্দ্র মাণিক্যও রাজ তরফে এর অনুসন্ধান করেছিলেন তাঁর খোঁজ ইতিহাসে নেই। এর মধ্যে অলৌকিত্ব আরোপ প্রক্ষিপ্ত হতে পারে। নিশ্চই কেউ লাগিয়েছিল হতে পারে রত্ন মাণিক্যের কোন অন্ধ অনুগামী যিনি মহেন্দ্র মাণিক্যকে সিংহাসনে দেখতে চান না। মহেন্দ্র মাণিক্য তখনো রত্ন মাণিক্যকে হত্যা করাননি। কাজেই অনুরাগীদের উচ্চশা থাকতেই পারে। কিন্তু এহ বাহ্য!

রত্ন কন্দলীরা এবার যে ঘটনার উল্লেখ করেন তাকে কোন যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা হবে? সোনার দুয়ারী ঘর থেকে আগুন " রাজা যে ঘরে থাকিতেন সেই ঘরে লাগিল। রাজার ঘরে আগুন লাগিবার কথা শুনিয়া মামুদ ছফি 'তুর্কী' ঘোড়ায় চড়িয়া তিনজন অশ্বারোহী সঙ্গে করিয়া তাড়াতাড়ি সেই আগুনের কিনারা দিয়া আসিয়া রত্ন মাণিক্য যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরে আসিলেন এবং রত্ন মাণিক্যকে বলিলেন " মহারাজা, তুমি ঘরের ভিতরে বসিয়া আছ কেন?

রাজার ঘরে আগুন লাগিয়াছে, সেই আগুনে তুমি যে ঘরে আছ সেই ঘর পুড়িবে। তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস। তোমার জন্যই আমরা এখানে আসিয়াছি।

রত্নমাণিক্য বলিলেন " মীর্জা, আমরা সেই ঘর ছাড়িয়া আসিয়াছি বলিয়াই তাহাতে আগুন লাগিয়াছে। আমরা যে ঘরে আছি তাহাতে আগুন আসিতে পারে না, ইহাতে তুমি একটুও সন্দেহ করিও না।" তখন মামুদ ছফি বলিলেন, " আগুনে বিশ্বাস কি আছে? তুমি তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আস।" তখন একটি পাল্কীতে তুলিয়া রত্ন মাণিক্যকে বট গাছের তলে লইয়া যাওয়া হইল।

তখন মামুদ ছফি রত্ন মাণিক্যকে বলিলেন " তোমার পরিবারবর্গের লোকেদেরও এখানে নিয়া আসা হউক।" রত্ন মাণিক্য বলিলেন " তাহাদিগকে আনাইবার প্রয়োজন নাই। তাহারা যে ঘরে আছে তাহাতে আগুন লাগিবে না, তুমি আমার এই কথার সত্যতার প্রমাণ পাইবা"। রত্ন মাণিক্য মামুদ ছফিকে আরো বলিলেন, " যতদিন আমার রাজ্যভোগ ছিল ততদিন করিয়াছি। আমি আর রাজা হইতে চাহি না। আমাকে দুইজন ব্রাহ্মণ দিলেই হয়। আমি ভাগবত, তন্ত্র আর পুরাণ শুনিয়া ঈশ্বরের আরাধনায় দিন কাটাইব।"

তারপরের বিবরণীতে আছে — " সেই আগুনে রাজার সকল ঘর পুড়িল। রাজভাণ্ডারে যাহা কিছু জিনিসপত্র ছিল সেগুলিও পুড়িয়া গেল। সেদিন আমাদের দরবারে উঠান অইল না। যে ঘরে রত্ন মাণিক্যকে রাখা হইয়াছিল সেই ঘরটি পুড়িল না। সেই রাত্রে মহেন্দ্র মাণিক্য তাম্বুকানীতের ঘর বানাইয়া তাহাতে বাস করিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য সমস্ত জিনিসপত্র পুড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন।" এবং অতঃপর দ্বিতীয় অলৌকিত্বটি ছিল রাজার রোগভোগ। গ্রহণী রোগে চৌদ্দ মাসের মাথায় তাঁর মৃত্যু। হতে পারে এখানেও মহেন্দ্র বধের চক্রান্ত। খাদ্যে বিষ প্রয়োগ। আর্সেনিক প্রয়োগ। ইতিহাস এখানেও নীরব। তবে আসামের রাজদূতেরা একে নিয়তী নির্ধারিত বলেই ইঙ্গিৎ করেছেন। অর্থাৎ পাপের বেতন মৃত্যু!

মহেন্দ্র মাণিক্যের পর ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য। তাঁর রাজত্বকালের সীমা ১৭১৪ খ্রিঃ থেকে ১৭২৯ খ্রিঃ পর্যন্ত। তিনি মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পৌত্র। তাঁর রাজত্ব কালের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল মুঘল কর্তৃক রাজধানী দ্বিতীয়বার লুণ্ঠন। লুণ্ঠনের ব্যাপারে মুঘলদের প্রলুব্ধ ও সহায়তা দিয়েছিলেন ছত্র মাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম। তিনিই মীর হাবিবের নেতৃত্বাধীন মুঘল বাহিনীকে উদয়পুর পৌঁছে দেন। কৈলাশ সিংহের মতে, দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্যের সঙ্গে মুঘল বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল কুমিল্লার কাছাকাছি কোন এক স্থানে। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী স্যার যদুনাথ সরকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন "যুদ্ধ হয়েছিল চণ্ডীগড়ে।" ঐ সময় দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্য চণ্ডীগড়ে অস্থায়ী রাজ আবাসে ছিলেন। চণ্ডীগড়ের অবস্থান ছিল উদয়পুর থেকে ১৪ মাইল পশ্চিমে উদয়পুর-সোনামুড়া সড়কের পার্শ্বে। চণ্ডীগড় ত্রিপুরার রাজাদের সীমান্তবর্তী দুর্গও বটে। তবে গোস্বামী মহাশয় তার "ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর" পুস্তকে তৃতীয় একটি মতের উল্লেখ করেছেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, জয়ন্তীয়া এই তিন অঞ্চল থেকে আক্রমণ সংগঠিত হয়েছিল। এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন স্যার যদুনাথ সরকারের "বেঙ্গল পোষ্ট এন্ড প্রেজেন্ট " (পৃঃ ১-৪) পুস্তক থেকে। বলা হয়েছে" মীর হাবিব ধর্ম মাণিক্যকে বন্দী করেন এবং ঢাকায় নিয়ে যান। ধর্ম মাণিক্য (দ্বিতীয়) পরে নবাবের

সহয়াতায় পার্বত্যরাজ্যের অধিকার ফিরে পান। (ত্রিপুরার রাজধানী উদয়পুর পৃঃ-৩৩)।" মীর হাবিব দ্বিতীয় ধর্ম মাণিক্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ১৭২৯ খ্রিঃ। রাজমালায় উল্লিখিত তথ্য অনুযায়ী যুদ্ধটা হয়েছিল চন্ডীগড়েই। জগৎ রামের রাজ-বিরোধী তৎপরতার কারণে ঐ যুদ্ধে পরাজয় এবং মুঘলরা নির্বিবাদে রাজধানী উদয়পুর লুঠের সুযোগ পায়। লড়াইয়ের সূত্রপাত হয়েছিল হস্তীকর আদায়কে কেন্দ্র করে। হস্তীকর নিয়ে ইতিপূর্বেও সন্ধি ও সংঘাত ঘটেছে। ত্রিপুরায় সম্পদের মধ্যে হাতিকরও অন্যতম কর হিসেবে গণ্য করা হত। যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন হাতির। কিন্তু সমতলে হাতি নেই। বাঙলার নবাবরা তাই হাতি সংগ্রহে মরীয়া।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ঐ যে তিনি বাহির হলেন পথে

রাজ আভিজাত্যের বর্ণনা, চোখের সামনে থেকে ফটোগ্রাফির এমন দৃষ্টান্ত বিরল। একই সঙ্গে অভিজাত মহলের কর্তা, রাজ আভিজাত্যের প্রতি সম্মান জ্ঞাপক আমাত্যকুলে অবশ্য মান্য রাজ নির্দেশিত পোর্টোকল, পদের সঙ্গে মানানসই সজ্জা বিন্যাসের সুশৃঙ্খল রকম বিন্যাস, এমনকী পা মেপে চলার চলমান ধারা বিবরণী যা রত্ন কন্দলীরা শব্দ শৃঙ্খলের পোর্ট্রেটে বাঁধিয়েছেন তা এক কথায় অনন্য। এই বর্ণনা থেকে ত্রিপুরার রাজকুলের মানের উচ্চতা, আভিজাত্যের দ্রাঘিমা, বর্ণময়তা ও ঐশ্বর্যের অনেকটাই পরিমাপ করা যায়। রত্ন কন্দলীরা রাজদরবারের এই চিত্র শিল্পীর তুলিতে ইজেলের ফ্রেমে কল্পনার রংমিশ্রণে বর্ণময় করেননি। একে বলা যায় চলমান ঘটনা প্রবাহের দৃশ্য সংকলন ভি ডিওগ্রাফি।

এর আগে-পরে কোন রাজ চাটুকার, বা রাজভক্ত, বা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবি, সে রাজমালাতেই হোক বা কোন রাজস্তুতিপদ-বন্ধেই হোক বা দূর থেকে লব্ধ তথ্যের বিশ্লেষণেই হোক এতটা বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনিষ্ঠ বিবরণ লখতে পারেনি। কারণটার জবাব হল গোপাল ভাঁড়ের সেই বিখ্যাত উক্তি " সত্য-মিথ্যের তফাৎ চার আঙুল।" অর্থাৎ চোখ আর কানের দূরত্ব। বাকীরা সকলেই কানে শুনেছেন ফলে যাচাই-বাছাই হয়েছে, ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ জায়গা নিয়েছে কিন্তু রত্ন কন্দলী আর অর্জুন দাস নিজের চোখে চলমান দৃশ্যের ভিডিওগ্রাফি করেছেন। কাজেই পছন্দ, অপছন্দ যাচাই-বাছাই-এর প্রশ্ন আসেনি। বলা যায় তাদের বীক্ষণ প্রকাশ আন্ -সেসরড়, আন-এডিটেড্। এমনটা মনে করার জোরালো কারণ রয়েছে, কারণ হল কোন তুচ্ছ বিষয়ও তাঁদের লেখনী বাদ যায়নি।

আরো একটা কারণ, এই বিবরণের একশ ভাগ কল্পনাবর্জিত। সেই কারণ হল এরা দূতের কাজ নিয়ে ত্রিপুরায় এসেছিলেন। তাঁদের রিপোর্টের উপর আসামের রাজা স্বর্গদের রুদ্র সিং ত্রিপুরা রাজাকে তুলাদণ্ডে মাপ করবেন, সিদ্ধান্ত নেবেন কাজেই তাঁর পুঙ্ক্ষানুপুঙ্খ বিবরণ চাই, অন্যথায় ভ্রান্তির সম্ভাবনা—কাজেই নির্ভুল তৈরীর জন্য তাদের দু'জোড়া চক্ষুকে গোয়েন্দাগিরিও করতে হয়েছে। তবে এই কর্মে যে তারা গাফিলতি করেননি সেই কথা তাদের বিবরণীতেও আছে। তারা সঙ্গের কতিপয় লোককে তথ্য সংগ্রহের জন্য গোয়েন্দাগিরিতে লাগিয়ে রেখেছিলেন। কাজেই রাজার পোশাক আর রাজবাড়ী দেখেই কল্পলোকে পাখা ছেড়েছেন, তা নয়।

যুঝার ফা থেকে কৃষ্ণ মাণিক্য ৭ম শতাব্দীর শেষ পাদ থেকে ১৭৬০ খ্রিঃ এই দীর্ঘ সময়ের রাঙামাটি এবং পরিবর্তিত নাম উদয়পুরের এত বিস্তৃত বিবরণ আর কোথাও লেখা নেই। কাজেই রত্ন কন্দলীদের পরিমাপককে আমরা প্রতীকীমান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। যে আভিজাত্য তারা প্রত্যক্ষ করেছেন তা একটি ধারাবাহিক অনুসরণে পুষ্ট। যে ঐশ্বর্য তারা প্রত্যক্ষ করেছেন তাও অর্জিত হয়েছে পুরুষানুক্রমে। একাধিকবার লুণ্ঠনের পরেও যার ক্ষয় -কীর্তি চোখে তেমন পড়ে না। মহেন্দ্র মাণিক্যের রাজপুরী আর কোষাগার ও ঐশ্বর্য ভাণ্ডার পুড়ে যাবার পরেও ঐ জতুগৃহ থেকে তৎকালীন সময়ের মূল্য মানে পঁচিশ লক্ষ টাকা মূল্যের রত্ন উদ্ধার হয়েছিল। ১৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ঐ সম্পদের মূল্য ২০১০ সালের অর্থমূল্যে পরিমাপ করলে এই বিষয়ে একটা ধারণা করা যেতে পারে। সে তো পুড়ে যাওয়া তোষাখানার পরিত্যক্ত সম্পদের মূল্য!

এই সম্পদকে কেন্দ্রে রেখে যদি আগে-পরে বিচরণ করি, তবে রাঙামাটি তথা উদয়পুর রাজধানী থাকাকালীন ব্যাপক সময়ের একটা গ্রাফ আঁকতে আমাদের খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এবং আভিজাত্যের পরিচ্ছেদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের বহর বিষয়েও ধারণা নিতে পারি।

"যুবরাজ ও উজির রাজার আদেশ শুনিয়া দিন তারিখ দেখিয়া বৈশাখ মাসের চারদিন গত হইলে আমাদিগকে দরবারে হাজির করার দিন স্থির করিলেন। দরবারের দিন অনুমান ষাট জন ঘোড় সাওয়ার দরবারে আসিল। তাহারা বিদেশ হইতে আসিয়া এরাজ্যের চাকুরীতে ভরতি হইয়াছে। তাহাদের পরনে ছিল জামা, ইজার এবং জামিয়ার, অস্ত্র ছিল ঢাল, রোয়াল, তীর এবং ধনুক। তাহাদের মধ্যে কাহারো কাহারো হাতে বঁড়শিও ছিল। তাহারা মাসিক হিসাবে রূপার টাকায় মাহিনা পায়।

ঢালীর সংখ্যা অনুমান এক হাজারের মতন হইবে। ইহাদের অস্ত্র ছিল ঢালও তরোয়াল। তীরন্দাজ ছিল অনুমান দেড় হাজার, তাহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল ও তীর ধনুক। হিন্দুস্থানী সৈন্যের সংখ্যা পাঁচ শত; তাদের অস্ত্র বন্দুক, ঢাল ও তরোয়াল। সৈন্যদের মধ্যে জমাদার ও হাজারী দুই পদের লোক আছে।

আমাদের নিবার জন্য ত্রিপুরার দুইজন দূত রামেশ্বর ন্যায়ালঙ্কার ভট্টাচার্য ও উদয়নারায়ণ বিশ্বাস ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের এখানে আসিলেন। আমাদের জন্যও দুইটি ঘোড়া আনা হইল। ত্রিপুরার ঐ দূতের সঙ্গে তীর ধনুকধারী অনুমান চল্লিশজন লোক আসিল।

যুবরাজ দরবারে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আসিল লাল নিশান আটটি, ঘোড়সাওয়ার ছয় জন, হিন্দুস্থানী সৈন্য, ঢালী, তীরন্দাজ অনুমান একশত জন। যুবরাজ পাল্কীতে চড়িয়া দরবারে আসিলেন। ঐ পাল্কীর চাল ছিল বনীত দিয়া ঢাকা। সেই চালের দুই মাথায় দুইটি রূপার কলাফুল দেওয়া ছিল। পাল্কীর গা বনীত দিয়া মুড়িয়া দেওয়া ছিল। উহার দুই মাথায় রূপা দিয়া বাঘের মুখ বানাইয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

যুবরাজের পরনে ছিল কিংখাবের জামা, সোনালী পটুকা, সোনালী কাজ করা গুজরাটি জিরা, এলাছার ইজার, ঘাড়ের উপর একখানি শাল। কানে মুক্তা, গলায় দুগ্‌গীর সহিত মুক্তার মালা, এবং কোমরে পাথর খচিত হাতল যুক্ত একখানি খঞ্জর। তাহার দুই দিকে দুইজন সেবক

সোনার হাতলযুক্ত দুইখানি তলোয়ার এবং সোনার চোখ লাগানো ঢাল লইয়া আসিতেছিল। তাঁহার আগে আগে আসিতেছিল দশটি হাতি, তার মধ্যে দুইটির উপরে বনীত দেওয়া ছিল। হাতিগুলির দাঁতে সোনার বলয় ছয় জোড়া করিয়া দিয়াছিল। উহাদের কপালে সোনার গোলাকৃতি গহনা পরানো ছিল। এই সমস্ত ছাড়া যুবরাজের চড়িবার তুর্কী ঘোড়া ছিল একটি, উহার জিন ছিল বনীতের তৈরী, এবং মুখ ছাউনি ছিল সোনালী রং এর। চামড়ার তৈরী জিন লাগানো 'টাঙ্গন' ঘোড়া ছিল বারোটি। একজন যুবরাজকে চামর ঢুলাইতেছিল, অপর একজন উপরে আরোয়ান ধরিয়া রাখিতেছিল।

তারপর আসিলেন রাজবংশীয় ধরণীধর ঠাকুর। তাঁহার সঙ্গে ছিল সবুজ রং-এর নিশান দুইটি। হাতি দুইটি, চামড়ার জিন লাগান ঘোড়া তিনটি, এবং বনীতের তৈরী জিন লাগান ঘোড়া একটি। ঢালী ও হিন্দুস্থানী সৈন্য সহ তাঁহার সঙ্গে চল্লিশজন লোক ছিল।

ধরণীধর ঠাকুর আসিলেন বনীতের ছাউনি দেওয়া পাল্কীতে চড়িয়া। তাঁহার পরনে ছিল মখমলের জামা, গুজরাটী সোনার কাজ করা জিরা, সোনালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার এবং একখানা শাল কাপড়। কানে মুক্তা, গলায় দুগদুগীর সঙ্গে মুক্তার মালা, কোমরে সোনালী রং-এর জামিয়ার। সোনার গিলটি করা তলোয়ার একটি এবং ঢাল একটি সেবকের হাতে ছিল। তাহাদের দেশে রাজবংশীয় লোকদিগকে ঠাকুর বলে।

তারপর উজীর আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতি ছিল ছয়টি। বনীতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া পাঁচটি, ঘোড়সাওয়ার তিনজন এবং ঢালী, হিন্দুস্থানী ও তীরন্দাজ সৈন্য মিলিয়া আশিজন লোক তাহাদের সঙ্গে আসিল। বনীতের ছাউনী দেওয়া পাল্কীতে চড়িয়া উজির আসিলেন। পাল্কীর দণ্ড টি ছিল মখমলে মোড়ান। পরনে ছিল খাছার জামা, সোনালী পটুকা, জিরা, গোছপোছ, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড় একখানা এবং কোমরে সোনালী রং -এর জামিয়ার। তিনি কানে মুক্তা, গলায় দুগদুগীর সঙ্গে মুক্তার মালা পরিধান করিয়াছিলেন।

পাল্কীর দুইধারে দুইজন সেবক লইয়া চলিয়াছিল ঢাল দুইটি, সোনার হাতলযুক্ত ও বনীতের তৈরী খাপের মধ্যে তলোয়ার দুইটি। এইরূপে সাজিয়া উজীর দরবারে আসিলেন।

তারপর আসিলেন নাজির। তার সঙ্গে হাতি দুইটি; ঘোড়সাওয়ার দুইজন, ঢাল-তরোয়াল ধারী সৈন্য অনুমান ষাট জন। বনীতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি ও চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি ছিল। নাজির মখমলের ছাউনী দেওয়া পাল্কীতে চড়িয়া আসিলেন। তিনি পরিয়াছিলেন ছাহানরের জামা, গুজরাটী সোনালী রং-রে পটুকা, সোনালী কাজ করা জিরা, রূপালী গোছপোছ, আতলঞ্চের ইজার, শাল কাপড়, কোমরে সোনালী কাজ করা জামিয়ার, কানে মুক্তা ও গলায় দুগদুগী (গলায় মুক্তার হার নেই)। দুই জন সেবক দুই দিকে দুইখানা ঢাল তরোয়াল লইয়া আসিতেছিল (সোনার বাট নেই) এইরূপে নাজির দরবারে উপস্থিত হইলেন।

তারপর কার্কোন আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল দুইটি হাতি, বনীতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া চারিটি, ঘোড় সাওয়ার দুইজন, ঢাল-তরোয়াল বন্দুকধারী সৈন্য ষাট জন। তাহার পরনে ছিল বন্দরী ছিটের জামা, বুটিদার জিরা, রূপালী গোছপোছ, সোনালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার, কানে মুক্তা, সোনালী কাজ করা জামিয়ার। সঙ্গে একটি

ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া একজন সেবক।

পরে আসিলেন কোতোয়াল মুছিব। তাহার সঙ্গে আসিল জরদ রং-এর নিশান সাতটি এবং হাতি আটটি। হাতিগুলির মধ্যে দুইটির উপরে বনীত দিয়া ঢাকনি দেওয়া হইয়াছে ও উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা দেওয়া হইয়াছে। বনীতের জিন ও সোনালী রংয়ের মুখ-ছাউনী দেওয়া ঘোড়া দুইটি ও চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া আটটি। ঘোড় সাওয়ার ছয়জন, ঢালী অনুমান চল্লিশ জন; বরকন্দাজ প্রায় ত্রিশজন, তীরন্দাজ অনুমান চল্লিশজন সঙ্গে আসিল।

তিনি পাল্কীতে চড়িয়া আসিলেন। ঐ পাল্কীর উপরে বনীত দিয়া ছাউনী দেওয়া ছিল, ছাউনীর উপরে দুই মাথায় রূপার দুইটি কলাফুল বসান ছিল। পাল্কীর বেড়া বনীত দিয়া মোড়া ছিল এবং পাল্কীর দরজায় রূপার তৈরী মকরের মুখ আটকাইয়া দেওয়া ছিল। কোতোয়াল মুছিবের পরেন ছিল সোনালী রং-এর বাদামী কাপড়ের জামা, সোনালী গুজরাটী জিরা, গোছপোছ, সোনালী পটুকা, গুজরাটী আতলঞ্চের ইজার। সোনালী রং-এর একখানি তসর দেড় ভাঁজ করিয়া ঘাড়ের উপরে লইয়াছিলেন। পাগড়ির উপরে সোনার তরোয়াল দুইটি কানে মুক্তা, গলায় পাথর খচিত কণ্ঠাবরণ, দুগ্‌দুগীর সহিত মুক্তার মালা, এবং কোমরে সোনার হাতলের উপরে পাথর খচিত খঞ্জর একটি পরিধান করিয়াছিলেন।

পাল্কীর দুই দিকে সেবকেরা সোনার মুষ্ঠিযুক্ত তরোয়াল দুইটি, সোনার চোখ দেওয়া ঢাল দুইটি এবং সোনালী রং করা বঁড়শি দুই গাছ লইয়াছিল। এইরূপে সাজিয়া কোতোয়াল-মুছিব দরবারে আসিলেন।

তারপরে দেওয়ান আসিলেন। তাহার সঙ্গে হাতি দুইটি, বনীতের জিন দেওয়া ঘোড়া একটি, চামড়ার জিন দেওয়া ঘোড়া তিনটি এবং ঢাল-তরোয়াল ধারী লোক অনুমান চল্লিশজন ছিল। তাহার পরনে ছিল চিকন কাপড়ের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, রূপালী গোছপোছ ও রূপালী পটুকা, আতলঞ্চের ইজার এবং শাল কাপড় একখানা। তিনি কানে মুক্তা ও গলায় সোনা দিয়া বাঁধা রুদ্রাক্ষের মালা দুই লহর পরিয়াছিলেন এবং একটি সোনালী জামিয়ার সঙ্গে লইয়াছিলেন।

এইরূপে সাজিয়া মখমলের ছাউনী দেওয়া পাল্কীতে চড়িয়া দেওয়ান আসিলেন।

চন্দ্রমণি ঠাকুর (ইতিপূর্বে চন্দ্রমণি ঠাকুর মুসলমানের রাজ্যে জমিনদার নিযুক্ত ছিলেন) দরবারে আসিবার সময় লাল নিশান ছয়টি (যুবরাজের চাইতে দুটি কম) ও হাতি চারটি সঙ্গে আনিলেন। ঐ চারটি হাতির দুইটির উপরে বনীত দিয়া ঢাকনি এবং উহাদের কপালে গোলাকৃতি সোনার গহনা দেওয়া ছিল। তাহাছাড়া বনীতের জিন ও রূপার মুখ ছাউনী দেওয়া তুর্কী ঘোড়া দুইটি, টাঙ্গন ঘোড়া ছয়টি, ঘোড় সাওয়ার ছয়জন এবং ঢালী, বরকন্দাজ, তীরন্দাজ সকলে মিলিয়া আশিজন লোক চন্দ্রমণি ঠাকুরের সঙ্গে দরবারে আসিল।

চন্দ্রমণি ঠাকুরের পরনে ছিল সোনালী বুটিদার জামা, গুজরাটী সোনালী পটুকা, সোনালী কাজ করা জিরা, রূপালী গোছপোছ, কানে মুক্তা, গলায় কণ্ঠাবরণ একটি ও দুইছড়া মণিগাঁথা মুক্তার মালা ও ঘাড়ের উপর একখানি শাল কাপড়।

চন্দ্রমণি ঠাকুর পাল্কীতে চড়িয়া আসিলেন। পাল্কীর ছাউনী বনীত দিয়া ঢাকা। বেড়া বনীত দিয়া মোড়ান। পাল্কীর উপরে দুইটি রূপার কলাফুল দেওয়া ছিল। ছাউনীর দুই মাথায় দুইটি

রূপার তৈরী মকর মাছের মুখ লাগাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ঐ পাল্কীর দুই ধারে সেবকেরা সোনার চোখ দেওয়া ঢাল দুইখানা ও সোনার হাতলযুক্ত তরোয়াল দুইটি বহিয়া আনিতেছিল। ঐ পাল্কীর উপর একজন সেবক একটি আরোয়ান ধরিয়া আসিতেছিল।

এইরূপে সাজিয়া চন্দ্রমণি ঠাকুর দরবারে আসিলেন। তারপর নেমুজী আসিলেন। তাহার সঙ্গে ছিল হাতি দুইটি, বনীতের জিনের ঘোড়া একটি, চামড়ার জিনের ঘোড়া পাঁচটি, ঘোড়সাওয়ার পাঁচজন। ঢাল-তরোয়ালধারী সৈন্য প্রায় ষাটজন।

তাহার পরনে ছিল কার্পাস সূতায় তৈরী বুটিদার জামা, বন্দরী ছিটের পটুকা, সামনের দিকে সোনার ঝালর দেওয়া রূপালী জিরা, আতলশ্চের ইজার, শাল কাপড় এবং কোমরে ছিল একখানি সোনালী কাজ করা জামিয়ার। একজন সেবক একটি ঢাল ও একটি তরোয়াল লইয়া সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল।

মখমলের ছাউনী দেওয়া পাল্কীতে করিয়া নেমুজীর দরবারে আসিলেন।

উপরোক্ত ব্যক্তিগণ ছাড়া বড়লোকদের মধ্যে কেহ কেহ পাল্কীতে উঠিয়া কেহ বা ঘোড়ায় চড়িয়া প্রায় ত্রিশ জনের মতন আসিলেন। তাহাদের অস্ত্র ছিল ঢাল-তরোয়াল এবং কোমরে ছিল জামিয়ার। পাইক প্রায় একহাজার পাঁচশত জন আসিয়াছিল এবং তাহাদের সঙ্গে ঢাল ও তরোয়াল ছিল।

রাজার জয়গানকারী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য এবং অন্যান্য যাহারা ছিল সকলেই আসিল। তারপরে সেদিন রাজধানীর লোকদিগকে দরবারে আনা হইল। রাজবাড়ীর দুইধারে তোপ দশটি, লম্বা কামান কুড়িটি পাতা হইয়াছিল।

তারপর রত্ন মাণিক্য রাজা আসিয়া সিংহাসনে বসিলেন। তখন উদয়নারায়ণ বসিবার জায়গা হইতে উঠিয়া আমাদিগকে নিতে আসিলেন। আমরা রূপার দুয়ারী ঘর হইতে সোনার দুয়ারী ঘরের মধ্যে গেলাম। সেই ঘরের আগে ছিল রাজার চড়িবার জন্য চারটি হাতি। উহাদের উপরে বনীতের ঢাকনী ও কপালে গোলাকৃতি সোনার অলঙ্কার দেওয়া ছিল। হাতির গা জরির কাজ করা বনীত দিয়া মোড়া ছিল এবং প্রতিটি হাতির দাঁতে আট জোড়া করিয়া সোনার তারের বালা পরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। সেই ঘরের নিম্নভাগে ছিল রাজার চড়িবার জন্য পাল্কী দুখানা। উহাদের দরজার উপরে সোনার পাত লাগানো ছিল। পাল্কী দুটির চারদিকে চারটি খুঁটা এবং ঐগুলিতে সোনার কলকা কাটা ছিল। পাল্কীর খুঁটাগুলি রূপা দিয়া তৈরী করিয়া ঐগুলির উপর বনীত দিয়া ছাউনী দেওয়া হইয়াছিল এবং ছাউনী দুইটির মাথায় দুইটি সোনার কলাফুল বানাইয়া বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাল্কীগুলির গা বনীত দিয়া মুড়িয়া প্রত্যেকটির মাথায় দুইটি করিয়া সোনার বাঘের মুখাকৃতি বানাইয়া আটকাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পাল্কীর নিকট রাজার চড়িবার জন্য তুর্কী ঘোড়া চারটি। উহাদের জিন সোনালী রং-এর বনীতের তৈয়ারী এবং ঘোড়াগুলির মুখছাউনীও সোনালী রঙের ছিল। সিংহাসনের সম্মুখে রাখা হইয়াছিল সোনার ত্রিশূল একখানা, একখানা চন্দ্রবাণ, তাছাড়া লাল, সাদা, জরদ ও সবুজ রঙের নিশান ছিল প্রায় ত্রিশটি।

সেখানে চারজন গুরুজর্বদার সোনার ও রূপার লাঠি লইয়া উপস্থিত ছিল। সেই প্রাঙ্গণের দুইধারে সোনালী ও রূপালী রঙের লাঠি প্রায় আশিটি রক্ষিত ছিল।"

এ কিন্তু দরবারের সাধারণ চিত্র নয়। আসামের রাজদূতের আগমন উপলক্ষ্যে বিশেষ দরবার। স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে এতটা মুঘলীয় আভিজাত্যের স্পর্শ পেয়েছেন ইতিহাসে তেমন উল্লেখ নেই। তবে কি মুঘলদের চাইতেও আভিজাত্যের উৎকর্ষ ত্রিপুরার রাজ পরিবারে বেশি ছিল? আসলে আভিজাত্য অর্থ সম্পদের উপর নয়, নির্ভর করে মানসিক উৎকর্ষের উপর। আর সেই সঙ্গে যদি যুক্ত হয় কোন বিশেষ প্রেক্ষিত তবে বিষয়টা চতুর্মাত্রিক উচ্চতায় পৌঁছায়।

১২ই এপ্রিল ১৭১২ খ্রিঃ আসামের দূতদের সঙ্গে মহারাজ রত্ন মাণিক্যের সাক্ষাত হয়। ১৭০৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের রাজনীতির এক পর্ব শেষ হল মুঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের দেহ অবসানেক মধ্যে। মুঘলদের পতন ঔরঙ্গজেবের শাসনকালের মধ্যপর্ব থেকেই হয়েছিল। দক্ষিণের মারাঠা নায়ক শিবাজী আর রাজস্থানের ক্ষুদ্র সামন্ত জয় সিং-এর কাছে ঔরঙ্গজেবের নাকানিচুবানী মুঘল সৌধের জীর্ণ চেহারাটি উলঙ্গ করে দিয়েছিল। ১৭০৭ -এ আলমগীর বেহেস্তে গেলেন, মর্তে দুর্বল মুঘল উত্তরাধিকার রেখে গেলেন যারা আর কোন দিনই শক্তি সংহত করতে পারেনি, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহই হয়ে রইলেন সেই অবক্ষয়ের চূড়ান্ত প্রতীক।

এই আবহে, ১৭১০ খ্রিঃ থেকে আসামের মহারাজা রুদ্র সিংহ " জয়ন্তী ও কাছাড় দেশ জয় করিয়া মুসলমানদের হাত হইতে বাংলাদেশ উদ্ধার করিবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তারপর বাংলার মৌরঙ্গের রাজা, বনবিষ্ণুপুরের রাজা, নদীয়ার রাজা, কোচবিহারের রাজা, বর্ধমানের জমিদার কীর্তিচন্দ্র, বরাহনগরের জমিদার উদয়নারায়ণ এই সকলের নিকট বড় ফুকনের নামে দূত পাঠাইলেন। তাদের লোক এদেশে আনাইলেন। রুদ্র সিংহ তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন " আমরা হিন্দু রাজাগণ বর্তমান থাকিতে যবনে ধর্ম নষ্ট করিতেছে। এই কারণে যদি আমরা সকলে একমত হইয়া যবনকে দমন করিয়া ধর্মরক্ষা করি তবে কি ফল হয় তাহা আপনারা সকলেই জ্ঞাত আছেন।" ঐ প্রেক্ষিতেই আসামের রাজা রুদ্র সিংহ ত্রিপুরায় দুইজন দূত রত্নকন্দলী এবং অর্জুন দাসকে ত্রিপুরার রাজা রত্নমাণিক্যের দরবারে পাঠান। উদ্দেশ্য " ত্রিপুরার রাজা একজন বড়া রাজা। তাঁহার সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লইলে অনেক কার্যে স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ তাহার সাহায্য পাইবেন (ত্রিপুর দেশের কথা, ত্রিপুরা চন্দ্র সেন, পৃষ্ঠাঃ২১)।" এই বড় রাজার বড় প্রদর্শন ছিল ঐ দরবারের আয়োজন আরেক বড় রাজার দূতদের উপযুক্ত মর্যাদায় গ্রহণের মধ্যে। আসামের রাজা স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ ত্রিপুরার রাজার শক্তি সামর্থ্যের বিচারেই সখ্যতার বীজ বুনলেন তাও স্পষ্ট। বাস্তবেও রাঙামাটি তথা উদয়পুরে রাজধানী স্থাপনের পর থেকে ১১৭০ বৎস দীর্ঘ সময়ে একাধিকবার পরাজয়ের মুখ দেখলেও বহুবারই নিজেদের শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন ত্রিপুরার রাজারা। রাঙামাটি বা উদয়পুর থেকে যুদ্ধ পলিচালনা করেই চট্টল ও মেহেরকুলের উপর অধিকার স্থাপন তথা রাজ্য বিস্তার, বহিঃশত্রুকে সীমান্তেই প্রতিহত করার একাধিক ঘটনা নৌবাহিনীর প্রয়োগ, দুই দুই বার হুসেন শাহের সৈন্যবাহিনীকে পরাস্ত করার মতন বীরত্বব্যঞ্জক ঘটনার সাক্ষী হয়েছে এই রাঙামাটি। প্রাচীন এই রাজবংশের ঐশ্বর্য আহরণই বা কম হবে কেন? ঐ ঐশ্বর্যই তো বার বার বহিঃশত্রুকে রাঙামাটি লুণ্ঠনে প্রলুব্ধ করেছে। রত্ন কন্দলীরা ঐ তেজ ও ঐশ্বর্যই প্রত্যক্ষ করেছেন, সঙ্গে রাজবংশের আভিজাত্য।

প্রজা হিতায়।

প্রজাহিতে শুদ্ধাচারী নৈষ্ঠিক রাজার দৈনন্দিন কর্মের প্রতিও রত্ন কন্দলীরা উঁকী মেরেছিলেন। ঐশ্বর্যের আড়ম্বর তাদের লক্ষ্যচ্যুত করতে পারেনি। রাঙামাটির রাজ পরিবারের মধ্যমণি খোদ রাজার দিনের কর্মের সূচনা হত । "রাজা প্রভাতে উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া করার পর দন্ত ধাবন করেন। তারপরে মালিকাওয়ালা রাজার শরীরে তৈল মালিশ করিলে রাজা নদীর জলে স্নান করিয়া সোনার ঘটিতে করিয়া এক ঘটি গঙ্গাজল মাথায় ঢালিতেন। রাজার আদেশের বলে এই গঙ্গাজল মাসে একবার নৌকায় করিয়া আনাইতে হইত। তারপর রাজা মন্দিরে গিয়া ইষ্ট-দেবতার সেবা-পূজা করেন। সেখান হইতে আসিয়া জলপান করিয়া পুরাণ পাঠ শুনেন। তারপরে ভোজন করিয়া বসন পরিধান করেন।

এই সময়ে রাজার সেবক ডাকিয়া বলে " মহারাজের বাহির হইবার সময় হইল।" সঙ্গে সঙ্গে সেলামবাড়ি বাজে। তখন যুবরাজ ইত্যাদি বড় বড় লোকেরা দরবারে উপস্থিত হন। রাজ সভাপণ্ডিত ইত্যাদি দরবারী লোকেরাও আসে। তারপর দেড় প্রহর অতিক্রান্ত হইলে রাজা আসিয়া সিংহাসন ঘরে সিংহাসনে বসেন। যুবরাজ সিংহাসন ঘরে আসিয়া রাজাকে প্রণাম করেন। সেই ঘরে গালিচার উপরে একটি সুজনী পাতা থাকে, যুবরাজ আসিয়া তাহাতে বসেন।

বড়ঠাকুরের জন্য ঐ গালিচার উপরে একখণ্ড কাপড় পাতা থাকে। বড়ঠাকুর আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া উহাতে বসেন। দুই জন সভাপণ্ডিত আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া এইরূপে বসেন। রাজ পুরোহিতও আসিয়া রাজাকে আশীর্বাদ করিয়া গালিচার উপরে বসেন। উজীর, নাজীর, নেমুজীর, কার্কোন, কতোয়াল - মুছিব ও দেওয়ান আসিয়া রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া থাকেন। এই ঘরের দিকে আসিবার সময় উপরোক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহই অস্ত্র-শস্ত্র সঙ্গে লইতে পারে না।

দেশের অন্য বড়লোকেরা তাহাদের লোকজন লইয়া এবং বাংলাদেশ হইতে আসিয়া যাহারা চাকুরী করিতেছে তাহারা রাজাকে প্রণাম করিয়া ঐ ঘরের সম্মুখে খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া থাকে। সেই খোল জায়গায় সোনার লাঠি লইয়া দুই জন এবং রূপার লাঠি লইয়া দইজন — এই চারিজন লোক দাঁড়াইয়া থাকেন। যে সমস্ত বিষয়ে আলাপ করিবার থাকে তাহা তখন হয়। তারপর একজন সেবক রাজবাড়ীর ভিতর হইতে ফুল -চন্দন, সুগন্ধযুক্ত পান ও সুপারী আনিয়া দেয়। একজন ব্রাহ্মণ, যুবরাজ প্রভৃতি সকলে নিয়মিত রূপে পান সুপারী বিতরণ করে। তারপর সকলে এই ঘর হইতে নামিয়া রাজাকে প্রণাম করে। ব্রাহ্মণেরা রাজাকে আশীর্বাদ করে। তারপর রাজা উঠিয়া রাজবাড়ীর ভিতরে যান ও অন্যান্যরা নিজ নিজ বাড়ীতে যান।

পালাক্রমে একজন বড়ুয়া সোনার দুয়ারী ঘরে, একজন হাজারী অনুমান ৪০ জন লোক লইয়া রূপার দুয়ারী ঘরে থাকে। তাহারা রাত্রিতেও এই নিয়মে পাহারা দেয়। উপরোক্ত নিয়মে প্রতিদিন কার্য চলে।"

নক্ষাত্রলোকে গোবিন্দ

"ত্রিপুর নরপতি শ্রীশ্রী গোবিন্দ দেব জ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য ছিলেন। ১৫৯০ শকে তাঁহার মহিষী সুমতী, পুণ্যশীলা এবং বরণীয়া গুণবতী দেবী বৈশাখ মাসের যুগাদ্যা দিবসে এই অতুলনীয় মঠ বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন"— উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দির সম্পর্ক বলতে গিয়ে একজন গবেষক লেখক এমনই মন্তব্য করেছেন। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য নয়, পতি-পত্নীকে গুণ বিচারে তূল্যমুল্য করা। গোবিন্দ মাণিক্য মহারাজ কল্যাণ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ্য পুত্র। কিন্তু তাঁকে তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই নক্ষত্র মাণিক্য বাংলার শাসন কর্তা " সুজার সাহায্যে উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া নক্ষত্র রায় ভীষণ যুদ্ধে গোবিন্দ মাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুর সিংহাসনচ্যুত করেন।" কিন্তু সেমাত্র কারোর মতে দুই বৎসরের জন্য। কারোর মতে ছয় বৎসরের জন্য। গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয় বারের জন্য ত্রিপুর সিংহাসনে বসতে সক্ষম হলেন এবং স্বকীয় পরিচয়ে বিশিষ্ট হলেন। রাজা থেকে ঋষিও হলেন।

আসামের রাজদূত রত্ন কন্দলী শর্মা এবং অর্জুন দাস বৈরাগী ১৭০৯-১৭১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে তিনবারে ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুরে মিলিতভাবে দীর্ঘ সময় অবস্থান করে ত্রিপুর রাজবংশ, রাজাদের কাজকর্মের ধরন, নাগরিকজীবন ও সংশ্লিষ্ট বহু তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। ইত্যাকার যাবতীয় বিষয়ের সমন্বয়ে তারা তাদের প্রস্তুত বিবরণ আসাম রাজ সকাসে উপস্থিত করেছিলেন। তাদের বিবরণীতে নক্ষত্র মাণিক্য - গোবিন্দ মাণিক্য বিষয়েও তথ্যাদি ছিল যদিও তা ৪০ (চল্লিশ) বৎসর পূর্বের শোনা ঘটনা। গোবিন্দ মাণিক্য প্রথম সিংহাসনে বসেন ১০৬৯ ত্রিপুরাব্দে তথা ১৬৫৯ খ্রিষ্টাব্দে; ১০৭৯ ত্রিং তথা ১৬৬৯ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু হয়। দূতদের বিবরণ " গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হইয়া তিনবৎসর রাজত্ব করিলে পর তাঁহার ভাই ছত্র মাণিক্য মুসলমান নবাবের নিকট গিয়া প্রতি বৎসর দুইটি হাতী দেওয়ার এবং বাংলার নবাবের নিকট জামিনদার থাকিবার সর্তে রাজী হইয়া মুসলমান নবাব হইতে লোকলস্কর আনিয়া গোবিন্দ মাণিক্যের সরাইয়া নিজে রাজা হইলেন। তারপর গোবিন্দ মাণিক্য রাজা লুকাইয়া লুকাইয়া নিজ ঘরে দুইবৎসর রহিলেন। ছত্র মাণিক্য রাজা হওয়ার পর লোকের সুখ দুঃখ বিচার করিতেন না। গণ্যমান্যদিগকে হতমান করিতেন। তখন সমস্ত বড় লোকগণ পরামর্শ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্যের নিকট গিয়া বলিলেন — " ছত্র মাণিক্য সমস্ত দেশ উচ্ছন্ন করিল। পূর্বে কোন মুসলমান বাদশাকে হাতী দেওয়ার বা জামিনদার থাকিবার চুক্তি ছিল না। ছত্র মাণিক্য তাহাই করিল। তজ্জন্য আমরা সকলে একমত হইয়া আপনাকে রাজা করিব।" এই কথা শুনিয়া গোবিন্দ মাণিক্য বলিলেন " ভালই হইয়াছে, তোমরা যদি সকলে একমত হইয়া আমাকে রাজা কর তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে ভাল করিয়া সম্মান দিব।" তারপর ছত্র মাণিক্যকে বধ করিয়া গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হইলেন। গোবিন্দ মাণিক্য রাজা হওয়ার পর মুসলমান নবাবকে হাতী দেওয়া বন্ধ করিলেন।"

গোবিন্দ মাণি[illegible]থম সিংহাসনে বসেন ১৬৫৯ খ্রিঃ, তিন বছর মা[illegible]ত্র মাণিক্যের শাসন বাদ দিলে দুই দফায় গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্য শাসন করেছেন সাত বছর। কৈলাশ সিং-

এর দেয়া তথ্যকে যদি যথার্থ ধরি অর্থাৎ ছত্র মাণিক্য ছয় বছর রাজ্য শাসন করেছেন তবে গোবিন্দ মাণিক্য মাত্র তিন থেকে চার বছর কাল রাজত্ব করেছিলেন। বিভিন্ন তথ্যে দেখা যাচ্ছে গোবিন্দ মাণিক্য নক্ষত্র মাণিক্য দ্বারা সিংহাসনচ্যুত হয়েছিলেন দুই বছর রাজত্ব করার পর। তারপর ছয় বছর যদি নক্ষত্র মাণিক্যের শাসন হয় তবে; ১৬৬৯ খ্রিঃ যেহেতু গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যু তবে দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসে গোবিন্দ মাণিক্য জীবিত ছিলেন মাত্র দুই বছর। কিন্তু গোবিন্দ মাণিক্যের বিপুল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তার এই স্বল্প শাসন মেয়াদ যথার্থ সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ত্রিপুর চন্দ্র সেনও একটি পর্যালোচনা করেছেন এবং মতামত দিয়েছেন। ত্রিপুরা বিষয়ে তিনিও গবেষক এবং তথ্য সংগ্রাহক। তিনি লিখেছেন — " Chatra Manikya ruled for two years only. When the nobilities of the Durban conspired with Gobinda to dethrone Chatra Manikya. During this period of two years he (Gobinda Manikya) was busy in conspiring against Chatra Manikya. When Gobinda's conspiracy became mature, he (Gobinda) killed Chatra Manikya and became Raja of Tripura again – Introduction – Tripur Deser Katha, Tripur Chandra Sen, P-8)". ত্রিপুর সেন কোন প্রশস্তি বা অপবাদমূলক অথবা পল্লবিত বা সঙ্কোচিত তথ্যকে গ্রহণ করেননি। ত্রিপুর চন্দ্র সেন নির্ভর এবং বিশ্বাস করেছেন গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ৪০ বছরের মধ্যে যে ব্যক্তিদ্বয় রাজবাড়ীর বুকে বসে তথ্য সংগ্র করেছেন সেই অর্জুন দাস ও রত্ন কন্দলীর উপর। মনে রাখতে হবে এরা দু'জন এসেছিলেন এবং ত্রিপুর রাজবাড়ীতে রাজকীয় আতিথ্যে দীর্ঘকাল অবস্থান করেছিলেন। তারা যখন উদয়পুরে দৌত্যকর্মে তখন গোবিন্দ মাণিক্যের বংশোদ্ভব উত্তর পুরুষেরাই ত্রিপুর সিংহাসনে। তারা তাদের অবস্থানকালেই রাজ পরিবারের একাধিক ষড়যন্ত্র প্রত্যক্ষ করেছেন। মহারাজ রত্ন মাণিক্যকে খুন হতে দেখেছেন, যুবরাজ চম্পক রাইকে খুন হতে দেখেছেন।

বিবেচনায় রাখতে হবে ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে মৈত্রীর সূত্র সন্ধানে অর্জুন দাস বৈরাগী এবং রত্ন কন্দলী শর্মাকে ত্রিপুর রাজ দরবারে পাঠানো হয়েছিল, সুতরাং কোন অস্থায়ী বা বিদ্বেষপূর্ণ রিপোর্ট বা অতিরঞ্জন বা কল্পিত কিছু, বা প্রমাণ নেই এমন গল্প কাহিনী তাদের নির্মম যুক্তি এবং প্রখর বীক্ষণে বাদ দিতে হয়েছে। তাদের কোন সূত্র যদি দুই রাজার মৈত্রী বন্ধনে বা মৈত্রী স্থাপনে অহেতুক প্রতিবন্ধক হয় তবে ব্যক্তিজীবনে অনর্থের ঝুঁকি থাকে, ফলে তারা হাঁসের মতনই দুধ থেকে জলজ অংশ বাদ দিয়ে খাঁটি দুধটাকেই গ্রহণ করেছেন। তার বহু পরে কৈলাশ সিংহের সংগৃহীত তথ্যনির্ভর রাজমালা বা রাজপ্রশস্তিমূলক " রাজমালা" এই দুইয়ের চাইতে শর্মা আর বৈরাগীরাই ঘটনার নিকট-প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বার্থবিহীন বিশ্বস্ত সাক্ষী। কৈলাশ সিংহ গোবিন্দ মাণিক্য বংশের তরফে লেখানো রাজমালার তথ্য নিয়ে কখনো সন্দেহ ও সংশয় প্রকাশ করেছেন। সুতরাং, ত্রিপুর চন্দ্র সেন কেন রত্ন কন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগীকেই নির্ভরযোগ্য বলে গ্রহণ করেছেন তার কারণ বোঝা যায়।

রত্ন কন্দলী শর্মা আর অর্জুন দাস বৈরাগীর রিপোর্ট নিশ্চই ১৭১৫ খ্রিষ্টাব্দে, ত্রিপুরা থেকে ফিরে যাওয়ার রাজ দরবারে জমা পড়েছিল। কারণ এই রিপোর্ট তৈরীই ছিল তাদের

কাজ। রিপোর্টে রাজ পরিবারের হালচালও স্থান পেয়েছে যেমন নাগরিক জীবন, দেশের অর্থনৈতিক চালচিত্র ইত্যাদিও যুক্ত হয়েছে। ঐ রিপোর্ট ত্রিপুরায় ছিল না। তাদের রিপোর্টের মূল পাণ্ডুলিপি রক্ষিত ছিল ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত ঐ পাণ্ডুলিপি আসামী ভাষায় " ত্রিপুরা বু-কুঞ্জী" নামে অনুবাদ করেন জনৈক এস. কে ভুঁইঞা। ত্রিপুর চন্দ্র সেন " ত্রিপুর দেশের কথা" নামে ঐ রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়াম থেকে ত্রিপুর চন্দ্র সেন ঐ রিপোর্টের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেছিলেন। তার অনূদিত বই প্রকাশ পেয়েছিল ১লা আগষ্ট, ১৯৬৪ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৯৭ খ্রিঃ ত্রিপুর চন্দ্র সেনের বই-এর দ্বিতীয় মুদ্রণও হয়েছে। ফলে ধরে নেওয়া যায় ত্রিপুর চন্দ্র সেনের বইটি বহু পাঠকের হাতেই পৌঁছেছে। কিন্তু ১৯৬৪ থেকে ২০১০ দীর্ঘ ৪৬ বৎসরেও রত্ন কন্দালী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগীর তথ্য বা ত্রিপুর সেনের বিশ্লেষণী সিদ্ধান্ত কোনটারই প্রতিবাদ হয়নি। বইটি শিশুপাঠ্য নয়। বেঘোরে বেহাতে যাওয়ার সম্ভাবনাও নেই। বইটি উপযুক্ত পাঠকের সংগ্রহেই গেছে। সুতরাং, শর্মা বৈরাগী, সেন তিন জনকে সঠিক বলে মেনে নিতে আপত্তি হওয়ার কথা নয়। সত্যের পরমেশ্বর রূপ হয় না। এক রঙেরই। কৈলাশ চন্দ্র সিংহ রাজমালা লেখেন রত্ন কন্দলী ত্রিপুরায় আসার ৮৭ বছর পরে ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে, আর রিপোর্ট পাশের ৮১ বছর পরে।

গোবিন্দ মাণিক্য মাণিক্য বংশের এক উল্লেখযোগ্য নৃপতি। এই ত্রিপুর নরপতি " শ্রীশ্রী গোবিন্দ দেব জ্ঞানীগুণীদিগেরও অগ্রগণ্য", রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রেও দক্ষ, প্রজারঞ্জকও নক্ষত্র মাণিক্যের সঙ্গে যুদ্ধ; তাও তাঁর পুত্র " রামদেবের" সেনাপতিত্বে, এছাড়া, রাজ্যে স্থিতাবস্থাই ছিল। এছাড়াও তাঁর দানকর্ম প্রজাহিতে রাজকোষ উন্মুক্ত রাখা, এবং ধর্মপরায়ণতার অনন্য স্বীকৃতিও রয়েছে।

গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নামও অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বাঁধা পড়ে গেছে। সঙ্গে উদয়পুর। এখানে "তৈলাধার পাত্র, না পাত্রাধার তৈল" এই বিতর্কের অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথেব গোবিন্দ মাণিক্যের আধার উদয়পুর। গোবিন্দ মাণিক্যই যেন উদয়পুরকে, তথা ত্রিপুরাকেই আধেয় করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিয়ে গেছেন বিশ্ব-উপস্থাপনায়। কেন্দ্রে গোবিন্দ মাণিক্য। বস্তুত, ত্রিপুর রাজ পরিবার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন মুকুট (১২৯২ বঙ্গাব্দে); রাজর্ষি (১২৯৩ বঙ্গাব্দে) এবং বিসর্জন (১২৯৭ বঙ্গাব্দে)। সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে রাজর্ষি। ত্রিপুর সম্রাট গোবিন্দ মাণিক্যকে রবীন্দ্রনাথেব বিবেচনায় মনে হয়েছে ঋষিতুল্য। রাজা হয়েও ঋষি। রাজর্ষি। ঐ অভীধার যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে গিয়ে গোবিন্দ মাণিক্যের গুণাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে তার অন্যতম হল রাজ সিংহাসনের প্রতি তাঁর আন্তরিক ঔদাসীন্য। ভাই নক্ষত্র যখন তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে যুদ্ধং দেহী তখন গোবিন্দ মাণিক্য তাঁর নিজের তরবারি ভাইয়ের সামনে নতজানু ভঙ্গিমায় তুলে দিতে চাইছেন যুদ্ধক্ষেত্রের নরহত্যা বন্ধ করার জন্যে। তাকে হত্যা করে সিংহাসন নিয়ে নিতে বলছেন অনুজকে।

হত্যা-লালসামুক্ত; সংসার ও সিংহাসনের প্রতি বীতরাগ, এবং স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগের ঔদার্য সমন্বিত রাজা তো ঋষিরই তুল্য। সবকিছুকে ন্যাস বলে তুচ্ছ মানছেন তিনি। নক্ষত্র মাণিক্যের আসক্তি তাকে রক্ত লুলুপ করেছে। আর রক্তপাত বন্ধ করতে গোবিন্দ ন্যায্য সিংহাসন ত্যাগ করে অরণ্যচারী হতে উন্মুখ, এমনকি নক্ষত্রের মনের হিংসা উৎপাটনে নিজরে

তরবারি তুলে দিতে চাইতেন — তাকে অন্তত ভ্রাতৃহত্যার মাধ্যমেও যদি তাঁর মন থেকে রক্ত পিপাসা বিলুপ্ত হয়। এ যেন বুদ্ধ-যীশুর দ্বিতীয় মর্তলীলা। বামগণ্ডে আঘাত করিলে দক্ষিণ গণ্ড পাতিয়া দিও -যীশুর অমোঘ বাণী।

কিন্তু ইতিহাস দেখেছে সিংহাসন রক্ষার জন্য তিনি যুদ্ধ করেছেন। সিংহাসন পুনরুদ্ধারের জন্য নিজেই ভ্রাতৃহত্যা করেছেন এবং হত্যার মাধ্যমে রাজা হয়েছেন (অর্জুন দাস বৈরাগী, রত্ন কন্দলী শর্মা, আসাম রাজার দূত; ত্রিপুর চন্দ্রসেন)। ফলে যে ত্যাগের কারণে গোবিন্দ মাণিক্য রাজর্ষি; আসক্তি বর্জিত এই ঋষিকে আমরা কোন তুলাদণ্ডে বিচার করবো; তার জন্য যথার্থ স্থান নিরূপণ করব?

তবে কি তথ্যের ভ্রান্তি? তাহলে কে সেই ভ্রান্তির শিকার? স্বভাবত-ই প্রায় সমকালের প্রত্যক্ষ সাক্ষী রত্ন কন্দলীরাই। রবীন্দ্রনাথের ত্রিপুরায় আগমন তার অনেক পরে। আসার আগেও রাজপরিবার বিষয়ে ওয়াকিবহাল হয়েছেন তিনি। নিশ্চিতভাবেই রত্ন কন্দলীদের অনেক পরে। বিসর্জন বা রাজর্ষিকে নিছক কল্প-কাহিনী বলা যাবে না। তথ্য, ইতিহাস ও কল্পনার মিশ্রণ এতে। কাজেই তথ্যে ভ্রান্তি থাকলে সৃষ্ট চরিত্রের মাত্রা পাল্টে যায়। গোবিন্দ মাণিক্যের ক্ষেত্রে কোনটা হল? ঐতিহাসিক চরিত্র ঐতিহাসিক রেখাচিত্রে একরকম অবয়ব পায়। আর যখন তাকে নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় সেখানে ইতিহাসের সারাংশের উপর মেদ-মাংসের প্রলেপেন তখন সে অধিকতর ভাস্কর হয়। কিন্তু রং চড়ে কঙ্কালের উপরে। ফলে তথ্যের ভ্রান্তি লক্ষ্যকে বিপরীতগামী করতেই পারে। ইতিহাস বলছে ত্রিপুর সিংহাসন নিয়ে তখন রক্তপাত হয়েছে। সংঘাতের বিপরীত পক্ষ হল নক্ষত্র মাণিক্য। নক্ষত্র মাণিক্য অনায়াসে সিংহাসন পান নি। গোবিন্দ মাণিক্য তার হাতের তরবারিও নক্ষত্রের হাতে তুলে দেননি। সিংহাসনের দখল পেতে রক্তপাতে কোন পক্ষেরই আগ্রহের অভাব ছিল না। তাহলে রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষি?

রাজর্ষির বর্ণনা এতটাই বাস্তবমান্য-বোধে সংস্পৃক্ত যে একে ইতিহাস বলেই মনে হয়। রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস লিখেননি। রচনার উৎসইতিহাস। তিনি কোথায় পেলেন সে-ইতিহাস? রাজমালায়? কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রাজর্ষির কিন্তু যাত্রা তার সঙ্গে রাজমালার গোবিন্দ মাণিক্যের মিল খুব কম। তবে? অন্য কোন উৎস? তাই হবে। হতে পারে সুহৃদ মহারাজ বীরচন্দ্র নিজেই সেই উৎস। অথবা তারই আত্মজন রাজপরিবার-ঘনিষ্ঠ কেউ ।এবং ইতিহাস যদি সরে গিয়ে থাকে তবে নাটের গুরু এদেরই কেউ। কিন্তু এতেও কিছু যায় আসে না। কারণ রবীন্দ্রনাথ রাজপরিবারের ইতিহাস লিখেননি। তিনি সাহিত্য রচনা করেছেন এবং মানবধর্মের কাঙ্ক্ষিত মডেলটিকেই গোবিন্দ মাণিক্যের মাধ্যমে রূপায়িত করেছেন। তিনি রাজ আদর্শের প্রস্তাবনার দালিলটিকে মানবিক বর্ণমালায় প্রোজ্জ্বল করেছেন এবং তা অনন্য সৃষ্টি। গোবিন্দ উপলক্ষ্য মাত্র ।

উদয়পুরে মাণিক্য রাজাদের এগারশ সত্তর বছরের দীর্ঘ রাজ্যপাটে রবীন্দ্র উল্লিখিত অনুরূপ না-জিরের দ্বিতীয়টি নেই। তবে ইতিহাস বলছে, যাই ফুটুক, আসল পদ্মের রূপ-বর্ণ ভিন্ন এবং গোবিন্দের সিংহাসন রক্তপাতবর্জিত নয়, রক্ত কলঙ্কিত। তবে এর স্বপক্ষে ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে এই বলে যে, এটিই একমাত্র রক্তপাতের ঘটনা নয়। সিংহাসনকে কেন্দ্র করে

ষড়যন্ত্র, ভ্রাতৃহত্যা, স্বজন হত্যা, গৃহত্যাগের ঘটনা আরো আছে, কাজেই এই হত্যাকাণ্ড বা রক্তলাঞ্ছনাকে বড় করে দেখাও ঠিক নয়। এইভাবেই একে লঘু করতে চাইবে।

১৫৩৫ খ্রিঃ জনৈক চন্তাই রাজ পুরোহিত দেব মাণিক্যকে হত্যা করেন। তার পশ্চাতে রয়েছে চন্তাইয়ের সিংহাসন লুলুপতা। মহারাজকে হত্যা করে তার শিশু পুত্রকে, মাত্র সাত বছর, সিংহাসনে বসিয়ে চন্তাই শাসনকর্তা হয়ে গেলেন। এই হত্যাকাণ্ডে পশ্চাতে আরো একটি ঘৃণ্য বিষয় জুড়ে ছিল তা হল, মহারাজ দেব মাণিক্য-হত্যায় তার মহিষী চন্তাই-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। মাত্র চার মাসের মধ্যে খুন হয়ে গেলেন চন্তাই। খুন হলেন চন্তাই-সহযোগী রাজ মহিষী। মর্মান্তিক হলো অবোধ চার বছরের শিশুটিকেও প্রাণ দিতে হল। বিজয় মাণিক্য রাজা হলেন। তিনি আবার হত্যা করলেন তাঁর শিশুর দৈত্য নারায়ণকে। ১৭১২ খ্রিঃ মহারাজ দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যকে হত্যা করেন ঘনশ্যাম। মহেন্দ্র মাণিক্য হয়ে সিংহাসনের মালিক হলেন। রত্ন মাণিক্য (২য়) কে সিংহাসনে বসতে সাহায্য করেছিলেন চম্পকরাই, চম্পকরাই নিহত হলেন রত্ন মাণিক্যের লোকেদের হাতে। মাঝে নিহত হয়েছিলেন নরেন্দ্র মাণিক্য। এক সময়ে মহারাজ জয় মাণিক্যকে হত্যা করে সিংহাসনের দখল নিয়েছিলেন অমর মাণিক্য। ঐ ডামাডোলে জয় মাণিক্যের শশুর রঙ্গনারায়ণের মস্তকও স্কন্ধচ্যুত হল। ইত্যাকার নানা ঘটনা। হত্যা ও রক্তপাতের ঘটনা ত্রিপুর রাজঅন্দরে, সিংহাসনের চারপাশে।

রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন গোবিন্দ মাণিক্যকে মহত্ত্ব র করেছেন। সিংহাসন মাত্রেই যদি রক্তের উৎসব তবে সাহিত্য-ব্যাকরণের বাইরে হবে ইতিহাস। বাস্তবে যেখানে বিত্ত, ক্ষমতা, প্রভুত্ব ও সিংহাসন সেখানে প্রার্থিত লাভে পিতৃরক্ত নিঃসরণেও পুত্রের হাত কাঁপে না। ভারতে মুসলমান শাসন তা বার বার প্রত্যক্ষ করেছে। ত্রিপুরার সিংহাসনও এই কলঙ্কমুক্ত নয়। একই দোষে দুষ্ট নক্ষত্র মাণিক্যের ত্রিপুর সিংহাসনের উপর দাবি ন্যায়, না ন্যায়-বহির্ভূত তা আইনী বিষয়। তবে আইনের পথ এত সূক্ষ্ম এবং ক্ষুরধার যে কীভাবে অস্ত্রোপচার হবে তা ধারণা করা কখনো কখনো আসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। বঞ্চিতরা তো অন্তত এমনই মনে করেন। গোবিন্দ মাণিক্যের এক অধস্তন পুরুষও আইনী বঞ্চনার জ্বালায় নিজে আজীবন দগ্ধ হয়েছেন। কুমার শচীন কর্তা অভিমান বশে ত্রিপুরামুখী হলেন না। পিতা নবদ্বীপ চন্দ্রের প্রতি বীরচন্দ্রের প্রত্যাখ্যান-উপেক্ষা তাকে এতটাই ক্ষুব্ধ করেছিল। এব্যাপারে কৈলাশ সিংহের রাজমালার প্রাসঙ্গিক অংশ ঃ

"ত্রিপুরাবাসী সর্ব সাধারণের এরূপ বিশ্বাস ছিল, যেদিন বীরচন্দ্র সিংহাসন আরোহণ করেন সেই দিবসে মহারাজ ঈশান চন্দ্রের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ চন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। মহারাজ ঈশান চন্দ্রের মহিষী ও প্রধান কর্মচারীগণ মহারাজ ঈশান চন্দ্রের উপকারার্থে যে সমস্ত কার্য করিয়া ছিলেন, তাহাতে তাহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে, ঈশান চন্দ্রের পুত্র বীরচন্দ্রের পর ত্রিপুর সিংহাসনের অধিকারী হইবেন। কিন্তু মহারাজ বীরচন্দ্র তাদের আশা ষোল কলা পূর্ণ করিতে কৃত সংকল্প হইলেন! যে দিন মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা ঈশান চন্দ্রের একমাত্র পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র গৃহ মধ্যে অনাহারে অবরুদ্ধ থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। তদনন্তর প্রায় এক বৎসর তিনমাস নবদ্বীপ চন্দ্র, মহারাজ বীরচন্দ্র দ্বারা রাজভবনে অবরুদ্ধ ছিলেন। এই কাল মধ্যে মহারাজ বীরচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ চন্দ্রের

বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র অপহরণ করেন। নবদ্বীপ চন্দ্রকে তাহার পিতা ঈশান চন্দ্র "নবদ্বীপ চন্দ্র নগর" নামক একটি জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র তাহাও বাজেয়াপ্ত করিলেন। মহারাজ বীরচন্দ্র বলেন, " নবদ্বীপ চন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য নবদ্বীপের বিমাতা মহারানী রাজলক্ষ্মী ও মহারানী চন্দ্রেশ্বরী তাঁহাকে বড়ই পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন।" বোধ হয় সেই অপরাধেই অল্পকাল মধ্যেই মহারাজ বীরচন্দ্র, মহারানী চন্দ্রেশ্বরীর " খেয়াইস" নামক তালুক বাজেয়াপ্ত করিয়া প্রত্যুপকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া দিলেন। এইরূপে মহারাজ বীরচন্দ্র স্বীয় দুর্দান্ত শত্রু ঈশান চন্দ্রের পুত্র, পত্নী ও ভৃত্যগণকে নির্যাতন করিয়া ১২৮০ ত্রিপুরাব্দের (১৮৭০ খ্রিঃ) ১৬ই ভাদ্র মাসে তাহার জ্যৈষ্ঠ পুত্র কুমার রাধাকিশোর যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। নবদ্বীপ চন্দ্রের সহায় বলিয়া কয়েকজন ঠাকুর লোককেও নির্যাতন করিয়া ছিলেন (পৃষ্ঠা- ১১২-১১৩)।" ঈশান চন্দ্রের চতুর্থ পত্নী জাতিশ্বরী দেবীর গর্ভে ১২৬৩ ত্রিপুরাব্দ (১৮৫৩ খ্রিঃ) ১৩ই মাঘ নবদ্বীপ চন্দ্রের জন্ম।

মহারাজ কৃষ্ণ কিশোর মাণিক্যের পত্নী সুদক্ষিণার গর্ভে ঈশানচন্দ্র, উপেন্দ্রচন্দ্র এবং বীরচন্দ্রের জন্ম। কৃষ্ণ কিশোরের পর রাজা হলেন ঈশান চন্দ্র। ঈশান চন্দ্রের পুত্র নবদ্বীপ। বীরচন্দ্র হলেন ঈশান চন্দ্রের ভাই। ঈশান চন্দ্রের পুত্র নবদ্বীপ চন্দ্র, না ঈশান চন্দ্রের ভ্রাতৃপুত্র , সিংহাসনের কার অধিকার আইনী লড়াইটা হয়েছিল তা নিয়ে। এর সঙ্গে রাঙামাটি বা উদয়পুরের সংযোগ নেই। সে হল ১৮৭০ খ্রিঃ কথা। রাধা কিশোর মাণিক্য যৌবরাজ্যে ১৮৭০ খ্রিঃ ১৬ই ভাদ্র তারিখে অভিষিক্ত হলেন। নবদ্বীপ চন্দ্র চূড়ান্তভাবে সিংহাসন বঞ্চিত হলেন। আর রাঙামাটি বা উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় ১৭৬০ খ্রিঃ কৃষ্ণমণি বা কৃষ্ণ মাণিক্যের সময়ে, সমসের গাজীর তাড়নায়। সে আরেক ইতিহাস।

নক্ষত্র মাণিক্যের সিংহসন-দাবি ছিল এক অদ্ভুত যুক্তির উপর। কল্যাণ মাণিক্যের ঔরসে গোবিন্দ মাণিক্যের জন্ম, কল্যাণ মাণিক্যের সিংহাসন আরোহণের আগে। আর নক্ষত্র মাণিক্যের জন্ম হয় তখন কল্যাণ মাণিক্য রাজ সিংহাসনে। জন্ম সময়ের বিচারে গোবিন্দ মাণিক্যের জন্ম। আগে। সুতরাং, তিনি কল্যাণ মাণিক্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র সন্দেহ কি? নক্ষত্র মাণিক্যের যুক্তি ছিল যেহেতু কল্যাণ মাণিক্য তখনও রাজা নন সেইহেতু গোবিন্দ মাণিক্য রাজপুত্র নন। আর কল্যাণ মাণিক্য রাজা হওয়ার পরে নক্ষত্র মাণিক্যের জন্ম হয়েছে বলে তিনিই রাজপুত্র। রাজপুত্রই রাজ সিংহাসনের অধিকারী । এই যুক্তির ন্যায্যতা নেই।

কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুর পর গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে বসেন ১৬৫৯ খ্রিঃ। বঞ্চিত মনে করে নক্ষত্র রায় রাজধানী ত্যাগ করে ঢাকা চলে গেলেন। মুঘল শাসনকর্তা সুজার আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করে সাফল্য পান। মুঘল সৈন্যের সহায়তায় সিংহাসনের দখল নিতে তিনি ত্রিপুরাভিমুখী হলেন। তাঁকে প্রতিরোধ করতে গোবিন্দ মাণিক্য পাঠালেন তার জোষ্ঠ্য পুত্র রামদেব ঠাকুরকে। রামদেব যুদ্ধে পরাজিত হলেন। ১০৭০ ত্রিপুরাব্দ বা ১৬৬০ খ্রিঃ কুমার নক্ষত্র ছত্র মাণিক্য নাম নিয়ে উদয়পুরে ত্রিপুর সিংহাসনে বসেন। নক্ষত্র রায়ের গোবিন্দ মাণিক্যের সিংহাসন দখলের লড়াই হয়েছিল কুমিল্লার নিকটবর্তী গ্রাম আমতলীতে (কৈলাশ সিংহ লিখেছেন ঃ " সম্ভবতঃ ছয় বৎসর ছত্র মাণিক্য রাজ্য শাসন করে পরলোক গমণ করেন"। তা হলে গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয় বার সিংহাসনে বসেন ১৬৬৭ খ্রিঃ কিন্তু ত্রিপুর

সেন লিখেছেন "Chatra Manikya ruled for two years only (page-8)" । তা হলে গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয় বার সিংহাসনে বসেন ১৬৬২ খ্রিঃ। গোবিন্দ মাণিক্যের সিংহাসন পুনর্দখল নিয়ে নিশ্চিতভাবেই বিভ্রাট রয়েছে। কৈলাশ সিংহকে অভ্রান্ত ধরলে গোবিন্দ মাণিক্য দ্বিতীয় বার সিংহাসনে বসেন ১৬৬৭ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬৬৯ খ্রিঃ তাঁর মৃত্যু । তাহলে কি তিনি দ্বিতীয়বার সিংহাসনে বসে মাত্র দুই বৎসর রাজ্য শাসনের সুযোগ পেয়েছিলেন? এবং প্রথম এক বৎসর ধরে, (১৬৫৯ খ্রিঃ প্রথম সিংহাসন লাভ; ১৬৬০ খ্রিঃ নক্ষত্র মাণিক্যের সিংহাসন দখল) মাত্র তিন বৎসর? অর্জুন দাস বৈরাগী আর রত্ন কন্দলী শর্মাদের উল্লিখিত তথ্য গ্রহণ করলে গোবিন্দ মাণিক্যের শাসন দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৭ (সাত) বছর। এবং এটাই সম্ভব।

কিন্তু কৈলাশ সিংহের কাছেই আবার আসতে হবে। তাঁর রাজমালায় ৬৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন " গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরদের নিকট যে রাজমালা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতে লিখিত আছে যে সুলতান সুজার সাহায্যে উপযুক্ত বল সংগ্রহ করিয়া কুমার নক্ষত্র রায় গোবিন্দ মাণিক্যের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। গোবিন্দ মাণিক্য ভ্রাতার অভিলাষ শ্রবণে বিবেচনা করিলেন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে ভ্রাতৃ শোনিতে পৃথিবী রঞ্জিত করিতে হইবে, নতুবা সমরানলে স্বীয় প্রাণ আহুতি প্রদান করিতে হইবে। অতএব বিনাযুদ্ধে রাজ্য পরিত্যাগ পূর্বক প্রথমতঃ রিয়াংদের বাসগৃহে এবং তদনন্তর চট্টগ্রামের পর্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।"

পরবর্তী প্যারাগ্রাফে কৈলাশ সিংহ লিখেছেন — " কিন্তু নক্ষত্র মাণিক্যের বংশধরদের নিকট যে রাজমালা রক্ষিত আছে তাহাতে লিখিত আছে যে, নক্ষত্র রায় ভীষণ যুদ্ধে গোবিন্দ মাণিক্যকে জয় করিয়া ত্রিপুর সিংহাসন দখল করেন।" অতঃপর কৈলাশ সিংহ সিদ্ধান্তে এসেছেন " এস্থলে কোন রাজমালা সত্য তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন হইলেও ভারতের তদানীন্তন ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া নক্ষত্র রায়ের বংশধরগণের নিকট রক্ষিত রাজমালার উক্তি সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে আমরা বাধ্য হইয়াছি।" পরবর্তী মূল্যায়ন হল " দুঃখের বিষয় যে গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ যে নক্ষত্র ও জগন্নাথের বংশধরগণকে সিংহাসন হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছেন, এমত নহে, তাহাদের উত্তরপুরুষগণের মধ্যে যাহারা অস্ত্রবলে কিম্বা কৌশলে সিংহাসন অধিকার করিয়াছেন, গোবিন্দ মাণিক্যের বংশধরগণ সেই সকল মহাপুরুষদের চরিত্র নিতান্ত বিকৃতভাবে ইতিহাস পটে চিত্রিত করিয়াছেন।"

গোবিন্দ মাণিক্য প্রভাবশালী রাজপুরুষদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই সিংহাসন উদ্ধার করেন। ত্রিপুর চন্দ্র সেন লিখেছেন — " When Gobinda's conspiracy became mature he (Gobinda Manikya) killed Chatra Manikya"। এই উদাহরণ পরবর্তীকালে গোবিন্দ মাণিক্যের উত্তরপুরুষ রত্ন মাণিক্যের (২য়) ভাগ্য নির্ণয়ে প্রভাব ফেলেছিল। রত্ন মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করে ভাই ঘনশ্যাম (তখন বড় ঠাকুর) সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেন নি। রত্ন মাণিক্যের প্রত্যাশা ছিল প্রাণে বেঁচে যাবেন। তিনি দিনে এক সের চাউলের সিধা আর দুই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের মুখে শাস্ত্র পাঠ শুনে অবশিষ্ট জীবন কাঁটাতে পারবেন ভেবেছিলেন। কিন্তু তা হয়নি। জনৈকা গঙ্গারানী ধাই মহেন্দ্র মাণিক্য উপাধিধারী ঘনশ্যামকে পরামর্শ দিলেন " এখন তুমি রাজা হইয়াছ। বুদ্ধি স্থির করিয়া কাজ করিতে হইবে। রত্ন মাণিক্য বাঁচিয়া থাকিলে তোমার বিপদের সম্ভবনা আছে। এই কথা জানিয়া রত্ন মাণিক্যকে আর বাঁচিয়া থাকিতে

দেওয়া উচিত হয় না (ত্রিপুরা বু -কুঞ্জী)।" গঙ্গারানী ধাই ঘনশ্যামকে যখন রত্ন মাণিক্য বধের পরামর্শ দেন নিশ্চই তার মনে তখন নিকট অত্মীয়ের উদাহরণসমূহ ভেসে উঠেছিল। এবং ঘনশ্যাম বা মহেন্দ্র মাণিক্যও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছিলেন। সতুরাং, বলতে হয় গোবিন্দ মাণিক্য ও নক্ষত্র মাণিক্য হিংসা ও রক্তপাতের উৎসমুখ খুলে দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ সত্য, শিব ও সুন্দরের পূজারী। তিনি কবি। গোবিন্দ বংশোদ্ভব অধস্তনদের রক্ষিত রাজমালার প্রাপ্ত তথ্য তাঁকে ঐ ভাবাবেগে নিয়ে গেছেন নৃপতি মুকুট দণ্ড, সিংহাসন ত্যাগ করে দরিদ্র বেশে দিন যাপনেও কুণ্ঠিত নন। গোবিন্দ মাণিক্য সেই মহত্ত্ব এবং ত্যাগকেই উচ্চকিত করেছেন। তবে প্রব্রজ্যার পর কেন তিনি সিংহাসনের প্রত্যাশী হলেন, দখলে নিলেন এবং রাজ্য শাসন ও রাজৈশ্বর্যে নিমগ্ন হলেন? " ত্যাজিতে মুকুট দণ্ড সিংহসান ভূমি" এই রাজ আদর্শের অবমাননা হল।

রবীন্দ্রনাথ নিজে উপষিদ জারিত। তাঁর মননের সার্বভৌম চৌহুদ্দি সীমায় একটি ধ্বনিরই অনুরণন " ঈশাবাস্য মিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং, জগৎ"। রাজ দন্ডধারীরা ঐ জগৎ থেকে চির নির্বাসিত। রাজা এবং রাজপুত্র সম্পদ স্বামিত্বে সার্বভৌম, শাসিত জগৎ যাঁর পদতলে, হত্যায় যার অধিকার এবং ঐ হত্যা রাজত্বসুখ নিশ্চয়তার জন্য প্রয়োজন, সেই রাজপুত্র ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসী হবেন কেন? তথ্য বিশ্লেষণে এটাই প্রতিপন্ন যে, গোবিন্দ মাণিক্য রাজ্যপাট ছেড়ে সন্ন্যাস নেননি। সিংহাসন আসক্তির কারণে তাঁকে অস্ত্র ধরতে হয়েছে এবং সিংহাসন পুনরুদ্ধারেও। তবু বলতে হবে " সেই সত্য রচিবে যা তুমি।"

গোবিন্দ মাণিক্য ও নক্ষত্র রায়কে নিয়ে সিংহ-সেনের বিপরীত বক্তব্য। বংশের অধস্তনরা এব্যাপারে সত্য উদ্ঘাটন করতে পারেন। নক্ষত্র মাণিক্য (রায়)-এর বংশধরাও রয়েছেন। এই বংশেরই প্রভাত রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে রাজন্য যুগের শেষ লগ্নে রাজ্যে প্রজা আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। কৈলাশ সিংহ বলেছেন রাজমালার দ্বিতীয় বা ভিন্নপাঠ নক্ষত্র মাণিক্যের বংশধরদের কাছে রয়েছে, তাহলে এব্যাপারে তারাও কথা বলতে পারেন।

বিতর্ক সত্ত্বেও গোবিন্দ মাণিক্যের রাজকীয় অবস্থানের হানি হয় না। একই সঙ্গে তিনি পরমেশ্বর। রবীন্দ্রনাথ গোবিন্দ মাণিক্যকে কল্পনা করেছেন ত্যাগব্রতী সন্ন্যাসীরূপে। আবার ইতিহাস তাঁকে প্রত্যক্ষ করেছে দণ্ডধারী শাসক হিসেবে। তাঁর পিতা কল্যাণ মাণিক্যও ছিলেন বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বীর। তিনি মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করেছেন, সৈন্যদের আধুনিক শিক্ষা দিয়েছেন। মুঘল সুলতান সুজাকে জব্বর ঠুকেছেন, রাজ্যের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করেছেন। নক্ষত্র মাণিক্য পক্ষান্তরে সুজার দাক্ষিণ্যে সিংহাসনের দখল নিয়েছেন। অর্থাৎ পিতার শত্রুকে আত্মবন্ধু করেছেন।

এবার পুত্র গোবিন্দ মাণিক্য । কৈলাশ সিংহ লিখেছেন " তিনি কিয়ৎ পরিমাণে মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" এই বাধ্যবাধকতার কারণ বোঝা যায়। সিংহাসন নিরুপদ্রপ রাখা। এর ফল তিনি পেয়েছেন। তাঁর শাসনকাল কার্যত নিরুপদ্রপই ছিল। যুদ্ধ বিগ্রহ না থাকায় প্রজাহিতেও মনোযোগ দিতে পেরেছেন।

বন্যা নিরোধক বাঁধ নির্মাণ, ভূমি উন্নয়ন অর্থাৎ অনাবাদি জমিকে আবাদে আনা তৎসঙ্গে ধর্মগ্রন্থ যা তৎকালে প্রজা -রাজা সংহতির অনুঘটক হিসেবে ধর্মকে ব্যবহার করায় সফল

আধ্যাত্মিক ধ্বজাও তিনি উড্ডীন রেখেছিলেন। মঠ-মন্দির নির্মাণে তিনি পরান্মুখ নন। বর্তমান বাংলাদেশের অধীন চন্দ্রনাথ পাহাড়ের চূড়ায় শিবমন্দির, উদয়পুরে জগন্নাথ মন্দির, গোপীনাথের মন্দির, জলাশয় খনন যেমন জাজীয়াড়া গ্রামে জলায় গুণবতী দিঘি ইত্যাদি। তৎসঙ্গে গুণবতী মন্দিরগুচ্ছ। যদিও তা তার মহিষী গুণবতীর ইচ্ছার প্রতিফলন। কিন্তু গোবিন্দ মাণিক্যের রুচি -ইচ্ছাকে বাদ দিয়ে তো তা হয়নি।

এই সব সিংহাসন আরোহীর রুটিন কাজের মধ্যে চমৎকারিত্ব নেই, কেবল চলমান দিশা আছে। ছত্র মাণিক্যও অনুরূপ প্রজাহিতৈষণা করেছেন। দিঘি খনন করেছেন 'ছত্রসাগর' তাঁর নামে, একাধিক জায়গায় নামকরণ হয়েছে, ছত্রের খিল, ছত্রের হাট ইত্যাদি রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হয়েছে ছত্রচূড়া। তাঁর শাসন স্থায়িত্ব মাত্র দুই বছরের। কাজেই ব্যাপক কর্মকাণ্ডের অবসর তাঁর ছিল না। ত্রিপুরার সব রাজারাই জলাশয় খনন করেছেন, কীর্তির স্থায়ীত্ব ও প্রজাহিতৈষনী এতে দুটিই হত।

এসব হল স্থূল তুলনা। নক্ষত্র মাণিক্যকে বলা হয়েছে মেজাজী ও দাম্ভিক, ফলে নিজের অমাত্যদের সঙ্গেও তার বিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। রত্ন কন্দলীরা যা জানিয়েছেন তাতে এই প্রত্যয় হয় যে নক্ষত্র মাণিক্যের পতন স্বভাবদোষে। অমাত্য ও পারিষদদের মনোকষ্টের কারণ ছিল তাঁর আচরণ। পদাধিকারীদের ঐ অসন্তুষ্টিই নক্ষত্র মাণিক্যের বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। আচরণে মুগ্ধ এবং নির্ভরযোগ্য বিবেচনা করেই তারা গোবিন্দমাণিক্যের অবস্থান গোপন রাখতে সাহায্য করেন চক্রান্ত শুরু করেন এবং সাফল্য অর্জন করেন। রত্নকন্দলী গোবিন্দ মাণিক্যের তাঁর সুহৃদদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি " আমি তোমাদের ভাল করিয়া সম্মান দিব" উল্লেখ করেছিলেন। প্রাসাদ বিপ্লবহীন নিরুদ্রপ শাসন থেকে মনে হয় গোবিন্দ মাণিক্য প্রতিশ্রুতি পালনও করেছিলেন। এই মানসিক অবস্থানের বৈপরীত্যই ছিল নক্ষত্র-গোবিন্দ দ্বৈরথের এপি সেন্টার। গোবিন্দ মাণিক্য প্রথা এবং আইন দুইয়ের বিচারেই সিংহাসনের ন্যায্য উত্তরাধিকারী। স্বভাবের কর্কষতা তাঁকে দাম্ভিক ও লোভী করায় এক অযৌক্তিক বাহানায় নক্ষত্র মাণিক্য অন্যায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এবং বিষাদময় পরিণতিকে অনিবার্য করে তোলেন। নিজেকে গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারের জায়গায় নিয়ে যান। এও তার সদ্ বিবেচনা ও দৃঢ় দৃষ্টির অভাব। প্রাজ্ঞের মনোভাব হলো অদ্য ভক্ষ ধনুর্গণঃ। সর্বগ্রাসিতা নয়।

তবে, এক্ষেত্রেও একশ শতাংশ নম্বর পাওয়া গোবিন্দ মাণিক্যের পক্ষেও মুশকিল। নক্ষত্র মাণিক্যের কর্কষতার পাশাপাশি পূর্ণ গোবিন্দ - উন্মোচনের জন্য নীচের ঘটনাটির উল্লেখ প্রয়োজন। রবীন্দ্র নাথ বলেছেন " বাহিরে কুটিল হোক অন্তরেতে ঋজু।" এই ঘটনা থেকে গোবিন্দ মাণিক্যের ভেতরের কুটিলতাকে কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত করে। ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা "সেন্সাস বিবরণী ১৩৪০ ত্রিং এ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন " ছত্র মাণিক্যের পরে মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য পুনরায় রাজ্যলাভের পর একটি তুচ্ছ বিষয়কে উপলক্ষ্য করে রিয়াংদের সঙ্গে মনোমালিন্যের সূচনা হয়। " কতিপয় রিয়াং গোমতী নদীপথে বাঁশের চালি ভাসাইয়া আনিবারকালে গঙ্গাপূজা উপলক্ষ্যে রাজ সরকার হইতে স্থাপিত নদীপথের অবরোধ রজ্জু ছিন্ন করিয়াছিল। এই সূত্রে কর্মচারীগণের সহিত রিয়াংদের কলহ হওয়ায়, তাহাদিগকে

ধৃত করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। এই ঘটনার পর সমগ্র রিয়াং সম্প্রদায়, স্বভাব সুলভ উগ্রপ্রকৃতির বশবর্তী হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। রাজদ্রোহের কারণে ধৃত ও অবরুদ্ধ হইবার অল্পকাল পরে তাহাদের শিরশ্ছেদের আদেশ হইয়াছিল।

বহু সংখ্যক লোকের প্রাণ বিনাশ হইবে শুনিয়া রাজমহিষী গুণবতী মহাদেবীর করুণ হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিল। তিনি রাজ সমীপে রিয়াংগণের প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু মহারাজ গোবিন্দ, মহারানীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, ইহাদের দণ্ড বিধান না করিলে রাজ্যে শান্তি রক্ষা অসম্ভব হইবে। রাজ্যচ্যুতিকালে ইহারা (রিয়াংরা) যে দুর্ব্যহার করিয়াছিল তাহাও মহারাজা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু রাজমহিষী সেই সকল বাক্যে নিরস্ত হইলেন না। তিনি পুনর্বার প্রার্থনা করিলেন " — রিয়াংগণ চিরকালে" নিমিত্ত বশ্যতাপাশে আবদ্ধ থাকিবার প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহাদিগের জীবন রক্ষা করা হইবে, এইরূপ আদেশ চাই।"

মহারাজ অগত্যা পক্ষে মহিষীর বাক্যে সম্মত হইলেন। তখন মহারানী রজনীযোগে কারাগৃহে উপনীত হইলেন। এবং রাজদ্রোহিতার বিষময় ফলের বিষয় রিয়াংগণকে বিশেষভাবে বুঝাইয়া দিলেন। তাহারা মনে করিল স্বয়ং দেবী ভবানী তাহাদের জীবন রক্ষার জন্য কারাগারে আর্বিভূত হইয়াছেন। রিয়াংগণ "মা, মা" রবে চিৎকার করিয়া মহারানীর পদমূলে পতিত হইল। মহারানী বলিলেন— তোমরা মাতৃ সম্বোধন দ্বারা সন্তানের স্থান গ্রহণ করিয়াছ। এখন মাতৃস্তন্য পান করিয়া সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও, কোনকালে তোমাদের পিতৃস্বরূপ ত্রিপুরেশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ করিবে না। অতঃপর স্বীয় স্তন্যপূর্ণ একটি পাত্র রিয়াংদের প্রধান সর্দারের হস্তে অর্পন করিলেন। রিয়াংগণ ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে সেই স্তন্য পান করিয়া মহারানীর অভিপ্রায়ানুরূপ প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইয়াছিল। অতঃপর মহারানী একখণ্ড প্রস্তর তাহাদিগের প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন যে " এই শিলাখণ্ড যতকাল স্থায়ী থাকিবে, ততকাল তোমাদের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ থাকিবে।"

" দণ্ডিতের সাথে, দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার" এখানে গোবিন্দ মাণিক্য কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার দিতে অপারগ রইলেন। দণ্ড দিলেন, তাঁর প্রাণ কাঁদল না। আমরা এই ঘটনা থেকে দেখলাম — (১) তিনি প্রতিহিংসা পরায়ণ; (২) মনে রাগ পোষণ করে রাখেন; (৩) তিনি ক্রোধী; এবং (৪) মস্তিষ্কের উষ্ণতা তাকে কখনো উন্মত্ত ও নিষ্ঠুর করে তোলে।

শিরচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ত-ই গোবিন্দ মাণিক্যের। যদি এই দণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হত? আমরা সপ্তদশ শতকে হয়তো আরো একটি রিয়াং প্রজা বিদ্রোহ দেখতে পেতাম। গোবিন্দ মাণিক্য সে-বিদ্রোহ হয়তো দমনে সক্ষম হতেন। আরো রক্তের বিনিময়ে তা করতে হতো। ঋষির রক্ত পিপাসা বেমানান হত না? আসলে যে দক্ষতার অভাব আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করলাম এর উৎপত্তি মূলে ক্রোধ। ঋষির তো ক্রোধ বেমানান। আবার সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষমতা এই অভিযোগই বা বাদ দেওয়া যায় কেমন করে? রিয়াংদের অপরাধ কি এতটাই গুরুতর ছিল যে প্রাণদণ্ডই হবে তার শেষ কথা? হয়তো তার সামন্ত অহমিকায় এতটাই আঘাত করেছিল যে রিয়াংরা তাঁর বেতনভুক কর্মচারীদের হেনস্তা করেছে তাঁর তা সহ্য হয়নি। তা বলে

এতটা? আসলে সামন্ত অহমিকা তাকে এতটাই উন্মত্ত করে দিয়েছিলেন কে তিনি বিচারশূন্য, মূঢ় হয়ে পড়েছিলেন। মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিয়ে রাজকীয় ক্ষমতা জাহির করতে চাইলেন। কিন্তু তার পরিণতি কী হতে পারে, ভাবলেন না। হ্যাঁ, রিয়াংদের প্রতি তিনি বিরক্ত কারণ তারা নিকট অতীতে নক্ষত্র মাণিক্যের দিকে ঝুঁকে ছিল। কিন্তু এই গোবিন্দ মাণিক্যই না তাঁর নিজের কোমরের খাপ থেকে তরবারি খুলে নিয়ে সিংহাসন লোভী নক্ষত্র মাণিক্যের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁকে বধ করে নক্ষত্রকে সিংহাসন দখলের পথ উন্মুক্ত করার জন্য! এই আচরণের সঙ্গে মানানসই হতো যদি উদ্ধত প্রজাদের মন জয়ের মাধ্যমে পথে আনার উদ্যোগ নিতেন। কিন্তু তিনি ভয় দেখিয়েই জয়ের সওদা করার শক্তিমানের চিরচারিত পথেই হাঁটলেন। পক্ষান্তরে তাঁর মহিষী গুণবতীকে মনে হয়েছে অনেক বুদ্ধিমতী। অনেক কৌশলী ও দক্ষ; কূটনৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন। কুটিল অথচ কী অনায়াসে রিয়াং প্রজাদের মন জয় করলেন তিনি। রাজর্ষি হয়েও গোবিন্দ মাণিক্য সামান্য ধৈর্য এবং কৌশল প্রদর্শনে ব্যর্থ রইলেন। যদি এর থেকে এই সিদ্ধান্তে কেউ পৌছেন যে, সামন্ত -মূঢ়তা নক্ষত্রের ন্যায় গোবিন্দ মাণিক্যের রক্তেও সমান প্রবাহিত তাকে কি তাতে আমরা বিচারমূঢ় বলব?

এই গোবিন্দ মাণিক্যকেই ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব একদিন চিঠি লিখলেন। দুই বংশের বন্ধুত্ব সুলভ নৈকটের জয় গেয়ে ঔরঙ্গজেব এক মস্ত দায়িত্ব তুলে দিলেন গোবিন্দ মাণিক্যের কাঁধে। কূটনৈতিক লেখার দুটি পাঠ থাকে। লাইনে সাজানো বর্ণমালার বক্তব্য। আর দুই লাইনের ফাঁকা অংশের না-লেখা সাদা অংশের বক্তব্য। গোবিন্দ মাণিক্য নির্বোধ নন; পারিবারিক বান্ধবের মনের কথাটিও তাঁর না-বোঝার কথা নয়। ঔরঙ্গজেব আমাদের আবার আরেক গোবিন্দ মাণিক্যকে চিনিয়ে দিলেন। বিশ্লেষণের আগে গোবিন্দ মাণিক্যকে লেখা চিঠিখানা দেখে নিতে হয়। ফার্সী ভাষায় লেখা এই চিঠি যখন লেখা হয় তখন ঔরঙ্গজেব ভাই সুজাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছেন। সুজাও মুঘল সিংহাসন দখলের খেলায় ঔরঙ্গজেবের হাতে ক্রীড়নক হয়ে পরে ঔরঙ্গজেবের বিশ্বাসঘাতকতায় সব আশা বিসর্জন দিয়ে কেবলমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকতে পালাচ্ছে। সুজা সসৈন্যে ছুটছিল দিল্লীর দিকে। ঔরঙ্গজেব তার পথরোধ করে এলাহাবাদে। এলাহাবাদ যুদ্ধে সুজার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ঔরঙ্গজেবের কাছে পরাস্ত হয়ে মুঙ্গের রাজমহল হয়ে ঢাকায় থিতু হতে চান। পিতা শাজাহানের সময়ে তিনি বাঙ্গলার শাসনকর্তা ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি মীরজুম্লা সসৈন্যে ঢাকার পথে খবর পেয়ে সুজা এবার সত্যিই নিরুপায়। ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে ঔরঙ্গজেবের ভয়ে পালিয়ে যান আরাকানে। ঔরঙ্গজেব চাইছিলেন আরাকান পৌছানোর আগে গোবিন্দ মাণিক্য সুজাকে বন্দী করে ঔরঙ্গজেবের জিম্মা করে দিক। চিঠির উপলক্ষ্য ও বিষয়বস্তু ছিল তাই।

গোবন্দি মাণিক্যকে লেখা ঔরঙ্গজেবের চিঠি।

অতুলনীয় উচ্চকুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বিষম সময়-বিজয়ী মহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত মহারাজা গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুর — আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গলে রক্ষা করুন।

আমি সুনিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি যে, আমার চিরশত্রু সুজা, ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পূর্ব-পুরুষের সম্মানিত মহোদয়গণের সহিত আপনার গৌরবান্বিত পূর্ব-পুরুষগণের পরস্পর আত্মীয়তা ও প্রণয় থাকা বশতঃ আমাদিগের সহিত বিবাদে লিপ্ত

দুর্ভাগ্য আফগানেরা ভবদীয় রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলে আপনার মহামান্য পূর্ব-পুরুষগণ অসিপ্রহারে যেরূপ সেই দুষ্ট আফগানদিগকে বঙ্গদেশে বিতারিত করিতেন, বর্তমানে আমিও তদ্রুপ আশা করি।

আমার লিখানুসারে আপনি উক্ত শত্রু সুজাকে ধৃত করিয়া সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করেন। যদি আপনার অভিমত হয় তবে আমার সেনাপতিকে মুঙ্গেরে অপেক্ষা করাইব। তাহাকে ধৃত করিবার পর আপনার সেনাপতির রক্ষণাবেক্ষণে সাবধানে প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন— যেন প্রাচীন বন্ধুতা স্থায়ী রহে।

নতুবা ইহা নিশ্চয় জানিবেন — আপনার রাজ্যে উক্ত অপরিণামদর্শীর অবস্থান করার জন্য ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পর মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য হইবে।

আমার লিপি অনুসারে কার্য হইবে বলিয়া আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।"

ঔরজেবের চিঠির তিনটি অংশ। সম্বোধনের মাধ্যমে গাছে তুলে দেওয়া, অনেকটা স্তুতির মতন শোনায়। তারপর প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। এবং সর্বশেষে তুলে আছাড় দেবার হুমকি।

এখন দেখার, ঔরঙ্গজেবের চিঠির বিষয়ে গোবিন্দ মাণিক্য কীরূপ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। প্রথমত, ঔরঙ্গজেবের ঐ চিঠির কোন জবাব দিয়েছিলেন কি না, দিয়ে থাকলে ভাষা ও বক্তব্য কেমন ছিল, তা জানা যায়নি। তবে এই চিঠি প্রাপ্তির পরের গোবিন্দ মাণিক্যের কতিপয় আচণের সঙ্গে আমরা পরিচিত – ঐ সব কার্যাবলী থেকে ঔরঙ্গজেবের চিঠির উপর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তার আঁচ করা যায়।

সুজার সঙ্গে গোবিন্দ মাণিক্যের অতি-হৃদ্যতার কোন দৃশ্যত কারণ নেই। পিতা কল্যাণ মাণিক্যের সময়ে সুজা একাধিকবার ত্রিপুরা আক্রমণ করেছে, ধন্য মাণিক্য সুজার আক্রমণ প্রতিহত করেন। কিন্তু সুজা সংযত না হয়ে ধন্য মাণিক্যকে বার বার উত্যক্ত করেছেন। সুলতান সুজার বাঙ্গলা শাসনকালে (১৫৮০ শকাব্দে) সুবে বাংলার যে সংশোধিত রাজস্বের হিসাব তাতে " সরকার উদয়পুর" সংযুক্ত ছিল। অর্থাৎ ত্রিপুর রাজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় হত। এর থেকে যে সিদ্ধান্তে পৌছানো যায় তা হল, কোন এক পর্যায়ে কল্যাণ মাণিক্য মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই হেন পিতৃশত্রু সুজার সঙ্গে গাঢ় সখ্যতা প্রায় অসম্ভব। অধিকন্তু গোবিন্দ মাণিক্য নিজেও " কিয়াৎ পরিমাণে মুঘল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন — কৈলাশ সিংহ।" এহেন সুজা কী করে গোবিন্দ মাণিক্যের বন্ধু হয়? এবং সর্বোপরি অনুজ নক্ষত্র মাণিক্য সুজার সৈন্যবলে বলীয়ান হয়েই গোবিন্দ মাণিক্যকে ১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। গোবিন্দ মাণিক্যের তা ভুলে যাওয়ার কথা নয়। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের হিসাবের খাতায় এই সব তথ্য ছিল। ছিল বলেই ঔরঙ্গজেব ভেবেছিলেন সুজা গোবিন্দ মাণিক্যের শত্রু, কাজেই সুজাকে হেনস্তা করার সুযোগ বা অনুরোধ গোবিন্দ মাণিক্য নষ্ট করবে না। অধিকন্তু, প্রবল শক্তিশালী ঔরঙ্গজেবের উপসংহার "ভবিষ্যতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ও মনোমালিন্য সংঘটিত হইবে" এই সতর্কবাণী অন্তত কাজ করবে ঔরঙ্গজেবের পক্ষে, এমনটা ভাবাই স্বাভাবিক।

তবে এই চিঠির আরো একটি দিক রয়েছে। ঐ চিঠির সম্বোধন পর্বের ভাষায় গোবিন্দ

মাণিক্যকে তুষ্ট করার যেমন চেষ্টা রয়েছে তেমনি গোবিন্দ মাণিক্যের শৌর্য বীর্য, মান্যতা ও বিশিষ্টতার স্বীকৃতি রয়েছে, তৎসঙ্গে ত্রিপুর রাজ্যের গুরুত্ব ও বিশিষ্টতা। এত দীর্ঘ প্রশস্তি কেবল চাতুর্যের নিদর্শন তা যুক্তিসঙ্গত নয়। সহজ কথায় মান্যবরকেই ঔরঙ্গজেব সম্মান জানাচ্ছেন কিন্তু তার সামন্ত অহমিকা ও শক্তি-দম্ভ ও বেশ জাগ্রত।" আল্লাতালা আপনার রাজ্য সুমঙ্গলে রক্ষা করুক", প্রশস্তির পরেই এই প্রচ্ছন্ন হুমকি ঐ দম্ভেরই প্রকাশ।

এই চিঠি পাওয়ার পর যা করলেন গোবিন্দ মাণিক্য তা হল — (ক) সুজাকে বন্দী করার কোন উদ্যোগ নিলেন না। সুজা অবশ্য সেই সময়ে ত্রিপুরা সীমান্ত দিয়ে আরাকানে চলে যান। কিন্তু একটি সংশয় তা হল সুজা আরাকান পলায়নের সময় গোবিন্দ মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে ছিলেন কি না? কৈলাশ সিংহ লিখেছেন " সিংহাসনচ্যুত ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য চট্টগ্রামের পূর্ব দিগন্ত পার্বত্য প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। তিনি চট্টগ্রামের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার বেউন সাহেবের বরাত দিয়েছেন — "Far in the jungles on the bank of the Myance, an offluence of the kassalong river, are found tanks, fruit-trees and remains of the masonary building -evidence that at some bygone period. The land here was cultivated and in habited by men of the plains. Tradition attributes this ruins to a former Raja of Hill Tipperach, who, it said, was driven from that of the country". সুজা ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী রাঙামাটি হইতে পর্বত শ্রেণী অতিক্রম করত গোবিন্দ মাণিক্যের বাসভবনে উপনীত হন। গোবিন্দ সুজাকে অতি আদরে গ্রহণ করলেন এবং তিনি তাহাকে যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। বিদায়কালে সুজা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ স্বীয় ব্যবহার্য 'নিমচা' তরবারী ও একটি হীরকাঙ্গুরীয় গোবিন্দ মাণিক্যকে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।" তা হলে ঔরঙ্গজেবের চিঠি ঠিক কোন সময়ের লেখা? দেখা যাচ্ছে সুজা যখন গোবিন্দ মাণিক্যের সাক্ষাতে তখন গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনচ্যুত এবং আত্ম গোপনে। তবে বেউন সাহেবের বর্ণিত বাড়িটিই গোবিন্দ মাণিক্যের বাসস্থান যদি হয়ে থাকে – রত্ন কন্দলীরা যে লিখলেন রাজ্যের উচ্চপদাধিকারীরা গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রক্ষা করতেন, পরামর্শ করতেন, নক্ষত্র মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করার ষড়যন্ত্র করতেন; তবে কি এরা পার্বত্য চট্টাগ্রামের ঐ ডেরাতে আসতেন ষড়যন্ত্র পাকাতে? তা অমূলক ও অবাস্তব। সুতরাং এটিই যথার্থ হবে যে, রাজধানীর নিকটবর্তী কোথাও গোপন আবাসেই গোবিন্দমাণিক্য আত্মগোপন করেছিলেন এবং সুজার সঙ্গে সেই গোপন আবাসেই গোবিন্দ মাণিক্যের সাক্ষাৎ হয়েছিল। কিন্তু তাও কী করে সম্ভব? সুজার এই আগমন নক্ষত্র মাণিক্যের অগোচরে তাহলে হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সুজা আশ্রয় চাইতে আত্মগোপন কারী, পলায়নরত সিংহাসনচ্যুত শক্তিহীন এক ভাগ্যাহতের কাছে সাহায্য চাইবেন কেন? আর সৌজন্য সাক্ষাৎকারের তো অবকাশই নেই, শত্রু তখন সুজার পশ্চাতে, এই সময়ে তার প্রয়োজন কার্যকরী সহায়তার, নিছক ভদ্রতা রক্ষার সময় কোথায়?

বিষয়টি মনে রাখতে হবে যে, গোবিন্দ মাণিক্য নক্ষত্র মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করেছিলেন। এরজন্যে তাকে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। মন্ত্রবলে তা হয়নি বা অনুকম্পা বা অনুশোচনা বশত নক্ষত্র মাণিক্য সিংহাসন শূন্য করে গোবিন্দমাণিক্যকে সিংহাসনে বসান নি। সিংহাসন

পুনরুদ্ধারে সাম্ভাব্য দুটি পথের যেকোন একটি তাঁকে গ্রহণ করতে হয়েছিল। হয় শক্তি সঞ্চয় করে যুদ্ধে পরাস্ত করে নক্ষত্র মাণিক্যকে ক্ষমতাচ্যুত করা – পার্বত্য চট্টগ্রামে আত্মগোপন করে তিনি এই বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন এমন উল্লেখ কোথাও নেই। আবার ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রাসাদবিপ্লব সংগঠিত করা যোগাযোগরহিত দূরত্বে ও দুর্গম প্রদেশে অবস্থান করে তাও সম্ভব নয়। তাহলে দ্বিতীয় পন্থা হল প্রাসাদবিপ্লব। ষড়যন্ত্র ,এবং রাজধানীর নিকটবর্তী কোথাও অবস্থান করা। যার কথা রত্ন কন্দলী শর্মা, অর্জুন দাস বৈরাগীরা বলেছেন এবং নিশ্চিতভাবেই প্রাসাদবিপ্লবে নক্ষত্র মাণিক্য নিহত হন এবং যথাযত ভাল সম্মান প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসনে বসেন। এই সম্ভাবনা সর্বাধিক নয়, একমাত্রই হবে। সুতারাং ঔরঙ্গজেব যথাযথ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিকেই চিঠি লিখেছেন। আর সুজার সাক্ষাৎ করাটা সিংহাসনা রূঢ় গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গেই ঘটেছিল, তা না হলে তিনি সুজাকে " যথোচিত সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই"— তা কি করে সম্ভব? যার কোন ভবিষ্যৎ নেই, ফের রাজা হতে পারবেন কি না তার নিশ্চয়তা নেই তাকে সুজা বহু মূল্যবান নিমচা তরবারি আর হীরার আংটি দিয়ে গেলেন!

রত্ন কন্দলীদের বিবরণীতে সুজার উল্লেখ নেই। এব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ তাদের কর্ম দিশায় আবশ্যিকও ছিল না। কিন্তু রাজ পরিবারের হালহকিকৎ জানা প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে তাদের উপস্থিতিতে রত্ন মাণিক্য, চম্পকরাই হত্যা অর্থাৎ সিংহাসন কেন্দ্র করে দুটি হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। নিরন্তর সিংহাসন দখলে ষড়যন্ত্র চলছে। সুতরাং, এব্যাপারে ইজা টানার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া রত্ন মাণিক্যকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণে গোবিন্দ মাণিক্যের প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছিল। কথাটা ছিল গোবিন্দ মাণিক্যকে জীবিত রাখাতেই নক্ষত্র মাণিক্যকে সিংহাসন হারাতে হয়েছিল। সুতরাং, ঘনশ্যাম তথা মহেন্দ্র মাণিক্যের প্রতি পরামর্শ ছিল, " শত্রুর শেষ রেখো না, তাকে নিকেষ কর" এই যুক্তিই মহেন্দ্র মাণিক্যকে সিদ্ধান্তে নিয়ে যায়। রত্ন মাণিক্যকে হত্যা করা হল। মহেন্দ্রের সিংহাসন নিষ্কন্টক করলেন। এই সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর নিকট অতীতের পরম্পরা স্বাভাবিকভাবেই তারা জানতে চাইবেন। যুক্তি-তথ্য দিয়ে চূড়ান্ত সত্য কেউই উদ্ধার করেন নি। রত্ন কন্দলীরাও আনুষঙ্গিক বিবরণ হিসেবে গোবিন্দ -নক্ষত্রকে উল্লেখ করেছেন। তারা বর্তমান ঘটনার সঙ্গে অতীতের উদাহরণ টেনেছেন। এবং ঘটনাগুলি সদ্য অতীত হলেও টাটকা। সুতরাং সত্যের সব চাইতে নিকটে পৌছতে পেরেছিলেন রত্নকন্দলী শর্মা, অর্জুন দাস বৈরাগীরাই। সুতরাং বেউন সাহেবের পার্বত্য চট্টগ্রামে ভগ্নবাড়ির চাক্ষুষ সাক্ষ্য এবং তাকে কেন্দ্র করে জনশ্রুতির ত্রিপুরার রাজাদের রাজবাড়ি এবং নিশ্চিতভাবে এটিই গোবিন্দ মাণিক্যের সিংহাসনচ্যুত অবস্থায় গোপন আস্তানার, এর নিশ্চয়তা নিয়ে সংশয় জাগে।

সংশয় এই কারণে যে, গোবিন্দ মাণিক্যের প্রথম সিংহাসন লাভের পর বা নক্ষত্র মাণিক্যের রাজত্বকালে চট্টগ্রামের উপর ত্রিপুরার রাজাদের শাসন প্রভাব ছিল না। মহারাজ বিজয় মাণিক্যই সর্বশেষ চট্টগ্রামের উপর ত্রিপুরার আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন। বিজয় মাণিক্য সম্পর্কে কৈলাশ সিংহ লিখেছেন " তিনি চট্টগ্রাম উদ্ধারের জন্য স্বীয় বাহুবল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। মগ ও মুসলমানদিগকে জয় করিয়া বিজয় মাণিক্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন।

এই যুদ্ধকালে এক সহস্র পাঠান অশ্বারোহী কোন কারণে বিদ্রোহী হইয়া রাজার (বিজয় মাণিক্যের) প্রাণনাশপূর্বক রাজধানী অধিকারের চেষ্টা করে। মহাবীর বিজয় মাণিক্য স্বয়ং রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও কতগুলিকে জীবিত অবস্থায় বদ্ধ করিয়া চতুর্দশ দেবতার নিকট বলি প্রদান করেন।" তারপর চট্টগ্রাম আবার মগদের দখলে চলে যায়। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে লিখেছেন "চট্টগ্রাম বন্দর মগ রাজার অধিকার ভুক্ত।" আবার মহারাজ বিজয় মাণিক্যের যে বৎসর মৃত্যু হয় (৯৯৩ ত্রিপুরাব্দ; ১৫৬৩ খ্রিঃ)" সেই বৎসর রলফ্ ফিছ চট্টগ্রামে গমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন "সাতগাঁও হইতে আমি ত্রিপুরেশ্বরের রাজ্যের মধ্য দিয়া চট্টগ্রামে গমন করিয়াছিলাম, রাক্ষিয়াং ও রামুবাসী মগদিগের সহিত ত্রিপুরেশ্বর অবিরত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ত্রিপুরাধিপতির দুর্বলতায় চট্টগ্রাম বারংবার রাক্ষিয়াং রাজার হস্তগত হয়। (রাফিয়াং মানে মগ রাজা)।"

বিজয় মাণিক্যের পর রাজা হলেন অনন্ত মাণিক্য, এর পর যারা সিংহাসনে বসেন তারা যথাক্রমে উদয় মাণিক্য, জয় মাণিক্য। রাজমালায় দেখা যাচ্ছে এই দুই নৃপতির সময়ে " ত্রিপুরার রাজ্য সীমা বিশেষ রূপে খর্ব হইয়াছিল।" তারপরে এলেন অমর মাণিক্য, রাজধর মাণিক্য, যশোধর মাণিক্য, তারপর কল্যাণ মাণিক্য, এই কল্যাণ মাণিক্যের পুত্রই গোবিন্দ ও নক্ষত্র তথা ছত্রধর। ঐ সময়ের মধ্যে অমর মাণিক্যকে বিশেষ আলোচনায় আনতে হয়। তিনি আরাকানের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন কিন্তু মগ উৎপাতদমনে তার ছেলেদের পাঠালেন, কিন্তু "কুমারদিগের মধ্যে ঐক্য না থাকায় তাহারা সহজেই পরাজিত হইয়া দুই কুমারই সসৈন্যে পলায়ন করিলেন। একজন স্বীয় বাহন হস্তীর পদপিষ্ট হইয়া নিহত হইলেন। মগেরা পলায়িত ত্রিপুর কুমারদের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। কুমারেরা নিতান্ত অপমানিত বোধ করিয়া পুনরায় মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। সেবারও তাহারা অশ্বারোহীগণের অবাধ্যতায় পরাজিত হইলেন। মগেরা রণমদে মত্ত হইয়া ত্রিপুর সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিয়া অবশেষে রাজধানী উদয়পুরে উপস্থিত হইল। অমর মাণিক্য নিতান্ত ভীত হইয়া মনু নদীতীরস্থ তেতৈয়া নামক স্থানে পলায়ন করিলেন।" মগেরা উদয়পুর লুণ্ঠন করে গেল। অমর মাণিক্যের পৌত্র যশোধর মাণিক্যও মগদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছিলেন। মগদের সঙ্গে সংঘাত কালেই মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দাবি মতন হাতি, অশ্ব ও রাজকর দিতে অস্বীকার করায় মুঘলরা ত্রিপুরা আক্রমণ করে। মুঘল সৈন্য তাকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যায়। তিনি আর ত্রিপুরায় ফেরেননি। তীর্থ পর্যটনকালে ৭২ বৎসর বয়সে বৃন্দাবনে প্রাণ ত্যাগ করেন। অনুমানে বলা যায় চট্টগ্রাম মগেদের নিয়ন্ত্রণেই রয়ে গেল, ত্রিপুরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

এবার গোবিন্দ মাণিক্যের পিতা কল্যাণ মাণিক্যের সময়ের পরিস্থিতি। কৈলাশ সিংহের " রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস" - এ তিনি লিখেছেন " ইদানীন্তন ভূপতিগণ মধ্যে কল্যাণ মাণিক্য একজন পরাক্রান্ত ও বলশালী নরপতি ছিলেন। কিন্তু অমর মাণিক্যের পুত্রগণ আরাকান যুদ্ধে একটি মুকুটের জন্য বিরোধ করিয়া যে ক্ষতি করিয়া গিয়াছেন, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পূর্বেই ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা খর্বাকৃতি হয়। পশ্চিম দিকে মুসলমানগণ অনেকগুলি পরগনা দখল করিয়া তাহা স্থায়ীরূপে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।" দক্ষিণ দিকের মধ্যে মগ অধ্যুষিত পার্বত্য চট্টগ্রাম অন্তর্ভুক্ত।

এই ঘটনা প্রবাহ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, গোবিন্দ মাণিক্যের পিতৃদেব কল্যাণ মাণিক্যের মৃত্যুকালেও চট্টগ্রাম ত্রিপুর - নিয়ন্ত্রণের বাইরে এবং শত্রুভাবাপন্ন রাজ্য। গোবিন্দ মাণিক্য কোন ভরসায় শত্রুপুরীতে নিজেকে নিরাপদ মনে করবেন? তাহলে এই সিদ্ধান্তে স্থির হতে হয় যে, (১) গোবিন্দ মাণিক্য ছত্র মাণিক্যের রাজত্বকালে রাজধানী নিকটবর্তী কোথাও ছিলেন; (২) সুজার সঙ্গে গোবিন্দ মাণিক্যের সাক্ষাৎকার গোবিন্দ মাণিক্যের অনুকূল সময়ে।

শত্রুপক্ষের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে নক্ষত্র মাণিক্যকে সিংহাসনচ্যুত করার উদ্যোগ নিয়েছিলন এমন কথা কোথাও নেই। এই ক্ষেত্রে দুর্বল মগদের চাইতে সবল ঔরঙ্গজেব অনেকবেশি কাঙ্ক্ষিত হওয়ারই কথা। তবে এব্যাপারে গোবিন্দ মাণিক্যের বয়ান (রাজমালায়) নেই। আবার ইতিহাস লেখকেরাও নিরুত্তর থেকেছেন। গোবিন্দ মাণিক্য সিংহাসন পুনরুদ্ধারে ঔরঙ্গজেব কেন, কোন শক্তিকেন্দ্রেই ধর্না দেননি। সিংহাসন পুনরুদ্ধারে শক্তি প্রয়োগও মাঝে যুদ্ধও করেননি।

সিদ্ধান্তে আসতে চাইছিলাম (১) সিংহাসনচ্যুত গোবিন্দ মাণিক্য আত্মগোপনে চট্টগ্রামে ছিলেন কি না, যেমনটা কৈলাশ সিংহ অনুমান করেছেন চট্টগ্রামের এক সময়ের ডেপুটি কমিশনার বেউন সাহেবের বরাতে। (২) সুজা গোবিন্দ মাণিক্যের কোন অবস্থায় গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন? অনুসন্ধান দুটি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। সব চাইতে দূরে অবস্থান করলেও গোবিন্দ মাণিক্যের সমসাময়িককালের দিল্লীর বাদশা ঔরঙ্গজেবকে সাক্ষী মানতে পারি যদিও তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী নন।

ঔরঙ্গজেব তার চিঠিতে গোবিন্দ মাণিক্যকে লিখেছেন " আমি নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছি আমার চিরশত্রু সুজা ভবদীয় রাজ্যে গোপনে অবস্থান করিতেছেন।" অর্থাৎ ত্রিপুর রাজ্যের মালিক গোবিন্দ মাণিক্যই; সিংহাসন তার পুনঃপ্রাপ্তি হয়েছে। চিঠির সম্বোধনও এখানে বিবেচনায় আনতে হবে " অতুলনীয় উচ্চকুলোদ্ভব সৌভাগ্যবান রাজ্যেশ্বর বিষম সমর বিজয়ী মহোদয় পঞ্চ শ্রীযুক্ত গোবিন্দ মাণিক্য বাহাদুর" একজন সিংহাসনচ্যুত দুর্ভাগ্যতাড়িত ক্ষমতাহীন রাজপুত্রকে ঔরঙ্গজেব কেন বাছাবাছা বিশেষণে "রাজ্যেশ্বর" বলে সম্বোধন করবেন? আর ক্ষমতাচ্যুত ব্যক্তির কাছে তিনি যাঞ্চাই বা করতে যাবেন কেন? সুতরাং, রাজ্যচ্যুত নয়, রাজা গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গেই সুজার সাক্ষাৎ সম্ভাবনা ঝুঁকে থাকে। গোবিন্দ মাণিক্যের বহু পুরুষ আগে চট্টগ্রাম ত্রিপুর রাজাদের অধীন ছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে এর অধিকার নিয়ে মগেদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বিরোধের দৌড় চূড়ান্ত পর্যায়ে। গোবিন্দ মাণিক্যের পিতার আমলেই ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমা হাত ছাড়া কৈলাশ সিংহ বান-ডিন- ব্রোক কৃত এক মানচিত্রের উল্লেখ করে বলেছেন — " কোডাবাসকাম নামে ঐ মানচিত্রে যে রাজ্যটি, তা আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যবর্তী, এবং এটিই পার্বত্য চট্টগ্রাম (পৃঃ ৬৬) ।" তাহলে বেউন সাহেব পার্বত্য চট্টগ্রামে রাজ আবাসের ভগ্নাবশেষ দেখেছেন তা বহু প্রাচীন সময়ের কোন পূর্বতন ত্রিপুর রাজের অস্থায়ী আবাসের ভগ্নাবশেষ।

আসলে ঠিক কোথায় গোবিন্দ মাণিক্যের সঙ্গে সুজার সাক্ষাৎ হয়েছিল তা নিয়েও বহুমত। কেউ বলেছেন বেউন সাহেবের দেখা পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বেচ্ছা নির্বাসিত আবাসে। আবার কৈলাশ সিংহ একটি ভিন্নমতও দিয়েছেন " আরাকানের রাজসভায় গোবিন্দ মাণিক্যের সহিত

সুজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল।" অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এর কোনটাই সত্য নয়। ঔরঙ্গজেবই সত্য ধারণ করে রয়েছেন। তখন সিংহাসনে নক্ষত্র মাণিক্য থাকলে সুজা তাঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ করে আরাকান পলায়নে সাহায্য চাইতেন। মানুষ তো ক্ষমতাবানের কাছেই যাঞ্চা করে। আত্মগোপনে থাকার সময়ে গোবিন্দ মাণিক্যেরই তো প্রাণ সংশয়, তার নিজেরই সাহায্যের প্রয়োজন।

গোবিন্দ মাণিক্য কিন্তু ঔরঙ্গজেবের চিঠি অনুসারে কাজ করেননি সুজাকে হেনস্তা করার কোন উদ্যোগও নিলেন না। পক্ষান্তরে " উজাগঞ্জ" গ্রামে, কুমিল্লার কাছে সুজা মসজিদ নির্মাণ করলেন। গোবিন্দ মাণিক্য " সুজার নির্মচা তরবারী ও হীরার আংটি বিক্রয় করিয়া বহু অর্থ ব্যয়ে সুজা মসজিদ নির্মাণ করাইয়া ছিলেন (কৈলাশ সিংহ ৬৮ পৃঃ)।"

সঠিক সময়ে কেউ উল্লেখ করেননি বলে হতে পারে, ঔরঙ্গজেবের চিঠি প্রাপ্তির আগেই সুজা ত্রিপুরা অতিক্রম করে আরাকান চলে গিয়েছিলেন। সুতরাং, পাখি খাঁচা ছাড়া। কিন্তু সুজা মসজিদ নির্মাণ তো তার পরের ঘটনা। সুতরাং, গোবিন্দ মাণিক্য, ঔরঙ্গজেবের প্রচ্ছন্ন হুমকিকে উপেক্ষা করেছেন। সার্বভৌম, স্বাধীন নৃপতির মতনই স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এখানে আমরা বীর্যবান গোবিন্দ মাণিক্যের পরিচয় পাই।

সুজা কাহিনী বাদ দিলে রাজাদের রুটিন কাজ, জলাশয় খনন, মুদ্রা প্রচলন, নিজ নামে কোন স্থানকে নবনামকরণ, গ্রাম পত্তন, মন্দির নির্মাণ তা দুই ভাইই নিজেদের শাসনদৈর্ঘ্যের অনুপাতে কম-বেশি তা করেছেন। গোবিন্দ মাণিক্য বেশি সময় রাজত্ব করেছেন। সুতরাং সংখ্যায় তিনি এগিয়ে।

তবে যে দুটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে তাহল — (১) নক্ষত্র মাণিক্য, তাঁর উপযুক্ত পুত্র 'উৎসব রায়' থাকা সত্ত্বেও তার পরবর্তী সিংহাসন প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কোন উদ্যোগ নেননি। নিশ্চয়ই সময়ের অপেক্ষা করেছেন। তবে কি মৃত্যু তাঁর জীবন আকস্মাৎ চলে এসেছিল? উৎসব রায়ও নক্ষত্র রায়ের পরিবার রাজধানী থেকে পালিয়ে গেলেন আত্মরক্ষার তাগিদে; কেন তা হল? (২) গোবিন্দ মাণিক্যের সিংহাসন আসক্তি ও রাজ্যলোভ ছিল। তিনি সিংহাসন রক্ষার এবং সিংহাসন পুনঃপ্রাপ্তির জন্যে যুদ্ধ-ও ষড়যন্ত্র করেছেন। নক্ষত্র মাণিক্যের হাতে তরবারিও তুলে দেননি । তাহলে কোথায় আমরা রাজর্ষির সন্ধান করব?

এবার গোবিন্দ মাণিক্যের নিজের মূল্যায়ন — " অলৌকিক কার্যের অনুষ্ঠাতা শ্রীশ্রী কল্যাণ মাণিক্য দেবের ইন্দুমতাতুল্যা সহরবতা নামে মহির্ষী ছিলেন। ইন্দ্রপত্নী শচী যেরূপ জয়ন্তকে প্রসব করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্র দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণা যেরূপ রঘুকে প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ কল্যাণ মাণিক্য পত্নী, গোবিন্দ ও জগন্নাথ নামক অতি তেজস্বী দেবতুল্য দুইটি পুত্র প্রসব করেন। তাহাদের মধ্যে চন্দ্রকূলভূষণ, সজ্জনাগ্রগণ্য মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্য দেব জেষ্ঠ্য এবং বীরশ্রেষ্ঠ জগন্নাথ কনিষ্ঠ ছিলেন। শ্রীশ্রী গোবিন্দ দেব বীর, মন্ত্রণানিপুণ ও তেজস্বী ছিলেন।" উদয়পুরে জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ করে, মন্দিরে গেঁথে দেওয়া প্রস্তর ফলকের লিপি উদ্ধার হয়। নিশ্চয়ই গোবিন্দ মাণিক্যের অনুমোদনে স্ব-মূল্যায়নই তো!

ডাইনী ও কৃতদাসী

"রত্ন মাণিক্যের পত্নীগণ তাঁহার (রত্ন মাণিক্যের) মৃতদেহ সম্মুখে রাখিয়া ঈশ্বরের নামগান করিতে লাগিলেন। রত্ন মাণিক্যকে বধ করিয়া সেই চারিজন লোক গেয়া এই খবর মহেন্দ্র মাণিক্যকে জানাইল। রাত্রি প্রভাত হইলে রাজা, যুবরাজ, চন্দ্রমণি বড় ঠাকুর ও অন্যান্য বড় লোকদিগকে ডাকাইয়া আনিলেন। এবং ব্রাহ্মণও আনাইলেন। রাজা তাহাদের সকলকে বলিলেন — "রত্ন মাণিক্যের মৃত্যু হইয়াছে এখন তাঁহাকে দাহ করিবার ব্যবস্থা কর।" তারপর গোমতী নদীতীরে মুক্তিঘাটে রত্ন মাণিক্যের জন্য চিতা প্রস্তুত করাইয়া দিলেন। (রত্ন কন্দলী ও অর্জ্জুন দাসের বর্ণনার বঙ্গানুবাদ, ত্রিপুর চন্দ্র সেন, পৃঃ ৯৫)।

মহেন্দ্র মাণিক্য রত্ন মাণিক্যের মৃতদেহ মুক্তিঘাটে (শ্মশানে) আনবার জন্য যুবরাজ চন্দ্রমণি বড় ঠাকুর, ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের পাঠালেন। এঁরা রত্নমণির জন্য বিস্তর কান্নাকাটি করল। চন্দ্রমণি ঠাকুর শবদেহের পায়ে পড়ে " আজ আমার পিতৃ বিয়োগ হইয়াছে " বলে কাঁদলেন। যুবরাজ চন্দ্রমণি ঠাকুরও বিলাপ করলেন। কিন্তু যার আদেশে হত্যা সেই মহেন্দ্র মাণিক্য যখন শবদাহের অন্তি যাত্রার রাজকীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত। তাঁর কান্নাকাটির বিলাপের সময় কোথায়? মৃত রাজার স্বর্গারোহণের ব্যবস্থা আর নিজের সিংহাসন সুরক্ষা এবং লোকনিন্দার ভয়কে তাড়াবার জন্যে বৃষোৎসর্গের বন্দোবস্তে তাঁর মন তখন।

রত্ন মাণিক্যের পত্নীরা সতী হবেন। তারা বললেন —" এখন তোমরা অস্থির হইলে লাভ কি? তোমাদের অদৃষ্টে যাহা ছিল তাহা হইয়াছে এখন আমাদের সদ্গতি যাহাতে হয় তাহার উপায় চিন্তা কর (ঐ)।"

সব প্রস্তুত হলে রত্ন মাণিক্যের শব-খাট কাঁধে তুলে নেওয়া হল। " সেই খাটে রত্ন মাণিক্যের মহিষী বসিয়া শবের উপরে চামর দোলাইতে লাগিলেন। মৃতরাজার অন্যান্য পত্নীগণকে ভিন্ন ভিন্ন দোলায় উঠাইয়া শবের দুই দিকে লইয়া যাওয়া হইল। তাহারা দোলায় উঠিয়া ঈশ্বরের নামগান করিতেছিলেন। এবং আধুলি, সিকি, আনি, দু'আনি এবং আধআনি বিলাইতেছিলেন। খৈ, ফুল ইত্যাদি ছিটাইতে ছিলেন। শবের সম্মুখে ব্রাহ্মণগণ শঙ্খ-ঘণ্টা বাজাইয়া যাইতেছিলেন। বাদ্যকরেরা বাদ্য বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছিল, হাতি, ঘোড়াও সঙ্গে গিয়াছিল। যুবরাজ ইত্যাদি তালেবর লোকেরা খালিপায়ে মৃতের সঙ্গে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন। রত্ন মাণিক্যকে বধ করা ইহয়াছে শুনিয়া নগরের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষেরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শবের সঙ্গে চিতার জায়গায় যাইতেছিল। যাহারা ঘরে রহিল তাহারাও কাঁদিতেছিল।" মহেন্দ্র মাণিক্যও জনসমক্ষে এবার চোখের জল ফেললেন। কর্তব্যের তাড়না বা প্রজাতুষ্টি – কে জানে কীসের তাগিদ? হতে পারে বা অপরাধকে লঘু করে দেওয়ার রাজকীয় কূট কৌশল।

রত্ন মাণিক্যের বিমাতা চন্দ্রমণি ঠাকুরের মা রত্ন মাণিক্যের পত্নীদের শাশুড়ী রত্ন মাণিক্যের বিধবাদের প্রবোধ দিলেন। বধূদের বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে বললেন — " তোমরা ভাগ্যবতী। স্বামীর সঙ্গে যাও।" এ হল রত্ন কন্দলী আর অর্জুন দাসদের চোখে দেখা "

সতী"দের বিবরণ। রত্ন মাণিক্যের বিধবারা সতী হলেন।

ওথেলো হাতের কল্পিত রক্তচিহ্ন মুছে ফেলে কেবল অনবরত হাত ধুয়ে অবচেতনের পাপ থেকে মুক্তির উপায় খুঁজছিলেন। মহেন্দ্র মাণিক্য, আত্মপ্রবোধের জন্য এক হাজার টাকার সিকি-আধুলি বিলালেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে স্বর্ণ বিলালেন। রত্ন মাণিক্যের চিতার উপর মঠ তৈরী করালেন। মৃতের আত্মার মুক্তির জন্য পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করলেন এবং পরিশেষে রাজ বংশীয় " হরিধন ঠাকুরের পুত্রকে পাঠাইয়া" গয়ায় পিণ্ডদান ও জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে এক হাজার টাকা ব্যয় করে ভোগ দিলেন। ব্রাহ্মণদের পর্যাপ্ত দক্ষিণা দিলেন।

রত্ন কন্দলীরা রাজ পরিবারেই দ্বিতীয় সতীদহরও উল্লেখ করেছেন। রত্ন মাণিক্য যখন চম্পক রাইকে হত্যা করে তখন " চম্পক রাইয়ের পত্নীগণ সহমরণে যাইবার জন্য রাজার (রত্ন মাণিক্যের) অনুমতি চাইলেন। তিনিও ঐ মুক্তিঘাটেই চিতা তৈয়ার করে সহগামী পত্নীদের সঙ্গে চম্পক রাইয়ের মৃতদেহ সৎকার করিয়ে ছিলেন। গঙ্গাতে অস্থি বিসর্জন ও গয়াতে পিণ্ডদানেও পিছিয়ে ছিলেন না।"

সহমরণ বা সতীদাহ রাজ পরিবারে মাত্র ঐ দুটি নয়। রাজমালার দ্বিতীয় লহরে উল্লেখ আছে ধন্য মাণিক্যের পট্টমহির্ষি মহারানী কমলাদেবী পতির চিতায় সহমৃতা হয়েছিলেন। দেব মাণিক্যের পট্টমহিষী এবং বিজয় মাণিক্যের মহিষীবৃন্দ স্বামীর সহগামিনী হয়েছিলেন। আবার সহমরণে ইচ্ছুক হয়েও ফিরে এসেছিলেন অনন্ত মাণিক্যের সহ ধর্মিনী মহারানী জয়াবতী। তাঁর পিতা গোপীপ্রসাদ পরে উদয় মাণিক্য তাঁকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এমন আরো উদাহরণ রাজ পরিবারেই রয়েছে। অমর মাণিক্যের প্রধানা মহিষী সহমৃতা হয়েছিলেন।

খোদ রাজবাড়ির এই উদাহরণ প্রজা সাধারণের উপরও ছায়া বিস্তার করবে তা স্বাভাবিক। সমাজে সতীদাহ প্রথা কেমন বিস্তার লাভ করেছিল এবং তা সমাজের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল সে-সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় চট্টগ্রামের তৎকালীন কমিশনার Mr. D.R.Lyall-এর ত্রিপুরার রাজ দরবারে স্থিঁত পলিটিক্যাল এজেন্টকে দেয়া পত্রের এবং তদ উত্তরে ৩রা সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের পত্র থেকে। ঐ চিঠিতে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য লিখছেন " সতী- দাহ এ রাজ্যের বহু প্রাচীনকালের প্রচলিত প্রথা এবং প্রজাগণ এই প্রথাকে অতি পবিত্র বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সে সকল পাবর্ত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত, তাহারা এখনো অশিক্ষিত, সুতরাং রাজ দরবার হইতে এই প্রথার প্রতিকূলে হস্তক্ষেপ হইলে রাজ্যে অসন্তোষভাব ও তজ্জনিত অশান্তি উপস্থিত হইতে পারে। বিশেষতঃ এই প্রথা বিগত দশ বৎসর হইতে উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিতেছে। এই স্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে বৃটিশ রাজ্যে যেরূপ উৎপীড়ন বা প্ররোচনা প্রভৃতির দ্বারা সতীকে দগ্ধ করা হইত, এ রাজ্যে তাহা হয় না। সতী স্বেচ্ছায় স্বামীর অনুগমন করিয়া থাকে।

এ সমস্ত বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দরবার এতদ্বিষয়ে কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা প্রচারের আবশ্যকতা অনুভব করে না। কিন্তু যাহাতে কেহ উৎপীড়ন বা প্ররোচনার দ্বারা সতীদাহ না করে এবং ক্রমশঃ আপনা হইতে যাহাতে এই প্রথা উঠিয়া যায় দরবার সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।"

১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর তারিখ প্রচারিত আইনে ইংরেজ সরকার সতী-দাহ

প্রথা বন্ধ করেন (Regulation XVII of 1829)। বৃটিশ ভারতের অন্তর্গত দেশীয় রাজ্যসমূহেও ঐ আইন কার্যকরী হয়েছিল। কিন্তু ঐ আইন চালু হওয়ার পরেও দীর্ঘ ষাট বৎসর ঐ প্রথা ত্রিপুরায় চালু ছিল ।

" অন্যান্য রাজ্যে যে কার্য সাধনের নিমিত্ত আইন বা রেগুলেশনের প্রয়োজন হয় ত্রিপুরায় একমাত্র রাজার বাক্যেই তাহা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এ রাজ্যে সতী-দাহর প্রথা নিবারণের নিমিত্ত ব্যবস্থাপক - সভা আহ্বান কিম্‌বা আইন প্রণয়ন করিতে হয় নাই। স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্যের এক ক্ষুদ্র রোবকারী মূলেই সেই প্রথা তিরোহিত হইয়াছে [Sd/ B.C. Deb; রাজমালা পৃঃ ২১৪]।"

বীরচন্দ্র মাণিক্যের রোবকারী ঃ

" রোবকারী , স্বাধীন ত্রিপুরা, দরবার, শ্রীশ্রী যুত বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর।

সন ১২৯৯ ত্রিং (১৮৮৯ খ্রীঃ), তাং ৮ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু জানা যায়, এ রাজ্যের পার্বতীয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে সতী-দাহ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে লয় প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব তাহা রহিত করা আবশ্যক। সেমতে — হুকুম হইল যে —

এতদ্বারা উল্লিখিত সতী-দাহ প্রথা রহিত করা যায়, ও এই আদেশ প্রচারের তারিখের পর হইতে এই আদেশ লঙ্ঘনক্রমে কোন স্থানে উক্ত ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে, কি তাহার উদ্যোগ করা হইলে সংসৃষ্ট ব্যক্তিগণ দণ্ডনীয় হইবে। কার্যে পরিণত হওয়ার আদেশে এই রোরকারী রাজস্ব বিভাগে পাঠান যায়।

(স্বাক্ষর) শ্রী প্যারীমোহন রায়,

মুন্সী।"

এই আদেশ জারী সহজ ছিল না। রাজদরবারের পক্ষ থেকে এটি স্বতঃস্ফূর্ত আদেশও নয়। এর সূচনা করেন চট্টগ্রামের কমিশনার ডি.আর. লায়েল। বাংলা সরকারের পক্ষে অনুরুদ্ধ হয়ে লায়েল ১১ই জুন, ১৮৮৮ ইং সনে আগরতলাস্থ সহকারি পলিটিক্যাল এজেন্ট উমাকান্ত দাসকে লিখলেন —

"During my recent movement in the Sonamura Division in Marchlast, I heard of three cases of the kind having occurred amongst Jamatias in the course of the last two or three years. If any more have taken place within the last 4 or 5 years anywhere in the state, this offfice may be supplied with a list of them"(পত্রের অংশ বিশেষ।

উমাকান্ত দাস কমিশনারের আদেশ পালন করলেন। রাজ দরবারে বাংলা সরকারের মনোভাবে জানালেন, বার বার তাগাদা দিয়ে জবাব চাইলেন। কমিশনারের তরফ থেকে আবার চিঠি এলো। ঐ চিঠির জবাবে বীর চন্দ্র মাণিক্য উপরোক্ত চিঠি লিখেছিলেন। বীরচন্দ্রের ঐ চিঠিতে কোন উদ্যোগ বা আশ্বাসের কথা ছিল না। ফলে ডি. আর. লায়েল ফের পলিটিক্যাল এজেন্ট গৌরীশংকর বিশ্বাসকে লিখলেন

" The reply is excessively unsatifactory and not what I should have expected from a rular so enlightened as the Maharaja, not

can I admit that the facts are correctly stated".

"রাজ দরবারের লিখিত উত্তর সন্তোষজনক নয়। মহারাজের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট থেকে আমি এইরূপ উত্তর পাব বলে প্রত্যাশা করি না। ঐ পত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা প্রকৃত বলেও স্বীকার করতে পারি না।"

তারপর লিখলেন —" সতীদাহ পার্বত্য ত্রিপুরার আদিম প্রথা নহে। আমার বিশ্বাস পার্বত্য জাতির মধ্যে এই প্রথা নূতন প্রবর্তিত। যে সকল পাবর্ত্য লোক হিন্দু ধর্মোচিত আচার অবলম্বন করে তারা সতীদাহ প্রথার অনুসারী।

এই প্রথা নিষিদ্ধ বলেই সম্প্রীতি হ্রাস পাচ্ছে। কৈলাশহরের গত ফ্রেব্রুয়ারী মাসের ঘটনাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদি মহারাজের এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায় যে এ বিষয়ে কোন রাজকীয় নিষেধাজ্ঞা নেই, তবে এই প্রথা পুনর্বার প্রবল হবে। কারণ, ইহা সহজেই উপলব্ধ হয় যে, যা নিষিদ্ধ নয় তাই অনুমোদিত। সুতরাং এতে এই প্রথায় উৎসাহ দানই করা হবে।

আমি অনুরোধ করছি আপনি (পলিটিক্যাল এজেন্ট গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস) এই বিষয়ে পুনর্বার মহারাজ সমীপে উপস্থিত করবেন যাতে ১৮২৯ সনের ১৭ নং রেগুলেশনের ন্যায় একটি আইন জারী হয় এবং সেভাবে কাজ হয়। আপনি এইভাবেই পরামর্শ দেবেন।

আমি বিশেষভাবে জ্ঞাত করাতে চাই যে, যে-প্রথা ৬০ বৎসর হল আইনবিরুদ্ধ বলে ভারতবর্ষে প্রচার করা হয়েছে এবং যা সমস্ত সুসভ্যজাতি অসভ্য ব্যবহার বলে মনে করেন, মহারাজের বর্তমান কার্যদ্বারা সেই প্রথায় উৎসাহ বর্ধন করা হচ্ছে।"

পত্রের এখানেই শেষ নয়। উপসংহারে প্রছন্ন হুমকিও দেওয়া হল — " I shall be very unwilling to have to lay this question at length before the Government and trust that the Maharaja will take such action as will not necessitate my pushing the matter further". (বিষয়টি সবিস্তারে সরকারে উপস্থাপিত করা আমার অভিপ্রেত নয়, বিশ্বাস করি মহারাজ এমন বন্দোবস্ত করবেন যাতে আমাকে এ বিষয়ে আর অধিক কিছু না করতে হয়)"।

গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস ঐ চিঠির প্রতিলিপি আগরতলাস্থ সহকারী পলিটিক্যাল এজেন্টকে পাঠালেন এই মন্তব্য লিখে — " তিনি যেন বিষয়টি মহারাজের নিকট উপস্থাপিত করেন এবং তিন মাস পরে রিপোর্ট করেন যে, সতী-দাহ প্রথা নিবারণ বিষয়ে আইন রাজ্যে প্রচারিত হয়েছে এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এই আইন অনুসারে কাজ হচ্ছে।"

পলিটিক্যাল এজেন্টের প্রছন্ন হুমকি পত্র পাওয়ার পরে মহারাজ বীরচন্দ্র মাণিক্য সতীদাহ প্রথা রহিত করে সরকারি আদেশ জারি করেন। ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দের পর কোন সতীদাহের তথ্য রাজ্যে নথিভুক্ত হয়নি। দেখা গেছে খোদ রাজ অন্তঃপুরে এই প্রথা অমান্য করা হয়েছে। এর বিস্তারিত উল্লেখ কোথাও নেই, কিন্তু যাকে বলে হাঁড়ির মধ্যে একটি ভাত টিপেই যেমন পুরো হাঁড়ির ভাতের সন্ধান মেলে, তেমনি একটি ঘটনাই পুরো বিষয়ের আঁচ পেতে সাহায্য করে। রাজবাড়ির অন্তঃপুর অনেকটা মাকাল ফলের মতন। দৃশ্যতঃ বহিঃরঙ্গে নয়নরঞ্জন, লোভনীয় ও ঈর্ষা উদ্রেককারী কিন্তু ভেতরে কালো কুৎসিত। সতীদাহের ধর্মীয় অনুমোদন বা অনুকূলে ধর্মের অপব্যাখ্যা তো ছিল। কিন্তু তাকে অবশ্য মান্য করার পেছনে ভিন্নতর উদ্দেশ্যও ছিল।

সাধারণ ক্ষেত্রে যেমন সম্পত্তির উত্তরাধিকার বঞ্চিত করা, সম্পত্তি গ্রাস করাই ছিল মুখ্য — রাজবাড়ির ভেতর তো আরো ভয়াবহ। রাজা বেঁচে থাকতেই রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্র যেখানে, রাজার অবর্তমানে অসহায় বিধবাকে বাঁচিয়ে রেখে পরে সবল হওয়ার সুযোগ রেখে সিংহাসন দখল কণ্টকিত করে রাখার কোন মানে নেই; সুতরাং রাজার বিধবাকেও সঙ্গে পুড়িয়ে মার। রানীকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় শক্তিকেন্দ্র গড়ে উঠতে পারে, তার ছেলেরা অধিকার দাবী করতে পারে, সুতরাং রানীকে আগুনে পোড়াও আর নাবালক থাকলে বা সাবালক তাদের হত্যা কর বা তাড়িয়ে দাও।

অনন্ত মাণিক্যকে তাঁর শ্বশুর গোপী প্রসাদ সিংহাসনের জন্য হত্যা করেন। অনন্ত মাণিক্যের বিধবা জয়াদেবী উদয় মাণিক্যের কন্যা। নিঃসন্তান। জয়াদেবী স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যেতে— পিতা উদয় মাণিক্যের তখন তিনি রাজা ঘোষণা করেছেন নিজেকে, অনুমতি চাইলেন। গোপী প্রসাদ তথা উদয়মাণিক্য কন্যাকে স্বামী অনন্ত মাণিক্যের চিতায় সহমরণে যাবার অনুমতি দেন নি। এক্ষেত্রে জয়াদেবী নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনায় অসাহায়ত্বের ও পিতার নিষ্ঠুরতায় বিহ্বল এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কার্যত আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিলেন। সে-অনুমতি তার মিল না। আসলে গোপী প্রসাদের মনে তখন দ্বিবিধ ভাবনা। লোভের বশে পাপের পাহাড় জন্মিয়েছেন, সিংহাসন পেলেন কিন্তু নিজের কন্যাকে বিধবা করলেন নিজ হাতে, কাজেই ক্ষীণ পাপবোধ তাকে সামান্য হলেও আছন্ন করে। পাপের বোঝা কন্যাহত্যার মাধ্যমে আর বাড়াতে চাইলেন না। দ্বিতীয়ত, কন্যা অপুত্রক বলে ভবিষ্যতে তার (তরফে উত্তরাধিকার-বর্জিত বলে) কোন ভয়ের কারণও ছিল না। সুতরাং কন্যাকে বাঁচিয়ে রাখলে কোন ক্ষতি নেই। কিন্তু কন্যার তেজ ও বিক্রমের কাছে ভীত হয়ে চন্দ্রপুরে প্রাসাদ গড়ে চলে যেতে হল। মান্যতা না পেলেও, জয়াদেবী সিংহাসন দখল করে রইলেন।

গোপী প্রসাদ কন্যার প্রতি ভালবাসায় তাকে সহমরণে নিবৃত্ত করেন তা মনে করাটা কষ্ট-কল্পিত হবে। কারণ যে-ব্যক্তি লোভের বশে নিজের জামাতা কে খুন করে সিংহাসনের দখল নিতে পরান্মুখ নন্, তার হৃদয়ে যে স্নেহ ভালবাসার রেশ নেই তা বলা বাহুল্য। স্বামীর হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করে এবং নিজের পিতাই তার স্বামীর ঘাতক তা দেখে যে প্রতিক্রিয়া জয়াদেবীর মনে হয়েছিল, তা হল নরাধম লোভী নীচমনের অধিকারী পিতার লালসাকে প্রত্যাঘাত করতে হবে। জয়াদেবী স্বামীর শূন্য সিংহাসনে পিতা গোপীকে বসতে দিলেন না। ক্রুদ্ধ জয়াদেবী গোপী প্রসাদকে এড়িয়ে, তাকে সিংহাসনে বসার সুযোগ না দিয়ে তড়িৎ নিজেই সিংহাসনে বসে যান এবং সিংহাসন গোপী প্রসাদের জন্য নয় তা বুঝিয়ে দিলেন কন্যা জয়া দেবীর ক্রোধ গোপী এতটাই তীব্র এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল যে, উদয় মাণিক্যকে পাঁচ মাইল দক্ষিণে চন্দ্রপুর গ্রামে গিয়ে বাসস্থান তৈরী করতে হয়। সে যাই হোক, সতীদাহ বা সহমরণের ক্ষেত্রেও যে ব্যতিক্রমী বিধান আছে, আসলে বিধানটাই ছিল প্রয়োজনভিত্তিক। সদ্য বিধবারা আত্মীয় পরিজনদের ভবিষ্যৎ নির্যাতনের তীব্রতা কল্পনা করেও আত্মহত্যার আকাঙ্ক্ষাকে মনে জাগিয়ে তুলতেন, এক্ষেত্রে প্রলেপ হল ধর্মীয় ভাষ্য। রাজ পরিবারে সতীদাহ সবচাইতে বেশী প্রত্যক্ষ করেছে উদয়পুর। ১১৭০ বছরের রাজ-তখ্ত।

নরহত্যা ও সতীদাহের মতনই আরো একটি কুপ্রথা রাজ্যে চালু ছিল তা হল ডাইনী

সন্দেহে হত্যা। এখানেও হাঁড়ির একটি ভাতই প্রলয়ের ইঙ্গিত দেয়। ঘটনাটি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে, এই উদয়পুরেই ঘটেছিল। ১৮৭৩ খ্রিঃ উদয়পুর বিভাগ বা দক্ষিণ বিভাগ সৃষ্টি হল। উদয় চন্দ্র সেনকে প্রথম উদয়পুর বিভাগের বিভাগীয় প্রশাসন-প্রধান করা হল। তার পরেই ধনঞ্জয় ঠাকুর। ঘটনাটি তাঁর সময়ের।

উদয়পুর বিভাগের শাসনকর্তা থাকাকালে " ডাইন বলি" নামে একটি রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। পাঞ্চিহাস রায় নামক জনৈক রিয়াং সর্দারের বাড়িতে কপিরায় নামে এক রিয়াং আশ্রিত ছিলেন। তন্ত্র-মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসা করে তার জীবিকা নিবার্হ হত। "প্রাচীন সংস্কার বশে" সেই গ্রামের কালাহা রিয়াং প্রভৃতি কতগুলি লোক গরীব কপিরায়কে 'ডাইন' বলে স্থির করেন। তারা কপিরায়ের স্ত্রী 'খিচিমা'কে বলল " তোমার স্বামী ডাইন হইয়াছে অতএব তাহাকে বধ করা উচিত।" খিচিমা বললেন —" সে ডাইন হইয়া থাকিলে বধ করিতে পার।" ১৮৮১ খ্রিষ্টাব্দের বাংলা জ্যৈষ্ঠ মাসে " একদিন দিবা দুই প্রহরের সময় পর্বত মধ্যস্থিত নিবিড় অরণ্যে কালীপূজা উপলক্ষ্যে হতভাগ্য কপিরায়কে বলি দেওয়া হল। এর ১০ মাস পর ঠাকুর ধনঞ্জয় এই খবর পেলেন। তদন্ত করে তথ্য ও সত্য উদ্ধার করেন এবং বিচারের জন্য সদরে সেসন কোর্টে মোকদ্দমা রজ্জু করেন। বিচারে তাদের কারাদণ্ড হয়েছিল। " ডাইন হইয়া থাকিলে বধ করিতে পারে " এর থেকেই 'ডাইন' বিষয়ে সমাজের ধারণাটি কীছিল বুঝা যায়।

দাস-প্রথা

নয়া বিশ্ব আবিষ্কারের পর আমেরিকার বিশাল ভূখণ্ড আবাদ করার জন্য যে বিপুল জনশক্তির প্রয়োজন ছিল তা মেটাবার জন্য দখলদার আমেরিকানরা এক অভিনব পন্থা আবিষ্কার করলেন। বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমের যোগান পেতে ওরা মানুষ ক্রয়-বিক্রয়ের বাজার খুলে বসলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ আফ্রিকার অধিবাসীরা হল জীবন-শ্রম-পণ্য। এই ক্রীতদাসেরাই আমেরিকার কৃষি-সমৃদ্ধি, খনিজ-উত্তোলন-এর বিনামূল্যের শ্রমিক এবং আমেরিকার সমৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপক। তবে এরাই যে ক্রীতদাস ক্রয় বিক্রয়ের অগ্রপথিক তা নয়। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান যুগের প্রারম্ভ থেকে ষোড়ষ-সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বহু ক্রীতদাসের সন্ধান মেলে যারা স্বীয় প্রতিভায় সেনানায়ক থেকে শাসন কর্তা এবং সুলতান বাদশা পর্যন্ত হয়েছেন। আমরা ইতিহাসে তাদের প্রতিভার চমৎকারিত্বটুকু দেখেছি কিন্তু ইতিহাসবিদ্‌রা যে বিষয়টা স্পষ্ট করেননি তা হল ক্রীতদাস প্রথা ভারতও চাক্ষুষ করেছে। তার তিক্ত স্বাদ গ্রহণ করেছে। উন্নত ও শক্তিশালীরাই নিজস্ব সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দুর্বল মানব সমষ্টিকে ব্যবহার করে তাদের শ্রম ও মেধা শোষণ করেছে। উচ্চ আরোহীরাই ছিল সমাজের সুবিধাভোগী। এবং দাসদাসী ক্রয়-বিক্রয় প্রথা বা রাজার দুর্ভাগ্যক্রমে এই ত্রিপুরাতেও প্রাচীনকালে ছিল। ১৮৭৮ পর্যন্ত ক্রীতদাস প্রথা বহাল তবিয়তে ত্রিপুরাতে ছিল। মহারাজ বীরচন্দ্র ১২৮৮ ত্রিং সনের ১৭ই আষাঢ় (১৮৭৮ খ্রিঃ) এক ঘোষণায় ত্রিপুরায় ক্রীতদাস প্রথা রহিত করেন। ক্রীতদাস প্রথার সংবাদ জেনে এবং ক্রীতদাসদের দুর্বিষহ জীবনের বিবরণ জেনে ব্রিটিশ সরকার মহারাজ বীরচন্দ্রকে এই প্রথা বন্ধে বাধ্য করেন। ক্রয় বিক্রয় ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি বা পরিবার ঋণ শোধের উপায় হিসেবে মহাজনের কাছে নিজেদের নিজেরাই বিক্রি করে

দিতেন। বিনা পারিশ্রমিকে মনুষ্যেতর জীবন যাপনের পরও তাদের ঋণ শোধ হত না। কারণ ঋণ শোধ হলে তো বিনা পারিশ্রমিকে বেগার মজুর-এর মজা বন্ধ হয়ে যায়। ক্রীতদাসীদের অবস্থা ছিল আরো অবর্ণনীয়, এরা মালিকের জৈবিক ইচ্ছা মেটানোর উপকরণ হতে বাধ্য হত। কৈলাশ সিংহ লিখেছেন — " যদিচ কোন সময়ে কোন ক্রীতদাসী গৃহিণী পদবী লাভ করত পরম সুখে জীবন যাপন করিয়াছেন সত্য।"

বিচার-ব্যবস্থা

১২৮৮ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে) 'পাহাড়ী' আদালত ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল। অর্থাৎ বিচার ব্যবস্থার সংস্কারের শুরু। কেমন ছিল " পাহাড়ী আদালতের" বিচার ব্যবস্থা ; বা তার ভাল-মন্দ দিক্? প্রাচীনকালে ত্রিপুরার পার্শ্ববর্তী রাজ্য সমূহেও বিচার ব্যবস্থা সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধির দ্বারা যেমন পরিচালিত হত, ত্রিপুরায় তেমন ছিল না। অপরাধকেই বিচার্য করা হত অপরাধীর গোত্র বা সম্প্রদায় নয়। যেমন — ত্রিপুরা রাজ্যে পার্শ্ববর্তী হেড়ম্ব রাজ্যের মহারাজ গোবিন্দ চন্দ্রের শাসনকালে যে দণ্ডবিধি প্রচলিত ছিল, তার কয়েকটি ধারা নিম্নরূপ

ক) মারনে মারণং — মারনেতে যদি মারিত ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তবে তাকে রাজা প্রতিবদল শূলাদি দ্বারা মারিবেন।

খ) কৃতাপরাধোপি রাজনি কৃতপ্রহারং শূল মারোপ্যাগ্নেপচেৎ— কৃতাপরাধি যে রাজা তাহাকে যদি কোন ব্যক্তি প্রহার করে তবে তাকে শূলে দিয়া গাঁথিয়া অগ্নিতে পাচনা করিবে।

গ) ব্রাম্মণেষু কোপাৎ পানিং প্রহারণ শূদ্রঃ পানি ছেদন দণ্ডঃ শূদ্র যদি ক্রোধ করিয়া ব্রাহ্মণকে হস্ত দ্বারা প্রহার করে তবে তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়।

ত্রিপুরায় " পাহাড়ী আদালতের" বিচার এই ধরনের প্রতিহিংসা পরায়ণ ও সাম্প্রদায়িক ভেদ -বুদ্ধির দ্বারা চালিত হত না। বিচারের জন্য তখন লিখিত কোন আইন ছিল না। আইনকে কেতাবের মধ্যে ঢুকিয়ে বিচারের মানবিক দিকটাকে যান্ত্রিক ও কূট-কৌশলী করে তোলা হয়নি। বিবেক, বিবেচনা মতন ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই ছিল বিচারকের অগ্রাধিকার। তিনি " ন্যায় ও ধর্মানুমোদিত" যুক্তি অবলম্বনে স্বীয় বিবেকানুযায়ী বিচার কার্য সম্পাদন করতেন। আইন ব্যবসায়ীর কূটবুদ্ধি ধর্মাধিকরণে প্রবেশের সুযোগ ছিল না। দোষী ব্যক্তি সরল চিত্তে বিচারক সমক্ষে আত্মদোষ স্বীকার করিত, মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত করে নির্দোষীকে দোষী সাব্যস্ত করার প্রয়াস ছিল না। বিচার প্রার্থীগণ বিচারককে পিতা, অভিভাবক অথবা দেবতার ন্যায় মনে করতেন এবং কোন পক্ষ, বিচার প্রার্থী বা অভিযুক্ত বিচারকের কাছে মনোগতভাব ব্যক্ত করতে কুণ্ঠিত হতেন না। সুতরাং, সেকালের বিচারে বর্তমান কালের ন্যায় " আইন-নজিরের" 'মারপ্যাঁচ' অথবা সওয়াল জবাবের শোর-হাঙ্গামা ছিল না। এই কারণে বিচারের পথ অতিশয় সরল ছিল এবং সহজেই সত্যোদ্ঘটিত হত।" অপিচ অর্থী-প্রার্থীকে রসুম, তলবানা, বারবরদারী এবং আইন ব্যবসায়ীর চাপে সর্বস্বান্ত হতে হত না।

গুরুতর অপরাধীর শিরশ্ছেদ অথবা শূলে চড়িয়ে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। কখনো কখনো দণ্ডার্হ ব্যক্তিকে কুকুর দিয়ে খাওয়ানো হত। এছাড়া হাতির পায়ের তলায় ফেলে মৃত্যুদণ্ড, নাক কান কেটে দেওয়ার মতন বিধানও ছিল। এই সব দণ্ডাদেশ কার্যকরী হত প্রশস্ত স্থানে জন সমক্ষে।

গোপী প্রসাদ বা উদয় মাণিক্যের সময়ের একটি বিচারাদেশ কার্যকরী করা হয়েছিল এইভাবে। তিনি তাঁর ব্যভিচারিণী স্ত্রীদের হাতির পায়ে পিষ্ট করে কুকুর দিয়ে খাইয়েছিলেন। তাদের অপরাধ ছিল " তাহার ২৪০ টি স্ত্রীগণের মধ্যে অনেকেই রজনীযোগে রাজবাটি হইতে বহির্গত হইয়া পরপুরুষ সহযোগে ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতেন। সে-সময়ে গৌড়ের এক মুসলমান রাজপুত্র দেশ পর্যটনে বহির্গত হইয়া ত্রিপুরায় উপস্থিত হন। উদয় মাণিক্য তাহার যথোচিত অভ্যর্থনা করেন। কিন্তু যখন জানিতে পারিলেন তাহার কয়েকটি স্ত্রী রাত্রিকালে ঐ যবন রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া তৎসহবাসিনী হইয়াছেন তখন তিনি তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দিলেন; এবং ঐ সকল স্ত্রীকে হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করত, কুক্কর দংশনে বধ করিলেন (রাজমালা, কৈলাশ সিংহ- পৃঃ ৫৬-৫৭)।"

১২৮৭ ত্রিপুরাব্দে (১৮৭৭ খ্রিঃ) বিচার ব্যবস্থার সংস্কার করা হয়। ঐ সময়ে যুবরাজ রাধাকিশোর খাস আপিল আদালতের বিচারপতি নিযুক্ত হন। ধনঞ্জয় ঠাকুর উদয়পুর বিভাগের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন " ডাইনী হত্যার" বিচার তিনি কীভাবে করেছিলেন এবং উদয়পুর থেকে সেই বিচার আপিল আদালত সেসন কোর্টে আগরতলায় পাঠান এবং অপরাধীর শাস্তি বিধান হয় তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সংস্কার সাধিত হয় ১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। মন্ত্রী মোহিনীমোহন বর্ধনের হাতে ঐ সংস্কার সাধিত হয়।

যুবরাজ রাধাকিশোর-এর আগ্রহাতিশয্যে মোহিনীমোহন বর্দ্ধন। পার্বত্য জুমিয়া প্রজাবর্গের উন্নতির জন্য বাঙ্গলায় প্রচলিত প্রথামত কৃষিকার্য শিক্ষার্থে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং প্রজাদিগের বিশেষ যন্ত্রণাদায়ক 'তৈথুং' প্রথা রহিতেরও চেষ্টা করেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি সাফল্য পাননি।

গোধিকা, আত্মজা ও নৌ-বৃত্তান্ত

গোধিকা

নিরীহ সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী পাহাড়ের আনাচে-কানাচে ঘুরছিল। তুচ্ছ প্রাণী। নজরে পড়ে গেল জবরদস্ত সেনাপতি রায় কাচাগ -এর। মস্তিষ্কের বদ্ধ জট খুলে গেল। হ্যাঁ, এই তো মুস্কিল আসান। উপায় খুঁজে পেলেন রায় কাচাগ। আদেশ করলেন, পাকাড়ো ঐ গোধিকা (গুইল)। কেন, এর কী প্রয়োজন — ভেবে কেউ বিস্মিত হলেন; কেউ হয়তো উল্লসিত হলেন, নাকে মাংসের সুগন্ধ ঠেকলো। সেনাপতির আদেশ। কাজেই গোধিকা পাকড়াতে কারোর উৎসাহের অভাব হল না। এবার শক্ত লতার খোঁজ। তাও পাওয়া গেল। সঙ্গে বিস্ময়ও বাড়ল। সেনাপতি কী করতে চান? শক্ত লতা; এবার বাঁধা তার কোমরে, তাড়া কর যাতে ঐ উঁচুটিলায় যেখানে শত্রু সৈন্য, কুকিরা থানাগেড়ে বসে আছে দীর্ঘ আট মাস। আর রায় কাচাগকে হতাশার প্রান্ত সীমায় নিয়ে এসেছে।

লম্বা বন্যলতা কোমরে নিয়েই গোধিকা উঠে গেল পাহাড়ের সানুদেশে। এবার আর লতার গতি নেই। হাল্কা টান দিয়ে গোধিকার গতি বাড়ানোর চেষ্টা হল। না, লতা কোথায় যেন আটকে আছে; আরো জোর। না, হেলদোল নেই। বাকিরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। রায় কাচাগ স্বস্তি পেলেন। হ্যাঁ যা ভেবেছিলাম, তাই হল। শক্ত লতা উপরে কিছুতে ভালভাবে আটকে গেছে। এতই শক্ত যে এই লতা ধরে একজন আস্ত মানুষ উপরে উঠতে পারে। মনের কথা কাউকে ভাঙলেন না। অপেক্ষা করে রইলেন কখন রাতের আঁধার চরাচর ঢেকে দেয়।

অন্ধকার নামতেই ঐ লতা বেয়ে দড়িদারা নিয়ে একজন উপরে উঠে গেল। বন্ধ দুয়ারের চাবি খুলে গেল। সেই সৈনিক সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাওয়া দড়ির এক এক প্রান্ত শক্ত করে গাছের গুঁড়িতে বেঁধে দিল। শত্রুসৈন্য তখন নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমে। দড়ির অপর প্রান্ত ধরে রায় কাচাগের সৈন্য একে একে পাহাড়ের উপরে উঠে গেল। শত্রু ছাউনী ঘিরে ফেলল। তারপরের ইতিহাস তো লিখা রয়েছে। কুকিরা এত অপ্রস্তুত, এত শোচনীয় অসহায় পরাজয় ইতিপূর্বে আর কখনো কুকিরা হজম করেনি।

দীর্ঘ আটমাস অপেক্ষা করেও রায় কাচাগ পর্বত চূড়ায় কুকি দুর্গের কাছে ঘেঁষতে পারেন নি। ভেবেছেন হয়তো রণে ভঙ্গ দিয়ে হতাশ হয়েই ফিরতে হবে। কুকিরা যে দুর্লঙ্ঘ গিরিচূড়ায়। শত্রুই সুবিধাজনক অবস্থানে। প্রত্যাবর্তন মানে পরাজয়। লজ্জা। যিনি কি না নিকট ভবিষ্যতে আরো বড় জয়ের গৌরব অর্জন করবেন, হোসেন শাহকে পর-পর যুদ্ধে অপূর্ব রণকৌশলে পরাস্ত করে রণকৌশলের এক নজির সৃষ্টি করবেন। ত্রিপুরার ইতিহাসকে উজ্জ্বল করবেন, নিজে খ্যাতিমান হবেন এই ব্যর্থতা বা পরাজয় তিনি মানবেন কেন?

এমন সময়ে এই গোধিকা। রাজমালায় গোধিকা বৃত্তান্ত এইভাবে লেখা হয়েছে ঃ " তাহার কটিদেশে বেত্র বন্ধন করিয়া তাহাকে পর্বতে চড়াইয়া দিলেন। গোসাপটি প্রথমে পর্বতে উঠিতে লাগিল। এদিকে ক্রমান্বয়ে সুদীর্ঘ বেত্র যোজনা করা হইতেছিল। গোধিকা পর্বতের

সানুদেশে আরোহণ করিবার পর হস্তস্থিত বেত্র টানিয়া দেখা হইল, তাহা বিশেষ দৃঢ় হইয়াছে। অতঃপর রাত্রীকালে সেই বেত্র অবলম্বন করিয়া সৈন্যগণ একে একে পর্বতারোহণ করিল এবং অকস্মাৎ কুকীদিগকে আক্রমণ করিয়া অল্পায়াসেই রায় কাচাগ দুর্গ জয় করিতে সমর্থ হইলেন (রাজমালা, দ্বিতীয় লহর, পৃঃ ১৩৫)।" ঔরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীকে প্রায় অনুরূপ কৌশলেই একাধিকবার নাস্তানাবুদ করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী। ধন্য মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৬৩ খ্রিঃ থেকে ১৫১৫ খ্রিঃ। অর্থাৎ ষোড়ষ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার ঘটনা এটি। শিবাজী ঔরঙ্গজেবের দ্বৈরথ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ে। " কুকিদের সঙ্গে ধন্য মাণিক্যের বিবাদের মূলে ছিল একটি শ্বেত হস্তী। (রাজমালা - কৈলাশ সিংহ) ।" কিন্তু রায় কাচাগ তাঁর প্রতিভার প্রথম মাইল ফলক প্রোথিত করলেন।

রায় কাচাগ অনুরূপ বুদ্ধিমত্তা রণকৌশলের পরিচয় এরপরও দুইবার দিয়েছেন। ঐ দুই যুদ্ধই হয়েছিল গৌড় অধিপতি আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মোজাফর হোসেন শাহ'র সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে। হোসেন শাহ ও আরাকানের রাজা 'মেভ' যৌথভাবে ত্রিপুরা দখলের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের দখল নিয়ে ঐ যুদ্ধ। " ত্রিপুর সেনানী সেনাপতি রায় কাচাগের নেতৃত্বে" হনুমান মূর্তি লাঞ্ছিত পতাকা লইয়া এবং আরাকান রাজ বৃষভ ধ্বজ ও হোসেন শাহের সৈন্যগণ অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত পতাকা লইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইলেন। অবশেষে যবন ও মগদিগের ভূজগর্ব খর্ব করিয়া রায় (কাচাগ) সেনানী বিজয়ী পতাকায় পরিশোভিত হইয়াছিলেন (রাজমালা, কৈলাশ চন্দ্র সিংহ)।"

এই পরাজয়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে হোসেন শাহ গৌর মল্লিককে সেনাপতি নিযুক্ত করে ত্রিপুর রাজ ধন্য মাণিক্যের বিরুদ্ধে পাঠায়। হুসেন সাহের সৈন্যরা প্রথমে জয়ের মুখ দেখে। মেহেরকূল দুর্গ দখল করে। উল্লসিত হোসেন শাহের সৈন্য রাঙামাটির দিকে এগিয়ে চললো। এরা সোনামাটিয়ায় শিবির করে রাঙামাটি আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন (সোনামাটিয়া বর্তমান সোনামুড়া শহর)। হোসেন শাহের বিশাল বাহিনীকে রায় কাচাগ নিজস্ব উদ্ভাবনীতে গোহারা হারান। গোমতীর উজানে তিনি বাঁধ নির্মাণ করেন : ফলে গোমতীর নিম্ন ভাগের জল শুকিয়ে গেল। গৌড়ের সৈন্যরা পদাতিক ও নৌসেনা এরা চড়ায় শিবির স্থাপন করলেন। চতুর্থ দিনে নদীর বাঁধ কেটে ফেলা হল। জলের তোড়ে সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ-নৌকা বানচাল হয়ে গেল। হাতি ঘোড়া, অস্ত্র এবং যুদ্ধের নৌকা বিপুল সংখ্যায় রায় কাচাগের দখলে এলো। এ তো প্রায় বিনা যুদ্ধে জয়। কৌশলের জয়। হোসেন শাহের বিরুদ্ধে রায় কাচাগ আরো একবার কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন, ঐ কৌশলেও তিঁনি জয়ী হন। হোসেন শাহ পরাজিত হন।

দ্বিতীয়বারেও পরাজয় হোসেন শাহকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। সেনাপতি গৌর মল্লিককে হোসেন পদচ্যুত করেন। হৈতন খাঁ ও করা খাঁ নামে দুই পাঠানকে সেনাপতি নিযুক্ত করে ধন্য মাণিক্যের বিরুদ্ধে বিশাল বাহিনী, পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, একশত হস্তী, একলক্ষ পদাতিক সঙ্গে বাংলার বারভূঁঞাদের কাছ থেকে সাহায্য-সেনা-সহ ত্রিপুরা বিজয়ে পাঠালেন। হোসেন শাহ'র সৈন্যরা জামির খাঁ গড় (রাঙামাটি উপকণ্ঠে বর্তমান বাগমা) এবং বর্তমান চড়িলামে ছয়ঘড়িয়া গড় জয় করেন। জামির খাঁ গড়ের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন খড়া রায়। এরা দুর্গ রক্ষায়

ব্যর্থ হলেন। হৈতান খাঁ এই দুর্গের দখল নেন। অতঃপর রাঙামাটি বা উদয়পুর তাদের আক্রমণ-সীমায় চলে এল।

এবারও সেই গোমতীই জয়ের মুখ দেখাল। আর সেনাপতি রায় কাচাগ-ই হলেন নায়ক। " এই সময় ত্রিপুর সৈন্যগণ পর্বতজাত বিষলতা ফেলিয়া গোমতীর জল বিষাক্ত করিয়াছিল। সেই জল পান করিয়া দুই চারিজন মুসলমান সৈন্যের মৃত্যুর পরেই তাহারা ত্রিপুর সৈন্যের ষড়যন্ত্র বুঝিতে পারিল। এবং পানের নিমিত্ত দুই প্রহরের মধ্যে এক দীঘিকা খনন করিয়া লইল। এই দীঘিকা ''তুরুক' দীঘি নামে পরিচিত হয়। (রাজমালা, দ্বিতীয় লহর)।"

সেনাপতি রায় কাচাগ আররো গোমতীকেই তাঁর অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন। সাফল্যও পেলেন। এবারও গোমতীর উর্ধ্ব অববাহিকায় বাঁধ দেওয়া হল। কিন্তু প্রশ্ন হল ন্যাড়া বেল তলায় কয় বার যায়? কাজেই বহুমুখী আক্রমণের উদ্যোগ নিয়ে ধৈর্য ধরে গোমতীর বাঁধ কাটার অপেক্ষায় রইলেন। সাতদিন পর ন্যাড়ারা দ্বিতীয়বার বেলতলায় এলো। তখনই গোমতীর বাঁধ কেটে দেওয়া হল। প্রবল বন্যার সৃষ্টি হল। গৌড় সৈন্যরা ভেবেছিল দীর্ঘদিন যখন নদী শুষ্ক দুর্গম পাহাড় অতিক্রমের চাইতে নদীপথ সুগম হবে এবং দ্রুতগামীও হবে! তারা গোপনে রাত্রিতে পায়ে হেঁটে রাঙামাটির উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিল। চর মারফৎ ঐ সংবাদ পেয়েই বাঁধ কেটে দেওয়া হয়। এবার রায় কাচাগের পক্ষে বাড়তি উদ্ভাবনী ছিল অসংখ্য ভেলায়, প্রতিটিতে তিনটি করে " মনুষ্যাকৃতি পুতুল, তাদের হাতে জ্বলন্ত মর্শাল"-সহ স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া রাতের অন্ধকারে হোসেন শাহের সৈন্যদের ভ্রম হল শত শত ত্রিপুর সৈন্য রাতের অন্ধকারে তাদের আক্রমণ করেছে কি না। সঙ্গে জলের তোড়া । ফলে মনে আতঙ্ক শতগুণ বেড়ে গেল। আতঙ্ক নিয়ে যঃ পলায়তি, সঃজীবতি। আবারো যুদ্ধে পরাজয়। যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে শত্রুর মনে আতঙ্ক সৃষ্টিকারী এমন ভীষণ অমোঘ প্রাকৃতিক অস্ত্রের আবিষ্কার তো তাঁর পক্ষেই সম্ভব যে ইতিপূর্বে নিরীহ গো-সাপকে পর্যন্ত যুদ্ধের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে সাফল্য পেয়েছে।

এবার কিন্তু রায় কাচাগ শত্রুদের নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে দিলেন না। আয়োজন আগেই করে রেখেছিলেন। দুই দিক থেকে সৈন্যব্যূহ সাজানো এবার সাঁড়াশি আক্রমণ আর সামনে তো জলস্রোত কালান্তক যম! দুই সেনাপতির প্রাণ রক্ষক হল তাদের ঘোড়া। বাহিনীর কথা চিন্তা না করে এরা ঘোড়ায় চড়ে দে ছুট। রাজধানী ঢাকায় তাদের দৌড় থামল। সৈন্যদের অধিকাংশ জলে ডুবে মরল। কিছু কচুকাটা হল। আর "যাহারা ধৃত হইয়াছিল, তাহাদিগকে চতুর্দশ দেবতার সমক্ষে বলি প্রদান করা হইল (দ্বিতীয় লহর)।" অপর সেনাপতি মমারক খাঁকে খাঁচায় পুরে রাঙামাটিতে ধন্য মাণিক্য সমক্ষে নিয়ে আসা হল। দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর রণকৌশল, গেরিলা পদ্ধতি, সেনাপতি রায় কাচাগ প্রায় দেড় শত বছর আগেই শত্রুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছিলেন। কুকিদের থানাংছি দুর্গ ও কুকী প্রদেশ জয়ের পর মহারাজ ধন্যমাণিক্য তাঁকে "..................................... বহু মান্য কৈল।

বস্ত্র পুষ্প হস্তী দিয়া গৃহে পাঠাইল।।
বহুতর গ্রাম পাইল রাজপুত্র সম।
রায় কাচাগ রায় কছুম যুদ্ধেতে উত্তম।।

(ধন্য মাণিক্য খণ্ড, রাজমালা।)

একটি মহাজন বাক্য " As is the Headmaster, so is the school", এবার দেখি রায় কাচাগ রায় কছুম ভ্রাতৃদ্বয়ের হেডমাস্টার তথা রাজা ধন্য মাণিক্য কেমন ছিলেন। পিতা ধর্ম মাণিক্যের মৃত্যুর পর সেনাপতিরা ধন্যকে সিংহাসন-বঞ্চিত করে। ঐ সেনাপতিরাই ধন্যের সহোদর প্রতাপ মাণিক্যকে হত্যা করে। রাঙামাটির সিংহাসনের দখল নিয়ে সেনাপতিরা পরস্পর কলহে লিপ্ত হয়। নিজের জীবন বিপন্ন মনে করে ধন্য মাণিক্য এক পুরোহিতের ঘরে লুকিয়ে রইলেন। " অনেক মারামারি কাটাকাটির পর" প্রধান সেনাপতি স্থির করলেন সংকট ত্রাণের উপায় হল ধন্যকেই সিংহাসনে বসানো। তাই করা হলো। তখন ধন্য মাণিক্যের বয়স মাত্র এগার।

সেনাপতিদের এই উচ্ছৃখল, ঔদ্ধত্যের তিনি প্রতিশোধ নিলেন এক বছরের মধ্যে। উপায় উদ্ভাবন করে ধন্য মাণিক্য দীর্ঘ তিনমাস রাজ অন্তঃপুর থেকে রেরুলেন না। অসুখের ভান করে স্বেচ্ছায় গৃহবন্ধী রইলেন। ঐ সময় সেনাপতিরা পুরোহিতের কাছে রাজদর্শনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। অনুমতি মিলল। রাজ দর্শনের পর " বিদায় অভিবাদনের সময় পুরোহিতের নির্দেশে রাজার দেহরক্ষীরা দুষ্ট সেনাপতিদের শিরশ্ছেদ করে। অতঃপর বিশ্বস্ত রায় কাচাগ ও রায় কছুম দুই ভাইকে ধন্য মাণিক্য সেনাপতি পদে বৃত করেন। " তন্মধ্যে রায় কাচাগের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এরূপ পরাক্রান্ত ও খ্যাতনামা ছিলেন যে মেকেঞ্জী সাহেব তাঁহাকে ত্রিপুরার অধীশ্বর চয়চাগ মাণিক্য বলিয়া ভ্রম করিয়া ছিলেন (রাজমালা দ্বিতীয় লহর)"। তখন ধন্য মাণিক্যের বয়স মাত্র বার বছর।

ততদিনে দিগন্তে অন্যত্র ধন্যমাণিক্যের অবয়ব ফুটে উঠছে। তিনি দেবার্চনাস্থলে নরবলির সংখ্যা হ্রাস করেন। বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষকতাও তাঁর সময়ে শুরু হল। তাঁর প্রযত্নে উৎকল খণ্ড ও জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধীয় বই বাংলায় লেখা হল। ত্রিহুত থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের আনিয়ে নিজের পরিবারের মধ্যে ও প্রজা সমাজে নৃত্যগীতের প্রচলন করেন। দেবালয় নির্মাণ, দেবতা প্রতিষ্ঠায় অনন্য কীর্তি স্থাপন করলেন। ১৫০১খ্রিঃ ধন্য মাণিক্য উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির নির্মাণ করেন। ৫১ পীঠের এক পীঠ হিসেবে যা ভুবন খ্যাত। তাঁর রাজত্বকালও ছিল দীর্ঘ ৫২ বৎসর, ১৪৬৩ খ্রিঃ থেকে ১৫১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত।

আত্মজার প্রেম

নব সংসার পাতিযে যাই চল,
যেকোন নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেথায় অনন্ত নোনাজলও
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।

রাজ দুহিতা, ধন্য মাণিক্যের প্রিয় কন্যা ফুলকুমারী তাঁর প্রিয়জনকে নিয়ে কণ্টকাবৃত বনে সংসার পাততে চাইছিলেন। পেতেও ছিলেন। কিন্তু নোনাজলের যোগানও এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেল। মাধ্যাকর্ষণে কেবল খেজুর নয়, খেজুর গাছটিই উপড়ে পড়ে জীবন ও ভালবাসায় দাঁড়ি টেনে দিল। ফুলকুমারী গোমতীর জলে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। আর তার ভালোবাসার

ধন, যার হাত ধরে রাজ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করে, সাধারণের মিছিলে রাজনন্দিনী পা রেখেছিলেন, সেই প্রেমিকও রাজরোষে পড়ে নিষ্ঠুর হত্যার শিকার হলেন। " একটি প্রেমের অমিত প্রগল্‌ভা, ধ্রুব তারকাকে মর্ত্যে" নামিয়ে এনেছিল। আর ঐ প্রেমেরই মানসী দুর্বলতা "মহাপ্রলয়ের" পথ খুলে দিল। এ যুগপৎ সামন্ত অহমিকা, নিষ্ঠুরতা মুক্তমনের উপর ক্ষমতাশালীর অবিচারের কাহিনী। এখানে আবার আরেক ধন্য মাণিক্য।

ধন্য -কন্যা, ফুলকুমারীর কাহিনীটা এমনই। রাজবাড়ীর যুগল-বিয়ের রেষ (ধ্বজকুমার ও দেবকুমারের বিয়ে) সপ্তাহ অতিক্রম করেছে কিন্তু উৎসবের সমাপ্তি নেই। ঐ উপলক্ষ্যেই রাজ অঙ্গনে এক বর্ণাঢ্য শোভা যাত্রা। সেই শোভাযাত্রায় শ্বেত হস্তীর পীঠে বসে রাজকন্যা ফুলকুমারী। শোভাযাত্রার মধ্যমণি। এ সেই শ্বেত হস্তী যাকে কেন্দ্র করে ধন্য মাণিক্যকে লড়তে হয়েছে কুকি রাজার সঙ্গে। রায় কাচাগের মতন দুর্ধষ সেনাপতিকেও আট মাস থানা গেড়ে বসতে হয়েছিল থানাংচি প্রদেশে কুকি-দুর্গ অবরোধ করে এই শ্বেত হস্তীর জন্যে।

শোভাযাত্রার মাঝখানেই হাতি উন্মত্ত হয়ে উঠল। মাহুত-সহ ফুলকুমারীকে নিয়ে ছুটল জঙ্গলের দিকে দলছুট হয়ে। গোমতী নদী অতিক্রমের সময় মাহুত নদীতে লাফিয়ে পড়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করলেন কিন্তু অসহায় রাজকন্যা ফুলকুমারী হাতির পীঠেই রইলেন। আত্মরক্ষার কোন উপায় করতে পারলেন না। হাতি লোকালয়ে অতিক্রম করে জঙ্গলে ঢুকেছে। রাজকুমারীর বাঁচার আশা নেই। তাঁর আর্তচিৎকারেও কেউ উদ্ধারে এগিয়ে আসতে পারছে না। মত্ত হাতির বৃংহনে ভয়ার্ত লোকেরা পিছিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় দেখা দিলেন উদ্ধার কর্তা। অশ্বারোহী এক সাধারণ সৈনিক। রতন। এ যেন নিয়তী! যথার্থই নিয়তী। এবং সর্বনাশেরও সূচনা।

মত্ত হাতীর বৃংহন উপেক্ষা করেই সে এগোল। শ্বেত হস্তী গণেশও যেন সহায় হল পেছনের গুটিয়ে বসে পড়ল। রাজকুমারী ইত্যবসরে হাতির পীঠ থেকে নেমে পড়লেন। কিন্তু কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাজকন্যা তখনো স্বস্বিত পাননি। উন্মুক্ত তরবারি হাতে সেই সৈনিক দ্রুত তাঁকে হাতির কাছ থেকে ছাড়িয়ে আনে। প্রাণ পেয়ে কৃতজ্ঞ রাজকুমারী আপ্লুত হলেন। বংশ মর্যাদা, পদমর্যাদা ভুলে গেলেন। বলা যায় প্রহর শেষের দিনের আলোয় সেদিনের চৈত্র সন্ধ্যায় গোধূলী লগ্নে রাজকুমারী নিজের সর্বনাশও নিশ্চিত করলেন। হৃদয়ে হৃদয় যোগ হল। তার পর বিদ্রোহ ও কন্টকশয্যা।

রাজকুমারী পিতার কাছে হৃদয় খুললেন। তাঁর প্রার্থিতকে যাঞ্চা করলেন। স্তম্ভিত রাজা ধন্য মাণিক্য রাজকীয় কূটবুদ্ধির আশ্রয় নিলেন। রাজকুমারীর ভালবাসা ব্যর্থ করতে তিনি কৌশল নিলেন ঐ সৈনিকে পদোন্নতি দিয়ে দূরে, কিলাগড় দুর্গে পাঠাবেন। ততদিনে হৃদয়ে হৃদয় যোগ সম্পূর্ণ। সুতরাং সৈনিক রাজ অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করলেন। দুই পক্ষের অনড়তাকে রাজা ক্ষমা করলেন। কিন্তু বংশ মর্যাদার দম্ভ ও রাজোচিত অহংবোধে তিনি উভয়ের জন্য রাজ অঙ্গনে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেদিলেন। গোমতীর অপঁর পাড়ে নিষ্কর জমি দিয়ে কন্যা ও তার প্রেমিককে কাযতঃ নির্বাসনই পাঠালেন। কোন পক্ষেরই প্রাণ সংহার না করায় বোঝা যায় কন্যার প্রতি তার ভালবাসাও স্নেহের ফল্গু তখনো প্রবহমান।

খোদ ধন্য মাণিক্যকে ভিন্নরূপে এক সংকটকালে, নিজের প্রাণ সংশয় বিবেচনায় তাঁর

সেনাপতিদের উদ্দেশে বলেছিলেন — " আমি রাজ্যলাভের অভিলাষী নহি, পুরোহিতের গৃহে ভৃত্যভাবে থাকিয়া এক মুষ্ঠি অন্ন দ্বারা জীবন যাপন করিব। তোমরা আমাকে হত্যা করিয়া অনর্থক অপযশ অর্জন করিও না।" তখন ধন্য মাণিক্যের বয়স বারো। আবার তার পরবর্তী রাজা রত্ন মাণিক্যও সিংহাসনচ্যুত হয়ে দিনে একসের চাউল আর ব্রাহ্মণের কাছে শাস্ত্র পাঠ শুনে দিন যাপনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কল্যাণ মাণিক্য বেঁচে রইলেন। সেনাপতিরা তাঁকে সিংহাসনে বসাল। কিন্তু রত্ন মাণিক্যকে হত্যাই করা হয়। যাই হোক রাজ দুহিতা রাজ ঐশ্বর্য ও বিলাস ছেড়ে বংশ গরিমা পরিত্যাগ করে সাধারণ হয়ে গেলেন।

কিন্তু সংকট এলো ভিন্ন পথে। বৃহৎ এক জলাশয় খননকে কেন্দ্র করে এলো সংকট। বর্তমান ধনী সাগর বা ধন্য সাগর যা মহারাজ ধন্য মাণিক্যের নামে, ঐ জলাশয়ের খনন কালে বিপত্তি হল দক্ষিণ পাড়ের মাটি ফেলা নিয়ে। দক্ষিণ দিকে কিছু অংশের মাটি রাজার দেওয়া ফুলকুমারীর জয়গাতেই ফেলতে হল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই বিষয়টাকে সহজভাবে নিলেন না। ভাবলেন ক্রুদ্ধ পিতা কৌশলে তাদের উৎখাত করতে চান। তারা তাদের জায়গায় মাটি ফেলতে বাধা দেবেন এই স্থির করে দৃঢ় হয়ে বসে রইলেন।

স্বামী সত্যাগ্রহী হয়ে নিশ্চুপ বসে রইলেন নিজের জমিতে। লোক ছুটল রাজার কাছে, মহারাজ, আমরা বিড়ম্বনায়, রাজ জামাতা তার জমি থেকে নড়ছেন না সেখানে কি করে মাটি ফেলি? ফলে দক্ষিণ অংশে কাজ বন্ধ হয়ে আছে। শ্রমিকরা হাত গুটিয়ে। তাছাড়া ঐ অংশের কাজ যদি অসমাপ্ত থাকে তবে জলাশয়ের দৈর্ঘ্য রাজ-ইচ্ছানুরূপ হবে না। করণীয় কাজে মহারাজের আদেশ চাই। রাজা এবার নির্মম। এই বার্তা তাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে ফেলে। আদেশ দিলেন মাটি কাটা বন্ধ করো না। মাটি ফেলে যাও, সে যদি নিজে থেকে সরে না যায় তবে তার উপরেই মাটি ফেল।

এই আদেশ পালন আরো কঠিন। কিন্তু রাজাজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়। সুতরাং ফুলকুমারীর সত্যাগ্রহী স্বামীর ভূতল সমাধি হল। ভালবাসার এই নির্মম করুণা পরিণতির পর ফুলকুমারীর কাছে জীবন অর্থহীন, বিশ্বাস হয়ে গেল। কী হবে প্রেমহীন, ভালোবাসা শূন্য এই রিক্ত জীবনের! ফুলকুমারী গোমতীর জলে আত্মবিসর্জন দিলেন। প্রেমের আকাশের সুষমা প্রতিহিংসা, ক্রোধ এবং অবিমৃষ্যকারিতার উন্মত্ত ঝড়ে বানচাল হয়ে গেল। আকাশে

"এখন মেঘের জমে দল,
এখানে এখন বাজের হাহাকার।
এখানে এখন মেঘেরা নিশ্চল,
এখানে এখন গভীর অন্ধকার।

ফুলকুমারী কি সেই অন্ধকারেই ডুবে গেলেন? না, ফুলকুমারী, রাজ দুহিতা হয়ে নায়, ফুলকুমারী জনচিত্তে বেঁচে রইলেন তার ভালবাসার গৌরবে। উন্মত্ত রাজা ধন্য মাণিক্য স্ববশে এলেন। কন্যার এই শোচনীয় পরিণতি দেখে তাঁর শূন্য হৃদয় হাহাকার করে উঠল। অবাধ্য মেয়েকে নিজের ভূখণ্ডে নির্বাসিত করেও সেই দানের জমি ফিরিয়ে নেবার জন্যে কূট- কৌশলের জাল পেতেছিলেন, ফুলকুমারী রাজার সেই ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিল। ফুলকুমারীর নীরব প্রতিবাদ রাজ-অহমিকার বুকে কামান দাগল। ধন মাণিক্য প্রায়শ্চিত্তমুখী হলেন। তাঁর

অনুশোচনার প্রথম প্রকাশ ঘটল মেয়েকে দেওয়া ভূখণ্ডের নাম ঘোষিত হল ফুলকুমারী। উদয়পুর শহরের দক্ষিণ প্রান্তে বিশাল ভূখণ্ড ফুলকুমারী, এত বিশাল যে এখন এখানে দুটি গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজস্ব- নথিতে ফুলকুমারী মৌজা। ধন্য মাণিক্য বেঁচে রইলেন, ফুলকুমারীও বেঁচে রইলেন। ধন্য মাণিক্যকে খুঁজতে হয় ইতিহাসের পাতা উল্টে, আর ফুলকুমারী বেঁচে রইলেন নিত্য দিনের পরিচয়ে।

ফুলটুঙ্গীর পূর্ব পাড় দিয়ে রাজপথ, পথের পূর্বপার্শ্বেই রয়েছে আরো একটি ছোট্ট দিঘি। জলটুঙ্গী। জলের মধ্যে টংঘর, এই অর্থে কি না কে জানে? ফুলটুঙ্গী জলটুঙ্গী ধ্বনিগত সদৃশ্য ভিন্ন কোন অর্থবহ করে কি না তারও ইতিহাস নেই। তবে জলটুঙ্গী নিয়েও রয়েছে একটি মর্মন্তুদ কাহিনী। সেখানেও রাজকন্যা তবে তার দয়িত অখ্যাত কেউ নন, তিনিও রাজপুত্র। এই কাহিনী রাজ জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণীকে কেন্দ্র করে। রাজকন্যার বিয়ে। রাজ জ্যোতিষী তো এই ক্ষেত্রে পাঁচ পা এগিয়ে চলেন। রাজকুমারীর ভবিষ্যৎ দেখে বলেছিলেন, রাজকুমারীর বৈধব্য দশা। শুভরাত্রিতেই তার স্বামীকে বাঘে খাবে।

শুরু হল রাজশক্তি আর দম্ভের সঙ্গে বাঘ আর ভবিতব্যের বাঘবন্দী খেলা। রাজ অহমিকা বলল, বাঘের কাছে হার, তা কখনো নয়। অতএব বাঘের এ্যান্টিডোট তল্লাসের বুদ্ধিমানেরা মাথা ঘামালেন। স্থির হল রাজবাড়ির পশ্চিমে গোমতী পেরিয়ে সমতল লোকালয়ে বাসর সজ্জার ব্যবস্থা হবে। সমতলে বাঘ নাও হানা দিতে পারে। তবুও ফাঁক রাখা হল না। গুণবতী মন্দির গুচ্ছের কাছে (এখন তো আর সেই সব মন্দির নেই, এই সব নির্মিত হয় আরো পরে, মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের সময়ে) নাতিবৃহৎ জলাশয় খনন করা হল। জলাশয়ের মাঝখানে তৈরী হল পাকা বাসর ঘর। বাঘ সাঁতার কাটতে পারে এই বুদ্ধি বুদ্ধিমানের চিন্তায় স্থান পেল না। তৈরী হল সুরক্ষিত বাসর ঘর। বাঘের নাগালের বাইরে। নীরমহলে ফুলসজ্জা। কল্পনাটাই তো রোমান্টিক। ফুলসজ্জার রাত কাবার হলেই তো ভবিতব্যকে ফাঁকি দেওয়া গেল।

বিয়ে হল। ফুলসজ্জার আসরে হুল্লুড় হল। রজনী মধ্যযামে বাসরসজ্জায় বসে রাজকুমারীর বায়না সেতো বাঘের গল্প শুনেছে। বাঘ এবং তার বিড়ম্বনার কথা ও শুনেছে। কিন্তু বাঘ দেখেনি। বাঘ দেখার অদম্য কৌতূহল। সুতরাং সে কুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন সে বাঘ দেখেছে কি না? রাজকুমার বহুবার মৃগয়ায় গেছেন। সুতরাং বাঘ তার বহু দেখা। এবার নবপরিণীতার বায়না হল দাও না একটা বাঘ এঁকে। ভাগ্য বিড়ম্বনার কথা রাজপুত্রও জানেন। তিনি রাজা হলেন না, কিন্তু পঞ্চশরে বিদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত কাগজে বাঘের ছবি আঁকলেন। কাগুজেও বাঘ জ্যান্ত হয়ে রাজকুমারকে গিলে খেল। দৈব জয়ী হল।

এই কাহিনীতে বড় বেশি ফাঁকফোকর। যুক্তির পারম্পর্যের অভাব। এই কাহিনীর পশ্চাৎ পটও কেউ উদ্ধার করেনি। জলটুঙ্গী ভরাট হয়ে এখন বহুজনের বসত। ফুলটঙ্গীরও একই দশা, পূর্ণ বিলুপ্তির দোরগোড়ায়। ১৯২৫ খ্রীঃ মহারাজ বীরবিক্রম এই জলটুঙ্গীও দেখে গিয়েছিলেন। পরে রুদ্রসাগরে নীরমহল নির্মাণের কল্পনার বীজ জলটুঙ্গীই তার মনে উপ্ত করেছিল কি না কে জানে! হতে পারে জলটুঙ্গীর বৃহৎ রাজসংস্কারণই হল রুদ্রসাগরের 'নীরমহল'।

কৃষ্ণমণি সমসেরের তাড়নায় তো রাঙামাটি বা উদয়পুর ছেড়ে গেলেন। কিন্তু তাঁর

অধঃস্তনদের কেউ উদয়পুরকে বিস্মৃত হননি। বীরচন্দ্র, রাধাকিশোর এবং তারো আগে কাশী মাণিক্য এবং সর্বশেষ বীরবিক্রম সকলেই উদয়পুরের ব্যাপারে স্মৃতিকাতর। কাশী মাণিক্যতো উদয়পুরে পুনঃ রাজধানী স্থাপনের উদ্যোগই নিয়েছিলেন।

নৌ-বৃত্তান্ত

ত্রিপুরার রাজধানী রাঙামাটির প্রাকৃতিক অবস্থান দুর্গম পাহাড়ে কিন্তু পার্বত্য ত্রিপুরার প্রধান নদী গোমতীর পারে যে গোমতী সমতল ত্রিপুরায় (চাকলা রোশনাবাদ) কুমিল্লা অতিক্রম করে মেঘনা ব্রহ্মপুত্র পদ্মায় লীন হয়ে বঙ্গোপসাগরে। সুতরাং রাজধানী উদয়পুর (রাঙামাটি) জলপথে আক্রমণের সুবিধা ছিল। স্থলপথে দুর্গমতা এবং দূরত্ব উভয়কে বিদূরিত করে গোমতী দ্রুত রাজধানী পৌছাবার উপায় ছিল। কাজেই নৌ আক্রমণের সম্ভবনার মধ্যেই উদয়পুর। হোসেন শাহের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় আক্রমণের সময় হোসেন শাহ পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তী বাহিনীর সঙ্গে নৌবহরও ব্যবহার করেছিলেন। " চতুর্থ দিবস রাত্রিতে বাঁধ ভাঙিয়া দেওয়ায় আবদ্ধ জলরাশি সশব্দে প্রবল বেগে আসিয়া মুসলমানগণের উপর পড়িল। তাহারা নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতে ছিল; আত্মরক্ষার অবসর ঘটিল না। তাহাদের নৌ-বহর, সৈন্যদল, যুদ্ধ - সরঞ্জাম সমস্তই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া গেল (রাজমালা, দ্বিতীয় লহর)।"

ধন্য মাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় স্থল এবং জলপথে আক্রমণ দুটিই হোসেন শাহের সামগ্রিক যুদ্ধ পরিকল্পনায়। ধন্য মাণিক্যের সেনাপতি রায় কাচাগ নিপুণ সেনাপতি, ধন্য মাণিক্যও যুদ্ধ নিপুণ কাজেই জলপথে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা তাদের ছিল না, তা যুক্তিগ্রাহ্য নয়। সুতরাং নদীপথে শত্রুসৈন্য প্রতিরোধের চিন্তাও ছিল। প্রস্তুতি ছিল। যদিও নৌযুদ্ধে ত্রিপুরার নৌবাহিনীর কৃতিত্ব তেমন নেই, বরং একবার বিপর্যস্ত হয়ে ত্রিপুর নৌবাহিনী। আত্মরক্ষার্থে পিছু হটেছিল এমন উল্লেখ আছে। কিন্তু এর সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। গোমতী পার্বত্য ত্রিপুরার প্রধান নদী। কিন্তু পার্বত্য নদী প্রস্থে কম। সুতরাং নৌবাহিনীর বন্দরের উপযুক্ত স্থানের অভাব। অর্থাৎ পোতাশ্রয়ের অভাব। এবার রাজধানী উদয়পুরেও ভৌগোলিক বিন্যাস দেখতে হয়। ধন্য মাণিক্যের রাজত্বকাল ১৪৬৩খ্রিঃ থেকে ১৫১৫খ্রিঃ পর্যন্ত। আজ থেকে ৫৪০ বছর আগের ভৌগোলিক অবস্থান।

তখন নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত হত, ছিপ নৌকা, কুশা নৌকা, ডিঙি নৌকা। ছোট অথচ দ্রুত গামী। ৮/১০ জন সৈন্যবহনক্ষম বা কিঞ্চিৎ বেশি। কাজেই বিশাল প্রশস্ত জলাভূমির প্রয়োজন নেই। কিন্তু গোমতীর নিজস্ব ধারা স্রোতের প্রবাহ মধ্যে বহু সংখ্যক নৌকা শত্রুচক্ষুর অগোচরে রাখার উপায়ও নেই। কিন্তু যুদ্ধ উপকরণ তো উন্মুক্ত প্রদর্শনী নয়। কাজেই তার জন্য গোপন জায়গা চাই। রাজধানী সংলগ্ন গোমতীর কাছেই ঐ উপযুক্ত নৌঅবস্থানের জলাশয় খুঁজতে হবে। এ অবশ্য ঠিক যে গোমতীর প্রবাহে চট্ করে শত্রু নৌবহর নিয়ে প্রবেশ করে রাজধানী আক্রমণ দুঃসাধ্য। কারণ গোমতীর নিম্ন অববাহিকায় সমতল ভূমি যেমন রয়েছে; আবার উঁচু টিলা পাহাড়ও রয়েছে, যেখানে ত্রিপুর সৈন্য প্রহায় থেকে শত্রুর প্রচেষ্টা বানচাল করে দিতে পারে। কিন্তু নদীকে ব্যবহারের বাসনা তো ত্রিপুর রাজাদেরও থাকতে পারে। বিশেষ করে ঢাকায় গৌড়ে , কর্ণ সুবর্ণে যে শত্রুপক্ষ রয়েছে তারা নৌ-সৈন্য সমৃদ্ধ। তাদের প্রতিরক্ষা এবং পর্তুগীজ নৌ-হার্মাদদের ঠেকানো এবং প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য নৌবহর ব্যবহার প্রয়োজন।

আর ত্রিপুরাতো বাংলার শাসন কর্তাদের আক্রমণ লক্ষ্যে। কাজেই গোমতী পথকে তারা ব্যবহারের চেষ্টা করতেই পারে। যেমন হোসেন শাহ করেছেন। বাংলার শাসন কর্তাদের কাছে নৌবহরের গুরুত্ব কেমন তা বোঝা যায় " বানিয়াচুং মহাল (শ্রীহট্ট) যদিচ তৎকালে শ্রীহট্ট হইতে খারিজ হয় নাই কিন্তু বানিয়াচুং এর অধিপতি ৪৮ খানা কোষা নৌকা যুদ্ধ কালে নবাবের আদেশ অনুসারে উপস্থিত রাখিতে বাধ্য ছিলেন" (রাজমালা, কৈলাশ সিংহ পৃঃ ১৫৮) এই তথ্য থেকে ।

আর ত্রিপুর রাজারাই বা নৌযুদ্ধের প্রয়োজন বিষয়ে অনবহিত থাকবেন কেন? কারণ সমতল বাংলাতো তাদেরও শাসন অধিকারে ছিল। ত্রিপুরার রাজাদের দ্বিতীয় কিরাত রাজ্য শ্রীহট্টে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। (শ্রীহট্ট ইতিবৃত্ত, অচ্যুতচরণ চৌধুরী) " রঘু বংশে কালিদাস এই দেশকে 'তালীবন শ্যাম উপকণ্ঠ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা সমুদ্রেরই উপকণ্ঠ ছিল এবং শ্রীহট্টের পাশেই তার অবস্থান। এই দেশ বহু কালাবধি ত্রিপুর রাজ বংশের শাসনাধীনে ছিল। পরে ঐ বংশীয় বিভিন্ন রাজাগণের সময়ে রাজ্য বৃদ্ধির সহিত সেই রাজ্যই ত্রিপুরা নামে খ্যাত হয় (শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় ভাগ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়, ৪৭ পৃঃ)"।

শীতল চক্রবর্তী মহাশয় তার " প্রাচীন ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন " ত্রিপুর রাজাগণ যখন প্রথম আসিয়া ব্রহ্মপুত্র তীরে রাজ্যপাট স্থাপন করেন, বঙ্গদেশ তখনও সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই। ত্রিপুরার পর্বতরাজিই তখন বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী ভূভাগ ছিল। এমন কি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন ভারত পরিভ্রমণে আসেন তখন তিনি ত্রিপুরার অন্তর্গত কমলাঙ্ক বা কুমিল্লাকে সমুদ্রের তীরবর্তীই দেখিয়া গিয়াছিলেন। কুমিল্লা হইতে সমুদ্রের বর্তমান স্থান লক্ষ্য করিলে মধ্যবর্তী স্থলভাগ সকল যে ক্রমে ক্রমে সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইয়াছে, তাহা সুন্দররূপেই উপলব্ধি করা যায়। ইহা হইতে বঙ্গদেশের উৎপত্তিও যে এইভাবে হইয়াছে তাহা বুঝিতে তেমন কষ্ট হয় না।

নিম্নবঙ্গের বর্ষাকালের দৃশ্য আমাদিগকে বিশেষ রূপেই তৎস্থলের পূর্বকালের সাগরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। ত্রিপুর রাজাদিগের রাজ্য পরিবর্তন, রাজ্য বিস্তার এবং রাজ্যে প্রজাস্থাপন প্রভৃতিতে সমুদ্রগর্ভ হইতে ত্রিপুরার দেশ গঠনের সুন্দর আভাষই পাওয়া যায়। (পৃঃ ৯৯)।"

দ্রুহ্য বংশীয়রা ভারতে এসে ত্রিবেগে রাজ্যপাট স্থাপন করেন এবং ত্রিবেগ " ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যা এই নদী ত্রয়ের সংগম এবং স্থানটি সুনির্দিষ্টভাবে নারায়ণগঞ্জের বিপরীত পারে সোনারগাঁও পরাগনায় অবস্থিত ছিল তা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। পুরাণে ভারতবর্ষের পূর্ব-দক্ষিণে " প্রবঙ্গ" নামে একটি প্রদেশ উল্লেখ রয়েছে। রাজমালায় প্রবঙ্গকে " বঙ্গরূপে লিখিত হইয়াছে" (শীতল চক্রবর্তী, পৃঃ৫২)"। বিশ্বকোষে এই প্রবঙ্গকে ত্রিপুরার অংশ বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় কিরাত রাজ্যের পর ' প্রবঙ্গে' ত্রিপুর রাজাদের রাজ্য স্থাপিত হয়। এই প্রবঙ্গ বা ত্রিপুরা লইয়া একটি প্রদেশ 'সমতট' নামে পরিচিত ছিল। যশোহর খুলনার ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে শীতল চক্রবর্তী লিখেছেন— " যাহাকে আমরা উপবঙ্গ বলিয়াছি, বৌদ্ধযুগে তাহারই নাম হয় সমতট। ইহা সমুদ্র হইতে পদ্মা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উপবঙ্গ অগ্নিকোণে বর্তমান ছিল বলিয়া বৃহৎ সংহিতায় উল্লিখিত হইয়াছে। রাজমালায়ও ত্রিপুরা

অগ্নিকোণবর্তী দেশ বলিয়াই কথিত হয়। ইহাতেও উপবঙ্গ যেমন ত্রিপুরাকে বুঝায় তেমনি সমতটও বিশেষরূপে ত্রিপুরাকে বুঝায় (পৃঃ ৮৪)।" সুতরাং পূর্বতন ত্রিপুরা জল-স্তনিত। বিশেষকরে পরবর্তীকালেও রাজ্য বিস্তার ও রাজ্য রক্ষার জন্যে সমতল বঙ্গে তাঁদের যেতে হয়েছে বার বার। কাজেই সোনার পাল গুটিয়েও সোনার বাঙলার সঙ্গে সন্ধি ও সংঘাতে থাকতেই হয়েছে তাদের। শত্রুর মোকাবিলায় শত্রুর সমকক্ষ প্রস্তুতি চাই। কাজেই পর্বত বেষ্টিত রাজধানীর একমাত্র জল- পথটিকেও নিরাপদ রাখার আয়োজন চাই। বঙ্গের জলপ্লাবিত অঞ্চলপতিদের নিরাপত্তার জন্যে, রয়েছে নৌবহর। এদের প্রতিহত করা, আক্রমণ করার জন্যেও প্রয়োজন নৌযুদ্ধের দক্ষতা, নৌবহর, নৌসেনা। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে নৌবহর রাখার উপযুক্ত জায়গা কোথায় এক সুখ সাগর ছাড়া? তাছাড়া কাছেই তো রয়েছে নৌসৈন্য প্রেরণের জন্য গোতমতীর জলপথ।

এবার রাজধানী উদয়পুরের কাছাকাছি নৌবহর রাখার নিরাপদ পোতাশ্রয়ের সন্ধান করি। গোমতীর দক্ষিণ পারে রাজবাড়ী। বিপরীত পারে উঁচুটিলা (বর্তমানে সাহেবের টিলা বা রামবাবুর টিলা নামে এর পরিচয়) এই উঁচু টিলার উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার বেশি নয়। দক্ষিণ প্রান্তের শুরু রামঠাকুর আশ্রমের সীমানা শেষ। তারপর থেকে জামজুড়ি পর্যন্ত পুরো গোমতী পথই নিম্ন সমতল ভূমিতে। উদয়পুর শহর থেকে জামজুড়ি পর্যন্ত গোমতীর বাঁদিকে দক্ষিণ - পশ্চিম উত্তর জুড়ে বিরাট বেষ্টনী নিয়ে সুখ সাগর। গোমতীর জল ঐ নিম্নভূমিতে ঢুকে যেত। ঐ নিম্নভূমিতে জমে যাওয়া জলই সৃষ্টি করে সুখ সাগর হ্রদ। সমুদ্রের ব্যাক লগ্ ওয়াটারের সৌন্দর্য দেখতে আমরা চিল্কা হ্রদে নৌকা বিহারে যাই। কেরলের কোচিতে যাই। সুখ সাগর তো গোমতীর ব্যাক লগ্ ওয়াটার বা জমে যাওয়া জল। গোমতী ছাড়াও ছোট - বড় আটটি ছড়ার জলে পুষ্ট এই হ্রদ। এই হ্রদে এখন আর ঘটি ডোবে না। ছড়াগুলির বয়ে আনা পলি আর বালুতে হ্রদের বুক উঁচুতে উঠে গেছে। এখন কেবল বর্ষায় নয়নাভিরাম জলের বিস্তার। বাকি সময় জল বিরল দৃষ্ট। এখন সুখ সাগর আবাদি ভূমি। উর্বর শস্যক্ষেত্র। ৭০/৭৫ বছর আগেকার পাড়ছোঁয়া জলরাশি তার ভয়মিশ্রিত সৌন্দর্য এখন সবই কষ্টকল্পনা।

গোমতীর সঙ্গে সুখ সাগরের সখ্যতা এতটাই নিবিড় ছিল যে, মাঝে মাঝেই গোমতী অস্থির হয়ে প্রতিবন্ধকতার বেড়া ভেঙে সুখ সাগরকে জড়িয়ে ধরতে চায়। ১৯৮৩ সনের প্রবল বন্যার সময়ে এমনই মরীয়া উদ্যোগ নিয়েছিল গোমতী। জগন্নাথ দিঘির উত্তর পাড় ভেঙে সুখ সাগরে আছড়ে পড়তে চেয়েছিল। মানুষের প্রতিরোধ তাকে আটকে দেয়।

এখন যে মরা গাঙ, ভাঙার পাড় অনুরূপ অতীতকেই তো মনে করায়। রাজনগর, জামজুড়ি, গাঙফিরা, অপর পাড়ে শালগড়া, আমতলীর বাঁধ আর লোলুঙ্গা থেকে ডাকমা দুলার বাঁধ এসবের বয়তো মাত্র ৪/৫ দশক। জামজুড়ি স্কুলের পাশ দিয়ে একটি জলস্রোত গোমতী আর সুখ সাগরকে এখনো যুক্ত রেখেছে। এই খাল দিয়েও গোমতীর জল ঢুকত সুখ সাগরে আবার নদীর জলে টান পড়লে, সুখ সাগরের জল গোমতীতে মিশত এই খাল দিয়ে। ব্রজেন্দ্র দত্ত তার বিবরণ - এ লিখেছেন " সুখ সাগর পুর্বে ইহা একটি হ্রদ ছিল। ইহার এক প্রান্তে ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ী অপর দিকে জামজুড়ি, সুখ সাগরের জল গমনাগমনের নালাকে প্রচলিত কথায় 'জান' বা 'জুড়ি' বলা হত। দুই-এর মিশ্রণে 'জামজুড়ি ' নামের উৎপত্তি।

বিশাল জলাধার গোমতীর সঙ্গে অবাধ সংযোগ কাজেই সুখ সাগরই নৌবহর রাখার উপযুক্ত স্থান হতেই পারে। সুখ সাগর রাজধানীর অতি নিকটে। রাজকীয় নৌবহর পোতাশ্রয়ের এর চেয়ে উৎকৃষ্ট স্থান আর কোথায়? বিজয় মাণিক্যের নৌবহর সুখ সাগরেই থাকত।

বিজয় মাণিক্য বঙ্গদেশ আক্রমণের সময় বিশাল নৌবহর ব্যবহার করেছিলেন। কৈলাশ সিং - এর রাজমালায় উল্লেখ আছে " তিনি ২৬ সহস্র উৎকৃষ্ট পদাতি এবং পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী এবং কতিপয় ওলন্দাজ সেনার সঙ্গে পাঁচ সহস্র নৌকা নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করেছিলেন। প্রথমে সোনার গাঁওর মুসলমানদিগকে পরাজিত করেন। তথা হইতে লাক্ষা নদী অতিক্রম করিয়া গঙ্গার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। নদী তীরবর্তী গ্রামগুলি লুণ্ঠন করেন। প্রচুর অর্থ এবং কতিপয় সুন্দরী রমণী সংগ্রহ পূর্বক ব্রহ্মপুত্র নদে উপস্থিত হইয়া, ধন এবং স্ত্রীলোকদিগকে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন (পৃঃ ৫৪)।"

নদী ও জলাভূমিতে বেষ্টিত বঙ্গদেশ বিজয়ে এবং সেদেশের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করতে নৌবহর যুদ্ধের আবশ্যিক সংযোজন।

হাজার বছর আগে খোদ রাজধানীর সমতল অংশ যা বর্তমানে উদয়পুর শহর তার ভুপ্রকৃতি কেমন ছিল? উদয়পুর সরোবর শহর। এই সরোবরের আধিক্য বিষয়ে খোঁজ নিলেই অতীত অনেকটাই ফর্সা হয়ে যায়। গোমতীর গতিপথ বর্তমান খাতে ছিল না। মরাগাঙ -এর উৎস ও উৎপত্তি এই তথ্যই দেয়। দিঘিগুলির অবস্থানও লক্ষণীয়। যা বর্তমানে সাহেবের টিলা তার উত্তর প্রান্ত সমতল এবং গোমতীর পাড় এখানে খুবই নীচু, নদী স্ফীত হলে পাড় সংলগ্ন জায়গা ডুবে যেত। খানিকটা পশ্চিমমুখী হাঁটলেই অমর সাগর - অমর সাগর মিলেছে সুখ সাগরে। আবার জগন্নাথ দিঘি- গোমতী আর সুখ সাগরের সখ্যতায় এখন কৃত্রিমভাবে মানুষ বেড়া তুলেছে। সুখ সাগরের পাড় ধরে দক্ষিণে চলতে গেলে, বর্তমান শঙ্কর টিলা পেরিয়েই পশ্চিমে সুখ সাগর, পূবে ধনী (ধন্য) সাগর। মাঝখানে ধনী সাগরের উঁচু পাড়। ধনী সাগরের দক্ষিণ পাড় গিয়ে ঠেকেছিল আরো একটু দক্ষিণের জলাশয়ে কবিরাজ টিলার নীচ পর্যন্ত। ধনী সাগরের দক্ষিণ পাড় ঐ ক্ষুদ্র জলাশয়কে ধনী সাগর থেকে বিভক্ত করেছে। সুখ সাগরের পাড় ধরে দক্ষিণে হাঁটতে থাকলে দুই নং ফুলকুমারীতে প্রায় ত্রিপুরা সুন্দরী টিলার পাদদেশ পর্যন্ত জলাভূমি। আরো দক্ষিণে সেখানে রয়েছে বুড়া দিঘি। আবার মহাদেব দিঘি আর সাহেবের টিলার মাঝখানে রয়েছে কুমারী ঢেবা। মায়ের বাড়ির দক্ষিণে রয়েছে চন্দ্র সাগর। সবই সুখ সাগরের খণ্ড বিচ্ছিন্ন অংশ।

এবার কিছু বড় দিঘির দৈর্ঘ্য - প্রস্থের হিসেব নিতে হয়। কল্যাণ সাগর ৪৪০ x ২৪০ হত; বুড়া দিঘি ১১২০ x ৪৪০ হাত, চন্দ্র সাগর ১০১১x ৫৯২ হাত; অমর সাগর ২৪৫৬ x ৬০৪ হাত; বিজয় সাগর বা মহাদেব দিঘি ৫০০ x ৩০০ হাত; জগন্নাথ দিঘি বা পুরাণ দিঘি ১৫০৮x ৪৩৬ হাত; ধনী সাগর ১৬০০ x ৪৮০ হাত। দুই আড়াই বর্গমাইল স্থানে এত জলাশয় খননের প্রয়োজন হল কেন? রাজাদের স্থায়ী কীর্তির বাসনা? জলাশয়ই কি একমাত্র মাধ্যম? প্রজাহিত? তখন এত জল ব্যবহারের জন্য এত সংখ্যক প্রজা কোথায়? আসলে বর্তমান উদয়পুর শহর সবটাই ছিল নিম্নভূমি, জলাভূমি। নিম্নজলাভূমিতে বাঁধ তৈরী করে এই সব বৃহৎ জলাশয় তৈরী হয়েছে । জলদান তো পাবে মানুষ, তাহলে মানুষ আগে পরে

জল। অবশ্য সৃষ্টিতত্ত্ব বিপরীত কথা বলে। জল থেকে জীবের সৃষ্টি। জীব জন্মের পরতো বিপরীতটাই বাস্তব।

আমরা দেখছি জনবিরল রাজধানীতে জনবসতি গড়ে তোলার চেষ্টা। প্রথম রত্ন মাণিক্যের সময় থেকে। শহর বিস্তৃতি তখনকার প্রযুক্তিতে পাহাড়ী অঞ্চলে কঠিন ছিল। রাজবাড়ির পূর্ব অংশ গোমতীর দক্ষিণ পাড় তো পাহাড়। আর শহর বিস্তারের জন্য প্রয়োজন ছিল বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষের সহ-অবস্থান। প্রথম রত্ন মাণিক্য বঙ্গদেশ থেকে 'নব সক' -দের এনে প্রথম ব্যাপক উদ্যোগ নিলেন। সমতলের লোক, আবাদি ভূমি ছেড়ে পাহাড়ে আসবেন কেন? সুতরাং সমতল ভূমি চাই। তাও আবার রাজধানী সংলগ্ন। সেই সমতল তো বর্তমান উদয়পুর শহর। এই স্থান জলমগ্ন। কীভাবে বসতি হবে? সুতরাং জমি উদ্ধার করো। উঁচু জায়গা তৈরী করো। সহজ সমাধান হল স্থায়ী জলাশয় খনন করা। চারদিকে বাঁধ দিয়ে সহজেই তা করা সম্ভব। বৃহৎ আয়তনের নিম্নভূমির মাটি কেটে পাড় তৈরী করে এর সমাধান সম্ভব হল। বর্তমান শহরের রূপবিন্যাস তো ঐ রকমই। জলাশয়গুলির পাড়ে পাড়ে জনবসতি, বাণিজ্য কেন্দ্র, প্রশাসন কেন্দ্র সবই। এটি কষ্টকল্পিত নয়। অনুমানও নয়। বাস্তব।

সুতরাং রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ অংশে যেখানে জলাভূমির বিস্তার, আবার সমতলে যাওয়ার বা সমতল থেকে রাজবাড়ির বুকে ঢুকে যাবার পথেও রয়েছে নদী সুতরাং প্রতিরক্ষার জন্যে নৌবহর তো থাকবেই।

মহাদেব বাড়ি ও সাহেবের টিলার মধ্যবর্তী স্থানে অনেকগুলি ছোট জলাশয় যা আবার পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ঐসব জলাশয়ের সমষ্টিই হল কুমারী ঢেপা। নদী পেরিয়ে এসে রাজকুমারীরা এইসব জলাশয়ে নৌকা বিহার করতেন। এক শতাব্দীর আগের একটি প্রবাদের উল্লেখ করেছেন ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। প্রবাদটি ছিল " তালবাগ নদী হইবে, ফুলকুমারী ভরাট হইবে, কুমারী ঢেপা আবাদ হইবে, পোলা রাজা হইবে এবং উদয়পুর আবার রাজধানী হইবে। প্রবাদের ঐ অংশ 'ফুলকুমারী ভরাট হইবে' এই কথাটি কি নিম্নজলাভূমির তত্ত্বকেই সমর্থন করে না? দিঘি খননের পেছনে প্রজাহিতকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। এই সঙ্গে জুড়তে হবে পুরো অঞ্চলই ছিল মার্সিল্যান্ডদিঘি খননের দ্বারা ঐ মাটির সাহায্যে জলাভূমি উঁচু করে শহর সৃষ্টির উপযোগী করা হয়েছে। সুখ সাগর ছাড়া ৫০০০ নৌকা বিজয় মাণিক্য কোথায় রেখেছিলেন? কোথায় এত বৃহৎ জলাশয় এরাজ্যে?

কৃষ্ণমণিই যবনিকা টানলেন

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে উদয়পুর (পূর্বতন রাঙামাটি) চিরকালের জন্য ত্রিপুরার রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হল। মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য (কৃষ্ণমণি) সমসের গাজীর বাহিনীর তাড়া খেয়ে প্রথমে বনে, পরে আগরতলায় আশ্রয় নেন। অতঃপর ত্রিপুরার রাজধানী, উদয়পুরের পরিবর্তে আগরতলাতেই এবং এখনো ১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ত্রিপুরা ভারতভুক্তির পরেও, ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলাতেই রয়ে গেল।

কৃষ্ণ মাণিক্যের উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থানান্তরের কোন পরিকল্পনা ছিল না। পরিস্থিতির কারণেই তাঁকে তা করতে হয়েছিল। পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল দক্ষিণ সিকের উঠতি জমিদার সমসের গাজীর তাড়না যাকে ত্রিপুরা আক্রমণে সাহস যুগিয়েছিল উদয়মাণিক্যের ভাইয়ের ছেলে বনমালী ঠাকুর। বনমালী ত্রিপুরা রাজ্যের 'বনমালী' হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাই সমসেরের সঙ্গে জোট বাঁধেন। সমসের ছিলেন বনমালির উচ্চাশার সঙ্গী। বঙ্গের শাসক বর্গের কাছে বনমালী প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় সমসের ভিন্ন তাকে ত্রিপুরা সিংহাসনে যেতে সাহায্য করার কেউ ছিল না। সমসের 'বনমালী'কে লক্ষ্মণ মাণিক্য নামকরণে রাজ শিরোপা দিলেন। জমিদার রাজাকে সনদ দিল। কিন্তু ত্রিপুরার সিংহাসন জয় করে ঐ সিংহাসনে বনমালীকে বসাতে ব্যর্থ রইলেন। হয়তো সমসের বনমালীকে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসাতেই চাননি। নিজেই বসতে চেয়েছিলেন। এই ভাবনার কারণ হল, দক্ষিণ সিকের জমিদারী জমিদার ও তার ছেলেকে হত্যা করেই তিনি দখল করেছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমসের ত্রিপুরার সিংহাসন মুক্ত করে, অন্য কাউকে তাতে বসাবেন তা তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে খাপ খায় না। উদয়পুরে থিতু হওয়ার আগেই সমসেরকে কিন্তু উদয়পুর থেকে সরতে হয়। তার প্রমাণ হল তিনি লক্ষ্মণ মাণিক্যকে উদয়পুরে আনেন নি, নিজেও লুঠপাটের অধিক কাল উদয়পুরে থাকতে পারেননি। থাকতে পারেন নি বলেই; নিজেকে অথবা লক্ষ্মণ মাণিক্য কাউকেই গদীয়ান করতে পারেননি। লুঠপাটের ও গণহত্যার নিষ্ঠুরতা ছাড়া ত্রিপুরার জনমনে কোন ছাপও রাখতে পারেন নি।

যদি তিনি কৃতকার্য হতেন নিজে না হউক চুক্তি মোতাবেক অন্তত লক্ষ্মণ মাণিক্যকে তিনি ত্রিপুরার ভূমিতেই থিতু করতেন "এক অভিনব সিংহাসন প্রস্তুত পূর্বক" লক্ষ্মণ মাণিক্যকে "তাহাতে স্থাপন করলেন" তা করতেন না। গোবিন্দ মাণিক্যের রাজপ্রাসাদ যা কৃষ্ণ মাণিক্য ছেড়ে গেছেন, তাতেই 'লক্ষ্মণে'র অভিষেক হত। এই "অভিনব সিংহাসন" নিশ্চিত ভাবনার জন্ম দেয় যে যদি ত্রিপুরা পূর্ণ জয়ও করতেন তবুও ভিখারী 'বনমালী'কে রাজ তখ্‌তে বসতে সমসের দিতেন না।

সামসেরের উত্থান হয়েছিল কৌশলে। বিজয় মাণিক্যের উজীরকে উৎকোচে বশ করে (কৈলাশ সিংহ) চাকলা রোশনাবাদের সনদ গ্রহণের মধ্যে। বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর তিনি রাজকর বন্ধ করে চাকলা রোশনাবাদের জমিদার বলে ঘোষণা দিলেন। যুবরাজ কৃষ্ণ মণির অকর্মণ্যতা, বার বার যুদ্ধক্ষেত্র সামসেরের কাছে পরাজয় শিকারে তাকে বাধ্য করে। এবং

তিনি উদয়পুর ছেড়ে অরণ্যে আশ্রয় নেন। বনপথে আগরতলা পৌছান। ঐ সময়ে দীর্ঘকাল তিনি সৈন্য সংগ্রহের চেষ্টা করেন, কাছাড় ও মণিপুরেও যান কিন্তু প্রয়োজনীয় সৈন্য সংগ্রহেও ব্যর্থ হন। কিন্তু তখন সমসের কোথায়? গোবিন্দ মাণিক্যের প্রাসাদ ,উদয়পুরে তো তিনি নেই! সমসের সমতল ত্রিপুরাতেই তরবারি শান দিচ্ছেন।

সমসের সম্পর্কে এই মূল্যায়ন কোন কল্পিত কিছু নয়। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত হল " বিলোনীয়ার দিক থেকে সমসের গাজী দুইবার উদয়পুর আক্রমণ করেছিলেন। মহেশ পুষ্করিণী থেকে উদয়পুর পর্যন্ত রাস্তা ছিল। সোনাতোলা পাথর, মুণ্ডমালা, গাভারী, কিল্লা প্রভৃতি প্রাচীন স্থানের মধ্য দিয়ে এই পথে সে (সামসের) সেকালের রাজধানীতে (উদয়পুর) প্রবেশ করেছিল। গাজীনামার মতে মহেশ পুষ্করিণী পথেই রাজকীয় বাহিনী পরাস্ত করে সমসের উদয়পুরে প্রবেশ করেছিল। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, সমসের এই পথে আক্রমণ করে রাজধানী দখল করতে পারেননি।" ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন, সমসের দুইবার এই পথে অকৃতকার্য হয়েছেন। গাজীর কোটপথেই সাফল্য পান (পৃঃ ৮৩)।

এবার গাজীনামার পাঠ আমাদের চোখ খুলে দিতে পারে

" এথ দেখি মণিপুরি রাজ সৈন্যগণ।
উদত্রপুর মোহারাজা লই ততক্ষণ।।
ধাই পই গেল তারা সব আগরতলা (য়)।
গাজীর দিগের সৈন্য তবে বাহুড়ী খেলাম।।
উদয়পুরে রাজসৈন্য দিসাভ্রম হইয়া।
কেহ বনে কেহ স্তলে গেল পালাইয়া।।
উদয়পুরে রাজধন যতেক আঁছিল।
সমসের গাজীর সৈন্য সব লুটি নিল।।

এই বিবরণের পর বলতে হয় " কোথায় সে রাজা? কোথা রাজধানী?"

গাজীনামার এই অংশ থেকে পরিষ্কার যে, সমসের বনমালীকে শিখণ্ডী করে উদয়পুরের ঐশ্বর্য লুঠ করতেই এসেছিল। সে সাফল্যও পেয়েছিল কৃষ্ণমাণিক্যের সঙ্গে উদয়পুরে কোথাও সমসেরের যুদ্ধ হয়েছে, সেই উল্লেখ কোথাও নেই। কৃষ্ণ মাণিক্যের পরাজয় ঘটেছিল মহেশ পুষ্করিণীতেই। সমসের উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হলে তিনি পালিয়ে যান। অরক্ষিত রাজধানী সমসের লুঠ করে, রাজবাড়ি ও রাজকোষ লুণ্ঠন করে। ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এটাই সমসেরের বীরোচিত সাফল্য। তবে ঐতিহাসিক বাস্তবতা যা তা হল সমসের মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্যকে সিংহাসন ছাড়া, রাজধানী ছাড়া করে। ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দের ঐ ঘটনা। ১১৭৫ বছরের দীর্ঘ রাজধানীর গৌরব রাঙামাটি তথা উদয়পুর হারাল। ব্রজেন্দ্র দত্ত তাঁর উদয়পুর বিবরণীতে লিখেছেন— " রাঙ্গামাটি অধিকার করিয়া রত্নপুরে রাজধানী স্থাপন করা, ত্রিপুর নরপতিগণের যেরূপ গৌরবজনক বিষয় হইয়াছিল, মুসলমানদিগের আক্রমণ (সমসের) সময়ে উদয়পুর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়াও তাহাদের পক্ষে তদ্রুপ অত্যন্ত বিষাদপূর্ণ সংঘটনা হইয়া থাকিবে।" তিনি বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও "২৫/৩০ বৎস পূর্বে (উদয়পুর বিবরণী ছাপা হয় ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে) উদয়পুরের আদিম অধিবাসী প্রাচীনদের নিকট ঐ সকল বিষয়ে করুণ

সঙ্গীত শুনা যাইত' উল্লেখ করে একটি গ্রাম্য গানের অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। গানটি হল —

" রাজা কৈ গেলারে!
তোমার সোনার উদয়পুর কারে দিলারে।
কতদূর গিয়া রাজা ফিরে ফিরে চায়,
আমার সোনার মোড়া পাল্কী মোগলে দৌড়ায় —
দুঃখ রহিল রে!"

সমসের সম্পর্কে একটি মত হল — " Samsher Gazi was the representative of the peasents, workers and down-trodden people of Tripura. The striggle lunched by Samsher Gazi initiated the dawn of political consciousness among the exploited, neglected peasents and workers of Tripura. This was for the first time that the people became conscious as to their rights. They could imbibe that the people are the real soverign and they can change the government lunched by Samsher Gazi instilled democratic conciousness for first time in the minds of the people of Tripura, [Tripura of eighteen century with Samsher Gazi, against Feudalism — a Historical study — Bibhas Kanti Kilikdar)".

১৮৭১ খ্রিঃ প্যারিকমিউন। ফিউডালিজম বা সামন্ততন্ত্র থেকে মুক্তির প্রথম স্ফুলিঙ্গ সমাজ বিবর্তনের নিয়ম অনুসারী, যার পরবর্তী ধাপ ধনতন্ত্র। আর রাষ্ট্র কাঠামোর জন্যে গণতন্ত্র। উদার ধনতন্ত্রীরা শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির দিশা দেখিয়েছিল সেদিন। শ্রমিক আর উদার ধনতন্ত্রীরা যুক্তভাবে কাজ করেছিল সেদিন।

সমসেরের মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে। প্যারীকমিউনের একশত এগার বছর আগে। কিন্তু ইতিহাস নিশ্চিতভাবেই কিলিকদার মহাশয়ের বীক্ষণ ও বিশ্লেষণ ঠিক হলে, সমসের গাজীর প্রতি খুব অন্যায় অবিচার করেছে। ১৮৪৮ খ্রিঃ মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো লেখার সময়ও সমসেরের প্রতি ঘটিয়েছেন দ্বিতীয় অবিচার। বুর্জোয়া ঐতিহাসিকেরা সমসেরকে কিডন্যাপ করতে পরেন। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানী মার্কস? এতবড় ঐতিহাসিক কাজ সমসের সম্পন্ন করলেন বিশ্ব ইতিহাসে যা প্রথম দিগ্-দর্শন, অথচ একশত এগার বছর পরের একটি ক্ষুদ্র ঘটনাকে (কারণ প্যারী কমিউনের অস্তিত্বকাল ছিল স্বল্প আর সমসেরর শ্রমিক-কৃষক যৌথ ফ্রন্টের ক্ষমতা ছিল বেশ কয়েক বছর। সর্বহারারা সমসেরের নেতৃত্বে শাসন কায়েম রেখেছিল) বিশ্বের সমাজ ও রাজনীতির পরিবর্তনের প্রথম দিগ্- দর্শন বলেছিলেন। এই কাজ মহামতী এবং অগ্রণী পণ্ডিত মনীষার যোগ্য কাজ হয়নি। তবে অগ্রণী জনগণের সান্ত্বনা এই যে Better late then never, শেষ পর্যন্ত লেনিনের পূর্বসূরী সমসের বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে উপযুক্ত বিশ্লেষণ পাদপ্রদীপের তলায় এলেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে লেনিন, মাও-সে-তুং, হোচিমিনের পূর্বসূরী সর্বহারার এই রাষ্ট্রনায়ক কি প্রাচ্যের বলে বা বাংলা ভাষাভাষী বলে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সমাজ বিজ্ঞানীদের ঈর্ষাতুর উপেক্ষার শিকার হয়ে রইলেন? ভারতের ইতিহাসও মার্কস গুলে খেয়েছেন! ইত্যাকার কথা বলার প্রেক্ষিত হল কতিপয় গবেষকের

বিশ্লেষণের যথার্থতা নিয়ে সংশয়। সুপ্রকাশ রায় সমসের বিষয়ে যৎসামান্য ইঙ্গিৎমাত্র রেখেছেন। সমসেরের বিশাল, ঐতিহাসিক কর্মকাণ্ডের, তাঁর শ্রেণীচেতনা ও শ্রেণীবিপ্লবের নেতৃত্বের বিষয়ে স্বল্পবাক্ থেকেছেন। তিনি সার্বিক বিশ্লেষণে যাননি, বা অন্য কেউ।

এবার সমসেরের কথায় আসি। দক্ষিণ সিকের 'কুঞ্জারা' গ্রামে ১৭১০ সমসেরের জন্ম। এক দরিদ্র ফকির পীর মহম্মদ তার পিতা। দরিদ্রতাবশত পীর মহম্মদ তার ছেলেকে দক্ষিণ সিকের জমিদার নছির মহম্মদের কাছে বিক্রি করে দেন। জমিদার তাকে ক্রীতদাস না করে তাকে নিজের ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়া শেখান। পাঠ সমাপনান্তে জমিদার তার নিজের জমিদারীতেই তহশিলে চাকুরী দিয়ে গ্রাসাচ্ছনের ব্যবস্থাও করে দিলেন। সেখানেই তার চেতনার উন্মেষ। তার জমিদার বনার বাসনা জাগে। জমিদারীর সনদ তো কিনতে হয়। তার জন্যে অর্থ চাই। অতএব, তার মনোযোগ গেল অর্থ সংগ্রহে।

অসুবিধা হল না, হবার কথাও নয়। কারণ তহশিলদারের স্বর্ণপ্রসূ হাতিয়ার তার মুঠোয়। ঝাঁকালেই টাকা। (Soon he realised that money was to be collected) এবং অর্থ যখন জোগাড় হল — ' he hit upon a plan. Oneday he went to the 'Zamindar and expressed his desire to marry the latter's (Samsher) daughter" । জননায়ক সমসের বৈবাহিক সূত্রে জমিদারীর মালিক হতে চাইলেন। জমিদার সমসের মহম্মদের সামন্ত অহমিকায় তা আঘাত দেয়। সমসেরকে তিনি তাড়িয়ে দেন। এবার সমসের ভিন্ন উপায়ে জমিদারী দখলের উদ্যোগ নিলেন। তিনি অস্ত্রধারী একটি বাহিনী গঠন করলেন নাছেরের প্রজাদের লুঠ করা অর্থ দিয়ে। একদিন অকস্মাৎ আক্রমণে সপুত্র নাছের মহম্মদকে খুন করেন। কিন্তু জমিদার খুন করেই তো জমিদারী পাওয়া যায় না। এবার প্রয়োজন সনদ। সনদের জন্য প্রয়োজন অর্থ। অর্থ তার সংগ্রহে ছিল। এবার দলবল নিয়ে ডাকাতি করে সেই অর্থবল আরো বাড়ালেন। (তাহার অর্থের অভাব উপস্থিত হইলেই, ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের দুর্বল জমিদারদের গৃহে দস্যুবেশে প্রবেশপূর্বক অর্থ সংগ্রহ করিতেন — কৈলাশ চন্দ্র সিংহ)। এবং সমসের মহারাজের উজীরকে অর্থবলে বশ করিয়া " কয়েক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে দক্ষিণ সিকের জমিদারী সনদ হস্তগত করেন।" এবার হলেন দক্ষিণ সিকের জমিদার।

কোন কোন গবেষক সমসেরের উত্থান পদ্ধতিকে 'গণউত্থান" বলে মনে করেন। সমসেরের ছয় হাজার সবল ও দক্ষ সৈন্যের তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, এরাতো সবাই ছিল বেতন ভুক। হ্যাঁ, এদের তিনি কৃষক শ্রেণী থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন। এখনো যেকোন দেশের রাষ্ট্রীয় সৈনিক তারাও তো ঐ শ্রমিক-কৃষকশ্রেণী থেকেই সংগৃহীত। সমসের অন্য শ্রেণীর লোক কোথায় পাবেন? এরা জমিদার নাছেরকে খুনেরও সহায়ক । এরা সমসেরের হয়ে ডাকাতিতে অংশ নিত। এরা সমসেরের জমিদারী রক্ষার কাজে ব্যবহৃত হত; উচ্চাশা পূরণে সমসেরের সহায়ক বাহনী হিসেবেই কাজ করত।

তহশিলদার হিসেবে প্রজার অর্থ লুঠ, ডাকাতি করে অর্থ লুঠ — এইভাবে অর্থবলে বলীয়ান হয়ে জমিদার খুন করে জমিদার হওয়া, এর কোন পর্বেই জনতা ছিল না। কৃষক শ্রমিকের ভূমিকাও নেই। তবে এই খুন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার একটি ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা এতে আছে। নাছেরের সুন্দরী কন্যার প্রতি তার লোভ। তার মনে হয়ে থাকতে পারে জমিদার কন্যার

উপর অধিকার পেতে হলে অর্থবলে সমকক্ষ হতে হবে। অতএব তহশিলের তহবিল লুঠ। কিন্তু ঐ অর্থও যখন তার উদ্দেশ্য চরিতার্থ করল না; জমিদার তার কন্যাকে তার অধীনস্তের হাতে সঁপে দিতে অস্বীকৃত হলেন, বরং ক্রোধ প্রকাশ করে শাস্তি দিতে চাইলেন তখন জাগল ঈর্ষা। ঐ ঈর্ষা থেকেই জমিদারকে সপুত্র হত্যার উন্মাদনা। আর এর পরবর্তী ধাপ হল নিজেই জমিদার বনে যাওয়া। বাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হল। এবার অর্থ দিয়ে ত্রিপুরার মহারাজার উজীরকে স্বমতে বশ করলেন। মহারাজ বিজয় মাণিক্যকে সমসেরের বশংবদ উজীর পটকালো। মহারাজ দক্ষিণ সিকের জমিদারী সনদ সমসেরের অনুকূলে দিয়ে দিলেন।

ততদিনে তার পৌরুষ অন্য খাতে ছুটছে। এবার " রাজা" হতে হবে। বিজয় মাণিক্য মারা যেতেই তার সামনে সুযোগ এল। যুবরাজ থাকতেই কৃষ্ণমণি সমসেরের পরাক্রমের কাছে পরাভূত হয়েছেন। এবার সিংহাসন নিয়ে বিরোধ। সমসের পক্ষভুক্ত হলেন। উদয় মাণিক্যের ভাইয়ের ছেলে 'বনমালী' ত্রিপুরার সিংহাসন লাভে প্রলুব্ধ তাকে হাতের পুতুল করলেন গৌড়েশ্বরের কাছে পাত্তা না পেয়ে প্রবল জমিদার সমসেরের আনুগত্য ক্রয় করলেন। ঐ বিবাদের সুযোগ নিয়ে " বনমালীকে ব্যবহার করে তার নিজেরই ত্রিপুরাধিপতি হওয়ার বাসনা হল। জমিদার থেকে "রাজা"। বনমালীর কাছে তার বাসনা গোপন। বনমালী রাজা হওয়ার উত্তেজনায় তখন ফুটছেন। এক জমিদার সমসের তাকে রাজা উপাধি দিল, এই চেতনা তাকে পীড়িত করেনি। মান-অপমানবোধও বনমালী বিস্মৃত। 'বনমালী' লক্ষ্মণ মাণিক্য হলেন। সমসের রাজা হওয়ার উপায় খুঁজছেন। ত্রিপুরা আক্রান্ত হল। উদয়পুর লুঠ হল। ব্যাস ঐ পর্যন্তই। দুইবার ব্যর্থ হয়ে তৃতীয়বার তিনি লুঠে সফল হলেন। ঐ লুঠে ত্রিপুরার তথাকথিত " সামন্ত শোষণ থেকে মুক্ত হতে চাওয়া" কিন্তু মুক্ত-সচেতন জনতা কোথায়? এই পর্যন্ত পৌঁছাবার প্রতিটি স্তরে কোথাও জনতা নেই। গাজীনামার চাইতে সমসের সম্বন্ধীয় আর কী বিশ্বস্ত বিবরণ গাজীর জন্যে লিখতে পারে? সেই গাজীনামার লেখক লিখলেন "গাজীর দিগের সৈন্য" গাজীর সমর্থক " জনতা", কিন্তু লিখেলেন না।

যাকে গবেষকরা সমসেরের গণ মিলিশিয়া বলছেন তাদের প্রথম কাজটা কী হল? " নাছের মহম্মদ (জমিদার)-এর সুন্দরী কন্যাকে লুঠ করে, সমসেরের অঙ্কশায়িনী করার দুষ্কর্মে সমসের সাহায্য করা। জনতার মুক্তি দাতা জন-নায়কের, শোষণ মুক্তির এই উপায় ও কর্মধারা দুঃখের বিষয় কোথাও স্থান পায় নি। হেলেনকে নিয়ে ট্রয়ের যুদ্ধ হয়েছে। ঔরঙ্গজেব নারী লিপ্সা চারিতার্থ করতে অহেতুক অন্যের রাজ্য আক্রমণ করেছেন, ইত্যাকার নজির ইতিহাসে অসংখ্য। সমসেরের উত্থান-পর্বের প্রথম চেষ্টাটির সঙ্গে ইত্যাকার ঘটনার মিল রয়েছে। এর সঙ্গে জনগণের মুক্তির সম্পর্ক কোথায়? জনগণই বা কোথায়? সমসেরের উত্থানে জনগণের সহায়তা ছিল না, জনগণ সক্রিয় ছিল না।

জনগণকে সামন্ত শোষণ থেকে মুক্তির জন্যই যদি তার উদ্যম হত তবে তার সংযোগ থাকত জনতার সঙ্গে। ঐ পাঠ সমসের জনতাকে দিয়েছেন, ইতিহাস এমন তথ্য লিখে যায়নি। বা যারা পরবর্তীকালে ঐ গুণসমন্বিত সমসেরকে প্রোজেক্ট করতে চাইছেন এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণ রাখতে পারেনি। সবচাইতে বড় প্রশ্ন, জনতার নেতা জনতার সম্পদ লুঠ করবেন কেন? তার লুঠ ও নির্যাতনের মাত্রা উদয়পুরে এতটাই ছিল যে রাজধানী উদয়পুর

জনশূন্য হয়ে পড়ে। তার বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহ এবং বাস্তবিকই উপজাতি প্রজাদের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজ্যপাট স্থাপনের চেষ্টা না করেই তিনি উদয়পুর ছেড়ে দ্রুত চলে যান। " People were very much eager to get free ------. They embraced Samsher's rise to power" এই কোলাকুলিটা কোথায় হয়েছিল? কে জানে। এর স্থান নির্দেশ কেউ করেননি।

কেউ বলছেন সামসেরের উদয়পুর আক্রমণের উদ্দেশ্য ছিল " to root out the feudalistic administration from Tripura" — বলতে হয় " মুখে দিলে গলে যায় আহারে কি মিষ্টি!" সামসের কৃষ্ণমণির পরিত্যক্ত সিংহাসনে বসাতে চাইলেন এক " ভিক্ষার্থী"কে যার দেহে রাজরক্ত থাকলেও ত্রিপুর রাজবংশের রক্ত নেই। উদয় মাণিক্য ত্রিপুর রাজবংশের কেউ নন। রাজার সেনাপতি রাজাকে হত্যা করে (নিজ জামাতা) সিংহাসনের জবর দখলদার। তারই ভাইপো 'বনমালী।' তাকে সিংহাসনে বসাতে চাইলেন। সামন্ত শাসন শোষণের প্রতীকই তো রাজা, জমিদার। ত্রিপুরার সামন্ত শাসন উৎখাৎ করে, সিংহাসন গোমতীর জলে নিক্ষেপ করলেন না। জনতাকে আহ্বান করলেন না তোমরা তোমাদের শাসক নির্বাচন কর। বা স্থির কর কীভাবে দেশ চালাবে। তা না করে তিনি " আভিনব সিংহাসন' বানালেন। রাজার নিয়োগপত্র দিয়ে নিজে জমিদার বনে রইলেন। সুযোগে 'রাজা' হওয়ার ফন্দি মাথায় রাখলেন। জনতা তো এর কোন স্তরেই নেই। সামন্ত ব্যবস্থা পাকা রেখে শোষণের পথ অব্যাহত রাখতে চাইলেন। সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে দাসদের যুদ্ধের যোগ্য সেনাপতিই বটে!

সমসের যদি ত্রিপুরারাজ্য লুঠপাট না করতেন, উদয়পুরে থেকে যেতেন তখন প্রগতি চৈতন্য সমসেরের অভ্যুত্থানের অন্যরকম ব্যাখ্যা পেতাম। ঘটনা তেমন ঘটেনি। বিপরীতই ঘটেছে। ক্ষমতা অর্জনের পর তিনি দাতা হয়েছেন। প্রজাদের মধ্যে নিষ্কর ভূমি দান করেছেন। সামন্ত এ্যাটিকেটের মধ্যেই পড়ে ঐ নিষ্কর প্রথা। এটা ক্ষমতাবানের হাতের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কখনো অনাবাদী জমিতে প্রজাপত্তনের জন্য, কখনো আনুগত্য ক্রয়ের জন্য, কখনো সামন্ত অহমিকা প্রর্দশনের জন্য। সামন্ত যুগে এই অস্ত্র সকল সামন্ত প্রভুই আখছাড় ব্যবহার করেছেন। একে বিজ্ঞাপনের বিষয় হিসেবেই দেখা হত। জমিদারী খরিদ করে সমসের তার জমিদারী প্রজাদের বিলিয়ে দেননি। সেই ইচ্ছাও প্রকাশ করেননি। তিনি নিষ্কর জায়গা বিলি করেছেন। কিছু দান খয়রাতি করেছেন। কিন্তু অর্থাগমের জন্য প্রজা শোষণের কাঠামো রেখেছেন।

প্রথম রত্নমাণিক্য তো বঙ্গদেশ থেকে দশ হাজার মানুষকে এনে রাজ্যে পুনর্বাসন দিয়েছিলেন। "নবশাক'দের এনে তিন পার্বত্য ত্রিপুরায় পরিপূর্ণ সমাজ গঠন করেন। " গোপমালী তথা তৈলী-তন্ত্রী-মোদক-বারুজা। কুলীল, কর্মকারশ্চ নাপিতো নবশায়ক। গোপ, মালাকার, তিলি, তাঁতী, মোদক, বারুই, কুম্ভকার, কর্মকার, নাপিত সঙ্গে শ্রীকর্ণ বা করণিক এবং প্রতিরক্ষার কাজে দশহাজর সৈন্যও এনেছিলেন। রাজধানী উদয়পুরে একটি সংহত পরিপূর্ণ সমাজ গঠনই তাঁর উদ্দেশ্য। আরো উদ্দেশ্য অনাবাদী জমি আবাদ করা। এদের অনেকেই নিষ্কর জমি পেয়েছেন, স্বল্প শুল্কেও কেউ। প্রশাসনিক সংস্কারের লক্ষ্যে তিনজন হিন্দুকেও নিয়ে আসেন। এদের দু'জন লিপি ব্যবসায়ী কায়স্থ। অন্যব্যক্তি চিকিৎসক। এদের

নাম যথাক্রমে খাণ্ডব ঘোষ, পণ্ডিতরাজ, তৃতীয় ব্যক্তি জয় নারায়ণ সেন। মুসলমান প্রজাও সঙ্গে ছিল।

ধন্য মাণিক্য কান্যকুব্জ থেকে এনেছিলেন বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামে দুই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। এরাই আদি রাজমালা রচয়িতা। এরা নিষ্কর জমি প্রাপক। রত্ন মাণিক্য সমাজগঠনের সঙ্গে শাসন সংস্কার করেছিলেন বঙ্গদেশ থেকে লোক নিয়ে এসে; সংস্কারে তারাই ছিলেন সহায়ক। নবাবী ঢং-এ প্রশাসন। অনুরূপ পদও সৃষ্টি করেন।

দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনেই আবাহন। প্রয়োজনেই বিসর্জন। প্রয়োজনে দান-খয়রাতি, খাজনা মুকুব, নিষ্কর ভূমি, রাজকোষ থেকে দাক্ষিণ্য-বিতরণ। সবই শাসন কৌশলের অঙ্গ। সব সময়েই এটাই নরমে-গরমে শাসন-কৌশল। প্রজা বশে রাখার চেষ্টা। নাম-ধাম বা সুনাম অর্জনের চেষ্টা। আবার রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা বিদ্রোহী হয়েছে। সমসের বিদ্রোহ সংগঠিত করেছেন, বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন তা নয়। তিনি ক্ষমতা ভোগের জন্য ক্ষমতা দখল করেছেন। ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য নিজস্ব কৌশল অবলম্বন করেছেন। জমিদারী দখল করে সমসের।— 'declared himself the Lord of Dakshinsk- B.K. Kilikdar'. আমি জনগণেশের দূত বলেন নি। বলেছেন আমি দক্ষিণ সিকের প্রভু বা রাজা। চমৎকার সামন্তমোচন! তিনি নিজেই বিদ্রোহী।

ইতিহাস বলে কৃষ্ণমণি যে সমসেরের ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করলেন, পরিত্যক্ত রাজধানীতে আর ফিরে এলেন না; যে সমসের তার ধনাগার লুঠ করল, প্রজার প্রাণ সংহার করল, সিন্ধুক ভাঙল, ১১৭০ বছরের রাজধানীর মায়া কাটাতে হল যার ভয়ে — সেই সমসেরের প্রতি কেমন দয়ালু দেখি। কৃষ্ণমণি রাজা হয়ে, চাকলা রোশনাবাদ ফিরে পেয়ে সমসেরের বিলি করা নিষ্কর, দেবোত্তর বাতিল না করে বহাল রাখেলেন তিনি —

" রায়ত হইয়াও কর্তা, দিয়াছে নিষ্কর।
আপনি লইলে কর লজ্জা বহুতর।।
তবে মহারাজ বহাল করিল সবার।
খয়রাত, নিষ্কর, মিনা আর দেবোত্তর।।

তিনি " ডাকাইত সমসের গাজীর সমস্ত নিষ্কর বহাল রাখিয়া মহত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন (কৈলাশ সিংহ - ৮৬)।" এখানে মহত্ত্ব মহানুভবতা গৌণ প্রত্যক্ষ কাজ করেছে সামন্ত আভিজাত্যের অহমিকা। সমসের হয়েছিলেন 'হ্যাভ নট' থেকে "হ্যাভে" উত্তীর্ণ। তার নব্য সামন্ত অহমিকার অঙ্গ ছিল আভিজাত্যের অনুকরণ। খয়রাতি, নিষ্কর, মিনা, দেবোত্তর এ-সবই সামন্ত শাসন ও মেজাজেরই অঙ্গ।

সমসের মৃত। কৃষ্ণমণি কৃষ্ণ মাণিক্য সিংহসনে। সভাসদরা বললেন, সমসের প্রজা হয়ে নিষ্কর, মিনা, দেবোত্তর খয়রাতি বিলিয়েছে, হোক না পরের ধনে পোদ্দারি, তবু, রাজা হয়ে আপনি তা খারিজ করে দেবেন? অতএব? সামন্ত আভিজাত্য চাগিয়ে উঠল। প্রজা রাজা হতে চেয়েছিলেন, এখন অবস্থা পাল্টেছে, তিনি সমসেরের কেড়ে নেওয়া ভূবলয়ে পুনরায় অধিকার পেয়েছেন—কাজেই নব্য - সামন্তের দস্তুরের কাছে কেতায় তিনি খাটো হবেন কেন? অতএব সব বহাল।

অষ্টাদশ, উনবিংশ শতাব্দীতে অসংখ্য নজির রয়েছে দেশে অধিকাংশ কুখ্যাত ডাকাত দলের সর্দাররা জমিদারেরই ছিলেন। ডাকাতি করে বিত্ত সংগ্রহ করেছেন, জমিদারী খরিদ করেছেন, সরকারের দায় মিটিয়েছেন। সমসেরও ডাকাতি (ধনীর বাড়ি লুঠ, আর তহশিলের তহবিল লুঠ এবং পদমর্যাদার ভয় দেখিয়ে প্রজাদের বিত্ত লুঠ) করেছেন। বিত্ত সংগ্রহ করেছেন। ঐ টাকায় বিজয় মাণিক্যের উজিরকে ক্রয় করেছেন। জমিদারীর মাশুল রাজাকে মিটিয়েছেন। কিন্তু কেউ কেউ সমসেরের ডাকাতিকে গ্লোরিফাই করেছেন এই ভাষায় " Samsher, to collect money, used to rob the miser Zamindars of their treasure" । হা-ভাতের ঘরে ডাকাতি করে এমন নির্বোধ ডাকাতের কথা কেউ ভূ-ভারতে শোনেনি। বিত্ত লুঠ করার জন্যেই তো ডাকাতি। তবে ভাষার চাতুর্য হল 'ধনী' শব্দের পরিবর্তে 'কৃপণ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অধিকাংশ জমিদারই দিলেন প্রজারঞ্জক ও লুঠেরা—সাদায় কালোয় পরমেশ্বর।

সমসের বিত্ত উপার্জন করে জমিদারের সুন্দরী কন্যাটিকে সর্বাগ্রে পেতে চাইলেন। অর্থের বিকৃতি এইভাবেই প্রকাশ পায়। আবার এখনো দেখা যায় বিত্ত উপার্জন ও রক্ষার জন্যে যারা গুন্ডা পোষেন, সেই গুন্ডা মালিকের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে প্রভুর সুন্দরী কন্যারত্নটিকেই সর্বাগ্রে সোহাগ-স্নাত করে। এবং কী আশ্চর্য মিল! সমসেরের জীবনে ঠিক এই ঘটনার অবিকল্পটিই দেখা গিয়েছিল। আশাভঙ্গে 'sudden attack' করে মেয়ের ভাই ও পিতাকে হত্যা করে। যৌন প্রতিহিংসা থেকে খুনের মোটিভেশন সৃষ্টিকে অপরাধ বিজ্ঞানীরা গুরুত্ব দিয়েই বিচার করেন। নিশ্চই দৈহিক বলে পুষ্ট সমসের এবং তাদৃশ তার সাঙ্গপাঙ্গদের উপর জমিদার নাছের মহম্মদ নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এই নির্ভরশীলতাই নাছের মহম্মদের পতন নিশ্চিত করে এবং সমসেরের উত্থানের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল।

ত্রিপুরার রাজপরিবার তখন অন্তর্কলহে দীন, দুর্বল। কলহের কারণে দ্বিধা বিভক্ত রাজশক্তি। কাজেই সমসেরের সময় ছিল অনুকূল। দুর্বল রাজাকে পরাস্ত করা সম্ভব বিবেচনায় সমসেরের আক্রমণের তালিকায় ত্রিপুরাকেই রেখেছিলেন। ত্রিপুরার রাজাদের চাকলা রোশনাবাদ-এর জমিদারী প্রাপ্তির ঘটনা-পরম্পরা কৈলাশ সিংহ তাঁর রাজমালায় এভাবে উল্লেখ করেছেন " ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ ছত্র মাণিক্যের প্রপৌত্র জগৎরাম ঠাকুর বলদাখালের জমিদার আকা সাদেকের সাহায্যে ঢাকা নেয়াবতের সুবিখ্যাত দেওয়ান মীর হাবিবের সহিত মিলিত হন। মীর হাবিব ত্রিপুরা বিজয়ের উত্তম সুযোগ বিবেচনা করিয়া স্বীয় প্রভু বাঙ্গালার শাসন কর্তা " নবাব মতিমন উল মুল্‌ক, সুজঅদ্দিন মাহাম্মদ খাঁ সুজঅদৌল্লা, আসাদ জং বাহাদুর" সংক্ষেপে সুজা উদ্দীনের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক একদল বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া জগৎরাম ঠাকুরের সাহায্যে ত্রিপুরায় উপনীত হন। কুমিল্লার নিকটবর্তী স্থানে ত্রিপুর সৈন্যের সহিত মীর হাবিবের যুদ্ধ হয়। মহারাজ ধর্মমাণিক্যের উজীর কমল নারায়ণ ঘোষ বিশ্বাস সেই যুদ্ধে নিহত হন। ধর্ম মাণিক্য পরাজিত হইয়া পর্বত মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মীর হাবিব জগৎরাম ঠাকুরকে " রাজা জগৎ মাণিক্য" আখ্যা প্রদানপূর্বক ত্রিপুরার রাজা বলিয়া প্রচার করেন। প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র সমতল ক্ষেত্র জগৎ মাণিক্যের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। নবাব সুজাউদ্দিন ত্রিপুরার সমতল ক্ষেত্রকে " চাকলে রোশনাবাদ" আখ্যা প্রদানপূর্বক

বার্ষিক ৯২, ৯৯৩ টাকা কর ধার্য পূর্বক জগৎ মাণিক্যকে জমিদারী স্বরূপ প্রদান করিয়া ছিলেন। রাজা জগৎ মাণিক্যকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কুমিল্লা নগরে একদল মুঘল সৈন্য স্থাপিত হইয়াছিল।"

পরের ঘটনা হল মহারাজ ধর্ম মাণিক্য মীর হাবিবের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে মুর্শিদাবাদ গিয়ে জগৎ শেঠের সহায়তায় নবাব সুজা উদ্দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। নবাব কেবল চাকলা রোশনাবাদের জন্য বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা করের বিনিময়ে জমিদারী স্বরূপ তা ধর্ম মাণিক্যকে অর্পন করার জন্যে ঢাকার শাসন কর্তাকে নির্দেশ দিলেন। এভাবে মহারাজ ধর্ম মাণিক্য চাকলা রোশনাবাদের জন্য বাঙলার নবাবের অধীনস্থ জমিদার শ্রেণীতে সন্নিবিষ্ট হন। অতঃপর থেকে চাকলা রোশনাবাদ ত্রিপুরার রাজাদের জমিদারী হিসেবে পরিগণিত হয়। এরই অংশ বিশেষের নাছির মহম্মদের বাবা সদা গাজি মহারাজ জগৎ মাণিক্যের কাছ থেকে জমিদারী শর্ত অর্জন করেছিলেন। এই সদা গাজীর ছেলে নাছের মহম্মদকে হত্যা করেই সমসেরের তথাকথিত সামন্ত বিনাশী গণ অভ্যুত্থান! অর্থাৎ নিজেই সামন্ত হয়ে বসা।

পরিকল্পনা মাফিক সামসের সসৈন্যে ত্রিপুরার দিকে অগ্রসর হলেন। দুর্বল এবং কলহ-দীর্ণ কৃষ্ণমনি তথা কৃষ্ণ মাণিক্য সামসেরকে প্রতিরোধ করে এমন শক্তি ছিল না। অতীতেও এমনটাই দেখা গেছে। যখনই কোন প্রবল শক্তি রাজধানী উদয়পুরের দিকে আসছে, রাজা সিংহাসন ছেড়ে জঙ্গলে পালিয়েছেন। উদয়পুরে বার বার লুঠ হওয়ার সময়ও তাই দেখা গেছে। কৃষ্ণ মাণিক্যও ব্যতিক্রমী ছিলেন না। তিনি সামসেরের ভয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিলেন। অতীতে দেখা গেছে রাজারা আশ্রয় নিয়েছে কৈলাশহর বা ধর্মনগরে। কৃষ্ণ মাণিক্য এবার অরণ্য অবস্থানে না থেকে অপেক্ষাকৃত সমতলে এবং বাংলার সীমান্ত সান্নিধ্যে আগরতলায় চলে গেলেন।

শূন্য রাজধানী। অসহায় নাগরিক সমাজ। প্রজা আন্দোলনের বীর জননেতা (!) কী করলেন? না তিনি রাজা-প্রজা সকলের সম্পদ লুঠ করলেন। প্রজার নায়ক; প্রজাদের রেহাই দিল না। সামন্ত শাসন থেকে মুক্ত করতে এসে (!) জনগণমন অধিনায়ক জনতার সম্পদ হরণ করলেন। কর আদায়ের মনোযোগী হলেন। এবং জনতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাতও হলেন। ঐ প্রত্যাখ্যানের পর তিনি ইংরেজদের অনুসৃত কৌশল গ্রহণ করলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সিরাজদৌল্লাকে নিকেষ করে মীরজাফরকে নবাব পদে বসিয়ে বাংলা লুঠ করেছিল। ত্রিপুরার পার্বত্য প্রজাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে সামসের উদয় মাণিক্যের ভাইয়ের ছেলে বনমালী ঠাকুরকে 'লক্ষ্মণ মাণিক্য' আখ্যা দিয়ে, বশংবদ বিধায় ত্রিপুরার রাজা হিসাবে ঘোষণা করলেন। এক জমিদার রাজার নিয়োগপত্রে স্বাক্ষর করলেন! প্রভু জমিদারের গোমস্তা হল রাজা 'বনমালী' এবং সমসেরের শোষণেরও হাতিয়ার। বনমালীর কাজ রাজ্য শাসন নয়, সামসেরের তহবিল স্ফীত করা, এর জন্য পার্বত্য প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায়। পার্বত্য প্রজারা দুইজনের দরজাই বন্ধ করে দিল।

সমসের উদয়পুরে পৌছলেন। শূন্য সিংহাসন। রাজার কোষাগার লুঠ করলেন। অরক্ষিত রাজধানীর নাগরিকরা তার লুণ্ঠন নির্যাতনের শিকার হল। সমসের উদয়পুরে প্রশাসন কায়েম করলেন না। প্রজাদের সামন্ত শোষণ থেকে মুক্ত করলেন না। শোষণ রজ্জু আরো দৃঢ় করলেন।

পরিশ্রম তো লুঠের জন্য, সম্পদের জন্য । তাই করলেন। এমনকি প্রত্যাশীদের হতাশ করে " down of political consciousness"...initiate করলেন না। বনমালীর (লক্ষ্মণ মাণিক্যের) উপর আদেশ হল পার্বত্য প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় করে আমার তহবিলে জমা কর। বনমালীকে বুঝিয়ে দেওয়া হল তার একটি নিয়োগ কর্তা রয়েছে, সে হল সমসের।

কিন্তু আশ্চর্য সমসের উদয়পুরে অবস্থান করলেন না। তবে কি এই জনগণমন অধিনায়ক মুক্তির দূতকে প্রজারা সমাদর করেনি? তাই সত্য হবে। ত্রিপুরায় তার অবস্থান না করার কারণ তো একমাত্র প্রজাদের ভয়। জনতা সুযোগ পেলে ডাকাতকে তাড়া করে। সমাদরের আসন পিঁড়ি দেয় না। ত্রিপুরা সামন্ত-বন্ধন-মুক্তির অগ্রদূত ও শ্রেণীচেতনা-সঞ্চারী দেবদূতক আসন পিঁড়ি দিল না। প্রজারা নিশ্চই এই পীরের আলখাল্লার আড়ালে তাঁর আসল গাত্রবর্ণ দেখে ফেলেছিলেন, আর নির্মম লুণ্ঠনের মাধ্যমেও নিজের উদ্দেশ্যকেও উলঙ্গ করে ফেলেছিলেন তিনি নিজেই। সমসের যে লুঠপাটের জন্যই ত্রিপুরায় এসেছিলেন তা প্রজারা দেখলেন। সদর দপ্তর থেকে এতদূরে এসে রুটিন মাফিক ডাকাতি করা তার কাছে লাভজনক মনে হয়নি। কাজেই অল্প সময়ে ব্যাপক লুঠ এবং বহু লাভ তাকেই শ্রেয় বিবেচনা করেছিলেন সামসের। " উদয়পুরে রাজধন যতেক আছিল, সমসের গাজীর সৈন্য সব লুটে নিল।" এত পরিশ্রম করে এতদূরে স্বর্গের ফেরেস্তা এসেছেন, উন-তহবিল নিয়ে নিজ দুর্গে ফিরবেন কেন? কাজেই নাগরিকদেরও নাঙ্গা করলেন।

সমসেরকে কেউ গেরিলা যোদ্ধা বলেছেন। এই ধরণার জন্ম তাঁর অন্ধকারে ডাকাতি করার কলাকৌশল দেখেই হয়তো । আর বিভ্রম একটা হতেই পারে। তিনি পার্বত্য ত্রিপুরা এলেন, মনে কেউ করতেই পারেন, সমসের গেরিলা যুদ্ধের ''হিন্টার ল্যান্ড'-এর সন্ধানেই এসেছেন! পাহাড়ে আত্মগোপন করে মীরকাসেমকেও তিনি ঘায়েল করে দিতে পারবেন! কৌশলে মীরকাসেমের সৈন্যদের পাহাড়ে কন্দরে ঢুকতে প্রলুব্ধ করে তারপর নিকেশ করে বাঙলা জয় করবেন। শিবাজী, জয় সিংহরা এই ভাবেই ঔরঙ্গজেবকে নাকে দড়ি লাগিয়েছিল। লক্ষ টাকার প্রশ্ন হল ত্রিপুরায় দুর্গ নির্মাণ করে, পর্বতে শক্তি সংহত করার উদ্যোগ না নিয়ে, পার্বত্য ত্রিপুরা ছেড়ে পালালেন। তিনিতো অনায়াসেই ত্রিপুরায় দখল কায়েম করতে পারতেন যেখানে খোদ রাজা তার ভয়ে কম্পমান ও অরণ্যাচারী।

রেভারেন্ড জেমস্ লঙ্ লিখেছেন— " Samsher obtained the Government but the people not recognising him." গবেষক বি. কে কিলিকদার লিখেছেন — " Samsher did not ascend the thore instead he installed Banamali Takhur". –অর্থাৎ ভাগ্যান্বেষী এক আজ্ঞাবাহীকে দিয়ে লুঠ ও ক্ষমতা ভোগের কৌশল। এই কৌশল তাকে লাভের মুখ দেখায়নি।

সমসের-উত্থানের পশ্চাতে দুটি মুখ্য কারণ — প্রথমটি তার ব্যক্তিগত উচ্চাশা এবং দ্বিতীয়টি সময়ের আনুকূল্য। উচ্চাশা থেকে তিনি সমমনস্ক সঙ্গী সংগ্রহ করে অর্থের জোগাড় করেন, জমিদারকে হত্যা করে তার সম্পদের দখল নেন। সময়ের আনুকূল্য হল, তখন বাংলা শাসনে নৈরাজ্য, ত্রিপুরার রাজপরিবারের কলহ এবং অযোগ্য রাজাদের সিংহাসনপ্রাপ্তি।

কৈলাশ সিংহ লিখেছেন — " মহারাজ মুকুন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর পর হইতে, ব্রিটিশ

পতাকা উড্ডীন হইবার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় বিংশতি বৎসর ত্রিপুরায় গণ্ডগোল চলিতেছিল। যখন কোন প্রাচীন রাজ্য বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে থাকে, তখন তাহার অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায় তদানীন্তন অবস্থাও তদ্রূপই হইয়াছিল ।"

রাজবংশের অনেকেই তখন রাজা হওয়ার জন্য লোলুপ। কিন্তু যোগ্যতার অভাব। এই বিশ বছরের মধ্যে যারাই রাজদণ্ড ধারণ করেছেন, এদের মধ্যে একমাত্র জয় মাণিক্যের বিচক্ষণতা যোগ্যতা ছিল কিন্তু ঐ সময় মুঘলদের আগ্রাসী তৎপরতার কারণে ত্রিপুরাও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

১১৪৭ ত্রিং অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রিঃ রুদ্রমণি ঠাকুর জয় মাণিক্য নামে সিংহাসনে বসেন। ঐ সময়ে আতঙ্কিত মুকুন্দ মাণিক্যের ছেলেরা এবং যুবরাজ গঙ্গাধর (ধর্ম মাণিক্যের ছেলে) ঢাকায় আশ্রয় নিলেন। ঐ সময়ে মুকুন্দ মাণিক্যের ছেলে পাঁচকড়ি ঠাকুর নবাবের অনুমতিতে মুর্শিদাবাদ থেকে ত্রিপুরায় আসছিলেন। পথেই অনুজ কৃষ্ণ মাণিক্যের চিঠি থেকে পিতার মৃত্যু ও রাজ্য নাশের সংবাদ পেলেন। তিনি আবার ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদ। নবাবের দরবারে তার আর্জি ছিল তার অনুকূলে ত্রিপুরার সিংহাসন প্রাপ্তিতে নবাবের সহায়তা গ্রহণ। তিনি সফল হলেন। নবাব ঢাকার নায়েব নাজিমকে আদেশ করলেন পাঁচকড়িকে সিংহাসন লাভে সহায়তা করার জন্য। নবাবের সৈন্য নিয়ে পাঁচকড়ি জয় মাণিক্যকে পরাস্ত করে সিংহাসনচ্যুত করেন। ১৭৩৯ খ্রিঃ পাঁচকড়ি ইন্দ্র মাণিক্য নাম নিয়ে উদয়পুরে সিংহাসন আরোহণ করলেন।

সিংহাসনচ্যুত জয় মাণিক্য ছয় মাস পাহাড়ে কন্দরে ঘুরে ১৪০০ সৈন্য সংগ্রহ করে, সিংহাসন উদ্ধারে তাঁকে সাহায্য করার জন্য প্রজাদের প্রতি আহবান জানান। মেহেরকূলের প্রধান ভূম্যাধিকারী হরিনারায়ণ চৌধুরী আরো অনেক জমিদার জয় মাণিক্যের পক্ষ নিলেন। অপরদিকে নূরনগরের তালুকদাররা ইন্দ্র মাণিক্যের পক্ষভুক্ত হলেন। দুই লাঠি একত্র হলে যা হয়, যুদ্ধ সেই অন্তহীন কলহ এবং ঠোকাঠুকি শুরু হল। সিংহাসন নিয়ে জয় মাণিক্য ও ইন্দ্র মাণিক্যের মধ্যে। ইন্দ্র মাণিক্য উত্তরখণ্ডে সংহত হলেন, দক্ষিণে জয় মাণিক্য। উভয়েই সমর্থন আদায়ে দাক্ষিণ্য বিতরণে মুক্তকচ্ছ হলেন, নিজ নিজ অনুগতদের মধ্যে নিষ্কর ভূমিদানের বন্যা বয়ে গেল। দড়ি টানাটানির ফল হল ইন্দ্র মাণিক্য দুর্বল হয়ে পড়লেন। সচল হলেন জয় মাণিক্য। যুদ্ধে ইন্দ্র মাণিক্য বার বার পরাজিত হয়ে ইন্দ্র মাণিক্য বাঙলার নবাবের আশ্রয়প্রার্থী হলেন।

জয় মাণিক্যও নিজের অবস্থান দৃঢ় করার জন্যে উৎকোচ দিয়ে ঢাকার নায়েবের আনুকূল্য ক্রয় করলেন। ফলও পেলেন হাতে হাতে। নায়ের নাজিম বকেয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য সরাসরি গ্রেপ্তার করে একেবারে ঢাকার জেলে পুরে দিল। ইন্দ্র মাণিক্য তথা পাঁচকড়ি বুঝতে পারেননি যে বড়র পীরিতি বালির বাঁধ। এই পাঁচকড়িই না নবাবের আনুকূল্য ক্রয় করে হাতির পাঁচ পা দেখেছিল এবং ইন্দ্র মাণিক্য উপাধী গ্রহণ করে ত্রিপুরার সিংহাসন আলো করে বসেছিল। আসলে ত্রিপুরার সিংহাসন, রাজ অন্দরের কলহ এবং দুর্বলতার সুযোগে বাঙলার নবাবের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। নবাবই সময়ে সুযোগে ত্রিপুরার সিংহাসন নিলামে চড়াত। ত্রিপুরার সিংহাসন হয়ে পড়েছিল নবাব ও তার ঢাকাস্থ প্রতিনিধির অবৈধ অর্থ উর্পাজনের উৎস। আর এর দুয়ার উন্মুক্ত করছিল পাঁচকড়ি তথা ইন্দ্র মাণিক্য। কৈলাশ সিংহ লিখেছেন

" হতভাগ্য পাঁচকড়ি রাজ্য লোভে নবাব হইতে সনদ গ্রহণ (ক্রয়!) পূর্বক ত্রিপুরার প্রকৃত স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।"

ইন্দ্র মাণিক্যই কারাবন্দী হয়ে তার দুষ্কর্মের মূল্য পরিশোধ করলেন। এদিকে জয় মাণিক্য। অধিক মূল্যদাতা হিসেবে নবাব নাজিমের আনুকূলেও ফের সিংহাসনের দখল নিলেন। কিন্তু সিংহাসন নিলামের অধিকার যেহেতু ঢাকা বা মুর্শিবাদের শাসন কর্তাদের, সেইহেতু পরিস্থিতি আবার মোড় নিতে শুরু করল। ধর্ম মাণিক্যের ছেলে যুবরাজ গঙ্গাধর তখন ঢাকায়, তিনি এবার হাইয়েস্ট বিডার। সুতরাং ঢাকার নায়েব নাজিম মহম্মদ রফি নামে এক সেনাপতির অধীনে একদল সৈন্য - সহায়তায় গঙ্গাধরকে ত্রিপুরায় পাঠালেন। কুমিল্লায় পৌঁছে গঙ্গাধর "উদয়মাণিক্য (২য়)" উপাধী গ্রহণ করে রাজদণ্ড হাতে নিলেন।

ষড়যন্ত্রের এবং সিংহাসন কেন্দ্রিক লড়াইয়ের এখানেই অবসান হল না। জয় মাণিক্য ঢাকায় অবস্থানরত জগৎ মাণিক্যকে, তাঁর অনুকূলে উৎকোচের দ্বারা সনদ ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত করলেন। শর্ত হল, জয় মাণিক্য রাজা হলে জগৎ মাণিক্যের ভাই নরহরিকে যুবরাজ পদ দেবেন। পারস্পরিক লেনদেনের ভিত্তিতে জগৎ মাণিক্য উদ্যোগী হয়ে কৃতকার্য হলেন। জয় মাণিক্য আবার সিংহাসনের অধিকার পেলেন। জয় মাণিক্য কথা রাখলেন, নরহরিকে তিনি যুবরাজ পদে বসালেন।

এদিকে ঢাকায় বন্দী অবস্থাতেও ইন্দ্র মাণিক্য কিন্তু নিশ্চুপ রইলেন না। ঐ সময় আলিবর্দী খাঁ বাংলা দখল করে তার জামাতা নিবাইশ মহম্মদকে ঢাকার নায়েব নাজির পদে বসান। ইন্দ্র মাণিক্য তার সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুললেন। তার পরামর্শে ইন্দ্র মাণিক্য নবাব আলিবর্দী খাঁকে ত্রিপুরার সিংহাসনে তাকে বসাবার জন্যে আর্জি জানালেন। আলিবর্দী ইন্দ্র মাণিক্যের আবেদন মঞ্জুর করে হোসেন কুলী খাঁকে সসৈন্যে ত্রিপুরায় গিয়ে ইন্দ্র মাণিক্যকে সিংহাসনের দখল দিতে নির্দেশ দিলেন। ১৪,০০০ সৈন্য নিয়ে হোসেন কুলী খাঁ আর ইন্দ্র মাণিক্য উদয়পুর অভিমুখী হতেই জয় মাণিক্য সিংহাসন ছেড়ে উদয়পুর ছেড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করলেন।

তিনি কিন্তু নিঃচেষ্ট রইলেন না। তিনি নবাব আলিবর্দীর প্রিয়পাত্র হাজি হোসেনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হলেন। দ্রুত সখ্যতা গড়ে তুললেন। তার সাহায্যে জয় মাণিক্য আবারো সিংহাসন লাভে যত্নবান হলেন। এই সংবাদ ইন্দ্রমাণিক্যের কানে এলো। তিনি সিংহাসন রক্ষায় মুর্শিদাবাদ চলে যান, আলিবর্দীর দরবারে। কিন্তু দুর্ভাগ্য মুর্শিদাবাদেই ইন্দ্র মাণিক্যের মৃত্যু হল। তিনি আর ত্রিপুরায় ফিরে আসতে পারেননি। ঐ শূন্য সিংহাসনে জয় মাণিক্য তৃতীয় বারের মতন বসেন। কিন্তু জয় মাণিক্য এবং ইন্দ্র মাণিক্য উভয়েই দুর্ভাগ্য তাড়িত। ইন্দ্রমাণিক্য রাজ্যের বাইরে বেঘোরে প্রাণ দিলেন। কিন্তু জয় মাণিক্য ও ইন্দ্র পতনের পরেও কিন্তু নিষ্কণ্টক হলেন না। ইন্দ্র মাণিক্যের কনিষ্ঠ ভাই কৃষ্ণমণি তার পেছনে লেগে রইলেন। কারণ তিনিও ত্রিপুরার সিংহাসনের দাবিদার। কিন্তু কৃষ্ণ মাণিক্যের পক্ষেও সহজে সিংহাসন লাভ হল না। জয় মাণিক্যের দেহান্তের পর তাঁর ছোট ভাই হরিধন ঠাকুর বিজয় মাণিক্য নাম নিয়ে সিংহাসনের দখল নেন। পার্বত্য প্রজাদের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা থাকলেও সমতলবাসী প্রজারা তাকে মান্যতা দেয় নি।

এরপরের ইতিহাস বলে " মহারাজ বিজয় মাণিক্যের শাসনকালে দক্ষিণ সিক নিবাসী

জনৈক মুসলমান প্রজা ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতে ছিল। মহারাজ বিজয় অত্যল্প বৎসর মাত্র রাজ্য শাসন করিয়া কাল কবলিত হন। তদন্তর যুবরাজ কৃষ্ণমনি ত্রিপুরার রাজদন্ড ধারণ করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। এক সামান্য প্রজার বাহুবলে পরাজিত হইয়া, তিনি অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।''

জমিদার নাছের মহম্মদ তার প্রতিপালিত সমসেরকে পরিণত বয়সে তার জমিদারীর অধীন 'কুত ঘাটের'' তহশিলদার পদে বসান। উপার্জনের পথ উন্মুক্ত হল। অর্থের অধিকারী হয়ে '' প্রথমেই নাছের মহম্মদের কন্যার পাণি গ্রহণের অভিলাষী হইলেন (রাজমালা - কৈলাশ সিংহ -৮২) ।'' জমিদার তাকে বন্দী করতে লোক পাঠালেন। তার নাগাল পাওয়া গেল না। সমসের পালিয়ে গিয়ে '' বেদরাবাদে'' আশ্রয় নিলেন। সেখানে অর্থবলে লুটেরা বাহিনী গঠন করে তার দ্বিতীয় কাজ হল সপুত্র জমিদারকে হত্যা করা। এবং 'বলক্রমে' সমসের নাছের মহম্মদের কন্যাকে বিবাহ করিয়া দক্ষিণ সিক নামে দখল করেন।'' এবার ত্রিপুরার মহারাজার উজিরকে অর্থবলে বশীভূত করেন। এবং '' কয়েক সহস্র মুদ্রার বিনিময়ে'' দক্ষিণ শিকের জমিদারীর সনদ আদায় করেন। বিজয় মাণিক্যের হাত থেকে । বিজয় মাণিক্যের মৃত্যুর পর ত্রিপুর রাজবংশ আরো হীনবল ও কলহপূর্ণ অবস্থায় দিশাহারা। ঐ সুযোগে সমসের ত্রিপুরার রাজাকে দেওয়া কর বন্ধ করে দিলেন। এই কর বন্ধের সাহস তার হয়েছিল আরো একটি কারণে। কারণটি হল, রাজপরিবারেরই অপর এক সিংহাসন প্রার্থী উদয় মাণিক্যের ভাইয়ের ছেলে বনমালী ঠাকুর সমসেরের সাহায্যে তার আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য সমসেরের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। সমসের ত্রিপুরার রাজশক্তির মহড়া নেবার মতন তখনো অর্জন করেনি, কিন্তু ঘরের ইঁদুর যেখানে বেড়া কাটছে সেখানে সেই ফাঁকে সেঁধিয়ে যাওয়ার চেষ্টা তো হবেই। দুই জনের পাকা কথার পর বনমালী লক্ষ্মণ হলেন, এবং সমসের লক্ষ্মণকে লক্ষ্মণ মাণিক্য নামে লক্ষ্মণকেই ত্রিপুরার রাজা বলে ঘোষণা করেছিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মণ হলেন 'বিভীষণ'' এবং সমসেরের ''রাজা''। লক্ষ্মণই সমসেরের উদয়লুঠের প্রেরণা। কিন্তু ইতিহাস বলে লক্ষ্মণ মাণিক্য ত্রিপুরার সিংহাসনে বসতে পারেননি। সমসেরের দাক্ষিণ্যে সমসেরের সম্বোধনের মধ্যেই তুষ্ট থাকতে হয়েছিল। এমনকি রাজাদের ধারাবাহিক বংশ তালিকাতেও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে। রাজমালা তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে '' ইনি সমসের গাজী কর্তৃক ত্রিপুরার নাম মাত্র রাজা হইয়াছিলেন।'' সমসের অপূর্ণ রাজার কাঁধে ভর দিয়ে ত্রিপুরা জয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কার্যত উভয়েরই স্বপ্নভঙ্গ হয়। কারণ ত্রিপুরা, রিয়াং, কুকি, প্রজারা কৃষ্ণ মাণিক্যের পক্ষেই ছিলেন এবং সমসেরকে প্রত্যাখ্যান করেন। এই ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ মাণিক্যের পক্ষে কোন ভূমিকা নেওয়া সম্ভব হয়নি। আবারো প্রশ্ন, সমসের উদয়পুরে কয়দিন ছিলেন? কোন অবস্থান করেছিলন, তার শাসন চৌহদ্দীতেও কেন ত্রিপুরা নেই?

কোন কোন গবেষক সমসের উৎকৃষ্ট শাসন কাঠামোর উল্লেখ করেছেন। ঐ কাঠামোটির রূপরেখা হল পরগনার শাসনকর্তা — সেনাপতি (Dewan of Samsher's Army) ; নূর নগর এবং গঙ্গামহলের জন্য একজন শাসনকর্তা। এই তার শাসন কাঠামো। এই ব্যবস্থা সব জমিদারদেরই। সমসের এই ক্ষেত্রে কী উদ্ভাবনীর স্বাক্ষর রাখলেন তা বোধের অগম্য। ঐ গবেষক আবার সমসেরের মধ্যে কর্মচারী নিয়োগে ধর্মনিরপেক্ষতাও দেখেছেন এবং এ ব্যাপারে

তাকে পথিকৃত হিসেবেও বর্ণনা করা হয়েছে। তার পদস্থ নিয়োগের ব্যাপারে ঐ গবেষক এবং কৈলাশ সিং -এর উদ্ধৃতি পাশাপাশি বিচার করা যেতে পারে।

" Dicipline in Administation" শিরোনামে গবেষক যা উদ্ধার করেছেন তা হল "Governors were appointed by Samsher Gazi one for each pargana in the even land. Those governors belongs to both of hindu and muslim communities. Abdul Rajjack was the Dewan of Samsher's Army. The governing power of Bishalgarh pargana was conferred upon a man named Chana Wlla. A man Abdul by name was appointed the administrator of Noornagar and Ganga Mahal. From the available source names of only two Hindu Governors....." এবার কৈলাশ সিং-এর বয়ান " সমতল ক্ষেত্রে প্রত্যেক পরগনায় সমসের গাজী একজন শাসন কর্তা নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই ছিল অধিক। আব্দুল রজক তার সৈন্য বিভাগের দেওয়ান ছিলেন। নূরনগর ও গঙ্গামণ্ডলের শাসন কর্তৃত্বে আব্দুল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার শাসন কর্তাদের মধ্যে জগৎপুরের গঙ্গাগোবিন্দ ও চৌদ্দগ্রামের হরিশ্চন্দ্র এই দুই হিন্দুর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।" মেহেরকূলের উত্তরে সমসের প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হননি এমনটাই কৈলাশ সিংহের রাজমালায়। সমসেরের জীবনীকারের বক্তব্যে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন " তাহার জীবন চরিত লেখক বলেন যে বিশালগড় অষ্টজঙ্গল পরগনার শাসনভার ছানা উল্লার হস্তে ন্যস্ত ছিল।"

গবেষক ও ইতিহাসকাল উভয়ের বক্তব্যে হুবহু মিল। গুরত্বপূর্ণ শাসনক্ষেত্রে, সেনাবাহিনীতে, সেনাদলে সর্বত্রই তার স্বধর্মের লোক। গবেষক এখানে সেক্যুলারিজমের সন্ধান পেয়েছেন। কারণ পরগনির দায়িত্বে দুই জন হিন্দু রয়েছে, আর রাজস্ব বিভাগে দুই হিন্দু। আর ইতিহাসকার বলছেন গোবিন্দ ও হরিশ্চন্দ্র বাদে " অন্যরা সকলেই সমসেরের স্বজাতীয় ও সম্পর্কীয় ব্যক্তি ছিলেন। (অর্থাৎ পরিবারতন্ত্র!) । কিন্তু রাজস্ব বিভাগের কার্য তাহাদের দ্বারা (সমসেরের স্বজাতীয় ও আত্মীয়দের দ্বারা) সুচারু রূপে নির্বাহ হইত না। এইজন্য হিন্দু শাসন কর্তার প্রয়োজন হইয়াছিলেন। ধর্মপুর নিবাসী গঙ্গাগোবিন্দ প্রধান দেওয়ান ও খণ্ডল নিবাসী হরিহর নায়েব দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহারা রাজস্ব বিভাগের কার্য নির্বাহ করিতেন"। দুর্বল পক্ষকে টাকা পাহারায় রাখার বুদ্ধিমান কৌশল সমসেরের মতন এখনো অনেকেই প্রয়োগ করেন। এই কৌশল সেক্যুলারিজম বা দুর্বলের প্রতি অনুকম্প নয়, এ হল নিরাপত্তার চাবি। প্রবলের ভয়ে এদিক- সেদিকের সাহসই দুর্বলের হবে না ধরে এ এক মনস্তাত্ত্বিক বিধান। তবে কেউ কেউ বলেন ইতিহাস রচনায় তথ্যের গুরুত্ব নেই, ব্যাখ্যাই আসল (Facts are something but interpretation is everything)। কৈলাশ সিং তথ্য দিয়েছেন আর গবেষক তথ্যের ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাখ্যার অধিকার পাঠকেরও রয়েছে।

সমসেরের দান খয়তাতির উল্লেখ কৈলাশ সিংহের রাজমালায়ও রয়েছে। তিনি বলেছেন " সমসের গাজী প্রকৃতপক্ষে দাতা ছিলেন। তিনি অনেক হিন্দু মুসলমানকে চাকলা রোশনাবাদের মধ্যে নিষ্কর জমি দিয়েছেন। তিনি ক্রয়-বিক্রয়ের সময়ে যাতে কেউ প্রতারিত না হয় তার

জন্যে ওজনের নির্দিষ্ট একক ধার্য করেদিলেন। এবং পণ্যের বাজার মূল্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। এ তার ব্যক্তিগত উদ্ভাবন কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণঅভ্যুত্থানের নায়কত্ব তা অতিরঞ্জন এবং কষ্টকল্পিত। এর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। দেখা গেল তার চরম বিপদের সময়ে মীর কাশিমের সৈন্যরা এসে কার্যত চিলের মতন ছোঁ মেরে তাকে মুর্শিদাবাদে তুলে নিয়ে গেল। জনতা জ্ঞানত যে তাকে রক্ষায় এগো লো না। কোন জন-আলোড়ন হল না। আর ভিন্নপক্ষ ঐ জনতাকে নিয়েই রাজতন্ত্রের, শোষণের, স্বৈরাচারের আর সামন্ত দম্ভের ধারাবাহিকতা রক্ষায়, নিজেদের মতন করে মনোযোগী হল।

গণমুক্তির চ্যাম্পিয়ন সমসেরের পাশে শোষক সামন্ত প্রভুর গণশোষণকে রাখা যাক। পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলির কাছ থেকে ত্রিপুরার রাজা শুল্ক আদায় করতেন। এটা রাজস্ব আয়ের উৎস। পরিবার-পিছু শুল্ক " House Tax" কী ভয়ঙ্কর কথা! এর চাইতে বড় সামন্ত শোষণ আর কী ? নাগরিকরা শুল্ক দেবে কেন? সমসের প্রজাদের কাছ থেকে কোন শুল্ক অদায় করতেন না। অথচ বাছাই করা সেরা হিসাব রক্ষক রাখলেন। হিসেবের কারচুপি করার সাহস যাতে না হয় তার জন্যে দাঁয়ের তলার মাছ হিসেবে হিন্দুরাই তহবিলের পাহারাদার। রাজা, অথচ রাজকোষ নেই। তাঁর কোষাগার এবং কোষাধ্যক্ষের প্রয়োজন হল কেন?

এদিকে ত্রিপুরার সামন্ত রাজারা যে পারিবারিক শুল্ক ধার্য করলেন, সেখানেও কিন্তু সমসেরের মতনই, দয়া দাক্ষিণ্যের স্থান দিল। দরিদ্র পরিবার এবং বিধবাদের, তাদের কোন প্রত্যক্ষ রোজগারের উৎস নেই বলে, তাদের " Family Tax" দিতে হত না (Only the houses of the poor and widows were exempted)। আবার সামন্ত শাসনের শেষ দিকে ১৩২৯ ত্রিং সনে, অর্থাৎ ১৯১৯ খ্রিঃ থেকে ঘরচুক্তি করের যখন পুণর্বিবেচনা হল, তখন দেখা গেল একাধিক পরিবার এক চৌহদ্দিতে অবস্থান করলে ঐ গুচ্ছের জন্যে একটিই শুল্ক দিতে হত (We find that 2 or 3 families accomodated themselves in a single house were allowed to pay only one Tax, Act IV of 1329 T.E.) । ঘরচুক্তি কর সংগ্রহের সময়েও সামন্ত সরকারের আদেশের তারতম্য ঘটত, সাময়িক অর্থনৈতিক সংকটগ্রস্ত প্রজাদের শুল্ক মুকুবের আদেশ হত (Exempted from taxes had been recommended on the ground of being poverty striken) । আবার গোমতীর দক্ষিণ অঞ্চলকে বিশেষ অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করে রাখা ছিল, সে-জায়গায় পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে মাঝে মধ্যেই কিছু কিছু পরিবার এখানে চলে আসতেন, ত্রিপুরায় বসতি স্থাপন করতেন। ঐ নয়া বসতিপ্রাপ্ত পরিবারগুলির জন্যে, তাদের দুরবস্থার কথা বিবেচনা করে কর-স্বল্পতার বা রেহাইয়ের ব্যবস্থা ছিল। ঐ বিশেষ চিহ্নিত অঞ্চলটি যেখানে নয়া বসতি স্থাপনের সুযোগ ছিল তার নাম ছিল " জুলাই মহল।" যুবরাজ এর রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। যুবরাজই শুল্কহার নির্দিষ্ট করতেন (The new - settlers or Julaies paid only the nominal tax to be assessed by the Jubaraj)।

"কাজিয়ানা" নামে এক ধরনের শুল্ক আদায় করতেন ত্রিপুরার রাজারা। মুসলমান প্রজাদের কাছে ঐ শুল্ক আদায় হত। সমতল ত্রিপুরার মুসলমান প্রজারা ত্রিপুরায় চাষাবাদের জন্য আসতেন। স্থায়ী বসবাসের জন্যও আসতেন। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে আসা নয়া বসতি

স্থাপকদের কাছ থেকে যেমন কর আদায় হত, তাদের আর্থিক অসুবিধার কথা বিবেচনা করে, কম বা নামমাত্র, তেমনি মুসলমান প্রজারাও বসতি স্থাপনের জন্যে আসতেন, তাদেরও অনুরূপ শুল্ক দিতে হত। মজার বিষয় হল এই শুল্ককে কেউ কেউ ব্যাখ্যা করেছেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা ধর্মবিদ্বেষ সংজ্ঞাত বলে। এই শুল্কের পরিমাণ বাৎসরিক গড় হিসেবে আদায় হত মাত্র ৩৫০্ (তিনশত পঞ্চাশ) টাকা [Kaziana was exacted through observance of lease system]। একেই বলে গল্পের গরু গাছে চড়ানো। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নেই। আর এর সঙ্গে সমসেরের ধর্মনিরপেক্ষতা বা " দীন ইলাহী"রও কোন যোগসূত্র নেই। বাৎসরিক করের স্বল্প পরিমাণ থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না এরা জিরাতিয়া প্রজা। পরিযায়ী বসতি বিস্তারের অন্বেষণে, এবং ত্রিপুরার পার্বত্যভূমি আবাদের আবশ্যিক সহায়কও বটে। সুতরাং লিজ মানি ছিল নেহাতই প্রতীকী মাত্র! এর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের জিজিয়া করের তুলনা বাতুলতা। ধর্মকে টেনে আনাও বাতুলতা।

চতুর্দশ শতকে মহারাজ প্রথম রত্ন মাণিক্যের সময় থেকে ত্রিপুরার রাজাদের সঙ্গে ঢাকার মুসলমান শাসকদের সংযোগ স্থাপিত হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়েও উল্লেখ করা হয়েছে পার্বত্য ত্রিপুরা ভূমি আবাদ, জনবিরল অঞ্চলে বসতি বিস্তার এবং রাজধানী উদয়পুরে একটি জনাকীর্ণ সুসংহত সমাজ গড়ে তোলার জন্যে ঢাকার শাসন কর্তার কাছ থেকে প্রার্থী হয়ে দশহাজার বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষকে এই রাজ্যে নিয়ে আসেন তিনি, তাদের কম শুল্কে বা বিনাশুল্কে ভূমিবন্দোবস্তও দেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন প্রশাসনের কাজে উপযোগী কিছু মসীজীবী (শ্রীকর্ণ)। বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে বাছাই করা হিন্দুদের এনেছেন তা মেনে নেওয়া শক্ত। যখন তিনি শাসন সংস্কার করছেন মুসলমান রীতি পদ্ধতিতে। পার্বত্যজমি আবাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সমাজের প্রয়োজনে। পরবর্তীকালেও দেখাগেছে পরিশ্রমী মুসলমান প্রজারা স্বাগত হয়েছে, ঐ একই কারণে। রত্ন মাণিক্য ফার্সী ভাষার প্রচলন করেন এটিও অর্থবহ। কারা ফার্সী ভাষা শেখাতেন? উজির, নাজির, দেওয়ান পদ সৃষ্টি হল। হিসাব রক্ষণে সেরেস্তা বসানো হল।

রত্নফা সিংহাসনে বসেছিলেন ১২৮২ খ্রিঃ। সমসের মৃত্যু ১৭৬০ খ্রিঃ। ৪৭৮ বছর আগেই রত্ন মাণিক্য ঐ সব কাজ করেছেন। তখনই তিনি সেক্যুলার। এই সেক্যুলারত্ব শেষ মহারাজ বীরবিক্রম মাণিক্য পর্যন্ত চিড় ধরেনি। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতার অগ্রপথিক সমসের, কীভাবে মানবো?

সমসের পার্বত্য ত্রিপুরায় কোন প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলেননি। তুলতে পারেননি। এখানে নিজেকে তিনি গুছিয়ে নিতেই পারেননি। অথবা সম্পদ লুণ্ঠনেই ছিল তার প্রায়োরিটি। গাজীনামায় অমরত্বের বাইরে জনচিত্তে তার অমরত্বের আসন কোথায়? বিশেষ উদ্দেশ্যে জীবনী লেখকদের কষ্টকল্পনায় অবশ্য তার উজ্জ্বল আসন। যে লক্ষ্মণ মাণিক্যের উপর ভর করে তার ত্রিপুরা বিজয়ের চেষ্টা তা সফল হয় নি। বলতে হবে লুণ্ঠনের বাইরে আর কোন স্থায়ী ছাপ পার্বত্য প্রজার কাছে তাঁর নেই, এবং কাঁধে ভর করা বনমালী — অক্ষমের মতো যমুনার (গোমতীর) হাঁটুজলে আত্মহত্যা করলেন! অর্থাৎ গুরুত্বহীন হয়ে রইলেন।

সমসের উদয়পুর ত্যাগ করার পরও কৃষ্ণমণি উদয়পুরে ফিরে এলেন না। মীর কাশেম

তাঁকে ত্রিপুর রাজা হিসেবে মান্যতা দেওয়ার পরেও না। ১১৭০ বছরের পিতৃপুরুষের রাজধানী যা জয়-পরাজয় কৃতিত্ব ও ব্যর্থতা ও প্রজা পালনের গৌরবে ধন্য। ঐতিহ্যকে কেন তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন? বড় জটিল মনস্তত্ত্ব। দেখা গেল এই রাজধানীর সঙ্গে এই রাজবংশের এতটাই মনের মিশ্রণ যে কৃষ্ণ মাণিক্যের রাজধানী ত্যাগের ১৬৫ বছর পরেও বীরবিক্রম উদয়পুরের স্মৃতিতে আবেগ তাড়িত। রাধাকিশোর মাণিক্য ও তাঁর পূর্বপুরুষ কাশী মাণিক্য তো উদয়পুরে পুনঃ রাজধানী নির্মাণেই উদ্যোগী ! হতে পারে মীর কাশেমের উষ্ণতা-নৈকট্যই এর কারণ হবে। প্রয়োজনে তাঁর কাছে ছুটে যাওয়ার পথটা সংক্ষিপ্ত করে রাখলেন।

আনন্দ মঠে সত্যানন্দের মুখে শেষ সংলাপ ছিল "প্রতিষ্ঠা আসিয়া বিসর্জনকে লইয়া গেল।" কৃষ্ণমণির ক্ষেত্রে হল বিপরীত। তিনি প্রতিষ্ঠাকে সঁপে দিলেন বিসর্জনের হাতে।

কৈলাশ সিংহ সমসেরের অন্তিম পর্ব বিবৃত করেছেন " সমসেরের সৌভাগ্যতপন পশ্চিম আকাশে বিলম্বিত হইল। অশেষ গুণালঙ্কৃত আলিজী মীর কাসেম বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। যুবরাজ কৃষ্ণমণি নবাব সমক্ষে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যবস্থা নিবেদন করিলেন। ক্রমে সমসেরের দস্যুবৃত্তির সংবাদ নবারের কর্ণগোচর হইল। তিনি যুবরাজ কৃষ্ণমাণিক্যে " ত্রিপুরাপতি' বলিয়া স্বীকার করিলেন। নবাবের প্রেরিত সৈন্যগণ ত্রিপুরা (সমতল) উপনীত হইয়া সমসেরকে বন্দী করিয়া লইয়া গেল। পশ্চাতে নবাবের অনুমতিক্রমে তোপের মুখে বন্ধন করিয়া সমসের গাজীর প্রাণদণ্ড করা হইয়াছিল।"

অতঃপরও সমসের গাজী বেঁচে রইলেন—

ক) অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়েও জমিদারী হবার সাফল্যে;

খ) ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর লুঠ এবং সমতল ত্রিপুরায় ডাকাত সর্দার হিসেবে ত্রাস সঞ্চারী খ্যাতি অর্জনের চূড়ায় পৌঁছে;

গ) ত্রিপুর রাজ কৃষ্ণ মাণিক্যকে তাঁর রাজধানী উদয়পুর থেকে স্থায়ীভাবে বিতাড়নে সাফল্যের কারণে;

ঘ) কিছু কিছু মননে, চিন্তার প্রতিফলনে মার্কস-এ্যাঙ্গেলস্ পূর্ববর্তী বিপ্লবের "Initiated the dawn of political consciousness among the exploited peasents and workers of Tripura"– এই ভাগীরথ হিসেবে; এবং

ঙ) সমসের গাজীর বহু পরে রবীন্দ্রনাথ লিখিত

" স্ফুলিঙ্গ তার পাখায় পেল ক্ষণকালের ছন্দ
উড়ে গিয়ে ফুরিয়ে গেল এই তারই আনন্দ।"

সেই আনন্দকেন্দ্রে বিরাজমান যুগপুরুষ — দ্বিতীয় "দধীচি" হিসেবে।

'গাজীনামা' পুস্তকে সমসের গাজীর যুদ্ধ বর্ণনা ঃ " সমসের গাজী আগে মিলে সর্বজন।" এই সর্বজন হল লুঠের হিস্যাদারেরা। কারণ গণ-অভ্যুত্থানের সমসেরীয় প্রকরণ " গাজীনামা"য়

এভাবে বিবৃত ঃ

" মাল খাজনা জমা যত আছিল কাছারী।
আব্দুল্লা লুঠি নিল আগুসারী।।

জগতপুর, খগুল অবধি মণিপুর।
বৌদ্ধগ্রাম বগাসাইর মেহেরকুলপুর।।
কুরনগর লৌহগড় উদয়পুর গিয়া।
আটজঙ্গল বিশালগড় সকল লুটিয়া।।

এইভাবে সমসের জনগণের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন! সমসেরের গণ-মিলিশিয়া যে লুঠের বখরার প্রলোভনে জড়-করা মানুষ গাজীনামার ঐ বর্ণনা কি তা প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নয়? ইতিহাসে উদাহরণ রয়েছে, সৈন্যদের রাজকোষ থেকে বেতন না দিতে পারলে বা না দিয়ে, সুঠের মাধ্যমে রোজগারের স্বাধীনতা সৈন্যদের দিয়ে কোন কোন রাজা তার শক্তির ভিত তৈরী করতেন। উল্লিখিত বর্ণনা থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সমসের ঐ দুষ্কর্মের চাক্ষুষ উদাহরণ। ভাড়াটে স্তাবকদের দিয়ে বহু রাজা-বাদ্‌শাই নিজের প্রশস্তি রচনা করেছেন। গাজীনামা তেমনই একটি রচনা গ্রন্থ।

সমসেরের লুণ্ঠন-তৃষ্ণা, এবং লুণ্ঠন-দর্শন সুন্দর ফুটিয়ে তুলেছেন গাজীনামার লেখক, যিনি নিশ্চিতভাবে সমসেরের বেতনভুক কৃপাপুষ্ট মহাশয়।

মীর কাশেমের সৈন্য বিনা বাধায় সমসেরের কোমরে দড়ি দিল। সঙ্গী লুঠেরারা তখন হাওয়া। দলনেতাকে মুক্ত করার চাইতে যঃ পলায়তি স জীবতি -- এই কাপুরুষের ভূমিক নিল। সমসের প্রকৃত জননেতা হলে বা জ্ঞান উদ্রেককারী মহাজন হলে অনুচর বা অনুগামীরা সমসেরকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়ে নিজেরা পালাত না।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে সমসের উদয়পুর লুঠ করেন। ঐ সালেই তিনি মীর কাশেমের কামানের খোরাক এবং বেহস্তে যাত্রা। কিন্তু সমসের-শূন্য উদয়পুরেও জীবিত কৃষ্ণমণি আর ফিরে এলেন না। কেন এলেন না তার কারণ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। উদয়পুর এই রাজবংশের ঔজ্জ্বল্য থেকে বঞ্চিত হল।

‘চেয়ে দেখো,
একরাশ রজনীগন্ধা ছড়ানো’

উদয়পুরে, (পূর্বতন নাম রাঙামাটি) ত্রিপুর বংশের ৫৬ জন রাজা ১৭০ বৎসর রাজত্ব করেছেন। সময়ের ব্যাপ্তিরি শুরু এবং শেষ ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৬০ খ্রিঃ কৃষ্ণ মাণিক্য পর্যন্ত। ধন্য মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য, কল্যাণ মাণিক্য এই সব বিখ্যাত রাজারাতো উদয়পুরেই রাজত্ব করেছেন। ত্রিপুর রাজারা হিন্দু সনাতন ধর্মে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্মে মঠ নির্মাণ বহুকাল ধরেই চলে আসছে। নির্মিত হয়েছে দেবালয়, পূর্বপুরুষের স্মৃতি রক্ষায় নির্মিত হয়েছে স্মৃতি সৌধ, নির্মিত হয়েছে, বিলাস উপকরণ। বিভিন্ন রাজা নিজের শাসনকাল এবং উচ্চতা বিজ্ঞাপনের নিমিত্ত প্রচলন করেছেন ধাতুমুদ্রা স্বর্ণ এবং রৌপ্যের সাধারণ বিনিময়- মাধ্যমও ছিল, পণ্যের আদান প্রদানে, প্রচলন ছিল কড়ি। উৎকীর্ণ করেছেন দেবালয়গাত্রে, মঠে আপন মহিমা সম্বলিত শিলালিপি। ১১৭০ বছর বড় দীর্ঘ সময়। উদয়পুরে তো ঐ সবের অবশেষ ছড়িয়ে থাকার কথা। ছড়িয়ে রয়েছে, যদিও কতিপয় একেবারেই কালের গর্ভে লীন হয়েছে। কিছু ভগ্ন অতিভগ্ন অবস্থায় এখনো কালের সঙ্গে অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে লিপ্ত, আবার অতি আশ্চর্য প্রাণশক্তিত্বে দারুণভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আদরে আবেগে। যারা বিলুপ্ত তারা আর অধিকাংশের মনে নেই। কিন্তু তাদের সন্ধান চলছে তন্ন তন্ন করে, অনুসন্ধানীর মনের উত্তেজনায়। যারা রয়েছে, যারা মৃতপ্রায়, যারা বিলুপ্ত, বিশেষজ্ঞ গবেষকরা যদি তাদের খুঁজে পেয়ে ইজেলে দৃশ্যমান করতে পারেন তাহলে, বোবা ইতিহাস ব্যাঙময় হয়। তবে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে দুর্ভাগ্য হল ভারতের, সম্ভবত বিশ্বের প্রাচীনতম রাজবংশের বিলুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের তেমন প্রয়াস হয়নি। কেবল স্থায়িত্বের দৈর্ঘ্যে এই রাজবংশ কেবল নয়। অনাথ ভূখণ্ড ও আদিবাসীদের উপর আধিপত্য নিয়ে আর্য ভাবধারায় আদিবাসীদের উন্নত করে আর্য- অনার্য একীকরণের স্বার্থক সাফল্যে আধুনিক ভারতের প্রকৃত মননকে বিকাশের দায়িত্ব সর্বপ্রথম এরাই নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন, এবং সফল হয়েছিলেন। সমতট -এর বিস্তার নিয়ে গবেষণার কথা শোনা যায়। এই নামে বিশাল যে ভূভাগ যখন নিতান্তই জলমগ্ন, সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়নি তার তটভূমির আধিপত্য এই রাজবংশের শাসনাধীন এবং ভূখণ্ড যখন জলের উপরে মাথা তুলতে শুরু করে বসতি বিস্তারের আগেই স্বাভাবিক নিয়মে, ঐ ক্রমউত্থিত ভূখণ্ড স্বাভাবিক নিয়মেই ত্রিপুর সাম্রাজ্যভুক্ত হতে শুরু করে। ইতিহাস এই কথাই বলে নয়া ভূখণ্ড ; নয়া বসতের সভ্যতা বিকাশের চাবিটিও এদের হাতেই ছিল। এই রাজবংশের পরিক্রমণ পথও তো কম বিস্তৃত নয়। সেই গান্ধার থেকে দক্ষিণ চীন হয়ে কিরাত ভূখণ্ড ধরে বর্তমান পার্বত্য ত্রিপুরা। আদি পুরুষ যযাতি তো মহারাজা যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক এবং ঐরাজদরবারে মাননীয়। পরিক্রমা কাল ছেড়ে দিয়ে থিতু -কালের ইতিহাসও দীর্ঘতর। এখানেই তো তাদের অবস্থানের স্মারক-সম্ভার এই ত্রিপুরাতেই, আরো বিশেষ করে রাজধানী উদয়পুরে।

সব নেই। যা রয়েছে তার কিঞ্চিৎ ১৯২৫ সালে মহারাজ বীরবিক্রম তাঁর উদয়পুর সফরের সময় স্মৃতি- ভারাক্রান্ত মনে, এবং উজ্জীবিত স্মৃতি -কৌতূহলে বিশেষ পরিদর্শনের

বিষয় করেছিলেন। নক্ষত্র মাণিক্যের রাজপ্রাসাদ ঐ প্রাসাদে গোবিন্দ মাণিক্য ও উদয়পুরে সর্বশেষ কৃষ্ণ মাণিক্য পর্যন্ত অবস্থান করে গেছেন, ঐ প্রাসাদের ভগ্নদশা তাঁকে পীড়িত করেছে। দীর্ঘশ্বাস মোচন করে, রাধাকিশোর মাণিক্যের আপশোশ। "আগে যদি উদয়পুরে আস তাম তবে, আগরতলায় নয়, উদয়পুরেই ফের রাজধানী নির্মাণ করতাম" উল্লেখ করে নিজের ভারাক্রান্ত মনের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অপরাপর ভগ্ন ও ক্ষয়িষ্ণু স্মারক পুনরুদ্ধার ও রক্ষণের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন " যদি বছরে একহাজার টাকা ব্যয় করা হয় তা হলেও এই সব অমূল্য ইতিহাস উপাদান সংরক্ষণ সম্ভব" বলে মন্তব্য করে।

হারিয়ে যাওয়ার অনেক কিছুর সন্ধান রয়েছে, রাজমালা, রাজরত্নাকর, কৃষ্ণমালা, চম্পক বিজয় প্রভৃতি গ্রন্থে। উদয়পুরের পুরাত্ত্ব সেখানে বিশদে। রাজমালা তো শুক্রেশ্বর, বাণেশ্বর পণ্ডিত ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতে রচিত হয় ১৪০৭ খ্রিষ্টাব্দে। আর রাঙামাটি বা উদয়পুর তো এই বংশের রাজধানী ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। কিছু ইঙ্গিৎ ছড়িয়ে আছে গাজীনামায়ও। কিন্তু ঐ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা নিরুৎসুক। সম্ভবত, অবশিষ্ট বিশাল ভারতে মুসলমান শাসনের বিস্তার এবং দীর্ঘকালের প্রাধান্য এবং তৎপরবর্তী কালেও ১৯০ বছরের আগ্রাসী ব্রিটিশ শাসন ত্রিপুরার রাজ্যসীমাকে সঙ্কোচিত করে বর্তমান পার্বত্য প্রদেশে সীমাবদ্ধ করে রেখে, অবশিষ্ট ভারতের রাজনীতিতে একে প্রান্তিক অবস্থানে নিয়ে আসার কারণে, ত্রিপুরার ঐতিহ্যময় অতীত তার গুরুত্ব হারিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস পক্ষপাতিত্ব-দোষে- দুষ্ট হবে কেন। শীতল চক্রবর্তী, কৈলাশ সিংহ-সহ অন্যান্য গবেষকরাও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে " বৃহৎ বাংলার ইতিহাস ত্রিপুরার ইতিহাসকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ।"

তবে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রাজ উদ্যোগে উদয়পুরের প্রত্নতত্ত্ব উদ্ধারে চেষ্টা হয়েছিল। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দে পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ মশাইকে দিয়ে উদয়পুরের মন্দির গাত্রের শিলালিপি পাঠোদ্ধারের চেষ্টা হয়েছিল। বেশ উচ্চ বেতনে পণ্ডিত অমূল্যচরণে বিদ্যাভূষণ মশাইকেও এই কাজে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ ছিল ওনারা বহু লিপি উদ্ধারে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তার বৃহদাংশই সরকারে জমা করেননি। নিজেরা আত্মসাৎ করেছেন। কী উদ্দেশ্যে কে জানে? বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন — "পরের দ্রব্য না বলিয়া নিলে চুরি করা হয়।" ঐ পণ্ডিত প্রবরদ্বয় নিশ্চই চৌর্যবৃত্তির দায়ে অবিযুক্ত। আরো দুর্ভাগ্য, ঐ পাঠোদ্ধার কোথাও তাঁরা ব্যবহার করেননি। করলে, তাও কাজের কাজ হত ।

উদয়পুরের অনাদিচরণ ভট্টাচার্য, নিজ অনুসন্ধিৎসায় নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার চেষ্টা করেছেন। সংগৃহীত তথ্যাদি নিজের পাণ্ডিত্যের মিশ্রণে ব্যাখ্যাও করেছেন। " উদয়পুরের মঠ" শীর্ষক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন " পাগলা মেহের আলীর ভূত চাপে আমার। আমি শ্মশান ও মঠ খুঁজে মরি নদীর ধারে, ছড়ার পাড়ে। উদয়পুরের জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ- পশ্চিম কোনে রয়েছে কাশী মাণিক্যের শ্মশান। বর্তমান শান্তিপল্লী, না সেখানে কোন মঠ নেই।"

মঠের সন্ধান তিনি পেলেন পিত্রাছড়া ও গোমতীর সঙ্গমে। বিশুদ্ধ ত্রিবেগ রীতিতে ছোট একটি মঠ। কাৎ হয়ে আছে, দেয়ালে ফাটল। ইট খসে পড়ছে। তাঁর চোখে ঠেকল " বিশুদ্ধ ত্রিবেগ রীতিতে তৈরী হলে কী হবে — এই মঠে কিন্তু নিম্নতর ছাদবিশিষ্ট বহিঃগৃহটি নেই। মঠটিতে একটি মাত্র কক্ষ।"

সন্ধান পেলেন রাজনগর হয়ে পিত্রার রাস্তায় পিত্রা অভিমুখে প্রায় তিন কিলোমিটার এগিয়ে রাস্তার ডান দিকে। ঐ মঠের আকারও ক্ষুদ্র এটিও ত্রিবেগ রীতি কিন্তু মঠের বহিঃগৃহ অনুপস্থিত। এই পথেই আরো পূবে খানিকটা এগিয়ে জমাতিয়া পাড়া, উপজাতি মহল্লা। এই জমাতিয়া পাড়াতেও রয়েছে আরেকটি মঠ তবে অপেক্ষাকৃত বড়। বিশ, পঁচিশফুট উচ্চতা। গঠনশৈলী ছোট মঠগুলির মতনই। এটিও ত্রিবেগ রীতিতে তৈরী কিন্তু বহিঃগৃহ নেই। কেবল গর্ভগৃহ আছে। গর্ভগৃহে তিনি জ্বালানি কাঠই দেখেছেন স্তূপাকৃতি। মঠের পাশে ছোট্ট একটি ছনের চৌচালা ঘরে শিবলিঙ্গ পূজিত হচ্ছেন। জমাতিয়ারাই ঘরটি নির্মাণ করেছেন। মঠটি চরণ কুমার জমাতিয়ার বাড়ি-সংলগ্ন। শিবলিঙ্গটি ঐ মঠেই ছিল। মঠের শোচনীয়তার কারণে লিঙ্গপূজা অব্যাহত রাখার জন্য পৃথক ঘর নির্মিত হয়। কিন্তু জমাতিয়ারা বলছেন এখন থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শিবলিঙ্গ এরা জঙ্গলে কুড়িয়ে পেয়েছেন।

অনাদিবাবু প্রসঙ্গত, অপর একটি শিবলিঙ্গের উল্লেখ করেছেন যা তার শৈশবে দেখা । উদয়পুরের ফুলকুমারী গ্রামে তিনি ঐ লিঙ্গ দেখেছেন। " এই বিগ্রহ এখন মায়ের বাড়ির টিলার পশ্চিম দিকে প্রবেশ পথের বাঁদিকে ছোট্ট এক টিনের চৌচালায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সে ১৯৮১ সালের কথা।" তিনি এই তিনটি মঠের সন্ধানই নয়, উদয়পুরের পুরাকৃতির একটি তালিকাও তৈরী করেছেন। পরিশ্রমসাধ্য এই কাজ তিনি নিজস্ব তাগিদেই করেছেন। বলেছেন —" উদয়পুর আমার জন্মস্থান বলেই, তাকে স্বরূপে প্রকাশ করার এই উদ্যোগ"। তবে আর সকলের অবজ্ঞাও তাঁর মর্মপীড়ার কারণ হয়েছে। তিনি লিখেছেন — " পুণ্যার্থী রাজা-রাজন্যদের খনন করা দির্ঘিকা সমূহ ধীরে ধীরে মজিয়া- হাজিয়া গিয়া আবাদি জমিতে পরিণত হইতেছে। উদয়পুরের আশে পাশে অবস্থিত গ্রামগুলিতেও আছে ঐ ঐতিহ্যের সুবাস। সভ্য মানুষেরা এগুলিকে 'সুভাষিত' করিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে স্থানগুলিকে আর চিহ্নিত করা যাইবে না। প্রয়োজনের খাতিরেই এইগুলির একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়া হইল।

ক) মন্দিরসমূহ ঃ

ক্রমিক নং	নাম	অবস্থান
১।	চন্দ্রগোপীনাথের মন্দির	চন্দ্রপুর।
২।	ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির	মাতাবাড়ি।
৩।	শিববাড়ি	রাধা কিশোরপুর।
৪।	চতুর্দশ দেবতার (গোপীনাথের) মন্দির	রাধাকিশোর পুর।
৫।	লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির	রাধাকিশোর পুর।
৬।	দুইত্যার বাড়ি	শিববাড়ির ঈষৎ পূর্বে হরিভক্তি প্রচারিণী সভাগৃহের পশ্চাতে।
৭।	গুণবতী মন্দির গুচ্ছ	বদরমোকাম যাওয়ার পথে বাঁদিকে।
৮।	বিষ্ণু মন্দির,লোক পলানী	বদরমোকাম কল্যাণ সংঘের পার্শ্বে।
৯।	বদর সাহেবের দরগাহ্	বদরমোকাম, রাজবাড়ি যাওয়ার পথে গোমতীর পারে।

১০।	মুঘল মসজিদ	গোমতীর দক্ষিণ পারে, রাজবাড়ি যাওয়ার পথে ডানদিকে।
১১।	পুরাতন রাজবাড়ি	রাজনগর।
১২।	ভুবনেশ্বরী মন্দির	পুরাতন রাজবাড়ির আঙ্গিনায়।
১৩।	বিষ্ণু মন্দির	পুরাতন রাজবাড়ির আঙ্গিনায়।
১৪।	নক্ষত্র রায়ের প্রাসাদ	পুরাতন রাজবাড়ির আঙ্গিনায়
১৫।	বাবাজীর আখড়া	দারগার (বদর সাহেব) কাছে, নদীর পারে।
১৬।	জোড়া মন্দির	রাজনগর স্কুল মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে।
১৭।	নাগের দোল	ধর্মাশ্রম প্রাঙ্গণ।
১৮।	হরিমন্দির (জগন্নাথের শ্বশুর বাড়ি)	রামকৃষ্ণ পাঠচক্র প্রাঙ্গণ।
১৯।	হরিমন্দির	জগন্নাথ দিঘির পূর্বপাড়।
২০।	জগন্নাথ মন্দির (শ্লেট পাথরে নির্মিত)	জগন্নাথ দিঘির পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে।
২১।	শ্লেট পাথরে নির্মিত অপর একটি মন্দিরের ভগ্নস্তূপ	ধ্বজ নগর বাজারের উত্তর দিকে।

খ) <u>দিঘির নাম ঃ</u>

১। চন্দ্র সাগর	চন্দ্রপুর।
২। কল্যাণ সাগর	মাতাবাড়ি।
৩। বুইড়্যার (সেনাপতি রণাগণ) দিঘি	ফুলকুমারী।
৪। ধনী (ধন্য) সাগর	ফুলকুমারী।
৫। বিজয় সাগর	রাধাকিশোর পুর।
৬। অমর সাগর	রাধাকিশোর পুর।
৭। পুরান (জগন্নাথ) দিঘি	রাধাকিশোর পুর।
৮। ছেঁচড়া দিঘি	ছনবন।

অনাদিবাবু উদয়পুরের কতিপয় গ্রামের নামকরণের মধ্যেও ঐতিহাসিক স্মারক আছে বলে মনে করেন এবং তার তালিকাও তৈরী করেছেন —

১। চন্দ্রপুর	উদয় মাণিক্য স্থাপিত।
২। ফুলকুমারী	ধন্য মাণিক্যের মেয়ের নাম।
৩। গোকুলপুর	কার নামাঙ্কিত ?
৪। ধ্বজনগর	ধ্বজ মাণিক্যের নাম অনুসারে?
৫। ছনবন	ছনের বন সত্যিই কি ছিল?
৬। রাজার বাগ	কোন রাজার বাগ?
৭। নোয়াপাড়া	পুরান বা জগন্নাথ দিঘির পশ্চিম পাড়ে। তবু নোয়াপাড়া নাম হইল কেন?

৮। ভাঙ্গার পাড় / মরাগাঙ — কোন নদীর কীর্তি? গোতমী?
৯। খিলপাড়া কেন পাড়াটা খিল (অনাবাদী) পড়েছিল?
১০। বৈষ্ণবীর চর কোন সে বৈষ্ণবী?
১১। কাশী মাণিক্যের শ্মশান কাশী মাণিক্যকে কি এখানেই দাহ করা হয়েছিল?

জায়গার নামগুলির উৎপত্তির কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সেসব প্রশ্নবোধক রেখেছেন। কিন্তু নামগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাঁর জলাশয়ের তালিকাটি অসম্পূর্ণ। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের সন্ধানে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। ঐ নামগুলি এবং তাদের অবস্থান পর্যালোচনা করলে উদয়পুরের তৎকালীন সময়ের সমাজচিত্রটির হদিস পাওয়া যায়। ব্রজেন্দ্র দত্তের তালিকাটি দীর্ঘ, তিনি ছোট -বড় মিলিয়ে ৪৫টি জলাশয়ের তালিকা তৈরী করেছেন। এর মধ্যে সুখ সাগর হ্রদকেও তিনি তালিকাভুক্ত করেছেন। তালিকাটি হল—সুখ সাগর; বাংমা ঢেপা (এটিও হ্রদই ছিল); বড় অমর সাগর; ধন্য সাগর (ধনী সাগর); পুরান দিঘি (জগন্নাথ দিঘি); বিজয় সাগর; বুড়িয়া দিঘি; মাতাবাড়ি দিঘি (কল্যাণ সাগর) ; চন্দ্র সাগর; ধর্ম সাগর (মাতাবাড়ির কাছে বাউস্যা পাড়ায়); ছত্র সাগর (দক্ষিণ চন্দ্রপুর); রাম সাগর (খিল পাড়া); মহেন্দ্র সাগর (খিল পাড়া); নানুয়ার দিঘি (খিলি পাড়া); রাজধর মাণিক্যের দিঘি (গ্রাম সোনামুড়া); ধ্বজ মাণিক্যের দিঘি; কুমারী দিঘি (মহাদেব বাড়ির পেছনে); কমলা সাগর; চন্তাই দিঘি (গ্রাম সোনামুড়া); চেচরা দিঘি; উজীরের দিঘি (গ্রাম সোনামুড়া); কল্যাণ সাগর (দক্ষিণ চন্দ্রপুর); মাতাবাড়ির দিঘি নয়); সত্য নাজিরের দিঘি (গ্রাম সোনামুড়া) মৈঘ্যা দিঘি (গ্রাম সোনামুড়া) ; হস্তীমর্দনের পুষ্করিণী (খিল পাড়া); ছড়িবরদারের পুষ্করিণী (খিল পাড়া); ধর্ম গোধীর পুষ্করিণী (থানার পুকুর, রাধা কিশোর পুর); মাগুসাই; বিলগুসাই (জগন্নাথ দিঘির পূর্বপাড় উকিল পাড়ার পূর্বে)।

ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুর বিভাগের কালেক্টর ছিলেন দফায় দফায় সাত বৎসর। কিন্তু তিনিও জলাশয়ের পূনাঙ্গ তালিকা তৈরী করতে পারেননি। তার নিজের স্বীকারোক্তি হল " উদয়পুরে পুরাতন দিঘি ও পুষ্করিণীর সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য।" তবে উপরিউক্ত দিঘির তালিকায় আরো যে সংযোজন করেছেন তা হল ঃ ঠাকুরের পুষ্করণী, ভট্টের পুষ্করিণী, কানা গোয়ালিনীর পুষ্করিণী; কামরনীর পুষ্করিণী, শাল পুষ্করিণী, দুধ পুষ্করিণী, তীরপাদুম দিঘি, দেবতামুড়া পুষ্করিণী, জলটুঙ্গী, ফুলটুঙ্গী, দাগীর মার পুষ্করিণী, পুরোহিতের পুষ্করিণী, গণকীর পুস্করিনী, দাইরা দিঘি, তাল পুষ্করিণী, জইগ্যার মার পুষ্করিণী (সংখ্যায় দুইটি), কামারিয়ার পুষ্করিণী ইত্যাদি।"

এই সকল নাম থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় উদয়পুরে আগে কত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বসতি ছিল। ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন " রাজারবাগ, বাগের পুষ্করিণী, জামাইমুড়া ইত্যাদি নাম দ্বারা এযাবৎ অনেক স্থান পরিচিত হইতেছে। বাগের পুষ্করিণী সন্নিকটস্থ বহু পুরাতন আমগাছগুলি এখনো জীবিত আছে (উদয়পুর বিবরণ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রিঃ)। ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চার দফায় উদয়পুরে ছিলেন। তখনই তিনি তথ্য সংগ্রহ করেন। তিনি লিখেছেন — " বর্তমান উদয়পুর টাউনের ৭ / ৮ মাইল দূরবর্তী কমলা সাগর নামক স্থানে কাচিগাং -এর সন্নিকটে কতগুলি পুরাতন অট্টালিকা ও মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। কমলা সাগরের উত্তর পাড়ে ঐ সকল প্রাচীন কীর্তি বর্তমান আছে। ঐ সকল

পুরাতন কোন ইষ্টকে ত্রিশূল ও চন্দ্রাকৃতি ছাপ দেখা গিয়াছে। উদয়পুরেও "১৪৪১" অঙ্কবিশিষ্ট অর্ধচন্দ্রের ছাপযুক্ত এরূপ পুরাতন ইষ্টক পাওয়া গিয়াছে।

বারভাইয়া, পদ্মপুকুর, বাংমা (বাগমা) প্রভৃতি ঐ অঞ্চলের অনেক পুরাতন স্থান ইতিমধ্যে আবাদিত হইয়া স্থানের পূর্ব গৌরব সূচিত করিতেছে। নাজিরের জাঙ্গাল ও তদ্রুপ একটি প্রাচীন কীর্তি। অনেক স্থানেই ইহারই অবলম্বনে বর্তমান বিশালগড় - উদয়পুর রাস্তা নির্মিত হইতেছে (বর্তমানের উদয়পুর - আগরতলা সড়ক)। মঠ, মন্দির, রাজবাড়ী প্রভৃতি প্রাচীন কীর্তির ন্যায় উদয়পুরের প্রসিদ্ধ সাগর। দীর্ঘিকা ও অন্যান্য জলাশয়গুলিও উল্লেখযোগ্য। ইষ্টক প্রস্তর নির্মিত মন্দিরাদির ধ্বংস হইলেও ঐ সকল জলাশয়ের চিহ্ন লোপের সম্ভাবনা দেখা যায় না।" ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের অনুমান বা ধারণা কিন্তু পূর্ণ সত্য নয়। তাঁর তালিকভুক্ত বহু জলাশয়ের বিলুপ্তি মানুষ ঘটিয়েছে, ভরাট করে বাসস্থান নির্মাণ করেছে বা চাষের জমিতে পরিণত করেছে।

২৭-১-১৯২৫ তারিখে " বিকালে পুরান মন্দির ইত্যাদি দেখিবার জন্য বাহির হই। মহাদেব বাড়ী, চতুর্দশ দেবতার বাড়ী, লুকপলানী ইত্যাদি অনেক মন্দির ও দালান দেখি। ঐ সব পুরান দালানের উপর এখন বড় বড় বটগাছ হইয়াছে। এখনো কিছু টাকা, বেশি নয়, বাৎসরিক ১০০০্ টাকা ব্যয় করিলে এই সব পুরান কীর্তিগুলি রক্ষা করা যাইতে পারে।" মহারাজ বীরবিক্রম পরিদর্শনের পর ঐ মন্তব্য করেন। মন্দির দালান ধ্বংস হয়েছে, জলাশয়গুলিও মানুষ গিলে খেয়েছে।

গোয়ালিনীর পুকুর, পুরোহিতের পুকুর, গণকার পুষ্করিণী, মৈঘ্যাদিঘি, ঠাকুরের পুকুর, কামারিণীর পুকুর, ভট্টের পুকুর, জুইগ্যার মার পুষ্করিণী, ছড়িবাদারের পুষ্করিণী, হস্তী মর্দনের দিঘি, মাগুসাই ও বিলগুসাই- এর পুকুর। পদবী ও বৃত্তির নিরিখে এই জলাশয়ের নাম থেকে স্থানীয় বসতি- বৈচিত্রের একটি রেখাচিত্র ফুটে ওঠে। কামার কুমোর, পুরোহিত, ধোপা, তাঁতী সকলকেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। একটা পূর্ণাঙ্গ সমাজের রূপ। এ তো গেল প্রজার পরিচিতি, পদবী ও বৃত্তির নিরিখে; রয়েছে রাজাদের নামেও দিঘি, জলাশয়। কল্যাণ সাগর, বিজয় সাগর, জগন্নাথ দিঘি, অমর সাগর, হ্রদতুল্য এই সব বৃহৎ জলাশয় বিভিন্ন রাজাদের নামে। প্রতিটিই তাদের সমকালকে ধরে রেখেছে। তাদের সময়ের কথা বলেছে। শ্রম-সম্পদ ও রাজকীয় বাসনার সঙ্গে নয়া বসতের উদ্যমের কথা বলছে। সুতরাং জলের ঢেউয়ের তলায় অন্তঃস্রোতে বিছানো রয়েছে ইতিহাসের পাতা।

বর্তমানে প্রায় সব উপাদানেই পলি পড়ছে। উদ্ধারের উপায় নিশ্চই রয়েছে। কিন্তু উদ্যম নেই। হতে পারে সমাজ বিবর্তনে আমরা এখ ন গণতন্ত্র - ধনতন্ত্রের চৌবাচ্চায় পালিত হচ্ছি। ফলে, বিবর্তনের পথে ফেলে আসা পথে কাঁটা বিছিয়ে দিচ্ছি। সামন্ত যুগ আমাদের উন্নত চেতনার কাছে বড় অবমাননার যুগ, সুতরাং পরিত্যাজ্য। কিন্তু একটি স্থানের ইতিহাস, জনবসতির ইতিহাস তার প্রথম পদপাত থেকে বর্তমান চূড়া — একটি ধারাবাহিক পরিক্রমা। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রাজসিংহ উপন্যাসের সমাপ্তি টেনেছিলেন এই বলে যে বাঙালী ইতিহাস বিস্মৃত জানি—কাজেই নিজেকে সে পরিচয়হীন রাখতে চায়। কথাটা ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সত্য। যা কিছু "আমা-কৃত" অন্ধকারে আমিই আলোকবর্তিকা। সুতরাং,অতীতের

অবশেষ যদি কিছু থাকে, তাকে ধ্বংস করো। এই উন্নয়নের নামে আগ্রাসন।

যেমন পাঠান-বিজয়ী ধন্য মাণিক্যের তৈরী বৈকুণ্ঠপুরী—আট কোণা মন্দির, ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল নির্মাণকল্পে উন্নয়ন - উত্তেজনার সম্মার্জনী আঘাতে ধুলোয় মিশেছে। কিন্তু উন্নয়নের এমনই তাড়না যে স্কুল ঐ টিলা থেকে সমতলে ধন্য সাগরের পাড়ে নেমে এসেছে এখন। এই উন্নয়নের পালকে যুক্ত রইল কালাহাড়ি কলঙ্ক দাগ, ভাস্কর্য ও ইতিহাস ধ্বংসের রক্তচিহ্ন। এই ধ্বংস করা হয়েছে সজ্ঞানে, বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে যখন আমরা অনেকটাই জ্ঞানবৃদ্ধ। জলটুঙ্গীর বিলুপ্তি তো অতি সাম্প্রতিক ঘটনা। এখন ঐ জলাশয় নেই। মহেশ কর্মকারের খাসতালুক এখন তার উত্তরাধিকারের হাতে শরিকি হিস্যায় বিভক্ত হয়েছে। জলাশয়টি বুঝিয়ে প্লটে জমি বিক্রি করে শরিকরা নিজ হিস্যা বুঝে নিচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্য। এই বাণিজ্যের পরিকাঠামো গড়তে গিয়ে বহু আগেই জলটুঙ্গীর মধ্যবর্তী " নীর মহলের" বিলয় ঘটানো হয়েছে। ফুলটুঙ্গী এখন কোটি টাকার বাণিজ্য সুখ। ভরাট হচ্ছে; ষাট লক্ষ টাকা কানি দরে বিক্রি হচ্ছে! এখন রাজা নেই, এখন এবা ব্যক্তি মালিকানায়। রাজার সম্পদ কি করে জনৈক শ্যামা শঙ্কর ঘোষের হাতে এলো এবং হস্তান্তরিত হল 'আসলাম' নামীয় এক উপজাতি হোটেল ব্যবসায়ীর হাতে। আবার তার উত্তরাধিকারীর হাত ফস্কে এখন এটি বহু কোটির বণিজ উপকরণ। সভ্যতা মানেই কি অতীতকে মুছে দিয়ে বর্তমানকে আলোকিত করা?

চক্ষুষ্মানেরা উদয়পুরে এই সব রাজন্য ভাস্কর্যের মধ্যে ত্রিপুরার নিজস্ব রীতিকে খুঁজে পেয়েছেন যা অবশিষ্ট ভারতের ভাস্কর্য রীতির চাইতে আলাদা। এ ব্যপারে বিশদে আলোচনা করেছেন অনাদিবাবু (ভট্টাচার্য)। ত্রিপুরার এই নির্মাণ শৈলীর নাম হল 'ত্রিবেগ' রীতি। ত্রিপুর রাজবংশ কিরাত দেশে রাজ্য বিস্তারের আগে ত্রিবেগেই রাজ্যপাট স্থাপন করেছিলেন, তিনি বেগ তথা তিন জলধারাব বা নদীর মিলনস্থল। ঐ ঐতিহ্যের অমরত্ব, ত্রিবেগ নামের মধ্যে। এর থেকে এটাই প্রতিপাদ্য যে ত্রিপুরার ভাস্কর্য-শিল্প তার একান্তই নিজস্বরীতি। গোটা ভারতেই মন্দির, মঠ, মসজিদ বা বিভিন্ন নির্মাণ ভাস্কর্যের অসংখ্য উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে। এক এক ভূ-অঞ্চলে দেখা যায় এক একটি রীতির অনুকরণ। যা আবার অন্য অঞ্চলের চাইতে পৃথক।

কেন এমন বৈচিত্র্ বা পার্থক্য ? এর কারণ অনুসন্ধানে যা বোঝা যায় তা হল অঞ্চল ভেদে বোধের সাজুজ্যতা এক একদেশীকতা তো একটি বিষয় বটে এবং তৎসঙ্গে যে বিষয়টি তা হল নির্মাণের ভিত্তি। মন্দির নির্মাণের জন্য চাই ভিত্তিভূমি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের জমি বা ভূমি বিভিন্ন ধরনের। এই ভূমি চরিত্রের উপর নির্ভর করেই মন্দিরের কাঠামো-আকার-বিন্যাস। লক্ষণীয় ত্রিপুরায় খুব উঁচু এবং আয়তনে বিশাল মন্দির নেই; যেমন ভারতের সর্বোচ্চ উঁচু মন্দিরটি রয়েছে দাক্ষিণাত্যে, মাদুরাইতে - মীনাক্ষী মন্দির। গগন চুম্বী যাকে বলে, এই বিপুল ভরের মন্দির দাক্ষিণাত্যের কঠিন আগ্নেয়শিলাই কেবল বহন করতে পারে। নব্য পলল মৃত্তিকায় বা নবীন পর্বতের শানুদেশ বা তার উপত্যকার গরম গ্রন্থনার মাটি এত ভার বহনে অক্ষম। বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তি ঐ প্রতিবন্ধকতা দূর করেছে কিন্তু শত শত বৎসর আগে মানুষ ছিল একান্তই প্রকৃতিনির্ভর। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আকার, প্রকৃতি ও উচ্চতা বিষয়টিকে মাটির গঠনের উপরই ছেড়ে দেওয়া হত। ফলত, ভারতে অঞ্চলভেদে গঠন-বৈচিত্র অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এর নামও হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন। যেমন দক্ষিণ ভারতে

দ্রাবিড় শৈলী; শক্ত-পোক্ত মাটি, কাজেই তার উপর যত খুশি ভর চাপাও। আবার উত্তর ভারতে একটি পৃথক উপস্থাপন।

উত্তর ভারতে হিমালয়ের দক্ষিণ ভাগ থেকে বিন্ধ্যপর্বত পর্যন্ত অঞ্চলের মাটি দাক্ষিণাত্যের মাটির মতন তত শক্ত নয়, ফলে ততটা ভার বহনে সক্ষমও নয়, এই যে নাগর সমভূমি এই অঞ্চলে মন্দির অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার এবং ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট। এই গঠনশৈলীকে বলা হচ্ছে নাগর শৈলী। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দিরটিকে এর প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে বলা হয়। এই শৈলী দ্রাবিড় শৈলী থেকে পৃথক। কিন্তু মধ্য-ভারতে একান্তই কোন নিজস্ব ঘরানার প্রচলন হয় নি। সেখানে ভূমির গঠন ও উত্তর ভারতের মতন পলল মৃত্তিকার হাল্কা বাঁধনে নয়, বরং দাক্ষিণাত্যের আগ্নেয়শিলা এখানেও ধাক্কা দিয়েছে, আর উত্তর অংশে উত্তরের আলগা বাঁধন এসে জায়গা পেতে চেয়েছে। ফলে দ্রাবিড় ও নাগর শৈলী মিলে একটি 'মিশ্র শৈলী' তৈরী হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা এই মিশ্র শৈলীর নাম রেখেছেন বৈকার শিল । রাজস্থান বা রাজপুতনা বা গুজরাটে অসংখ্য উদাহরণে এই শৈলী অনন্য। সেই অর্থে এটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি স্বতন্ত্র শৈলীও কেউ বলতে পারেন।

এবার নব্য পলল মৃত্তিকার বাংলার স্থাপত্য শৈলী। এ বিষয়ে " ত্রিপুরার মন্দির স্থাপত্য" শীর্ষক নিবন্ধে যে আলোচনা করেছেন অনাদি বাবু তা হল ঃ " আঞ্চলিক মিশ্র শৈলীসমূহের মধ্যে " বাংলা রীতি' স্বকীয় মহিমায় ভাস্বর।" এর আবার কতগুলি উপবিভাগ রয়েছে।

ক) এক বাংলা রীতি ঃ খড়ের দোচালা ঘরের অনুকরণে নির্মিত বক্রতল ছাদবিশিষ্ট মন্দির। বীরভূম, মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়ায় এই ধরনের নির্মাণ কাঠামো রয়েছে।

খ) জোড় বাংলা রীতি ঃ একই উচ্চতাবিশিষ্ট সমান আকার ও আয়তনের দুটো দোচালা ঘরকে দৈর্ঘ্যের দিকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে যেমন দেখায়, জোড় বাংলা মন্দির দেখতে ঠিক তেমনি। ঐ ধরনের মন্দিরও বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমেই বেশি দেখা যায়।

গ) চৌচালা এক চূড়া ঃ চৌচালা খড়ের ঘরের অনুসরণে তৈরী। উপরে কারুকাজ করা চূড়া থাকে। চূড়ার গঠনশৈলীর পার্থক্য অনুসারে এক নামকরণ: যেমন রেখ দেউল; পীড়া দেউল।

ঘ) এক চূড়াবিশিষ্ট আটচালা ঃ এই ধরনের অনেকটা চারচালা বিশিষ্ট দোতলা ঘরের অনুরূপ। দ্বিতলে কোন কক্ষ থাকে না। কালীঘাটের মন্দিরটি এই স্থাপত্যর উদাহরণ।

ঙ) রত্ন শৈলী ঃ চৌচালা, বহুতল ও বহুচূড়াবিশিষ্ট মন্দির। এদের চূড়ার সংখ্যা অনুযায়ী মন্দিরের নামকরণ হয়। যেমন — চৌচালা, একতল এবং পাঁচ চূড়াবিশিষ্ট হলে " পঞ্চরত্ন"। দ্বিতল, আটচালা এবং নয়টি চূড়াবিশিষ্ট হলে " নবরত্ন"। তিনতল বারটি চালা এবং তেরটি চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরের নাম " ত্রয়োদশ রত্ন"। এমনি করে " সপ্তদশ রত্ন" ইত্যাদি। দাক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ী রত্নশৈলীর নিদর্শন।

এক বাংলা রীতিতে উদয়পুরে তিনটি স্থাপত্য নিদর্শন রয়েছে। বদরমোকামে বদর সাহেবের দরগাহ, কাছেই কল্যাণ সংঘর পার্শ্বে লোক পলানী দালানটি এবং জগন্নাথ দিঘির পূর্বপাড়ে হরিমন্দিরের প্রবেশ তোরণ। উঁচু চত্বরের উপর নাতিউচ্চ প্রাকার বেষ্টিত, সিঁড়িযুক্ত তোরণ শোভিত হরিমন্দিরটি যেন একটি দুর্গবিশেষ। উদয়পুর থেকে রাজধানী সরে যাওয়ার পর

মহারাজ কৃষ্ণ মাণিক্য কুমিল্লার কাছে (অধুনা বাংলাদেশ) জগন্নাথ পুরে চারতলা, সতের চূড়া বিশিষ্ট " সতের রতন" নামে যে মন্দির নির্মাণ করেন এতে বোঝা যায় পরবর্তীকালে "রত্নশৈলী" ত্রিপুর রাজাদের আকৃষ্ট করেছিল।

বলা হয়েছে ত্রিপুরার নিজস্ব স্থাপত্য শৈলীটির নাম " ত্রিবেগ"। ত্রিবেগ রীতি বিকশিত হওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে মৃত্তিকার গঠন প্রকৃতি। রাজারা এর পৃষ্ঠপোষক। তবে রাজ আনুকূল্য ছাড়াও সাধারণ মানুষের মনের আবেগে কিছু নির্মাণ হতে থাকে। অনাদিবাবু তাঁর নিবন্ধে বলেছেন —" সাধারণ প্রজারা নদী-সঙ্গমে বা পথ-সঙ্গমে বাঁশের মণ্ডপ তৈরী করে বা দেবতার 'থানে' বটগাছ, সিজগাছ স্থাপন করে তার নীচে দেবতার পূজা দেয়।" কিন্তু রাজার তো রাজকীয় ব্যবস্থা চাই; তাই রাজসিক ব্যবস্থা। দেবতার জন্য পাকা দালান কোঠা। অতএব ত্রিপুরায়ও মন্দির তৈরী কর। মঠ বানাও। এখানকার প্রকৃতি আর ভূমির গঠনরূপকে মেনেই তা কর। অন্যের অনুকরণের প্রয়োজন নেই। আমার রাজ্যে যেভাবে সম্ভব। ভূমি, জলবায়ু, পরিবহণ এই 'ত্রিতাপ' ত্রিপুরার ক্ষেত্র গগনচুম্বী বৃহদায়তন দেবমন্দির নির্মাণের ব্যাপারে অন্তরায়। অধিকন্তু পার্বত্য ত্রিপুরার দুর্গমতার জন্য উন্নতমানের কাঁচামাল, পাথর, মসলা, দক্ষ কারিগর, শিল্পী যোগানও সম্ভব ছিল না। তাই স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য এঁটেল মাটি পুড়িয়ে ইট তৈরী করে কাজ চালাবার মতন যোগ্যতাসম্পন্ন কারিগর সংগ্রহ করে মন্দির নির্মাণে হাত দেওয়া হল। " সৎকাজে শতেক বাধা" অচিরেই ত্রিপুরায় গড়ে উঠল "অনুপম এক মন্দির স্থাপত্য শৈলী — যে-শৈলী সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মন্দির-স্থাপত্যে এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করল"। দেখা যাচ্ছে 'ত্রিবেগ' রাজ্যপাট থাকার সময় ত্রিপুর রাজারা কোন স্থাপত্য নির্মাণ করেননি।

ত্রিপুর রাজারা ত্রিবেগে ছিলেন ১৪৩৭ খ্রিঃপূর্ব থেকে ১৩০০ খ্রিঃ পূর্ব পর্যন্ত ১৩৭ বৎসর, চার পুরুষ দৈত্য, ত্রিপুর, ত্রিলোচন ও দাক্ষিণ। সেখানে তারা থিতু নন, চলে আসেন খলংমাতি, সেখানে তারা স্থায়িত্ব পেয়েছিলেন ১৩০০ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ১৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত, রাজত্ব করেছেন ৫২ পুরুষ বা বাহান্নজন রাজা। সেখানেও কোন নির্মাণ নেই; তারপর ছাম্বুলে ৪৪০ বৎসর কিন্তু ৫৯০ খ্রিষ্টাব্দে থিতু হলেন রাঙামাটিতে। সেখানেই দীর্ঘকাল স্থিতি। এই স্থায়িত্বের অবকাশই তাদের কীর্তি-স্থায়ীকরণের প্রেরণা ও সুযোগ এনে দেয়। গড়ে তোলেন -মঠ-মন্দির রাজগৃহ বিনোদনগৃহ, স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি। 'ত্রিবেগ' নাম তারা বিস্মৃত হননি। ফলে বাস্তব কারণে যে স্বতন্ত্র স্থাপত্য রীতি তাঁরা অনুসরণ করলেন, ঐ ঘরানার নাম হয়ে গেল 'ত্রিবেগ' রীতি। বিশেষজ্ঞরা 'ত্রিবেগ'কেই স্থায়ী করে দিল। প্রশ্ন উঠেছিল ত্রিবেগ রীতির স্থাপত্য শৈলীর আধিক্য উদয়পুরেই কেন? উদয়পুরে প্রাচীন মন্দিরের সংখ্যা ৫০ টি ; এর অর্ধেক পঁচিশটিই বিশুদ্ধ ত্রিবেগ রীতিতে তৈরী। ফলত, এই কেন, এর উত্তর হল ১১৭০ বছরের স্থায়ী রাজ্যপাট। এবং বংশের বড় রাজারা এখানেই রাজত্ব করেছেন। তাদের বর্ণময় জীবন, পলিশীলিত মনন, ও ঐশ্বর্য তাদের নান্দনিক প্রতিষ্ঠাকর্মের অনুপ্রেরণা। রামদেব মাণিক্য নির্মিত বিখ্যাত ভুবনেশ্বরী মন্দিরটি ত্রিবেগ রীতির এখনো নিটোল নিদর্শন।

তবে ত্রিবেগ রীতির আধিক্য থাকলেও পার্বত্য ত্রিপুরার বাইরেও সমতল ত্রিপুরা চাকাল রোশনাবাদেও ত্রিপুর রাজারা ত্রিবেগ শৈলীতে মঠ-মন্দির নির্মাণ করেছেন। ময়নামতী পাহাড়ে

'চণ্ডীমুড়া'য় এই রীতিতে তৈরী একটি অর্ধভগ্ন মন্দিরের অবশেষ মিলেছে। ময়নামতা বর্তমানে বাংলাদেশে। তবে এটা অনস্বীকার্য যে, ত্রিপুর-রীতি পরিত্যক্ত হতে শুরু করে ১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে, উদয়পুর থেকে রাজধানী স্থানান্তরের সময় থেকে।

'ত্রিবেগ' রীতিতে তৈরী মন্দিরগুলির অধিকাংশই দক্ষিণ দুয়ারী। গোটা চারেক পশ্চিম দুয়ারী। একটি মাত্র মন্দির পূর্ব দুয়ারী। অধিকাংশ মন্দিরই চত্বরের উপর নির্মিত। পুণ্যার্থীদের পক্ষে মন্দির প্রদক্ষিণের সুবিধার জন্যে এই ব্যবস্থা। [রাজধর মাণিক্যের (১৫৮৬ খ্রিঃ — ১৫৯৯ খ্রীঃ) বিষ্ণু মন্দির রাজবাড়ীর সীমাতেই কিঞ্চিৎ দক্ষিণ দিকে, একেবারে গোমতীর পাড় ঘেঁষে তৈরী। ঐ মন্দির পরিক্রমাকালে সংকীর্ণ চত্বর থেকে মহারাজ রাজধর মাণিক্য গোমতী নদীতে পড়ে যান এবং তাঁর মৃতু হয়।]

মন্দিরগুলি পাতলা পোড়া ইটে, (৪" x৪" x ১^{১}/$_{২}$" মাপে) তৈরী। ইট তৈরীর ফর্মা ছিল না। নরম এঁটেল মাটির চাদর তৈরী করে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রয়োজন মতন সাইজ করে কেটে পোড়ানো। পোড়া ইট গাঁথা হত কলিচুন, সুরকী ও খয়ের সংমিশ্রণে তৈরী ' মশলা' দিয়ে। মন্দিরের বক্রতলও বিশেষ কায়দায় ইটের পর ইট গেঁথে তৈরী। মন্দিরের দুটি প্রকোষ্ঠ। একটি বহিঃগৃহ অপরটি গর্ভগৃহ। দুই প্রকোষ্ঠই একই ধরনে নির্মিত বক্রতল একচূড়া বিশিষ্ট ছাদ। গর্ভগৃহের ছাদটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। ছাদ পশ্চিমবঙ্গের চৌচালা রীতিতে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত বৌদ্ধস্তূপের আকৃতি লাভ করেছে।

বৌদ্ধস্তূপের অনুসরণে রয়েছে 'অন্ত' ও 'আমলক'। ' আমলক' কোন মন্দিরে কমলালেবুর আকৃতি, কোন মন্দিরে মিষ্টি কুমড়োর মতন শির কাটা। দেয়াল ভীষণ পুরু। ফলে বাইরের আকৃতির অনুপাতে ভিতরের পরিসর সংকীর্ণ। পুজোর উপকরণ তৈজস পত্রাদি রাখার জন্য ভিতর প্রকোষ্ঠে কুলুঙ্গী রয়েছে। মন্দিরে প্রবেশপথ একটি। দরজায় হিন্দুরীতি ও আরবী রীতির মিশ্রণ। মন্দিরের কোন জানালা নেই। দরজার বিপরীতে ছোট্ট পরিসরের ফোকর রয়েছে বায়ু চলাচলের জন্যে। গর্ভগৃহে দেবমূর্তি স্থাপনের জন্য ইটের বেদী (জগমোহন) দেখা যায়। বাইরের দেয়াল সাদামাটা হলেও চারদিকেই দেয়ালের গায়ে ইঞ্চি খানের পুরু, ইঞ্চি দুয়েক প্রশস্ত কতগুলি সরল শিরা ভূসমান্তরাল করে ভিত্তিভূমি থেকে মন্দিরের কার্ণিশ পর্যন্ত টানা। সরল রেখাগুলিতে খচিত রয়েছে ফুল, মাছ, হীরকাকার ছাঁচ।

কোন কোন মন্দিরে পোড়ামাটির টালিতে তৈরী লতাপাতা পশু-পাখি, দেবদেবীর মূর্তি খচিত। ভুবনেশ্বরী মন্দিরের পেছনে বাইরের দিকে একধরনের কতগুলি টালি এখনো রয়েছে। লোকপলানী ভবনের দ্বিতলের কক্ষটির পূর্বদিকের দরজাটিতেও পোড়া মাটির কাজ ছিল। কিছু কিছু কাজ উদয়পুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের পেছনে, গোমতীতে কাৎ হয়ে পড়ে থাকা 'মন্দিরটিতেও রয়েছে।

'ত্রিবেগ শৈলী' প্রচলনের আগেও মাণিক্য রাজারা মন্দির গড়েছেন। এব্যাপারে অন্যতম পূর্বসূরী মহারাজ ধন্য মাণিক্য। উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, শিবমন্দির, কমলাসাগরের কালীমন্দির ত্রিবেগ রীতি অনুসারে নয়। উদয়পুরের জগন্নাথ বাড়ির মন্দিরটিও 'ত্রিবেগ শৈলী বিকাশের আগে। আসলে ত্রিবেগ শৈলীর প্রধান্য থাকলেও মিশ্র ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে ত্রিপুরায় এবং উদয়পুরেও। দেখা যায় কোন কোন মন্দিরের বাইরের দিকের কোণগুলি 'শিরতোলা

নয়', আরবী স্থাপত্যের মিনারের অনুসরণে প্রতিটি কোণে 'ঠেস্‌না' যুক্ত করা হয়েছে। ছাদের কার্নিশ ধীরে ধীরে নেমে এসে ঠেস্‌নায় মিশেছে। 'ত্রিবেগ' ত্রিপুরার নিজস্ব শৈলী হলেও স্পষ্টতই এখানে তিনটি রীতি বাংলা চৌচালা, একচূড়া, বৌদ্ধস্তূপ এবং ইসলামি মিনার অতি সুন্দরভাবে সমন্বিত হয়েছে।

অনাদি ভট্টাচার্য তার দীর্ঘ ভাস্কর-কাঠামো পরিদর্শন, চাক্ষুষ ও হৃদয়ঙ্গম করার পর একটি বিশেষ কথার উল্লেখ করেছেন —" উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশের ছাদে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যের বিভিন্ন গঠনশৈলীর মিনিয়েচার নমুনা রয়েছে। এই নমুনাগুলো দেখলে ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্য সম্বন্ধে ধারণা জন্মাবে এবং তুলনামূলকভাবে ' ত্রিবেগ শৈলী'র' অনন্যতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যাবে।"

এই যে শিল্প-সমন্বয় যেখানে ত্রিপুরার নিজস্ব শৈলী ' ত্রিবেগ'-এর প্রাধান্যের সঙ্গে বৌদ্ধ ও ইসলামি স্থাপত্যের মিশ্রণ তা ত্রিপুর রাজবংশ এবং ত্রিপুরাকে এক ভিন্ন উচ্চতাও দান করেছে।

১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে (১৫৮৩ শকাব্দ) নির্মিত হয়েছিল উদয়পুরে জগন্নাথের মন্দির (বিষ্ণু মন্দির?)। উদয়পুরের জগন্নাথ মন্দিরের স্থাপত্যে ইসলামীয় রীতির প্রভাব পড়েছে সেকথা কাশীনাথ দীক্ষিত বলেছেন — "It is built in a style characteristic of later Mohammedan period. It is square in plan with a passage on the east, facing entrance and recesses in the wals on the other three sides. The top is crowned with a dom with a vaulted roof in pure Mohammedan fashion" (শ্রীরাজমালা, চতুর্থ লহর, পৃঃ ৯০)। ত্রিপুরার মন্দিরে যে ঠেস্‌না লক্ষ্য করা যায় এগুলি মুসলিম মিনানের অনুকরণ। ডঃ কার্তিক লাহিড়ী তাঁর ' মন্দির মসজিদ গীর্জা মঠ' পুস্তিতায় ত্রিপুরার মন্দিরের আরো বৈশিষ্ট্যের কিছু উল্লেখ করেছেন। " একই আবেষ্টনীর মধ্যে দুটি বা তিনটি মন্দির। বিশেষ করে উদয়পুরে কয়েকটি গুচ্ছমন্দির দেখা যায়। বর্তমান ধর্মাশ্রম যেখানে প্রতিষ্ঠিত সেখানে একই সঙ্গে দুটি মন্দির। মহাদেব বাড়ি গুচ্ছ, দুত্যার বাড়ি, গুণবতী গুচ্ছ, লোক পলানী ঝুলন-সহ দুটি মন্দির, গোমতীর দক্ষিণ পাড়ে (রাজবাড়ীর সীমায়) পাশাপাশি তিনটি মন্দির — এসব গুচ্ছমন্দিরের নিদর্শন।

ডঃ লাহিড়ী ত্রিপুরার মন্দিরে উড়িষ্যা শৈলীর প্রভাবেরও উল্লেখ করেছেন। " ত্রিপুরার রাজারা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করার পর সপরিবারে পুরী তীর্থ দর্শনে যেতেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত গোপীনাথ মন্দিরে ত্রিপুরার রাজা রামগঙ্গা মাণিক্যের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এক শিলালিপি আছে। শিলালিপি এরকম ঃ—

" জিলে ত্রিপুরার মোহারাজা সরকার
উদএপুরে শ্রীল শ্রী রামগঙ্গা মণি
ক্য ভ্রাত শ্রীল কাশীচন্দ্র ঠাকুর
শ্রীমতি ইন্দুরিনা তারা রাজ কু
মার শ্রীল কৃষ্ণ কিশোর ঠাকুর
ইতি সন ১২২৬ সন তারিখ ১৬ শ্রাবণ।"

উড়িষ্যার নাটমন্দির যে-উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, ত্রিপুরার নাটমন্দির সে-উদ্দেশে ব্যবহার হলেও তা যে জগমোহন রূপেও ব্যবহার হতো, মহাদেব বাড়ির বর্তমান নাট মন্দির দেখলে বোঝা যায়। মন্দিরগুলির বেশির ভাগই কল্যাণ মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য বা তার সমসাময়িক কালের রাজাদের দ্বারা নির্মিত। রাজধর মাণিক্য বোধ হয় সরকারিভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন। " বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষা ছিল মহারাজা।।

পরম বৈষ্ণব সাধু বা হিংস্রায় প্রজা।

সাধুর চরিত্র রাজা বৈষ্ণব আচার।

পাত্র মিত্র সৈন্য বশ করে আপনার।।"

(শ্রীরাজমালা, তৃতীয় লহর, রাজধর মাণিক্য খণ্ড, পৃঃ ৫০)।

পরবর্তীকালে মাণিক্য রাজারা রাজধরের পথই অনুসরণ করেছেন। মহারাজা অসংখ্য বিষ্ণু, হরি, ও লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির নির্মাণ করেছিলেন এবং তাদের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আনুগত্য থেকেও সহজে অনুমান করা যায়। ফলে চৈতন্য মহাপ্রভুর লীলাক্ষেত্র নীলাচলের মন্দির স্থাপত্য রীতির প্রভাব এ অঞ্চলের মন্দির স্থাপত্যে বর্তাবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। " মন্দির মসজিদ গীর্জা মঠ — কার্ত্তিক লাহিড়ী, পৃঃ ১৬-১৭)।

ভগ্ন, অর্ধ ভগ্ন এবং অক্ষত মন্দিরের সংখ্যা বিচারে ত্রিপুরার মধ্যে উদয়পুর অগ্রগণ্য এবং অত্যন্ত সীমিত এলাকায় সচরাচর এতগুলি মন্দির দেখা যায় না। তাই উদয়পুরকে " মন্দির পুর" বললে অত্যুক্তি হয় না।

এখনতো নামই হয়েছে 'মন্দির নগরী', আবার আহ্লাদী নাম সরোবর নগরী। এই রাজ্যের প্রায় সমস্ত মন্দিরই একই রীতিতে নির্মিত (ডঃ লাহিড়ী)। কাজেই প্রতিনিধি স্থানীয় মন্দিরগুলি নিয়ে আলোচনা হলে, হাঁড়ির সব ভাতেরই সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির ঃ

উদয়পুর থেকে চার কিলোমিটার দক্ষিণে আগরতলা-সাব্রুম রাস্তার বাম পার্শ্বে একটি নাতি উচ্চ টিলার (কূর্ম পীঠ) উপরে এই মন্দির ১৫০১ খ্রিঃ মহারাজ ধন্য মাণিক্য নির্মাণ করেন। ১৮০ বছর পরে ১৬৮১ খ্রিঃ মন্দির পরিমার্জন করা হয়। আবার প্রায় পৌনে দু'শ বছর পরে মন্দিরটি পুনরায় সংস্কার করেন রাম মাণিক্য। মন্দিরটি বিষ্ণু বিগ্রহ স্থাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু

" ভগবতী রাজাতে স্বপ্ন দেখায় রাত্রিতে।

এই মঠে আমা স্থাপ্য রাজা মহাসত্ত্বে।।

চাটিগ্রামে চট্টেশ্বরী তাহার নিকট।

প্রস্তরেতে আমি আছি আমার প্রকট।।

তথা হইতে আনি আমা এই মঠে পূজ।

পাইবা বহুল বর যেই মত ভজ।।"

(শ্রীরাজমালা, দ্বিতীয় লহর, ধন্য মাণিক্য খণ্ড, পৃঃ ৩০)।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর উদয়পুর বিবরণ-এ লিখেছেন —" উদয়পুরে এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে বর্তমান বিগ্রহ মাঁয়ের বাড়ীর নিকটবর্তী ব্রহ্মছড়ার কোন স্থানে জল মগ্ন ছিল, ত্রিপুরার

নরপতি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পীঠস্থানে এই বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন।" চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মছড়া উভয় ক্ষেত্রেই 'স্বপ্ন' ভূমিকায়। তাবে মিমাংসা? মিমাংসার সন্ধান কেউ করেছেন দেবীর গাত্রবর্ণ এবং মুখাবয়ব এর মধ্যে। মুখাবয়বে মোঙ্গলীয় ছাঁচ। গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। চোখের দৃষ্টি খর। তাদের পক্ষপাতিত্ব চট্টগ্রামের প্রতি। শ্রীরাজমালাতে উল্লেখ আছে যে, সেনাপতি রসাঙ্গমর্দন নারায়ণ দেবী মূর্তিটি আনেন চট্টগ্রাম থেকে। গবেষক দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী এক্ষেত্রে যে যুক্তির অবতারণা করেছেন তা প্রণিধান যোগ্য। তাঁর যুক্তি হল " রাজমালাতে ধন্য মাণিক্যের চট্টগ্রাম অভিযানের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, ১৪৩৫ শকাব্দে (১৫১৩ খ্রিঃ) এবং পুনরায় ১৪৩৬ শকাব্দে (১৫১৪ খ্রিঃ) ধন্য মাণিক্য চট্টগ্রাম দখল করেন। ধন্য মাণিক্যের সময়ের প্রাপ্ত মুদ্রাও ১৪৩৫ শকাব্দেরই সাক্ষ্য দেয়। ১৪৩৬ শকাব্দে প্রেরিত বাহিনীতে প্রথম রসাঙ্গমর্দনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই ১৪৩৬ শকাব্দ বা ১৫১৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে দেবী মূর্তি আনা সম্ভব নয়, কারণ এর পূর্বে চট্টগ্রাম ত্রিপুরা রাজ্যের দখলে ছিল না (ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর, পৃঃ ৫১)"। মন্দির তো নির্মিত হয়ে যায় ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দেই। তাহলে কি চৌদ্দ বৎসর মন্দির বিগ্রহ-শূন্য ছিল? না কি ব্রহ্মছড়া তত্ত্বই যথার্থ?

মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। একটি অনুচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর এভাবে স্থাপিত যে, দর্শনার্থী অনায়াসে মন্দির প্রদক্ষিণ করতে পারেন। গর্ভগৃহের অভ্যন্তর বৃত্তাকার হলেও বাইরের চার কোণে চারটে ঠেস্‌না বা আলম্ব আছে। দেয়ালের এপাশ-ওপাশ জুড়ে সমান দূরত্বে আনুভূমিক ও সামঞ্জস্য রেখে ছোট ছোট খাড়া বা উলম্ব রেখা নানা আকারের আরও ক্ষেত্র রচনা করেছে। অন্যদিকে, ঠৈস্‌নার গায়েও কিছুদূর অন্তর অন্তর আনুভূমিক উদ্‌গত রেখা প্রায় বৃত্তাকার হয়ে ঠেস্‌নার সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। ঠেস্‌নার মাথায় উল্টানো কলস, সেই কলসের উপর চারচালা বিন্যস্ত। চারচালার ঠিক মধ্যখানে বৃত্তাকার বেদীর উপর মোচাকৃতি অণ্ড, অণ্ডের মূল বা পাদদেশে শ্রেণীবদ্ধ ছোট ছোট কুলুঙ্গী অণ্ডকে অনেকটা পদ্মের পাপড়ির আকার দিয়েছে। অণ্ডের উপর আমলককে প্রলম্বিত করে মোচাকার করা হয়েছে। বিশেষত অণ্ডের গঠনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্যে। আমলকের সারিবদ্ধ লম্বা লম্বা উচ্চাবচ ত্রিতল বক্ররেখা স্পষ্ট দেখা যায়। আমলকের উপর করণ্ড এবং সর্বোপরি পতকা।

আমলকটি যে এখানে প্রলম্বিত হর্মিকা, অথবা চতুষ্কোণ হর্মিকাটি মোচাকার অণ্ডের সঙ্গে সংগতি রাখার জন্য লম্বিত করা, তা মন্দিরের সমগ্র মস্তক অংশটি পরীক্ষা করলে বোঝা যায়।

শীর্ষ অংশটি বৌদ্ধ স্তূপেরই বিবর্ধিত রূপ, মন্দিরটি যে অনেক সময় বর্মী প্যাগোডা বলে ভুল হয়, তার মূল কারণ মন্দিরের উপস্থিত স্তূপটি। অনেকে অবশ্য মনে করেন যে মন্দিরটি আসলে বৌদ্ধ মন্দিরই ছিল (মন্দির মসজিদ গীর্জা মঠ – ডঃ কার্তিক লাহিড়ী)। দক্ষিণ ত্রিপুরায় বৌদ্ধ প্রভাব ও বৌদ্ধ বসতি বিস্তারের প্রভূত সাক্ষী রয়েছে।

মন্দির মধ্যে অন্য একটি প্রস্তর মূর্তি রয়েছে। তাকে ' ছোট মা' বা 'চণ্ডী' বলা হয়। মন্দির গাত্রের শিলালিপিতে লেখা রয়েছে " আসীৎ পূর্বং নরেন্দ্রঃ সকলগুণযুক্ত ধন্য মাণিক্য দেবো।"

ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর সেবা পূজার জন্য তালুক আছে। তাঁর সেবা পূজার ব্যয় ঐ আয়

থেকে নির্বাহ হত। এখন ঐ তালুকের বিরাট অংশ শতাধিক দ্রোণ সম্পত্তির মধ্যে সংলগ্ন এক দ্রোণের মতন (ষোল কানি জমি) অংশ বাদ দিয়ে পুরো জমিই সেবাইৎদের ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পত্তি, মালিকানা ও প্রশাসনিক সহযোগিতায় পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন আইন করেও 'দেবী' ঐ সম্পত্তি আর দাবি করতে পারবে না। আর ব্যয় নিধায় সরকারি তহবিল থেকে করা হচ্ছে।

১৩১৩ ত্রিং ১৯০৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মায়ের বাড়িতে বাৎসরিক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে, তার আগে মেলা হত না। ঐ মেলা হত পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে। পরে ১৯৩১ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ঐ মেলার সময় বদল হয়ে দীপাবলি উপলক্ষ্যে মেলা বসছে। একদিন রাত্রির মেলা গড়িয়ে এখন তিন দিন।

মহাদেব বাড়ির মন্দির গুচ্ছ ঃ

উদয়পুরের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির হল ত্রিপুরেশ ভৈরব তথা মহাদেবের মন্দির এবং তৎসংলগ্ন মন্দির গুচ্ছ। মন্দির গুচ্ছ প্রাচীর বেষ্টিত, মহাদেব দিঘির উত্তর পাড়ে। প্রাচীরের তোরণটি চারচালা। প্রবেশ পথ ধনুকাকৃতি খিলান যুক্ত। খিলানের ঠিক উপরে দীর্ঘায়ত পদ্মের পাপড়ি যার গতি উপর থেকে নীচের দিকে। এর উপর পতাকা দণ্ড। মন্দিরের নির্মাতা ধন্য মাণিক্য। ১৬৫১ খ্রীঃ মহারাজ কল্যাণ মাণিক্য, ঠিক ১৫০ বৎসর পরে, ১৫০১ খ্রিঃ নির্মিত শিবমন্দিরের সংস্কার করেন।

তোরণ দিয়ে ঢুকে নাট মন্দির। তার ছাদ নেই। সামনের বড় মন্দিরটি চর্তুদশ দেবতার মন্দির। বাঁধানো চত্বরের উপর মন্দিরটি। মন্দিরের বহিঃগৃহের প্রবেশ পথ খিলান যুক্ত। বহি:গৃহের দেয়ালের নিরাভরণতা দূর করার জন্য পাঁচটি আনুভূমিক উদগত পর্শুকা সমান দূরত্বে টানা হয়েছে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখো। বহি:গৃহের সামনে পূর্ব-পশ্চিম কোণে দুটি ঠেস্‌না ছিল। বর্তমানে ভগ্ন । বাঁকানো আলসে ও সর্বোচ্চ পর্শুকার মধ্যে চতুষ্কোণ প্রতিষ্ঠা ফলকটি সংস্থাপিত।

বহি:গৃহের উপরে গর্ভগৃহের অনুরূপ চারচালা ও স্তূপ গর্ভগৃহের দেয়ালেও আনুভূমিক সমান্তরাল উদ্গত পর্শুকা রেখা রয়েছে। এই রেখাগুলির মধ্যে কেবল দুটি সমস্ত দেয়ালে অবিচ্ছিন্নভাবে ধাবিত, অন্য রেখাগুলি বহি:গৃহের ও গর্ভগৃহের সংযোগ স্থল পর্যন্ত প্রসারিত। গর্ভগৃহ ও চারদিকে গোলাকার ঠেস্‌না, যার স্ফীতি নীচ থেকে উপরে ক্রমশঃ হ্রাসমান। ঠেস্‌নার গায়ে সমান দূরত্বে পর্শুকা রেখা, ঠেসনার মাথায় কলস, কূর্মাকৃতি চালায় প্রলম্বিত অংশ ঠেস্‌নার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে। চালার উপর গোলার্ধ আকার অণ্ড তার উপর ছোট্ট ঘটের মতন আমলক। এর উর্ধ্ব অংশ ভগ্ন। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দির কল্যাণ মাণিক্য গোপী নাথের উদ্দেশে দান করেন।

ঐ বেষ্টনীতে লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরটি দক্ষিণমুখো। ১৬৭৩ খ্রিষ্টাব্দে গোবিন্দ মাণিক্যের ছেলে রাম মাণিক্য এর নির্মাতা। এর গড়ন চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের মতনই। পার্থক্যের মধ্যে মন্দিরটি বাঁধানো চত্বরের উপর নয়। বহি:গৃহে প্রতিষ্ঠা ফলক নেই। মস্তকে অণ্ডের পাদদেশে সারিবদ্ধ কুলুঙ্গী। গর্ভগৃহের বক্রাকার আলসের নীচে সারিবদ্ধ ছোট ছোট অলঙ্করণ। দুটি মন্দিরেই কোন বিগ্রহ নেই।

শিবমন্দিরটিও একই রীতিতে তৈরী। ১৩১২ ত্রিপুরাব্দ (১৯০২ খ্রিঃ) থেকে শিবচর্তুদশী উপলক্ষ্যে স্থায়ীভাবে মেলা সংগঠিত হয়ে আসছে। মহাদেব বাড়ির মেলাই উদয়পুরে সর্ব প্রাচীন মেলা, ত্রিপুরাসুন্দরী মেলার এক বৎসর আগেই এর প্রচলন। ১৯০৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এই মেলার অঙ্গ হয়। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই মন্দিরের সরকারি ব্যয়ে সংস্কার হয়। টিনের একটি নাটমন্দির ও তখনই নির্মিত হয়। মহাদেব বাড়ির প্রবেশ তোরণে যে দুটি সিংহ মূর্তি তা শুরুতে এখানে ছিল না। মহাদেব দিঘির উত্তর পাড় ধরে কিঞ্চিৎ পূর্বমুখী দূরত্বে মাটির তলা থেকে ঐ সিংহ মূর্তি দুটি উদ্ধার হয়। দুটি মূর্তিকেই প্রবেশ দ্বারে স্থাপন করা হয়। তাও বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার কথা। উদয়পুর বিবরণ-এর লেখক ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত অনুমান করেছেন, ঐ স্থানেই, পূর্বে মন্দিরের সিংহদ্বারা ছিল। একই চত্বরে একাধিক দেবতা মন্দির, চতুর্দশ দেবতা, গোপীনাথ ও ভৈবেবের মন্দির থাকায় পণ্ডিত চন্দ্রোদয় বিদ্যাবিনোদ এই স্থানকে " দেবতা পাড়া" বলতেন।

জগন্নাথের দোল বা জগন্নাথ বাড়ি ঃ

উদয়পুরে জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কালো শ্লেট পাথরে এই মন্দির নির্মিত। সাধারণ্যে পরিচিত জগন্নাথের মন্দির হিসাবে। এর গায়ে প্রাপ্ত শিলালিপি অনুসারে মন্দিরটি নির্মাণ করেন গোবিন্দ মাণিক্য ও তাঁর ভাই জগন্নাথ দেব ১৫৮' শকাব্দ তথা ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে। " পিতা কল্যাণ মাণিক্যের আজ্ঞানুসারে অনন্তধাম বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে এই উত্তম প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রী গোবিন্দ মাণিক্য দেব, বীর, মন্ত্রণা নিপুণ ও তেজস্বী অনুজ জগন্নাথ দেবের সহিত মাতা সহরবতী স্বর্গার্থী বিষ্ণুর ও মনোহর অতুল প্রাসাদ দান করেন। শ্রীশ্রী গোবিন্দ মাণিক্য ১৫৮৩ শকের (১৬৬১ খ্রিঃ) কার্তিকী পূর্ণিমাতে বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে প্রাসাদন দান করেন।"

ত্রিপুরার সব চাইতে উল্লেখযোগ্য মন্দির হল এই জগন্নাথের মন্দির। (১) এইটিই ত্রিপুরার এক মাত্র পাথরের (শ্লেট) নির্মিত মন্দির ; (২) সর্ববৃহৎ মন্দির। এই মন্দিরের চারদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, মন্দিরটির নাটমন্দির ছিল। তবে ভেতরে বিগ্রহ পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়ত, এটি বিষ্ণুর মন্দির কাজেই সুভদ্রা বলরাম আর জগন্নাথের অবস্থান না থাকারই কথা। তবে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের মতে এটি জগন্নাথেরই মন্দির। কুমিল্লার উপকণ্ঠে ত্রিপুর রাজাদের নির্মিত জগন্নাথ মন্দিরের " পাণ্ডার তত্ত্বাবধানে অধুনা (১৯০১ খ্রিঃ থেকে ১৯২৬ খ্রিঃ-এর কোন এক সময়ে, যেহেতু সুনির্দিষ্ট তারিখ তার লেখাই নেই, হতে পারে। ঐ সময়ের মধ্যে প্রায় সাত বছর ব্রজেন্দ্র চন্দ্র উদয়পুরে মহকুমা শাসক ছিলেন।) উদয়পুরস্থিত জগন্নাথ বাড়ীতে নূতন জগন্নাথ বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছে। ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দ (১৯০৪ খ্রিঃ) থেকে স্থানীয় লোকের চেষ্টায় প্রতিবৎসর রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হচ্ছে। ঐ ব্যাপারে সরকারী সাহায্য ২৫' টাকা।

মন্দিরটি চতুষ্কোণ। চারটি ঠেসান আছে। এগুলি অলংকৃত। মন্দিরে অনেকগুলি কুলঙ্গী। কুলঙ্গীতে দেব-দেবীর মূর্তি রাখা হত। বছর পঞ্চাশেক আগে মন্দির সংলগ্ন জগন্নাথ দিঘিতে দুটি মূর্তি বিষ্ণু ও উমা, পাওয়া গেছে।

মন্দিরটির গঠন রীতি নিয়ে বিশেষজ্ঞরা নানা মত ব্যক্ত করেছেন। কাশীনাথ দীক্ষিতের মতে " The top is crowned by a dome with a vaulted roof in pure

Mohammedan fashion" । শ্রীমাচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে মন্দিরটি " অবিকল সারনাথের স্তূপের মত।" স্তূপের গায়ে পদ্ম পাপড়ির অলংকরণ মন্দির স্থাপত্যের ইসলামি প্রলেপকে অনেক খানি আবৃত করেছে (মন্দির মসজিদ গীর্জা মঠ – ডঃ কার্তিক লাহিড়ী)।" আলসে কারুকার্য খচিত। মন্দিরের দেয়ালে স্থান স্থানে পদ্ম ফুল আঁকা চতুষ্কোণ ফলক আছে। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী, যা হিন্দু মন্দিরে সচরাচর দেখা যায় না। উড়িষ্যার শৈলীর প্রভাব। দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী " ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুরে ' লিখেছেন — " সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ, দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের শ্বশুর উড়িষ্যা থেকে জগন্নাথ মূর্তি এনে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন।

কল্যাণ মাণিক্যের দোলমঞ্চ বা ঝুলন মন্দির ঃ

মন্দিরটি জলটুঙ্গী ও ফুলটুঙ্গীর পূর্বদিকে। এর পাশেই রয়েছে আরো দুটি মন্দির। ঝুলন মন্দিরটি দ্বিতল। প্রথম তলায় অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ। একে লুকপলানীর দালান বলে। এর উপর তলায় দোচালা ঘরের ন্যায় প্রকোষ্ঠের উপরিভাগে চার কোণে লোহার আংটি যুক্ত ছিল। এই প্রকোষ্ঠের চারদিকে ইটের দেয়ালে ছাপ দেওয়া অনন্ত সর্প এবং বিষ্ণুর মূর্তি আঁকা ছিল। এটিকেই কল্যাণ মাণিক্য স্থাপিত দোলমঞ্চ বলা হয়। সংলগ্ন দুটি মন্দিরের একটি বিষ্ণু মন্দির অপরটি দুর্গা মন্দির। রত্ন কন্দলী — অর্জুন দাসের বিবরণে এদের উল্লেখ রয়েছে।

বদর মোকাম ঃ

ঝুলন মন্দির পেরিয়ে কয়েক পা দক্ষিণে গোমতীর পারে বদর মোকাম বা বদর সাহেবের দরগাহ্। ইটের দোচালা কবরস্থান। বদর সাহেবের কবর স্থান। আওলিয়া দরবেশ বদর সাহেব চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্টে খুব প্রভাবশালী মান্য ছিলেন। উদয়পুরে মুসলিম প্রভাব বিস্তারের সময় তিনি উদয়পুরে আসেন এমনটাই অনুমিত। আতারাম ও বুধিরাম, দুই ভাই, নরসুন্দর কথিত এদের একজনকে দিয়ে বদর সাহেব মাথা কামিয়ে ব্যবহৃত খুরটি সোনায় রূপান্তরিত করে দিলে আপ্লুত অবিভূত আতারাম-বুধিরাম ভ্রাতৃদ্বয় তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীক্ষান্তে ধর্মান্তরিত হন। দরগার বর্তমান খাদিম বংশ ঐ আতারাম-বুধিরামের বংশধর বলে নিজেরা দাবি করেন। ঐ খাদিম বংশ ও তাদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন বলে দাবি করে থাকেন। এই দরগায় চেরাগ (বাতি) দেবার জন্য রাজ সরকার থেকে " চেরাগী মিনাহ" ভূমি দান করা হয়েছিল। এখানে প্রতিবৎসর ১লা বৈশাখ তারিখে দীর্ঘ দিন ধরে মেলা বসে আসছে।

মুঘল মসজিদ ঃ

বদর সাহেবের বাড়ির বিপরীতে (পূর্বদিকে) গোমতীর অপর পারে বদর মোকাম খেয়াঘাট পেরিয়েই ঐ মসজিদের ভগ্নাবশেষ। মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ করা হয়নি। ফলে ছাদও তৈরী হয় নি। ১৬২১ খ্রিঃ মুঘলেরা উদয়পুরে লুঠ করে; দখল করে প্রায় দুই বৎসর উদয়পুরে অবস্থান করে। রত্নের সন্ধানে ওরা উদয়পুরের দিঘিগুলির জল সরিয়ে শুকিয়ে ফেলে। ফলে জলের অভাবে মহামারী দেখা দিলে আপনা থেকেই মুঘলরা উদয়পুর ছেড়ে পালায়। সে যশোধর মাণিক্যের সময়।

ষোলকোণ দালান বা বৈকুণ্ঠপুরী ঃ

এর অস্তিত্ব এখন নেই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ঐ স্থান সাফসুতোর করে ত্রিপুরাসুন্দরী স্কুল স্থাপন করা হয়। এখন ঐ স্বতন্ত্র গঠনের যার আকৃতি সাদৃশ্য আগ্রার

তাজমহলের মতন (অনাদি ভট্টাচার্য), তার অবশেষ সজ্ঞানে নির্মূল করা হয়। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত বিভাগীয় শাসক থাকাকালে " বৈকুণ্ঠপুরী" প্রত্যক্ষ করেছেন। লিখেছেন — " এই মন্দিরের ইষ্টকের গাত্রে কোন আস্তর দেওয়া হয় নাই। গাঁথুনী পরিষ্কার ও সুন্দর। মন্দিরটির অর্ধেক অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ইহার উপর হইতে (টিলাভূমির উপর এটি প্রতিষ্ঠিত ছিল) সুখ সাগর ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি বড় মনোরম। ধন্য মাণিক্য এই মঠ নির্মাণ করান। ইহার সন্নিকটে " ফুলকুমারী কুঞ্জ" নামে একটি সুন্দর টিলা আছে (উদয়পুর বিবরণ)।"

শ্রীশ্রী হরিমন্দির ঃ

জগন্নাথ দিঘির পূর্বপাড়ে বর্তমান প্রধান ডাকঘরের সঙ্গে এই মন্দির। অনুমান সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এই মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটি একটি সুউচ্চ বাঁধানো চত্বরের উপর। প্রদক্ষিণের সুবিধা নেই। দো-চালা তোরণের মধ্য দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে মন্দিরের বহি:গৃহ। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী। বহি:গৃহের সামনের দুই কোণায় দুটি বৈস্না, উপরে কলস। অন্যান্য মন্দিরের মতই দেয়ালে সমান দূরত্বে আনুভূমিক উদগত পর্শুকা। বহি:গৃহের আলসে ও সর্বোচ্চ পর্শুকা রেখার মধ্যস্থলে চতুষ্কোণ প্রতিষ্ঠা ফলক বর্তমানে তা অপহৃত বা অবসৃত। বহি:গৃহের পর অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহটি চতুষ্কোণ। বহি:গৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে বহু তাক বিশিষ্ট আলসে এবং সর্বোচ্চ পর্শুকা রেখার মধ্যে সমতল জায়গায় সারিবদ্ধ ত্রিভুজাকৃতি অলঙ্ককরণ, গর্ভগৃহের উত্তর এবং দক্ষিণ দেয়ালে অনুরূপ অলঙ্করণ। বর্হিগৃহের চূড়া স্তূপের মতো, গর্ভগৃহের মস্তক অংশেও অনুরূপ স্তূপ। গোলার্ধ অংশের উপর বৃত্তাকার অংশ, তার উপরের অংশ অনেকটা জালার মতো, জালার মুখে নিরেট চাকতি। জালাটি লতা-পুষ্প খচিত নক্শার একটি বিচিত্র রূপ (মন্দির , মসজিদ্, গীর্জা, মঠ - ডঃ লাহিড়ী)। ১৯০১ খ্রিঃ এর সংস্কার হয়। তখনই রাধাকৃষ্ণের একটি ছবি স্থাপিত হয়। প্রতিবৎসর দোল উৎসবের সময় লাইব্রেরি তহবিল থেকে দেড় টাকা অনুদান দেওয়া হত।

গুণ্ডিচা বাড়ি ঃ

দ্বিতীয় বিজয় মাণিক্যের শ্বশুর ও সেনাপতি দৈত্য নারায়ণ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরটি উদয়পুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের সাধুনিবাসের আড়ালে গোমতীর পারে এবং গোমতীতে পতনোন্মুখ।

নাগের দোল ঃ

বর্তমান চক বাজারের দক্ষিণ - পূর্বে, অমর সাগরের উত্তর-পশ্চিম কোণে যে ধর্মাশ্রম, তার নাট মন্দিরের আড়ালে পাশাপাশি দক্ষিণ দুয়ারী দুটি মন্দির। এদের নাগের দোল বলে। রাজমালার কল্যাণ মাণিক্য খণ্ডে —

" তার বামভাগে রাজা আর মঠ দিল।
বহু যত্ন করি ধর্ম সম্প্রদান কৈল।।
ধর্মমঠ বলি নাম রাখিল তাহার।
নিত্য নিত্য দান রাজা করিছে অপার।।"

দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী সিদ্ধান্তে এসেছেন —" বর্ণনা মতে পশ্চিম দিগের মন্দিরটি বিষ্ণুমন্দির আর পূর্বদিকের মন্দিরটি ধর্মমন্দির বা ধর্মমঠ।"

অমাত্যের দোল ঃ

বর্তমানে অস্তিত্বহীন এই মন্দির ছনবনে মুসলমান বস্তির সংলগ্ন ছিল বলে উদয়পুর বিবরণীতে লেখা আছে।

পুরাতন গারদ ঃ

অধুনা অস্তিত্বহীন। তবে কিছুকাল আগেও এর অস্তিত্ব ছিল। এর সজ্ঞান বিলুপ্তি ঘটে। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের চোখে " এই দালানোর ছাদ এখনো পড়িয়া যায় নাই। যেভাবে ছাদ ফাটিয়াছে তাহাতে মনে হয় ইহাও আর অধিককাল স্থায়ী হইবে না। প্রকোষ্ঠগুলি দেখিতে সুন্দর। গুপ্ত কুঠুরীও আছে। এই গারদ হইতে একটি কামান রাজধানী আগরতলায় নীত হইয়া ছিল (হোসেন সাহের কাছ থেকে রায় কাচাগ -এর কেড়ে নেওয়া কামান; এটি আগরতলা কামান চৌমুহনীতে রক্ষিত আছে)। অপর একটি কামান ফুলকুমারীর কুড়ে বা কুণ্ডে গোমতী নদীতে পড়িয়া গিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রবাবুর অন্তত ৫৫/৬০ বছর পরে অনাদি ভট্টাচার্য তার বর্ণনা করেছেন — " পূর্ব রাধাকিশোর পুর বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের অব্যবহিত পশ্চিমে একটি দালানের ভগ্নাবশেষ এখনো বর্তমান। এটিকে গারদ বলে। গারদের পশ্চিমে মাঝারি সাইজের একটি দিঘির মধ্য স্থলে এক কক্ষবিশিষ্ট একটি দালানের ভগ্নাবশেষ এখনো বর্তমান, এর নাম " জলটুঙ্গী", আর জলটুঙ্গীর দক্ষিণে বড় পুকুরটির নাম ফুলটুঙ্গী।"

চন্দ্রসাগরের পাড়ের রাজবাড়ি ও মন্দির ঃ

গোপী প্রসাদ বা উদয় মাণিক্য " পাট স্থান কৈল তবে চন্দ্রপুর গ্রামে।" এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বার সুবৃহৎ প্রস্তরনির্মিত। প্রবেশদ্বারের উভয় পার্শ্বেই বাঙলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় প্রস্তরলিপি রয়েছে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ঐ মন্দিরের ফটোগ্রাফ নিয়েছেন বলে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র উল্লেখ করেছেন। অধুনা প্রায় বিলুপ্ত।

হীরাপুরের ভগ্ন মন্দির ঃ

হীরাপুর নাম পূর্বে লক্ষ্মীপুর ছিল।

উদয় মাণিক্য রানী হীরাপুর কৈল।।

নামের উৎস পাওয়া গেল। এখানে যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ ছিল তা "ধনের কুঠি" বলে সাধারণ্যে পরিচিত ছিল। এর প্রবেশদ্বার ছিল প্রস্তরনির্মিত। ধন পাওয়ার সম্ভাবনায় " রাজধানী আগরতলা হইতে বিশেষ অনুসন্ধানে বিশ্বস্ত লোক প্রেরিত হইয়াছিল (ব্রজেন্দ্র দত্ত) " মন্দিরের তোরণের উভয়দিকে বাঙলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক লেখা ছিল। কিন্তু পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি। এই মন্দির সংলগ্ন একটি পুষ্করিণী ও কাছেই ছোট-বড় দিঘি পুষ্করিণী অনেক রয়েছে।

চাঁদ -সুরুজের পুল ঃ

মুরগা ছড়ার উপর, খিলানের উপর তৈরী শক্ত ইটের সেতু। মুরগা ছড়া সুখ সাগরে এসে মিশেছে। এই সেতুর উপর দিয়েই মায়ের বাড়ির পুরনো রাস্তা ছিল। মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য এই পুলের উপর দিয়েই মায়ের বাড়ী এসেছিলেন।

দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্যের সময়ের বিষ্ণু মন্দির ঃ

পুরাতন রাজবাড়ির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এই মন্দির। মন্দিরে শিলালিপি ছিল। শিলালিপির

চতুর্থ পংক্তিতে " ভূপাল মহিষী ধন্যা সতী রত্নাবতী বরা", আর পঞ্চম পংক্তিতে " প্রীতয়ে হরে" লেখা-এর থেকে দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী মহাশয় অনুমান করেছেন " এই মন্দির নির্মাণে 'রত্নাবতী' নামে কোন মহিলা যুক্ত ছিলেন। শ্রীরাজমালা সম্পাদকের মতে, রত্নাবতী দ্বিতীয় রত্নামাণিক্যের পত্নী এবং তিনিই এই মন্দির নির্মাণ করান। আর 'প্রীতয়ে হরে' দ্বারা অনুমান করা যায় মন্দিরটি হরির প্রীতির জন্যে উৎসর্গ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য গোবিন্দ মাণিক্যের প্রপৌত্র। তিনি রাজত্ব করেছেন ১৬৮৫ -১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত।

দুত্যার বাড়ির মন্দির গুচ্ছ ঃ

মহাদেব বাড়ি সংলগ্ন মেলার মাঠ রাধামাধব মন্দিরের গা ঘেঁষে দুটি মন্দির। মন্দিরের গায়ে শিলালিপি ছিল কিন্তু উদ্ধার করা যায়নি। একমাত্র " দ্বিতীয়া" শব্দটি ও শকাঙ্ক "১৬২১" পড়তে সমর্থ হয়েছিলেন ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার। তাহলে খ্রিষ্টাব্দ দাঁড়ায় ১৬৯৯ খ্রিঃ। ঐ সময় দ্বিতীয় রত্ন মাণিক্য সিংহাসনে । তাঁর দুইজন 'দ্বিতীয়া দেবীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়। প্রথম জন রত্ন মাণিক্য মাতুল বালভীম নারায়ণের মেয়ে দ্বিতীয়া, আর দ্বিতীয় জন গোবিন্দ মাণিক্যের ছোট ভাই জগন্নাথ দেবের মেয়ে। হয় তো নির্মাণ এদেরই কারোর।

গুণবতী মন্দির গুচ্ছ ঃ

গুণবতী মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের মহিষী। এখানে তিনটিই মন্দির – একটি পূর্বমুখী, এর গায়ের শিলালিপি পাঠোদ্ধার করে জানা গেছে এই মন্দির মহারানী গুণবতী ১৬৬৮ খ্রিঃ নির্মাণ করে বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন। অপর দুটি মন্দিরের একটি পশ্চিম ও অপরটি দক্ষিণ দুয়ারী। ঐগুলিতে শিলালিপি নেই। ফলে ধরে নেওয়া হয়েছে তিনটি মন্দিরই মহারানী গুণবতীই নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরগুলি মহাদেব বাড়ি থেকে দক্ষিণে বদর মোকাম যাওয়ার পথে রাস্তার বাম পার্শ্বে। পুরাতত্ত্ব বিভাগ মন্দিরগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। সংস্কারও করেছে।

রাম মাণিক্যের বিষ্ণু মন্দির ঃ

মহারাজ গোবিন্দ মাণিক্যের পুত্র রামদেব মাণিক্য এই মন্দির নির্মাণ করেন। পুরাতন রাজবাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে এই মন্দিরটিই ভুবন বিখ্যাত বিসর্জন খ্যাত ভুবনেশ্বরী মন্দির। ১৬৬৯ খ্রিঃ গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যু হয়। মন্দিরের গায়ের শিলালিপি অনুযায়ী, গোবিন্দ মাণিক্যের মৃত্যুর ৮ বছর পরে এই মন্দির নির্মিত হয়ে গোবিন্দ মাণিক্যের স্বর্গপ্রাপ্তির উদ্দেশে পুত্র রামদেব বিষ্ণুর উদ্দেশে এই মন্দির নির্মাণ করেন। সুতরাং, গোবিন্দ মাণিক্য নক্ষত্র মাণিক্য উভয়েই তখন গতায়: সুতরাং নাটকে উপন্যাসে যা-ই থাকুক – ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় উক্ত দুই ভায়ের জীবৎকালে ভুবনেশ্বরী মন্দিরের (বিষ্ণু মন্দিরের) কোন অস্তিত্ব ছিল না।

১৭৬০ খ্রিষ্টাব্দে সমসের গাজীর তাড়া খেয়ে কৃষ্ণমণি উদয়পুর ছেড়ে আগরতলায় রাজধানী স্থাপন করলেন। আর উদয়পুরে রাজধানী ফিরে এলো না। এক সময়ে রাজধানী কৈলাশহর স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিন্তু ফের রাঙামাটি বা উদয়পুরেই ফিরে আসে। কৃষ্ণমণি কিন্তু আর দক্ষিণমুখো হলেন না।

আবার সমসের গাজী ১৭৬০ খ্রিঃ উদয়পুর লুঠ করলেন। নাগরিকের সম্পদও রাজার সম্পদের সঙ্গে লুঠ হল। অনুমান করা যায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ডও তখন ঘটেছিল, ফলে উল্লিখিত

দুই কারণে উদয়পুর জনশূন্য অন্ধকার প্রেতপুরীতে পরিণত হয়। এই অন্ধকার যুগ দীর্ঘকাল চলেছিল ১৮৭৩ খ্রিঃ উদয়পুর বিভাগ সৃষ্টির সময় পর্যন্ত। তবে তখনো অন্ধকার সম্পূর্ণ কাটে নি। প্রশাসন কেন্দ্র হয়ে গেল সোনামুড়া। অবশেষে ১৯০১ খ্রিঃ শাপমুক্তি ঘটে। উদয়পুর, উদয়পুর বিভাগের প্রশাসন কেন্দ্র হল। মধ্যবর্তীকালে কাশী মাণিক্য যখন কিছুকাল উদয়পুরে বাস করেন (তিনি উদয়পুরেই দেহরক্ষা করেছিলেন) তখনও উদয়পুরে বিরল বসতি। কিন্তু ভুললে চলবে কেন ১১৭০ বছর এই উদয়পুরেই ত্রিপুর রাজাদের রাজধানী ছিল। ফলে উদয়পুরে রয়ে গেছে অসংখ্য স্মারক, স্মৃতি, কীর্তিস্তম্ভ, শিলালিপি, রাজাদের টাকশালে প্রস্তুত ধাতুমুদ্রা, এমনকি কড়ি। ভগ্ন, অভগ্ন, ক্ষীণ-অবশেষ, এই সবের চিহ্ন এখনো রয়েছে। লিখেগেছেন ইতিহাস ও শুক্রেশ্বর-বাণেশ্বর রাজমালা লেখেন। এখানেই রাজমালা পরিমার্জিত হয়েছে। এছাড়া রাজধানীর নগর জীবনের বহু চিহ্নও ইতস্তত ছড়িয়ে রয়েছে। অর্থাৎ ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক উপাদান, গবেষক ও পণ্ডিতেরা এর থেকে পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরার রাজন্য যুগের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করতে পারেন। রাজমালার প্রতি যে পক্ষপাতিত্বের দোষ, তারও স্খালন হতে পারে।

১৯০৪ সালে বর্তমান উদয়পুর বর্তমান বাজারে'র প্রতিষ্ঠা। এর আগে ছিল খিলপাড়ায়। তখন এই স্থান নির্মাণ-উপযোগী করার জন্য জঙ্গল ও মাটি কাটতে হয়। ঐ সময়ে ঐ জায়গায় পাওয়া গেল এক হাঁড়ি প্রাচীন মুদ্রা। হাঁড়িতে পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রা ছিল আর কিছু কড়ি। একই হাঁড়িতে পাওয়া যাওয়ায় মনে হয় কোন ব্যক্তি তাঁর জমানো সঞ্চয় গোপনে মাটির তলায় রেখেছিল। অর্থাৎ ঐ পরিত্যক্ত জায়গায়ও পূর্বে বসতি ছিল। আবার বিভিন্ন সময়ের বলে এও মনে করা যায় কোন মুদ্রা সংগ্রাহকের কাজ এটি। আর কড়ি থেকে স্পষ্ট হয় কড়ি বিনিময়-মাধ্যম ছিল। সম্পদ বলেইতো গোপনে রক্ষার ব্যবস্থা।

১৯০৫ খ্রিঃ 'অরুণ' পত্রিক্যর রিপোর্টে " উদয়পুরে মৃত্তিকার নিম্নে যে কতগুলি প্রাচীন রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহার সংখ্যা ৫০। তন্মধ্যে আদি (১ম) রত্নমাণিক্যের সময়ের (১২৮২ খ্রিঃ সিংহাসনে বসেন) ২০টি, ধন্য মাণিক্যের সময়ের ১৭টি, অবশিষ্ট ১৩ টির লেখা পড়া যায় নাই। লেখাগুলি পারস্য ভাষায় লেখা বলিয়া মনে হয়। মহারাজ রত্নফা গৌড়ের অধিপতির সাহায্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া ১১৮৬ শকে বিজয়ী হন এবং ত্রিপুরার সিংহাসন অধিকার করেন। তাহার পিতার নাম ডাঙ্গর ফা।"

রত্নমাণিক্যের শাসনকালেই যে মুদ্রাগুলি প্রস্তুত হয়েছিল তা নিঃসংশয়। তবে এক রত্ন মাণিক্যের সময়েই ১০ রকম মুদ্রা দেখা যায়। এই দশ প্রকারের মধ্যেও কোনটায় সিংহের মুখ ডান দিকে, কোনটার মুখ বাঁদিকে।

মহারাজ ধন্য মাণিক্য ১৪২৩ শকাব্দে (১৫০১ খ্রিঃ) ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দির ও মহাদেবের মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর মুদ্রা দেখে বিশেষজ্ঞরা বলছেন তিনি ১৪১২ শকাব্দে (১৪৯০ খ্রীঃ) সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তাঁর সময়ের মুদ্রাগুলি নানা ধরনের। ফুলকুমারী মৌজার সর্দার তৈথিলা চৌধুরীর বাড়িতে (বর্তমান বনদুয়ার) মাটির নীচে ১৯০৪ খ্রিঃ এক কলসী কড়ি পাওয়া গিয়েছিল।

রত্না মাণিক্যের মুদ্রার লিপি উদ্ধার ঃ

১। এক পীঠে " শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব", অপর পীঠের মধ্যে সিংহ, প্রান্তে চক্রাকারে " শ্রী দুর্গা রাধানাপ্ত বিজয়ঃ রত্নপুরে শক ১১৮৬" । তিনটি মুদ্রার প্রান্তভাগের কারুকার্য স্বতন্ত্র।

২। এক পীঠে " শ্রী নারায়ণ চরণ পর শ্রী রত্নমাণিক্য দেব" অপর পীঠে " শ্রী দুর্গারাধানাপ্ত বিজয়ঃ রত্নপুরে", শক পড়া যায়নি। এমন মুদ্রার সংখ্যা ৪ (চার)টি।

৩। এক পীঠে অষ্ঠভুজ ক্ষেত্রের মধ্যে "শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব "অপর পীঠে " শ্রী নারায়ণ চরণ পর"। ২টি মুদ্রা প্রত্যেকটির প্রান্তচিহ্ন ভিন্ন।

৪। এক পীঠে " শ্রী নারায়ণ চরণ পর শ্রী রত্নমাণিক্য দেব " , অপর পীঠে সিংহ, সিংহের নীচে অগ্রভাগে " শ্রী" মধ্যভাগে " দু" এবং পশ্চাদ্ভাগে " র্গা" লেখা দুটি মুদ্রা।

৫। এক পীঠে " শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্যদেব" অপর 'পীঠে সিংহের নীচে " শ্রী" "দু" "র্গা" এমন ৪টি মুদ্রা। তিনটিতে সিংহের মুখ বামদিকে , একটিতে দক্ষিণ দিকে।

৬। এক পীঠে " শ্রীশ্রী লক্ষ্মী দেবী শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্যৌ, অপর পীঠে পার্বতী পরমেশ্বর চরণ পরৌ। " ১১৮৯" এমন একটি মুদ্রা।

৭। এক পষ্ঠে " শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব", অপর পীঠে সিংহ। একটি মুদ্রা।

৮। এক পীঠে " শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব',' অপর পীঠে সিংহের নীচে " ১১৮৮ শাক' ১টি (একটি) মুদ্রা।

৯। এক পীঠে " শ্রীশ্রী রত্নমাণিক্য দেব', অপর পীঠে " শ্রী দুর্গা" লেখা। ২টি মুদ্রা একটির সিংহের মুখ ডানদিকে। অপরটির মুখ বাম দিকে। প্রান্তচিহ্ন স্বতন্ত্র।

ধন্য মাণিক্যের মুদ্রা ঃ

১। মুদ্রার এক পীঠে " ত্রিপুরেন্দ্র শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য শ্রী কমলা দেবৌ", অপর পীঠে সিংহের নীচে ১৪১২ শক", ৫টি মুদ্রা। তিনটিতে সিংহের মুখ ডান দিকে, দুটিতে বাম দিকে।

২। এক পীঠে " শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য দেব", অপর পীঠে সিংহ। ৫টি মুদ্রা। একটি মুদ্রায় সিংহ নীচে পশ্চাদ্ভাগে ও উপরিভাগে ছয়টি বিন্দু চিহ্ন আছে।

৩। এক পীঠে " শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য দেব", অপর পীঠে সিংহ। ৯টি মুদ্রা ।

৪। এক পীঠে চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে " শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য দেব", অপর পীঠে সিংহ। ৯টি মুদ্রা।

৫। এক পীঠে " শ্রীশ্রী ধন্য মাণিক্য দেব", প্রান্তে " শ্রীশ্রী রাম রাম ২ চরণ পরায়ণ। অপর পীঠে সিংহ। ২টি মুদ্রা, একটিতে শক ১৪১২; অপরটি অপাঠ্য।

৬। এক পীঠে " বিজয়ীন্দ্র শ্রীশ্রী ধন্যমাণিক্য শ্রী কমলা দেবৌ", অপর পীঠে সিংহ। নীচে "১৪" মাত্র পড়া যায় (প্রস্তুত সন)। ১টি মুদ্রা।

শ্রীশ্রী গোবিন্দ মাণিক্যের একটি রূপার মুদ্রা, সিকি অপেক্ষা আয়তনে সামান্য বড় ও ওজনেও সামান্য বেশি, পাওয়া গিয়েছিল। এটি জগন্নাথ দিঘির পশ্চিম-উত্তর কোণে (যেকোণে জগন্নাথ বাড়ী অবস্থিত) মাটি কাটার সময় মাটির নীচে পাওয়া গিয়েছিল। জগন্নাথ মন্দিরটি গোবিন্দ মাণিক্য ও তস্য ভ্রাতা জগন্নাথ দেবের নির্মিত। গোবিন্দ মাণিক্যের দ্বিতীয় একটি রৌপ্য মুদ্রা জগন্নাথ দিঘির দক্ষিণ পাড়ে পাওয়া গিয়েছিল।

এছাড়া ফুলকুমারী মৌজায় রিয়াং সর্দার তৈথিলা চৌধুরীর বাড়িতে মাটির নীচে এক কলসী পূর্ণ পুরাতন কড়ি পাওয়া গিয়েছিল, ১৩১৪ ত্রিং (১৯০৪ খ্রিঃ) সনের। নিঃসন্দেহে এই কড়ি মুদ্রা প্রচলনের আধার। তখন কড়িই হয়তো ছিল বিনিময়-মাধ্যম। তৈথিলা চৌধুরীর বাড়ি বনদুয়ারে ঢোকার মুখে টিলার উপর। পরে ঐ বাড়ি তারিণী চৌধুরীর বাড়ি হিসেবে পরিচিতি পায়। সেই বাড়ির ঐতিহ্য এখন আর নেই।

শিলালিপি ঃ

মুদ্রা ছাড়াও কিছু শিলালিপিও উদ্ধার হয়েছে, মন্দির গাত্রের শিলালিপি এসবেরও সন্ধান মিলেছে। ত্রিপুর সুন্দরীর মন্দিরে পূর্ব দিকের দেয়ালে একটি লিপি রয়েছে, তাতে লেখা রয়েছে " আসীৎ পূর্বং নরেন্দ্র সকলগুণযুতো ধন্য মাণিক্য দেবো" ইত্যাদি। ঐ লিপির পাঠোদ্ধার কার তার বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে। " পূর্বকালে সমগ্রগুণসম্পন্ন ধন্য মাণিক্য নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি দানে কর্ণতুল্য ছিলেন, তাঁহার যুগে স্বর্গাধিপতি পৃথিবীতে আসিয়া ছিলেন। তিনি ১৪৩২ শকাব্দে গগণভেদী এই প্রাসাদ দেবগণসেবিতা লোকজননী অম্বিকাকে দান করেন। তাঁহার পর ত্রিপুরাধীশ্বর মহারাজ কল্যাণ দেব প্রবল রিপুগণ পীড়িতা পৃথিবীকে একমাত্র নিজ শক্তির দ্বারা শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বীরশ্রেষ্ঠ ধীর প্রকৃতি গোবিন্দ দেব রাজা দিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তাঁহার দানে ব্রাহ্মণ রমণীগণ স্বর্ণময় হইয়াছিলেন। তিনি সাম্ব রাজ্যে (ত্রিপুরায়) বিরাজ করিয়াছিলেন।"

ঐ শিলালিপির দ্বিতীয়াংশের অনুবাদ ঃ

" তাঁহার পুত্র মহারাজ রাম মাণিক্য, ধার্মিক, সত্যবাদী, নিখিলগুণসম্পন্ন কমনীয় মূর্তি, জিতেন্দ্রিয় এবং বদান্য ছিলেন। মহারাজ ধন্য মাণিক্য অম্বিকার উদ্দেশে যে মন্দির দান করিয়া ছিলেন, তাহার উপরে বৃক্ষাদি জন্মিয়া ফাটিয়া গিয়াছিল, দ্বিজপঙ্কজসেবিতা, কালীপাদপদ্ম লুব্ধ মধুপ ভূপতি শ্রীযুত রাম মাণিক্য ১৬০৩ শকে বাতাঘাত বিদারিত দেবমন্দির মনোজ্ঞ করেন " শকাব্দ ১৬০৩।"

বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় ঐ শ্লোক লেখা হয়েছে।

এছাড়া শিলালিপি উদ্ধার হয়েছে শিবমন্দির, রাজবাড়ির প্রাঙ্গণস্থিত ভুবনেশ্বরী মন্দির গাত্রেও।

শিবমন্দিরের শিলালিপির প্রথম ও দ্বিতীয় শ্লোকের অনুবাদ।

হরহরিচরণ পূজায় নিপুণ, অনুপম মহিমান্বিত (বীর কল্যাণ দেব) ধন্য মাণিক্য মহাদেবের উদ্দেশে যে সুন্দর মঠটি দান করিয়াছিলেন তাহা অতি জীর্ণ দেখিয়া পুনর্বার সম্পূর্ণরূপে নির্মাণপূর্বক শেষকালে মহাদেবকে দান করেন" (১)।"

চন্দ্রবংশাবতংশ ত্রিপুরাধীশ্বর কল্যাণদেব চারিটি জলধি বধূ নাচিতে নাচিতে তাঁহার কীর্তি গাহিয়া থাকে, সেই ধন্য মাণিক্য দেবের প্রভূত পুণ্যার্থ ১৫৭৩ শকাব্দে পুণ্যপ্রদ দেহ শঙ্করের প্রতি ভক্তিপূর্বক উৎসর্গ করিয়া দেয়।"

উত্তর পার্শ্বের দেয়ালের লিপি ঃ

" মহাদেব, পবন এবং চন্দ্র প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে (দেবগণও যাঁহাকে) সতত (চিন্তা করেন) এবং বেদ (যাঁহার কীর্তি) পুনঃ পুনঃ গান করিতেছে। কল্যাণ দেব (সংসার পরিত্রাণের

উপায়স্বরূপ তাঁহার পাদপদ্মে) অদ্ভুত মঠ দান করিয়াছেন। যিনি চন্দ্রবংশের অলঙ্কার, ধারতা ও শূরতা ও উদারতা গুণে যাহাকে পৃথু, রঘু এবং নহুষ প্রভৃতির মধ্যে কীর্তন করা হয়, যিনি বৃদ্ধকালে ভক্তিপূর্বক গোপীনাথকে এই অনুপম মঠ দান করিয়াছেন, সেই শ্রী কল্যাণদেব, গৌরব ও মহিমার সহিত পুত্রাদিসমভিব্যাহারে আনন্দ উপভোগ করুন। ১৫৭২ শকাব্দের ৫ই আষাঢ় মঙ্গল বারে কলাবতীর প্রতি অতিভক্তিপূর্বক চক্রাধি শোভিত এবং স্বর্ণ কলসে অলঙ্কৃত মঠ ব্রাহ্মণদিগের আশীর্বাদে দান করেন। ১৫৭২ শকাব্দ, ১৫ই আষাঢ়।"

ভুবনেশ্বরী মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালিপির পাঠ ঃ

" যিনি প্রচণ্ড বহু দণ্ডের আঘাতে কংসের কুবলয় হস্তীর দশন উৎপাটিত করিয়াছিলেন, যিনি দেবতাদিগের তেজ পরাভবকারী হইলেও সমরবাদ্য শব্দেই দ্বন্দ্বে ভয়াতুর চানুক নাম কংসের অনুচরকে যমালয়ে পাঠাইয়াছিলেন, যিনি প্রবলতর পরাক্রমের দ্বারা ত্রিভুবনের ত্রাসজনক প্রবল বাহুবলে দেবতাদিগের পরাভবকারী কংসকে সংহার করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদ পদ্ম হইতে ক্ষরিত মধুর মকরন্দ ধারাতে যাঁহার অন্তঃকরণরূপ ভ্রমর বিমুগ্ধ ছিল, যিনি অপত্যনির্বিশেষে প্রজাগণকে পালন করিয়াছেন, যাঁহার পদযুগল বন্দনার সময়ে নরপতি বৃন্দের মুকুট সকল পৃথিবী পৃষ্ঠে ঘর্ষিত হইত, কেবল ধর্মকার্যানুষ্ঠান যাঁহার ব্রত ছিল সেই গোবিন্দ দেব নরপতি ছিলেন। তিনি সুতীক্ষ্ণ শায়ক দ্বারা রিপুকুলের মর্মভেদ করিতেন, যুদ্ধস্থল হইতে কদাচিত পলায়ন করিতেন না, তিনি প্রভূত পরিমাণে স্বর্ণ, রত্ন এবং সুবৃহৎ মাতঙ্গ দান করিতেন। সৌন্দর্য সম্পদে যিনি কন্দর্পকেও জয় করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় তাঁহার প্রভাব ছিল। ত্রিপুর কুলপতি, পিতৃভক্ত, সাধুহৃদয়, শৌর্য-গম্ভীর সিন্ধু, সমস্ত নরপতিদিগের বিজেতা, শ্রীশ্রী যুত রামদেব তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বিস্তৃত কীর্তিকলাপরূপে শুভ্র বসনে ত্রিভুবন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে, মহাদেব আজন্ম উলঙ্গ হইলেও দৈববশতঃ বসনধারী বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিলেন। সমৃদ্ধশালী মহারাজ রামদেব, রত্নাদি দানের দ্বারা পৃথিবীস্থ দরিদ্রদিগের দারিদ্র প্রশমিত করিয়াছিলেন। কর্পূরপ্রবাহ ও উজ্জ্বল সুরধ্বনির ন্যায় শুভ্র কীর্তিশালী, প্রতাপান্বিত, নির্মলান্তঃকরণ, মহারাজ পিতার স্বর্গাভিলাষে এই উন্নত " শশধর কিরণ" প্রাসাদ ১৫৯৯ শকের মাঘীপূর্ণিমা দিনে ভক্তিপূর্বক বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে দান করেন।"

ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর পুরোহিত দিগের নিষ্কর ভূমির

-সনদ-

" ও স্বস্তিঃ শ্রীশ্রী যুত গোবিন্দ মাণিক্য বিষম সমর বিজয়ী মহামহোদয়ী রাজানাং আদেশোয়ং শ্রীকরে —

বিরাজস্যহন্যত পরঃ রাজধানী হস্তিনাপুর সরকার উদয়পুর পরগণেন উদয়পুর মৌজে চন্দ্রপুর গত্ররহ সাইলা বুরোয়া তুলাপুরুষ ও মহান্নদান বাবত সূর্যগ্রহণ কালে পৃতে বিংশতি দ্রোণ জমি শ্রীদ্বিজ রত্ন নারায়ণ পুরোহিতকে ব্রহ্মাত্তোর দেওয়া গেল। এই জমির খাজনা ও ভেটবেকারী ইত্যাদি সমস্তাঙ্ক নিষেধ। এই জমি আমল কাবেজ করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে আশীর্বাদ পূর্বক পরম সুখে ভোগ ইত্যাদি করিতে রহুক। ইতি সন ১০৭০ তারিখ ২৫শে বৈশাখ।

জাত্র — সাইলা মোঃ চন্দ্রপুর ১; খিলপাড়া — ১২; বাবুয়াপাড়া ১; সোনামুড়া ১; তিয়রা - ১; তোল-২; তিনলালিয়া - ১; ছাগল নাইয়া -১ বিংশতি দ্রোণ।"

দেবতা মুড়ার শিল্প-ভাস্কর্য। ছবিমুড়া হিসেবেও এর পরিচিতি রয়েছে। জায়গাটির পুরনো নাম মাছিছা। ত্রিপুরা ভাষায় একে ' মার্চ্ছিল' বলে। এখানে অতীতে রিয়াংদের বাস ছিল। রিয়াংরা ধন্য মাণিক্যের সময়ে 'ত্রিপুরা'র বশ্যতা অমান্য করায় সেনাপতি রায় কাচাগ তাদের বশে আনেন। রায় কাচাগ নিজেও রিয়াং সম্প্রদায়ভুক্ত। এখন এই স্থানের দেবতামুড়া নামেই প্রসিদ্ধি বা পরিচিতি। এটি উদয়পুর-অমরপুর-এর সীমান্তবর্তী এলাকা। এখানে গোমতীর বাম পার্শ্বে উত্তুঙ্গ পাষাণময় পাহাড়ের গায়ে নানাবিধ দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে। তার মধ্যে মহিষাসুর মর্দিনী, দশভুজা দুর্গা মূর্তিটিই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইসব মূর্তির জন্যেই এই জায়গার নাম হয়ে যায় দেবতামুড়া।

দেবতামুড়ার মূর্তিসমূহ ত্রিপুরার রাজাদের প্রাচীন কীর্তিচিহ্ন। কোন্ সময়ে কী উদ্দেশে নদীগর্ভ থেকে উত্থিত প্রস্তরময় উত্তুঙ্গ পর্বতে এইসব দেবদেবীর মূর্তি খোদিত হয়েছিল তা নিরূপিত হয়নি। এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম যাজকগণ ত্রিপুরায় হিন্দুদের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করছিলেন। সেই সময় প্রজা সাধারণকে হিন্দুধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখতে ধর্মপ্রাণ ত্রিপুরার রাজারা এইসব মূর্তি উৎকীর্ণ করিয়েছিলেন বলে কেউ কেউ মনে করেন।

খোদিত মূর্তিসমূহের কারুকার্য চমৎকৃত করে। সেকালে যে ত্রিপুরায় ভাস্কর - শিল্পীর অভাব ছিল না এর থেকে তা প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মানুষের অবহেলায় কাল তাদের দ্রুত গিলে খাচ্ছে। সেখানেও ঐতিহাসিকরা পৃষ্ঠা উল্টাতে পারেন।

মদন উৎসব ও দেবী দুর্গা

"পঞ্চশরে দগ্ধ করে একি ভোলা করেছ সন্ন্যাসী?" এই বান ফিরিয়ে নিয়ে কামদেব জাগ্রত না করলে সৃষ্টির বিনাশ। কাজেই পুনরুজ্জীবিত মদনের উৎসব, মদন -উৎসব। মদন ভষ্মই শেষ কথা হলে রাজ্য সুখেই বা কি লাভ? অতএব মদনের পূজা করো, বাৎসরিক কৃত্যে মদনোৎসবকে আবশ্যিক কর। ব্যপারটা উদয়পুরে রাজ-উদ্যোগেই ঘটা করে হত। যাকে বলে রয়ে সয়ে, সেক্সপীয়রের ভাষায় I shall drink life to the lees! বৈশাখের দশদিন অতীত হলে কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মদন পূজার অধিবাস। সকলকে মর্যাদা অনুযায়ী উপহারের আদান প্রদান। রাজ অঙ্গনে উদয়পুরে, মদন উৎসব প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ রয়েছে। ঐ একই সাক্ষী রত্নকন্দলী শর্মা আর অর্জুন দাস বৈরাগী। সময় আষ্টাদশ শতকের গোড়া, ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ, সিংহাসনে তখন দ্বিতীয় রত্নমাণিক্য। রাজদূত হিসেবে মান্যবর, অধিকন্তু দেশাচার। সুতরাং "আমাদিগকেও সিংহাসন ঘরে আসিয়া ডিমের কুসুমের রং-এর জামা, রঙিন পাগড়ি, রঙ্গিন পটুকা ও রঙ্গিন দোপাট্টা উপহার দিলেন।" মদন পূজার অঙ্গ হিসেবে রয়েছে মোট খেলা, জলকেলী। গায়ে জলছিটিয়ে দিয়ে উল্লাস, কে জানে লাজ ভাঙার অঞ্জলি কিনা ? এই জল কেলীর মধ্যমনিও রাজা স্বয়ং।

পূজা মন্দির উঁচু বেদিতে নির্মিত চৌচালা ঘর। উত্তমরূপে সাজানো। ঘরের ভিতর উঁচু বেদিতে কামদেব স্থাপনা অবশ্যই পূজার্থে। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়ে কামদেবের আচ্ছন্না ভাঙলেন। রাজা এসে সাষ্টাঙ্গে কামদেবকে প্রণাম করে সোনার নল দিয়ে কাম দেবের গায়ে জল ছিটায়ে দিলেন, দেবতার আলস্য ভাঙল। এরপর যুবরাজ ও অন্যান্যরা কামদেবকে প্রণাম করে রূপার নল দিয়ে কামদেবের গায়ে রাজার অনুরূপ জল ছিটালেন। তারপর "বাহিরের লোকেরাও জল ছিটাছিটি করিতে লাগিল। সুগায়কেরা মৃদঙ্গ যোগে সংকীর্তন করিতে লাগিল।" উৎসব মগ্নতা এতই স্বাভাবিক যে যেন " মধুমাসের মিলন মাঝে মহান কোন রহস্য নেই।"

রাজ অঙ্গনে সেদিন উৎসব সাজ কেমন ছিল তা রত্ন কন্দলীদের চোখ দিয়ে আমরা দেখি " সেদিন রাজা সাদা পোষাক পরিয়াছিলেন। যুবরাজ প্রভৃতি সকল লোকেরা রাজার দেওয়া উপহারের কাপড় পড়িয়া সেইখানে আসিয়াছিলেন। রাজা কাহাকেও বা ডাকাইয়া আনিয়া কাপড় পরাইয়া দিলেন। তারপর রাজা অন্দরে গেলেন। অন্যান্যরাও নিজ নিজ বাড়ীতে গেল। আমরাও আমাদের বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।" দেবতা তোষণ শেষ। এবার উৎসবের দ্বিতীয় ভাগ। এবার দেবতা নেই, দেবতার সন্তানেরা সক্রিয়। সেদিনের বিরামের পর দিন মোট খেলা বা জল কেলী। কেমন সে আয়োজন ও অংশ গ্রহণ? রত্নকন্দলীর চোখ থেকে ধার নিই ;

"পরের দিন পুর্বের মত যুবরাজ প্রভৃতি বড় বড় লোকেরা দরবারে আসিলেন। আমাদিগকেও দরবারে আনা হইল। তারপর রাজা অন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সেদিন রাজার পরনে ছিল গুজরাটী সোনালী তসরের জামা, সোনালী কাজ করা জিরা, সোনালী

গোছপেছ, সোনালী পটুকা এবং সোনালী বুটিদার ইজার। একখানা সাদা শাল কাঁধের উপর লইয়াছিলেন। সোনার তরোয়াল দুইটি এবং হীরা ও পাথর খচিত কলকা একটি হামাই চরাই পাখীর পাখার সঙ্গে পাগড়িতে গাঁথিয়া লইয়াছিলেন। পান্না ও মুক্তায় গাঁথা একটি মালা দুই পেঁচ করিয়া পাগড়ীতে পরিয়াছিলেন। রাজার কানে মুক্তা এবং গলায় হীরা ও পাথর খচিত কণ্ঠাবরণে মুক্তার ঝালর দেওয়া ছিল। ঐ কণ্ঠাভরণের মাঝখানে হীরা খচিত দুদদুগী একটি ছিল। নাভি পর্যন্ত ঝুল দিয়া তিন পেঁচ করিয়া মুক্তার মালা পরিয়াছিলেন। হাতের দশ আঙ্গুলে দশটি হীরা ও পাথর খচিত আংটি পরিয়াছিলেন এবং কোমরে হীরা ও পাথর খচিত খঞ্জুর একখানা লইয়াছিলেন।

কেমন করে রাজা মোট বা জলকেলীতে অংশ নিলেন? রাজাকে হাতীর উপরে তক্তার আসনে মহার্ঘ কাপড়ের ঘেরাটোপে বসানো হল। ঐ কাঠের মাচায় হাতীর দাঁতের কারুকার্য ছিল। খুঁটি ছিল সোনার পাতের মোড়ানো। তক্তার মাঝখানে রাজার মূল আসন। চারকোনায় চারটি সোনার খুঁটিতে সামিয়ানার ছাদ। রাজা তো হাতীর পিঠে আসন নিলেন। যুবরাজ এলেন, সম্ভ্রান্ত লোকেরা এলেন, তামাসা দেখতে সাধারণ লোকেরাও এলো। এবার রাজা চললেন গোমতীর জলে, সামনে নিশানধারী চারজন। রাজঅঙ্গন থেকে গোমতীর পাড় পর্যন্ত অপূর্ব শোভাযাত্রা। হাতীর উপর রাজা চলেছেন গজেন্দ্র গমনে ঘোড়া সওয়ার আর পদাতিকরা সামনে যাচ্ছে নানাবর্ণের পতাকা কাঁধে। হাতীর উপর নাকাড়া বাদ্যের তালে তালে। পেছনে চল্লিশ জন ঘোড় সওয়ার। তরোয়াল বন্দুক হাতে অনুমান পাঁচ হাজার মানুষ আর রাস্তার দুপাশে তামাসা দেখার জন্য লোকের ভিড়। এই শোভাযাত্রায় সোনার কাঠি রূপার কাঠি হাতে চার জন গুরু নবর্দার চলছিল। রত্নকন্দলীদের ধারণায় ঐ মিছিলে অনুমান দশ বারো হাজার লোক জড় হয়েছিল। এই জন সমাগম থেকে বুঝা যায় মদন উৎসবের আকর্ষণ কত তীব্র ও ব্যাপক। ১৭০৯ খ্রীঃ একটি উৎসব কেন্দ্রে এতলোকের জমায়েৎ মানে রাজধানীর প্রায় সকল ঘরেই তালা।

খেলা শুরু করতে রাজা হাতীর উপর বসেই হাতীশুদ্ধ জলে নামলেন। যুবরাজ ও খেলায় অংশভাগীরা দু'ভাগ হয়ে এবার জল ছিটাতে শুরু করলেন পরস্পরের গায়ে। রত্নকন্দলীদের বসানো হল " গোমতী নদীর ধারে একটি কুঁজী ঘরে।

জলকেজী শেষ হতে মদনের ভোগ ভাঙ্গের লাডু, ক্ষীরের লাডু, দই, দুধ বিতরণ করা হল। এই উৎসবে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশ নেই, তবে রত্নকন্দলীরা মিছিলে আসার পথে দেখেছেন " স্থানে স্থানে দশ পাঁচজন স্ত্রী লোক একত্র হইয়া কলাগাছের চারা লাগাইয়া তার নীচে প্রদীপ ও ঘট রাখিয়া উলুধ্বনি করিতেছিল। সেই সমস্ত স্ত্রীলোকদের জন্য রাজার আদেশে রাজার সেবক গণ আধুলি, সিকি, দোয়ানি এক আনি, আধ আনি মুঠ মুঠ করিয়া উড়াইয়া ফেলিতে ছিল।"

রাজন্য যুগে আরেকটি গণ উৎসব ছিল দুর্গা পূজা। এরও অনুমান নির্ভর বর্ণনার প্রয়োজন নেই। কারণ দুই প্রত্যক্ষদর্শী এখানেও তাঁদের সাক্ষ্য রেখে গেছেন তবে মদন উৎসবের মতো গণ অংশগ্রহণের উল্লেখ নেই। এতে মনে হয় পূজা অনুষ্ঠান তারা প্রত্যক্ষ করেন নি। বা হতেপারে মদন উৎসবকে রাজারা গণ উৎসবে পরিণত করেছিলেন কিন্তু দেবী দুর্গা ছিল

একান্তই রাজ পরিবারের আরাধ্যা। দুর্গার স্থায়ী মণ্ডপটি তো, অর্জুন দাসদের বর্ণনা অনুযায়ী রাজ অবরোধেই। তবে দুর্গা পূজার সমারোহ তারা যে দেখেনি তা বুঝা যায় " তাহাতে দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন" এই বক্তব্য থেকে।

যাক কেমন ছিল রাজ অবরোধে ঐ দুর্গা মন্ডপ?

" ত্রিপুরার রাজবাড়ীর চারি দিকে ইষ্টক নির্মিত গড়া ইহা উচ্চতায় ৬ হাত সমান হইবে। পরিধি হিসেবে স্বর্গদেবের (আসামের রাজা) রংপুরের ভিতরের দুর্গটির সমান হইবে। এই দুর্গটির সন্মুখে ঐ ইটের তৈয়ারী গড়ের সঙ্গে লাগাইয়া মাটি দিয়া একটি গড় বাঁধা হইয়াছে। ইহার উচ্চতাও পূর্ব কথিত গড়টির মতন হইবে। উভয় গড়ের দূরত্ব আমাদের দাবিকিয়াল দুয়ার হইতে বড় চরার মাথার রাস্তার দূরত্বের অর্দ্ধেক হইবে। এই একটি দুর্গ। এই দুর্গের দুয়ার দক্ষিণ মুখী। ইহাতে পূর্বে পশ্চিমে লম্বা একটি কুঁজিঘর আছে। এই ঘরের দুইদিকে ইষ্টক নির্মিত ভিটা আছে, উহা উচ্চতায় অনুমান পাঁচ হাত হইবে। মাঝখানে রাস্তা। এই রাস্তা দিয়া জোড়া হাতী যাইতে পারে। এই ঘরের কোন দুয়ার নাই। সারাদিন খোলা থাকে। এই ঘরে তীর, ধনুক, গাদাবন্দুক, ঢাল, তরোয়াল লইয়া ৪০ জন লোক সহ একজন হাজারী থাকে। এই ঘরটিকে রূপার দুয়ারী ঘর বলে। পূর্বে এই ঘরের দুয়ারে রূপার পাত মারা ছিল। এবং উপরে রূপার ঘট ছিল, এজন্য লোকে ইহাকে রূপার দুয়ারী ঘর বলে। রত্নমাণিক্য রাজার পিতা রাম মাণিক্য রাজার সময়ে এই ঘরটি পুড়িয়া যাওয়ার পর হইতে উহাতে আর রূপার ঘট বা দুয়ার নাই। ঐ ঘরের পূর্ব দিকে অনুমান এক বাঁও (চারি হাত) ভিতরের দিকে ইষ্টক নির্মিত ভিটার উপরে একটি চৌচালা ঘর আছে; তাহাতে রাজা দুর্গা প্রতিমা গড়িয়া পূজা করেন।"

সেই ঘরের নিকটে অনুমান চল্লিশ হাত উচুঁ একটি মন্দির আছে, এই মন্দিরে দোলযাত্রা উৎসব হয়। এই মন্দিরের উপরিভাগে ছন ও বাঁশ দিয়া চারিচালা ঘর তৈয়ারী করা হইয়াছে। পশ্চিম দিকের ইটের তৈয়ারী বিষ্ণুর এবং শিবের দুইটি মন্দির আছে; ঐগুলিও উচ্চতায় প্রায় ২০ হাত হইবে।

এই দুই মন্দিরের সন্মুখে ইটের ভিটার উপরে ছন বাঁশের ছাউনী দেওয়া একটি চৌচালা ঘর আছে। সেই ঘরের ভিটা হইতে এক হাত অনুমান উঁচু করিয়া মানুষ আরাম করিয়া বসিবার জন্য বাঁধিয়া দিয়াছে এবং তাহার উপরে চারিটি চাল দিয়াছে কিন্তু তাহাতে বেড়া নাই। এই ঘরে ৮ জন ব্রাহ্মণ দিনরাত অবিরাম পালা কীর্তন গান করে।

বিষ্ণু মন্দিরে পাথরের তৈরী লক্ষ্মী সরস্বতীর সঙ্গে গোপীনাথ নামে বিষ্ণু মুর্তি আছে, এই বিগ্রহ ব্রাহ্মাণে পূজা করে। শিবের পাথরের তৈরী গণেশও কার্তিকের সঙ্গে বৃষ আরোহন শিবের মূর্তি আছে সেখানেও ব্রাহ্মাণে পূজা করে। এই দুই জায়গার নির্মাল্য প্রতিদিন রাজাকে দেওয়া হয়।

এসবই হল রাজ অবরোধে পারিবারিক পূজা। তবে রাজধর্মই প্রজার ধর্ম অতএব প্রজারা পরোক্ষ হলেও রাজার বা রাজপরিবারের দেবধর্মে সহগামী। অর্জুনদাস বৈরাগী আর রত্নকন্দলী শর্মা অহম রাজা স্বর্গদেব রুদ্র সিংহ'র প্রতিনিধি হিসেবে ১৭০৯ থেকে ১৭১৫ খ্রীঃ ছয় বছরে তিনবারে দীর্ঘদিন উদয়পুরে কাটিয়েছেন। প্রজা সাধারণের মধ্যেও কোন গণ

উৎসবের খোঁজ তারা নিশ্চই পেতেন। অতএব আর যে সব পূজা পার্বন উৎসব, প্রজাদের তরফে তার খোঁজ মিলছে কেবল একশ' সোয়াশ বছর আগের। উদয়পুরে ত্রিপুরা সুন্দরী বা অমরপুরের চন্ডী মন্দির রাজারা সর্বসাধারণের জন্য উৎসর্গ করেছিলেন।

" ত্রিপুর রাজধানী উদয়পুর" পুস্তকে দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ গোস্বামী রাজধানী উদয়পুরের বহুবিধ উৎসব অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। মদন উৎসব, কের, খারচি, চতুর্দশ দেবতার পুজা গড়িয়া গঙ্গাপূজা, সবই রাজন্য আমলেই প্রচলিত। কিন্তু রথ যাত্রা, জন্মাষ্টমী, দীপান্বিতার মেলা, পৌষসংক্রান্তির মেলা, শিবচর্তুদশী মেলা, এইসবের প্রচলন বেশী দিনের নয়। শিব চর্তুদশী উপলক্ষ্যে উদয়পুরে মেলার শুরু হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে, ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ির মেলা। জন্মাষ্টমী উৎসব তো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদের শুরু থেকে। আর বারোয়ারী দুর্গাপূজা উদয়পুরে শুরু হয় ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে, রথাযাত্রার সূচনা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। মহাদেব বাড়ী প্রাঙ্গণে চড়ক পূজা গোস্বামী মহাশয় নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন ১৯৪৬-৪৭ খ্রীঃ। এটিও প্রাচীন উৎসব নয়। তবে গঙ্গাপূজা প্রাচীন ও সমাজ নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাসে এর জন্ম। ডম্বুরে মকর সংক্রান্তিতে স্নানও মানত রক্ষা ও উপজাতিদের বংশ পরম্পরা এবং বহু প্রাচীন।

ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে রাজাদের গভীরতম মান্য কুলদেবতা চর্তুদশ দেবতার পরেই দেবী দুর্গা। স্থায়ী দুর্গা মন্ডপ যেমন তার ১ম রত্নমাণিক্যের সময়ের প্রাপ্ত ২০টি মুদ্রার মধ্যে ১৩টি মুদ্রাতেই " শ্রী দুর্গারাধানাপ্ত বিজয়ঃ রত্নপুরে শক ১১৮৬" " শ্রী দুর্গারাধনাপ্ত বিজয়ঃ রত্নপুরে শক অপাঠ্য" " শ্রী- মধ্যভাগে দু' এবং পশ্চাদ্ভাগে 'র্গা' " সিংহের নীচে " শ্রী 'দু' র্গা" ও " শ্রী দুর্গা" লেখা। দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্যের লেখা " শিবদুর্গাপ" এবং কৃষ্ণমাণিক্যের মুদ্রাতেও অনুরূপ " শিব দুর্গাপ" লেখা।

বকুল বিছানো পথে

"এতদিন শুনেছ যে সুর হারায়েছে,
পুরনো তা কোন এক নূতন কিছুর,
আছে প্রয়োজন। তাই আমি আসিয়াছি,
আমার মতন আর কেহ নাই ....।"
–জীবনানন্দ দাশ।

বকুল, রুদ্রাক্ষ ও ধনেশের ঠোঁট

আমাদের কানে তখনো পুরনো বাঁশীর সুর। ১৯৫৬-৫৭ সালে আমরা আর কতটাই বা নূতন হতে পারতাম! তাই পুরনো সুরে চঞ্চল হয়ে, একদিন, আমরা আমি এবং সুশীল; সুশীল দে, পূর্বাশ্রমের পরিচয় মুছে গৌড়ীয় মঠে এখন সে মান্যবর, প্রাজ্ঞ নিশি মহারাজ; নিবিড় অরণ্য সন্ধানে বেরিয়ে গেলাম। তখনো উদয়পুরে শহরের হাতাতেই তমাল তালিবনরাজি লীলা। সুখ সাগরের দক্ষিণ পশ্চিমপাড়ে এখনো সেই দৃশ্য বিরাজমান। সূর্যাস্তের দৃশ্য এখানে বড়ই মনোরম ।

আমাদের অরণ্যে নিরুদ্দেশ আসলে রুদ্রাক্ষের খোঁজে। ঈশ্বর চিন্তা মনের ধারে কাছেও নেই। তবে রুদ্রাক্ষ ঈশ্বর সান্নিধ্যের একটি চাবি, এমন অবান্তর, অতিলৌকিক কথার কানাঘুষা, অদেখা ঈশ্বরের দর্শনের পথ খুলতে পারে কেবল মাত্র ঐ কৌতূহলেই দুই বৈরাগীর অবিশ্বাসী হয়েও বিশ্বাস - সন্ধানে পা বাড়ানো। এখনো ঈশ্বর নিয়ে আমার সংশয়। কিন্তু বন্ধু সুশীল নাস্তিক্য থেকে আস্তিক্যের সাম্রাজ্যে এখন দামী মনসবদার। সুশীল তাঁর নব দীক্ষিত বার্তায় শ্রোতাদের অমৃত ভাষণে মন্ত্রমুগ্ধ করে। সে তো গোড়া থেকেই অসাধারণ কণ্ঠের অধিকারী।

অনেক, আমাদের সমবয়স্করা তখন আমাদের মনে নায়ক। আমাদের কৃষতনুর হীনমন্যতা তাদের কাছ থেকে তফাৎ রাখত। সম্ভবতঃ ঐ কারণেই আমাদের ছিল ভিন্ন অভিমুখ। নির্জনতার খোঁজ। দুই-এর মধ্যেই সোরগোল। অন্যরা যখন চ্যাপ্টা এক টুকরো লোহার টুকরোকে এক অসাধারণ খেলার উপকরণে ছিলামানাই আর সিগারেটের বাক্সের খোলকে জুড়ে নিয়ে হাজার আর লাখের খেলায় মেতে থাকত, টেম, ড্যাং, বা মার্বেল। আমরা তখন ময়দান ছাড়া। তবে ঐ সব হিরোরা আমাদেরও ঈর্ষনীয় ছিল। ওরা ক্যাপ্টে ন, পাসিংশো, পানামা, কাঁচি, চারমিনার, রংবেরঙ এর সিগারেট দিয়াশালাইয়ের খোলের খোঁজে পথের আনাচে কানাচে। আমাদের সময় কাটত অন্য জায়গায়। ওরা তাদের জীবনকে অন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়ে ছিল, তাদের একজন সুনীল রুদ্রপাল, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মী পরবর্তী কর্ম জীবনে, কিন্তু খেলার মাঠের সাফল্যে তাকে দপ্তরে সাফল্য দেয় নি। কর্মরত অবস্থায় বিদ্যুতের ছোবলে প্রাণ হারায়; অন্য জন মৃণাল দাস, জেলা প্রশাসনের কর্ম জীবন শেষ করে ' নীড়' এই সাইনবোর্ডের তলায় ঔষধের ব্যবসায়ী।

আমাদের নিঃসঙ্গ জীবন প্রকৃতিকে খুঁজত। উদয়পুর শহরের দশহাত চৌহদ্দী পেরুলেই তো প্রকৃতির ক্রোড়। এখন যা ডাকবাংলা রোড, শহরের অভিযান রাস্তা, বালীগঞ্জ, তখন অমর

সাগর আর সুখ সাগরের জল বিভাজিকা। হাসপাতাল চৌমুহনীর পর বাস্তবিকই দু'শ গজ পেরিয়ে গেলে বর্ষায় কাদা জলে মমত্ব জড়ানো কদর্যময় পথ। লোকসংখ্যা স্বল্প। মাত্র বসতি গড়ে উঠছে। কর্মব্যস্ততাও তত নেই, ফলে পথচারীর সংখ্যা খুবই কম, ঐ পথে বর্তমানে যে উদয়পুর সার্কিট হাউস তা ছিল চন্দ্র কুমার দেব এর বাড়ী। মাঝখানে কুমোর পাড়া। চন্দ্র কুমার দেব, সুশীলদের দাদু মায়ের বাবা। তারপর ফাঁক রিক্ততায় বেড়া পড়ল জনৈক গোস্বামী বাড়ীতে। আসলে সার্কিট হাউসের তলা পর্যন্ত সুখ সাগরের বিস্তার। মাঝের খানিকটা শুকনো পথের পরে জল জল কাদার স্থায়ীত্ব। আমরা ঐ নির্জন পথের দুই পদাতিক কামরাঙা আর পেয়ারার লোভে প্রথম বিশ্রাম নিতাম, আসলে ধন্য করতাম চন্দ্র কুমার দেব দের বাড়ী। খুনসুটি আর উদ্গত স্বাধীনতার দৌরাত্বে অতিষ্ঠ করে এবার আমাদের যথার্থই নিঃশব্দের আহ্বানে বেরিয়ে পড়া। কখনো লাফিয়ে কখনো পায়ে ইচ্ছাকৃত কাদা মেখে দক্ষিণ মুখী যাত্রার পথে অমর সাগরের প্রায় শেষ মাথায় সুখ সাগরের উন্মুক্ত চৌহদী সীমায় ছিল " মালী বাড়ী" এরা এই নির্জনবাসে কেন তা তখনও বুঝতাম না। পরে জানলাম এই জায়গা তাদের ক্রীত সম্পত্তি নয় রাজাদের দাক্ষিণ্য লব্ধ, খাটনি মিনা সম্পত্তি। এই ভূমিতে তাদের বাসের শর্ত হল এরা ত্রিপুরাসুন্দরী বাড়ীর পূজোর ফুল তুলবে, ঢাক বাজাবে এবং তদ্উপযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট কাজ করবে। কিন্তু এই বাড়ীর অস্তিত্বকে আমি এবং সুশীল নিঃশব্দ ভাঙার অপরাধ বলে গণ্য করতাম। এবং বিরক্ত হতাম। ফলে এদের অস্তিত্ব প্রকৃতির শত্রুবলে গণ্য করে। অপেক্ষাকৃত এই উচুঁ ভূমিকে হৃদয় নিংড়ানো চড়া বলে তাদের অভিস সম্পাত দিতাম। এবং পা গুটিয়ে হাফ প্যান্ট পরা আমরা জলার পাড়ে ঘেঁষে ঘাসের উপর বসে রহস্যময় দিগন্ত রেখার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকতাম। দৃষ্টির মাঝপথে কখনো আড়াল করে দাঁড়াত সুখ সাগরের মাঝখানে শাখা পল্লব বিস্তারী এক বট গাছ। তখনো যুদ্ধ জয়ের পর রাম সীতার লংকা থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসার কালিদাসী বর্ণনা আমাদের অজ্ঞাত। দূরের সুন্দর প্রকৃতিকে বর্ণনা কবির ভাষা " দূরাদয়শ্চক্র নিভস্য তন্বী, তমালতালি বনরাজি লীলা; আভাতি বেলা লবণাম্বুরাসে ধারা নিবন্ধের কলঙ্ক রেখা" আমরা আয়ত্ব করিনি। ফলে সৌন্দর্যের তাপ হৃদয়কে উষ্ণ করত, কিন্তু ব্যাঙময় করত না। কলঙ্ক রেখা যে অপর সৌন্দর্যের দ্যোতক তখন কি করে বুঝব? শব্দটা অপরিচিত নয় তবে এর একটা কুৎসিৎ ব্যাঞ্জনা ঠারে ঠুরে বড়রা মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ফলে নিজেরাও থাকতাম কলঙ্ক থেকে দূরে।

একদিন কিন্তু ঐ বট গাছই " প্রহর শেষের দিনের আলোয়" আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনল। দূর নীরিক্ষ্য বট গাছ আমাদের খুব হাতছানি দিত। কিন্তু নির্জন তেপান্তরের কাদা ভর্তি মাঠ, মাঝে মধ্যে কাদার উপর জমে থাকা হাল্কা জলের উপর দক্ষিণা বাতাসে সৃষ্ট ঢেউ, কখনো সাপলা ফুলের বন আর বাজাল ধানের লতানো দেহের সঙ্গে তার চিবুক স্পর্শের জলের প্রাণান্ত ছুটা; সবই আমাদের টানত। আমরা জানতাম বাজাল ধান গাছের চিবুক স্পর্শ করে, তা যে যতই উপরে ঠেলে উঠুক; জলের সাধ্যি নেই। আমরা ঐসব দেখতে চাইতাম। আসলে প্রকৃতির পাঠ। কিন্তু সেই বটগাছতলা পৌছাতে এবং ফিরে আসা এক বিকেলের কাজ নয়। যেতে হলে ঠায় দুপুরেই পা চালাতে হয়। দুপুরের খাওয়া দাওয়া নিয়ে আমাদের ভয় নেই, তাড়া নেই। আমাদের দু'জনের কত প্রভাতি ভ্রমণ বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়েছে। নিরুদ্দেশ

ভেবে দুই বাড়ীর লোক খুঁজতে বেরিয়েছেন। বিবেচনাহীন আমরা ফেরার পথে বাড়ীতে ঢুকতে ভয়ে কেঁপেছি। কিন্তু পরদিন ফের হল। একদিন দুঃসাহসী প্রাতঃভ্রমণ প্রলয়ের পথ খুলে দিল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে ফিরতে হবে। ঐটিই একমাত্র ধ্যানজ্ঞান হওয়ায় স্নান, খাওয়া আনুসঙ্গিক আর সব আমরা ভুলেই গেলাম। ঠায় দুপুরের ভূতের বিশ্রামের সময়ে মনে এলো। আমার পরান যাহা চায়। ''যে ঠায় দুপুরে গাওয়া শাস্ত্র বিরুদ্ধ হলেও সুকণ্ঠ সুশীল বটের ছায়ায় তা ভুলে গেল। আবার গাইলো " দূর দেশী কোন রাখাল বটের ছায়ায়। ঐ দিনেই সুশীলের কণ্ঠের অনুরাগী হলাম আমি। তার কণ্ঠে " আমার পরান যাহা চায়, তুমি তাই তাই গো'' এখনো লোভনীয়। যদিও ''তুমি'' কে এখনো চিনি না। তুমি অদেখা ও অনুপলব্দ। এখনো দুজনে দেখা হলে, যদি অবকাশও পরিবেশ থাকে; আমাকে বায়না করতে হয় না; সুশীল নিজে থেকেই ঐ সুরে কথায় আমাকে জয় করার চেষ্টা করে। আমার স্থির বিশ্বাস সুশীল গানে একনিষ্ঠ হলে সে অন্যভাবে নামী পুরুষ হত। কিন্তু তার প্রারম্ভিক অনিকেত জীবন কোথাও তাকে থিতু হতে দিল না। শেষ কালে একেবারে সন্ন্যাস। আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধু বিচিত্র চৌধুরীও ১৯৬৬ / ৬৭ সালে, আমার অস্থায়ী আবাস কলকাতার সন্তোষপুর থেকে একেবারে সন্ন্যাসে। এখনো মনে আছে আগের দিন দেশপ্রিয় পার্কে প্রিয়া সিনেমা হলে দু'জনে " লাভ ইন টোকিও'' দেখে শর্মিলায় মুগ্ধ আমরা মাঝরাতে শয্যা নিয়েছি। পরদিন সকালে বিচিত্র শান্তি নিকেতনের নাম করে বেড়িয়ে গেল। আসলে সংসার থেকে তার ঐ মহানিস্ক্রমণ। এর কোন আভাস প্রেক্ষাগৃহে বসে অনুভব করিনি। বিচিত্র সন্ন্যাস নিয়ে আমাদের মাঝ থেকে ছিটকে গেল। আর সুশীল ৫৮ বছর বয়স পর্যন্ত সুনামে শিক্ষকতা করে, সন্ন্যাস নিয়ে আমাদের মধ্যেই রয়ে গেল। তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আমাদের ঘড়িতে বাঁধা।

কিন্তু সেদিনের সেই বটগাছ দুঃসাহী অভিযাত্রী দুজনের জন্যে নূতন এক অভিযানের দুয়ার খুলে দিল। এর পশ্চাতে রয়েছে রুদ্রাক্ষের উদ্দীপনা। ব্রহ্মা ছড়ার নাম তখন শুনেছি। সুখ সাগরের সঙ্গে মায়ের বাড়ীর পাদ দেশে তার মোহনা আমাদের দেখা, তার শীতল জল স্পর্শ আমরা ইতিপূর্বে অনুভবও করেছি, আমাদের দেহ শীতল করেছে। সেই ব্রহ্মা ছড়ার উজানে, কোন গহনে বা বলা যায় " গহন কোন বনের ধারে গভীর কোন অন্ধকারে'' সেই রুদ্রাক্ষ গাছ বনের সম্রাট হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে জানি না। বটগাট তলায় সিদ্ধান্ত হল আমরা রুদ্রাক্ষ গাছের তলায় যাব। সিদ্ধান্ত হল পর্বতের কাছে মহম্মদ যাবে। কিন্তু সে গাছই তো চিনি না। ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ীর পূজারী জয় কুমার ঠাকুরের গলায় গোটা গোটা শুকনো ফলের মালা দেখেছি, বড়রা তাকে রুদ্রাক্ষের মালা বলত। ঠাকুরকে প্রণাম করত। পরে ঐ মালা তাঁর ছেলে বিজয় ঠাকুরের গলায় শোভিত দেখেছি বহুকাল। পিতা পুত্র দুই জনেই এখন প্রয়াত। রুদ্রাক্ষ তাদের বাড়তি শ্রদ্ধা দিত।

উদয়পুর মাতাবাড়ী সড়কের বাম পার্শ্বে আশ্বিনী ডাক্তার (অশ্বিনী দে) - এর বাড়ীর পাশ দিয়ে পায়ে এসে জঙ্গলে ঢুকলাম দু'জন। ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ানো। রুদ্রাক্ষ গাছ আমরা চিনি না। বনের গভীরে বিরল বসতি। কোন বাঙ্গালী ঐ গহনে ডেরা বাঁধেনি। স্তন চূড়ার মতো নাতি উচ্চ টিলার চূড়ায় অরণ্য ঘেরা পরিবেশে কিছু উপজাতিদের বাড়ী। এক ছড়াকে আমরা

অনেকবার পার হলাম। সূর্য পশ্চিমে হেলতে, ব্রহ্মা ছড়ার পাড়েই এক বয়োবৃদ্ধা উপজাতি রমণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। সারা দিনে ঐ একমাত্র মানবী যিনি আমাদের সঙ্গে ভাঙা বাংলায় কথা বললেন। এবং অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগেই বন ছেড়ে বাড়ী ফিরে যেতে বললেন। তখনো কিন্তু চোখ অনুসন্ধান করছিল রুদ্রাক্ষ গাছের। সামনে সন্ধ্যা সমাগমের আয়োজন, অন্ধকারের হাত ছানি, নির্জন দুর্গম পথে বাড়ী ফেরা, পাছে না পথ হারাই। কি করে তখন বাড়ী ফিরব ঐ আতঙ্ক। সুতরাং রুদ্রাক্ষ গাছ কল্পালোকে থিতু করে হতাশ হয়ে বাড়ী ফিরে এলাম। তবে লাভ হল, ঐ আমাদের প্রথম অরণ্য সান্নিধ্য উপভোগ, উদ্দিষ্টের সন্ধান না পাওয়ার হতাশাকে আরণক আনন্দে ভাসিয়ে দিলাম এবং এরপর বহুবার। ঐ গাছের হদিস অন্যরাও পায়নি। অথচ বড় হয়ে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের " উদয়পুর বিবরণী" যখন হাতে আসে উদয়পুর মহকুমার " উদ্ভিদ তত্ত্ব" সাব হেডিং -এ বইয়ের কুড়ি নম্বর পাতায় দেখলাম লিখা রয়েছে " ব্রহ্মা ছড়ার পাড়ে কয়েকটি রুদ্রাক্ষের গাছ সুরক্ষিত হইতেছে"। তা দেখে কৈশোরের হতাশা এবং অবিশ্বাসকে আবার বিশ্বাসের ঘরে স্থাপিত করলাম। আর বুঝতে পারলাম " সুরক্ষিত হইতেছে" তাহা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার কথা। এখন জনগোষ্ঠীর জন্যেই কেবল সংরক্ষণ টিকে রয়েছে শ্রীবৃদ্ধি সহ পার্থিব বস্তু, তা প্রকৃতির দান হলেও, যদি বিনিময়ে অর্থের কামধেনু হয় হবে, সরকারের আইনকে লোভীর আইনের কুঠারে ঘায়েল হতে হয়। উদয়পুর মহকুমার ব্রহ্মাছড়ার পাড়ের " কতিপয় রুদ্রাক্ষ" "সংরক্ষণের" দেওয়াল চূর্ণ হয়েছে কোন কালে বহুজনের সমষ্টির কুঠারাঘাতে। এই লোভের মূলে বাণিজ্যিক স্বার্থ থাকতে পারে, আবার মূঢ়তাও। সে যাই হোক সেই রুদ্রাক্ষ - বৃক্ষ শোভিত ব্রহ্মাছড়ার মহার্ঘ বনভূমি মানুষের লোভের শিকার হয়েই নির্মূল হয়ে গেছে। সঙ্গে বহুমূল্যবান বৃক্ষ। বিরল রুদ্রাক্ষ বৃক্ষও হয় জ্বালানীর অভাব মিটিয়েছে, অথবা বাণিজ্যিক কারণে ভিন দেশে পাড়ি জমিয়েছে। গোমতীতে ফেলতে পারলেই তো সমতল বাংলা দেশ পর্যন্ত তার স্বচ্ছন্দ ও বাধাহীন গমন। আমরা দুই বন্ধু জীবন ভর মনের ভেতর সেই রুদ্রাক্ষের সন্ধান করে চলেছি। সুশীল সন্ন্যাস নিয়েও রুদ্রাক্ষ শোভিত নয়। আমারতো প্রশ্নই নেই।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত উদয়পুরের " উদ্ভিদ তত্ত্বে" আরো লিখেছেন — উত্তর চন্দ্রপুর এবং সোনামুড়া (উদয়পুর) মৌজায় কয়েকটি কুচিলা (Nuxvomica) গাছ ছিল। আগর গাছও ছিল। এরাও বহু আগেই উধাও।

উদয়পুর বিভাগের পার্বত্য ভূমি কোন স্থানেই অনুর্বর নয়। " শাল, গর্জন, নাগেশ্বর' আগর, জারুল, চাম্বল (চামল), গাম্ভারী (গামাই) এ বনভূমি পরিপূর্ণ ছিল। একশ বছর আগেই অতীত কালের ব্যবহার।

"উদয়পুর বিভাগের শালবন প্রাচীন কাল হইতে সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন গ্রন্থা দিতেও ইহার বিবরণ পাওয়া যায়। মুড়াপাড়া, পেরাতিয়া, পাউড়ামুড়া, ধূপতলী, গর্জি, তারপাদুম, দুধ পুস্কুরিনী, বগাবাসা প্রভৃতি স্থানে শালবন আছে। তালুক ও জোত বন্দোবস্ত দ্বারা শালবনের অনেক সমতল স্থান আবাদী ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। শালবনগুলির সীমানা খন্ড খন্ড ভাবে নির্ণীত হইলে এবং সংরক্ষণ সম্পর্কে উপযুক্ত চেষ্টা হইলে শালবনের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে।" কিন্তু " বহুকাল যাবত বনবিভাগের ধ্বংস সাধন ভিন্ন উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন উন্নতি

সাধিত হইতেছে না।" বন দপ্তরের দপ্তর সহস্রগুণ বেড়েছে কিন্তু " উন্নতি সাধিত হইতেছে না।"

" আগে এই বিভাগে বহু আগর গাছ ছিল। অরণ্য ভূমি ইজারা দেওয়ার ফলে ইজারা দাররা ঐ অরণ্য ব্যক্তিগত ব্যবসায় ব্যবহার করেছে। শাল গাছ ধ্বংস হয়েছে বিগত একশত বছরে, বহু আগেই ধ্বংশ হয়েছে আগর, নাগেশ্বর, গর্জন গাছ।" অর্থ এবং বৈশ্য মনোবৃত্তি যে কত ভয়ঙ্কর এবং অরণ্যের ও মূল্যবান বৃক্ষের শত্রু তা বুঝা যায় " বর্তমানে শাল, গর্জন ইত্যাদি সংরক্ষিত ও নিষিদ্ধ শ্রেণীর বৃক্ষ। বিক্রয়ের আয় বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল বৃক্ষের ধ্বংশই সূচিত হইতেছে (ব্রজেন্দ্র দত্ত)।" আমাদের কল্পিত রুদ্রাক্ষের বিলয় বিলুপ্তির মূলেও অবশ্যই বৈশ্য ভাবনা। তা হওয়াই বেশী সম্ভব।

অরণ্য উধাও মানে অরণ্যচারী প্রাণীদের গৃহহারা হওয়া। ১৯০১ সাল থেকেই উদয়পুর বিভাগের বনের অবনতি ঘটছিল। এখন কে বিশ্বাস করবে " এই বিভাগের পূর্ব সীমানার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে" এক সময়ে গন্ডার বিচরণ করত। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত লিখেছেন —" অম্পিও ব্রহ্মছড়া অঞ্চলে গেড়াছড়া নামে একটি ছড়া আছে। গন্ডার (গেড়া) থাকিবার স্থান বলিয়াই এই নামের উৎপত্তি।" ত্রিপুরার হাতি তো চির প্রসিদ্ধ। তখন প্রতি বৎসরই ফাঁদ পেতে (হাতির খেদা) হাতি ধরা হত। " হাতির দাঁত, হরিণের শিং, গবয়ের শিং, মৃগচর্ম" যথেষ্ট পাওয়া যেত। বন্য হাতি তো তখন প্রতি বছর শীতকালে আতঙ্কের। আমন ধান পাকত। পাকা ধান খাওয়ার লোভে দল বেঁধে হাতিরা বেরিয়ে আসত। কখনো মানুষের বাড়ী ঘর ভাঙত। সামনে পেলে মানুষ মারত। ১৯৬৮ সালে উদয়পুর শহর উপকণ্ঠে কুঞ্জবন টিলার পাদদেশে গোমতীর পাড়ে সন্ধ্যার অন্ধকারে বাজার ফেরৎ এক পথচারীকে হাতি পায়ের তলায় পিষে মারে। হাতির দ্বারা ঐটিই সর্বশেষ হত্যাকান্ড। ১৯৫০ /৫৫ পর্যন্ত ও হাতির আগমন বার্তা সম্পর্কে গৃহস্থকে সতর্ক করার জন্যে শূন্য কেরোসিন তেলের টিন ব্যাবাহার করা হত। টিন বাজিয়ে এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী এমনি করে বহুদূর পর্যন্ত স্থানে টিন বাজানো সংকেত হাতির আগমন জানিয়ে দেওয়া হত। ব্রজেন্দ্র দত্তের লিখিত এক তথ্যে জানা যায় " স্বর্গীয় মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের সময়ে কলিকাতাস্থ Zoological Garden এর প্রয়োজনে এই বিভাগ হইতে উল্লুক, বাঘের বাচ্চা প্রভৃতি সংগৃহীত হইয়াছিল। এই বিভাগে নানান প্রকারের ব্যাঘ্র ও কালো ভাল্লুক অনেক আছে। কিছুকাল হইল উদয়পুর টাউনের অনতিদূরে সম্পূর্ণ কাল বর্ণের একটি ব্যাঘ্র শিকারী কর্তৃক নিহত হইয়াছে। পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্যে ইহার চর্ম রাজধানী প্রেরীত হইয়াছে।

বন্য পশুর ন্যায় এই বিভাগের বনে ধনেশ পাখী, ময়না, তোতা, ভৃঙ্গরাজ প্রভৃতি পাখীরও অভাব নেই। এই বিভাগে ময়ূর, কাকাতূয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট জাতীয় পক্ষী দেখা যায় না। কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক সুন্দর পক্ষী সর্বত্রই দৃষ্টি গোচর হয়।

বর্তমান উদয়পুর বিভাগে অমর সাগর দোয়াল নামে বন্য হস্তী চলাচলের " দোয়াল" বা প্রচলিত বন্য পথ আছে। ইহার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোয়ালই মিলিত হইয়াছে। এই অমর সাগর অমরপুর উপবিভাগের অন্তর্গত। চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের বন্য হস্তীগুলির সহিত উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনীয়া সাব্রুম বিভাগের বন্য হস্তীগুলি কখনও কখনও দলবদ্ধভাবে এবং কখনো

কখনো পৃথকভাবে মিলিত হইয়া থাকে। দোয়াল দেখিয়া হাতীর সংখ্যা নিরূপন করিতে "পাঞ্জালী" গণ বিশেষভাবে শিক্ষিত। এখন ফাঁসী বা পরতাল দ্বারা বন্য হস্তী ধরিতে শুনা যায় না। " যোদ্ধা" ও "বাংড়ী কোট" প্রভৃতি দ্বারাই ধরা হয়।" ১৯২৭ সালেও ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুরের মহকুমা শাসক। এই বর্ণনা ঐ সময় পর্যন্ত আপডেট্ করা।

উদয়পুরে নূতন করে জঙ্গল আবাদ করে নূতন প্রজা বসতের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে অর্থাৎ ১৯০১ খ্রীঃ। ফলতঃ জঙ্গল তথা অরণ্য ধ্বংসের নয়া সূচনা কালও তখন থেকেই ধরতে হয়। তবে পুরাতন প্রজা বসতিও যে বেশ ভাল সংখ্যাতেই ছিল তার প্রমাণ রয়েছে সেই সময়ের একটি জরিপের রিপোর্টে। ঐ রিপোর্টে দেখা যায় সোনামুড়া (উদয়পুর শহর সংলগ্ন; হাইওয়েের পাশে) খিল পাড়া, উত্তর চন্দ্রপুর, দক্ষিণ চন্দ্রপুর ও মুড়াপাড়া এই পাঁচটি পুরাতন গ্রামে ৫৩ (তিপান্ন) দ্রোণের উপর পুরনো জলাশয় ছিল। জঙ্গল অভ্যন্তরে অনেক জলাশয় জরীপের কাজ তখনও বাকী। মানুষ রয়েছে বা ছিল বলেই জলাশয়। পুকুরের জলই তো ছিল তখন পানীয় জল। এই পরিসংখ্যান উদয়পুরে প্রাচীন জনবসতির সাক্ষ্য দেয়। পুকুর তো মানুষ, তার প্রয়োজনেই খনন করেছে। উদয়পুর শহরে, বিজয় সাগর বা মহাদেব দিঘীর জল তো ১৯৬০ সাল অবধি চারপাশের লোকেদের একমাত্র পানীয় জলের উৎস ছিল। শেষ দিকে ফিটকারীর প্রয়োজন হত। এখন গোমতীর জল পরিশোধিত হয়ে উদয়পুর শহরবাসীর তৃষ্ণা মেটায় কিন্তু অপরিশোধিত গোমতীর জল কেউ পান করে না। অথচ আন্ত্রিক তখন বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল না। ১৯৩০ - এর ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের উল্লেখে দেখা যায় উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ীর দিঘী, নানুয়ার দিঘী (খিল পাড়ায়) কমলা সাগর (বাগমা বগাবাসা) জগন্নাথ দিঘী, বিজয় সাগর প্রভৃতি জলাশয়গুলির জল এখনো অতি উৎকৃষ্ট। নূতন ও পুরাতন ছোট ছোট জলাশয় গুলির জলও উৎকৃষ্ট। পানীয় জলের সংস্থান জন্য তার সুপারিশ ছিল। " জঙ্গলাবাদী বন্দোবস্তের নজর বা সেলামী নগদ টাকায় গ্রহণ না করিয়া পুষ্করিনী খননের শর্তাদি সংযুক্ত তদ্রুপ বন্দোবস্ত দ্বারা এ সম্বন্ধে সুফল" লাভের চেষ্টা করা। ব্রহ্মা ছড়া রুদ্রাক্ষ বৃক্ষের বিলয়ের সঙ্গে বনের উল্লিখিত জন্তু জানোয়ার পশু পাখী, জলাশয় বহুলাংশেই হারিয়ে গেছে। উদয়পুর কাকরাবন পথে পালাটানায় এই সেদিন ও বহু সংখ্যক কালোমুখ চশমা বানর পথে ও পথ পার্শ্বের গাছে স্বাধীন বিচরণ করতে দেখা যেত। কম বয়স্ক পথচারীর কাছে হাঁটা পথে, অটোয় চড়ে অথবা গাড়ীতে যাওয়ার পথে বানরদের ঐ লীলা ভূমি ও তাদের রাজকীয় ভাবভঙ্গী বাড়তি আকর্ষণ ছিল। এখন বলা যায় কোথায় হারিয়ে গেল সোনালী দুপুরগুলো আধু আর নেই। বা থাকলেও উল্লেখ করার মতন নয়। জলার মধ্যবর্তী বটগাছ, আর ব্রহ্মাছড়ার না - দেখা রুদ্রাক্ষের ছায়ার হাহাকার আজীবন হৃদয় কুঁড়ে চলেছে।

আমার আর এক সহমর্মী। তাঁরও হৃদয়ে হাহাকার। সেই হাহাকার একটি বকুল গাছের জন্যে। কোন " নারীর জন্য" নয়। ঐ হাহাকার আবর্তে আবর্তিত হয়েছে প্রাক আধুনিক উদয়পুর শহর। সুতরাং প্রাক আধুনিক উদয়পুরের বৃত্ত চক্র পূর্ণ করতে হলে সেই সতীর্থ অগ্রজ শ্রদ্ধেয় অনাদি চরণের (অনাদি ভট্টাচার্যের) চরণাশ্রায়ে যেতেই হবে। আমার হাহাকার যেমন ব্রহ্মাছড়ার আশাভঙ্গ এক নামী গাছের কল্পলোক ঘিরে তেমনি অনাদি দার হৃদয়ে সিঁদ কেটেছে তার বসতবাড়ী সংলগ্ন সরকারের লাখেরাজ জমিতে স্বাধীনভাবে বেড়ে উঠা অটবী

সদৃশ বকুল গাছ। সে গাছ ছিল। তিনি চাক্ষুষ করেছেন। স্পর্শ করেছেন। তার প্রশ্রয় পেয়েছে। এর উপর অত্যাচার করার অবকাশ পেয়েছেন, যাকে বলে কৈশরোরের দইস্যামী। অনাদি বাবুর হাহাকার ঐ বকুল গাছকে ঘিরে। উন্নয়ন যেদিন তার সবুজ পল্লব, ডালপালার বিস্তার ফুলের সুবাস গ্রাস করল, হাহাকারের জন্ম তখন। আসলে বকুল তো মর্মমূলে কিন্তু হাহাকারের বিস্তার প্রাক্ আধুনিক উদয়পুর শহর বা পরিত্যক্ত রাজধানী উদয়পুরকে ঘিরে। এই হাহাকার থেকে উপলব্দ হয়, কোন প্যাশন-এর বশে মহারাজ কাশী মাণিক্যকে রাজধানী ফের উদয়পুর নিয়ে আসতে চাইছিলেন। কাজও শুরু করেছিলেন। পারলেন না । শেষে দেহ রাখলেন উদয়পুরে।

অনাদি ভট্টাচার্যের শুরুটা হল " তখনকার উদয়পুর টাউন জগন্নাথ দিঘীর চারপাড়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। মধ্য পাড়া নামক ঘনবসতি পূর্ণ অঞ্চলটির কোন অস্তিত্বই তখন ছিল না। (১৯৫৭ সনে, ঐ ধূ ধূ মাঠে দশরথ দেবকে নির্বাচনী জনসভা করতে আমিও দেখেছি)। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বোরো ধানের নীচু ক্ষেত। বর্তমানে যেখানে নটিফায়েড এরিয়া অথরিটির অফিস (সাম্প্রতিক বর্তমানে এটি এখন দ্বিতল বৃহৎ অট্টালিকায়, সিপি, আই (এম) পার্টির উদয়পুর বিভাগীয় অফিস) সেই টিনের ঘরটিকে বলা হত ডাক বাংলা (পরে ঐ টিনের ঘর অতিরিক্ত মহকুমা শাসকের আবাস হিসেবে, নবদ্বীপ সিং কেও থাকতে দেখেছি)। বর্তমানে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম থেকে শুরু করে এখনকার B.D.O.- র আবাস পর্যন্ত সবটাই ছিল সরকারী এলাকা। এই এলাকাতেই ছিল ডাকবাংলো, বার লাইব্রেরী, হাকিমের এজলাস, কোর্ট দারোগা বাবুর অফিস, এস. ডি. ওর অফিস, ট্রেজারী, গার্লস জুনিয়র হাইস্কুল, বড় হাকিমের বাসা, ছোট হাকিমের বাসা এবং ধাত্রীর (সরকারী বেতন ভুক, একমাত্র মগ ধাত্রী। তার দুই ছেলে বীরন্দ্র মগ ও ভূপেন্দ্র মগ। এরা জগন্নাথ দিঘীর দক্ষিণ পাড়ের কীরিট বিক্রম ইনস্টিষ্টিউটশনে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন বলে, অভিযোগ ছিল; এবং উদয়পুর দীর্ঘদিন এটি আলোচনার বিষয় ছিল। পরে কি কারণে তারা বেকসুর হয়ে যায়। পরবর্তীকালে তাদের একভাই হয় তান্ত্রিক সাধু। উদয়পুরেও সে কতিপয় শিষ্য জুটিয়েছিল) বাসা ইত্যাদি। বর্তমানে উপশিক্ষা অধিকর্তার অফিসের জায়গাটিতেই ছিল বালিকা বিদ্যালয়। স্কুল ঘরটি ছিল দক্ষিণমুখী, ছনের চাল, বাঁশের বেড়া। সামনে এক চিলতে সবুজ মাঠ। জগন্নাথ দিঘীর পূর্বপাড়ে ছিল উকীল বাবুদের এবং শহরের বিশিষ্ট জনদের বাড়ী। মেঘু ভট্টাচার্য, নলীনী সেন, শ্যামা শঙ্কর ঘোষ, বিনয় বিশ্বাস, শচীন্দ্র দত্ত, নীরোদ দেব, প্রফুল্ল মজুমদার, ফরিদ মিঞা চৌধুরী প্রমুখদের বাসস্থান।

উদয়পুরের প্রখ্যাত খেলোয়াড় বৃন্দ টাউন হল মাঠে নিয়মিত খেলাধূলার চর্চা করতেন (এখন ঐ মাঠের এক চতুর্থাংশ টাউন হল গ্রাস করায় মাঠটির অঙ্গহানি ঘটেছে। এই মাঠের বুক চিরে মধ্য পাড়ার নির্গমন সড়ক মিশেছে উত্তর দিকের পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত মূল সড়কে। অবশিষ্ট অংশে এখন নগর পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রনাধীন শিশু উদ্যান)। ফুটবলের টুর্নামেন্ট ও লীগ প্রতিযোগিতাগুলো ঐ মাঠে হত। অতএব সেখানে শিশু কিশোর হবু খেলোয়াড়দের প্রবেশ নিষেধ ছিল। কিন্তু এরা যাবে কোথায়? তাদের জন্য স্কুলের ঐ একচিলতে সবুজ মাঠ। বিকেলটা বিভিন্ন ধরণের দেশী খেলায় এরা মাঠটি জমিয়ে রাখত।

ছেলেরা খেলত বুড়িচি, গোল্লাছুট, নোনতা, গাডুডু হাডুডু ইত্যাদি। ফ্রক পড়া কিশোরীরা

ছোট ছোট ভাই বোনদের নিয়ে মাঠে আসত। কোলের শিশুদের মাঠের এককোনে কোন একজনের জিম্মায় রেখে ওরাও খেলায় মেতে উঠত '' ওপেন দি বায়েস্কোপ' ' খুদমগনী' টারজান এই নদীতে কুমীর নাই, টাপ্পুস টুপ্পুস ইত্যাদি খেলায়।

ছেলেদের মধ্যে যারা একটু বেশী রকম বাঁদুরে স্বভাবের তারা গাছে উঠে বাঁদরের মতনই ডালে ডালে লাফালাফি করে খেলত 'উয়ায়ে উয়া' খেলাটি; মতান্তরে এটিই বাঘারে বাঘা খেলা। আট নয়টি বাঁদুরে ছেলে একত্র হয়ে এই খেলাটি খেলত। লটারীর মাধ্যমে বেছে নিত 'কাগগু র'' বা মাটিতে থাকার দুর্ভাগাকে। বাকীরা সকলে গাছে চড়ে বসত। নীচের ছেলেটি গাছুড়েদের প্রশ্ন করত। তাদের প্রশ্নোত্তরগুলি এই রকম ঃ

কাগগুর প্রশ্ন করে	উপর থেকে সকলে জবাব দেবে
— ওয়ারে ওয়া?	— কিরে ওয়া?
- গাছে উঠছস ক্যানে?	- বাঘের ডরে।
- বাঘ কৈ?	- মাটির তলে।
- তোরা ক' ভাই?	- সাত ভাই।
- আমারে একটা দিবি নি?	ছুঁতে পারলে নিবিনি?

এই বার মাটি থেকে মাটিতে লাফিয়ে উঠার পালা আর গাছের বাঁদরদের নীচে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা। নীচের জন গাছের কাউকে ছুঁতে পারলে সেই হত পরবর্তী 'কাগগুর' বা মাটিতে থাকা বাঘ।

বর্তমানে পুলিশ ক্লাবের (এখন পুলিশ ক্লাব উঠে গেছে; দক্ষিণ জেলার জিলা পরিষদের অফিস) পূর্ব দিকে যেখানে সরকারী কোয়ার্টাস ঠিক সেখানেই ছিল অনাদি বাবুর হৃদয় নিঙড়ানো বকুল গাছটি। বিরাট ঝাঁকড়া বকুল গাছ। জাতে ফুল গাছ হলে কি হবে, আকৃতি বট গাছের মতো। উদার আকাশের নীচ মুক্ত বাতাসে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকা উর্দ্ধবাহু বকুল গাছ মরশুমে পুষ্প প্রেমিকদের উপহার দিত রাশি রাশি সুগন্ধী বকুল। যতনা ঝরে পড়ত, বাঁদুরে ছেলেদের ডালে ডালে দাপাদাপিতে ফুল ঝরত শতগুণ। বকুল প্রেমী নরনারীদের অভাব ছিলনা উদয়পুরে। জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড় তখন পীচ বাঁধানো নয়। উদয়পুরে ছিল না মোটর সাইকেল, স্কুটার, রিক্সা ১৯৫০ /৫২ সালে কুমিল্লা থেকে নিজেই চালিয়ে নিত্যহরি সাহার রিক্সা নিয়ে এলেন উদয়পুরে। উদয়পুরের কাঁচা রাস্তা মানুষ প্রথম রিক্সা দেখল। নিত্যহরি ইতিহাস গড়লেন।

ট্যাক্সি, ট্রাক টেম্পো আধুনিক যানবাহন। উদয়পুর কুমিল্লা ভায়া কাকড়াবন রাস্তায় একটি বাস চলত দিঘীর পূব পাড় হয়ে দক্ষিণ পাড় দিয়ে। উদয়পুর থেকে কুমিল্লা কান্দির পাড় পর্যন্ত ভাড়া দেড় টাকা। গাড়ীর উদয়পুরে স্ট্যান্ড ছিল বর্তমান সুপার মার্কেটের সামনে। পূর্ব বাজারে যা এখন পুরনো মোটর স্ট্যান্ড নামে পরিচিত। বহু আইনী লড়াইয়ের পর এই মোটর ষ্টান্ড এখন বর্তমান রাজারবাগে থিতু হয়েছে। ফিল দ্য লোনী এবং পল দ্য লোনী দুই ফরাসী ভাই প্রথম গাড়ী নিয়ে কুমিল্লা পর্যন্ত আসেন। উদয়পুরে তাদের বিশ্রামস্থল ছিল বর্তমান হরিয়ানন্দ হায়ার সেকেন্ডারী স্কুল ও রামঠাকুর আশ্রম নিকটবর্তী গোমতীর পাড়ে উঁচু টিলায়। সাহেবের থাকার জায়গা। টিলার নাম হয়ে যায় সাহেবের টিলা। এখনো ঐ নামে [illegible] টিলাভূমির পরিচয়।

এই টিলার অপর পাড়েই গোবিন্দ মাণিক্যের পরিত্যক্ত রাজবাড়ী আর টিলার দক্ষিণ পার্শ্বে উদ্বাস্তু পুনর্বসতি প্রাপ্ত ছোট্ট বসতি আর্বান কলোনী, যা স্পর্শ করেছে বদর সাহেবের বাড়ীর সীমানা পর্যন্ত। এখানেই গোমতীর উপর দ্বিতীয় সেতু। সাহেবের গাড়ী কোম্পানীর করণিক কর্মচারী ছিলেন ফনীন্দ্র প্রসাদ শূর। সাহেব ভ্রাতৃদ্বয় ঐ ব্যবসা ছেড়ে যায় ১৯৫২ সালে। ঐ বৎসরই হিন্দুস্তান পাকিস্তান পাসপোর্ট চালু হয়। অতএব সাহেবরা ব্যবসা গোটান। তাদের পুরনো গাড়ী কিনে নেয় পাখী রায় বর্মন ও সুনীল দে। পাখী বর্মন বা পাখী ড্রাইভারকে নিয়ে কিংবদন্তী প্রচুর। তিনি বহুকাল আগেই প্রয়াত। অপর ড্রাইভার সুনীল ড্রাইভার এখনো বেঁচে আছেন অতীতের স্মৃতিচারণ করে)।

শহরে সাইকেল ছিল সাকুল্যে তিনটি অথবা চারটি। জগন্নাথ দিঘীর উত্তরপাড়ের পথটি ছিল পায়ে চলা পথ। কুসুমাস্তীর্ণ না হলেও তৃনাস্তীর্ণ তো বটেই। পথের উত্তরে মাঠের দক্ষিণ সীমায় এককালে কাটা জল নিকাশী ড্রেনের লুপ্তপ্রায় অগভীর খাত। তা ছিল মখমলের মতো সবুজ ঘাসে ঢাকা। চোরকাটা বেছে ফেলে ড্রেনের ঐ অগভীর খাতে ইজিভাবে ইজিচেয়ারের কায়দায় পিঠ বাঁকিয়ে উর্দ্ধমুখে শুয়ে থাকা যেত। সবদিকেই তৃনাস্তীর্ণ ভূমির উপর ঝরে পড়ত রাশি রাশি সুগন্ধী বকুল।

সপ্তাহের মঙ্গল ও বুধবারে এই ছোট সবুজ মাঠ টুকুই ব্রাহ্ম মূহুর্ত থেকে বেলা সাতটা আটটা পর্যন্ত কতিপয় নাবালকের চিৎকার চেঁচামেচিতে সরগরম থাকতো। স্থানীয় গারদে অবস্থান কারী স্বাধীন ত্রিপুরা পুলিশ (I.T.P) বাহিনীর সশস্ত্র সদস্যবর্গ এখানে সাপ্তাহিক প্যারেড করতো। ড্রিল করতো। রাজন্য শাসিত ত্রিপুরায় মঙ্গলবার ছিল 'হাফ' আর বুধবার ছিল 'মাফ'।

অনাদি ভট্টাচার্যের নষ্টালজিক আবহ আর যে খন্ড চিত্র এঁকেছেন " আমাদের প্রিয় বকুল গাছটির আগার দিকে গোটা কয়েক তেঠাইলা (তিনটি ডালের সমন্বিত অবস্থান) ছিল। চাঁদনী রাতে ঐ তেঠাইলায় বসে আমরা গল্পের আসর বসাতাম। গল্পে গল্পে কখনো গভীর রাত হত। জ্যোৎস্না প্লাবিত গভীর রাতে বহু দিন ফুলপরী দেখার জন্য অপেক্ষা করেছি। দুর্ভাগ্য দেখা পাইনি। দেখা পেয়েছি ছোট বড় নানা ধরনের নিশাচর পাখীর। প্যাঁচা, বাদুর চামচিকে ইত্যাদি। কখনো তক্ষকের হেঁড়ে গলায় শিকারে আঁতকে উঠেছি। দেখা পেয়েছি বুদ্ধু ভুতুমের। ওদের বিরাট আকার আর গম্ভীর স্বর ভয় পাইয়ে দিত। নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভাবতাম ভুত প্রেত। চিৎকার করে বলতে থাকতাম ভুত আমার পুত, পেত্নী আমার ঝি। রাম লক্ষ্ণণ বুকে আছে করবি আমার কী? এখন এরা নেই। প্যাঁচা বাদুর চামচিকে উধাও।

স্বাধীনতা উত্তর যুগে ত্রিপুরার লোক বেড়েছে। রোগ বেড়েছে। কাথ খাবার জন্যে বকুল ছাল সংগ্রহের দৌলতে গাছটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাচ্ছিল। সরকারী বাড়ী তৈরীর সময় মানবিক দরকারেই পূর্ণ সৎকার হয়ে গেল। সেই গাছের ঝরা বকুল আজও আমার মনে সৌরভ ছড়ায়।"

দুটি গাছই সৃষ্টি থেকে ধ্বংসের নিশানা। উদয়পুরে ইতিমধ্যে অরণ্য প্রেমিকরা কোটিপতি হয়েছেন। অরণ্য হয়েছে ধু ধু প্রান্তর। উদয়পুরের অরণ্য প্রকৃতি মানুষের ব্যাভিচারের শিকার। বাৎসরিক বনমহোৎসবে ওরাই তো প্রধান পেট্রন!

তৃষ্ণা অভয়ারণ্যের ভয় দূর হয়েছে। কিছু গাছ করুণাধন্য হয়ে এখনো বেঁচে থাকলেও মাকড়সার প্রেম-আতঙ্ক অরণ্যভূমিকে সন্ত্রস্ত করে রেখেছে। অভয়ারণ্যে এখন আর অভয়ের প্রয়োজন নেই। মূল্যবান গাছ হাফিজ করে অরণ্য যে উধাও!

রুদ্রাক্ষ তো দস্যুর কবলে পড়ে নির্বংশ। ধনেশকে তাড়া করেছে নিষ্ঠুর ব্যাধ। ব্যাধ আর বনদস্যু একই সঙ্গে পরমেশ্বর। ঐ পরমেশ্বরেরাই বর্তমানকে গিলে খেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ফলে তাদের কৃতিত্বই বা কম কিসে? ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছিল বলেই তো এখন গবেষণার বিষয়!

গো-শকট

ব্রহ্মাবাড়ীর সামনে দক্ষিণ মুখী দাঁড়িয়ে থাকলে, যদি সময়টা উত্তীর্ণ সন্ধ্যা হয়, তখন, দেখা যেত সুখ সাগরের পাড় ধরে এক সার উজ্জ্বল জোনাকী ক্রমশঃ শহর মুখী হচ্ছে। যত শহরের দিকে এগুচ্ছে আলোর উজ্জ্বল্য তত বাড়তে থাকে। এক সময় স্পষ্ট হয় যে জোনাকী নয়, অপার্থিব কোন বস্তুও নয়, চিমনিতে ধোঁয়ার আস্তরণ জমিয়ে কেরোসিনে জ্বালানো হ্যারিকেনের আলো। এরা নিজেরা হাঁটছে না। গরুর গাড়ীর সামনে যেখানে চটের থলির গদীতে চালকের বসার আসন ঠিক তার ৪/৫ ইঞ্চি সামনে দড়ি দিয়ে বেঁধে গাড়ীর চেসিজের তলায় বেঁধে রাখা। হিসেব কষে দেখা যাবে আজ সোম অথবা বৃহস্পতি বার, গর্জি বাজার থেকে '' মাল'' নিয়ে ওরা শহরে আসছে। গর্জি উদয়পুর থেকে নয় মাইল দক্ষিণে। ধান, চাউল, পাট, সরিষা, কার্পাস, জ্বালানী কাঠ ও অন্যান্য কৃষি ও বনজ উৎপন্নের বড় বাজার। পাইকারী ও খুচরা দুই ভাবেই ক্রয় বিক্রয় চলে। চন্দ্র পুর ছাড়াও আরো বাজার রয়েছে, চন্দ্রপুর পেরাতিয়া, জামজুরী বাজার। সব কটিই কৃষি পন্যের বাজার। পরিবহনের জন্য স্বয়ংক্রিয় যান নেই। ফলে চাহিদা সঙ্কোচিত থাকত, স্থানীয় চাহিদার উপরেই উৎপন্নের পরিমাণ নির্ভর করত। গো-যান ঐ অভাব পূরণ করে, কৃষি পন্যের বাজার ব্যাপক করে দিয়েছে। পাট, সরিষা তখনো উদয়পুর থেকে বহিঃরাজ্যে চালানের ব্যবস্থা হত। উদয়পুর ছিল ডাম্পিং ষ্টেশন। ১৩১৪ ত্রিপুরাব্দে (১৯০৪ খ্রীঃ) যখন উদয়পুর বাজার প্রতিষ্ঠা হয় তখন এই বাজারের নাম ছিল '[illegible]লাঘাটি' বাজার। কারণ '' প্রত্যেক বড় বড় দোকানের পেছনেই ছিল পাট, কার্পাস, সরিষার গোলা বা গুদাম। '' মাল নিয়ে ঐ সব গো শকট শহরেও ঘুরত, যথাস্থানে, মহাজন বা গৃহস্থের বাড়ীতে '' মাল'' নামিয়ে দিত।

গোমতী বিশ্রামাগার থেকে ডাক বাংলা রোডে, ২৫০ / ৩০০ মিটার গেলেই এক সম্পন্ন মুসলমান, কালা মিঞার বাড়ী। রাস্তার বাম পার্শ্বে এখন যেটা ব্রজেন্দ্র সরকারের বাড়ী। এই বিশাল ত্রিতল দালান ও তার পশ্চাতের বিশাল চৌহদ্দী নিয়ে বিশাল বাড়ী। ডাকবাংলা রোড থেকে পেছনে উদয়পুর মাতাবাড়ী রাস্তা হল পার্শ্বে, আর লম্বায় অমল চক্রবর্তীর বাড়ী থেকে স্বরাজ সেন, মনোরঞ্জন চক্রবর্তীর বাড়ী পর্যন্ত। মস্ত উঠান, বাড়ীর মেয়েরা উঠান নিকোত, বাড়ীর সামনের রাস্তাও তারা সাফ সুতুর রাখত। এই কালা মিঞারই ছিল সবচাইতে বেশী সংখ্যায় গরুর গাড়ী। সংখ্যায় ৭ / ৮ টি। ডাক বাংলোর (তখনো তৈরী হয় নি) পথেই ছিল তাঁর বাড়ীতে ঢোকার পথ। উঠানের উত্তর পার্শ্বে ছিল গো-শকটের গ্যারেজ। তার পার্শেই ছনের ছাউনি দেয়া তিন দিকে আবরণ মুক্ত লম্বা গো-শালা। ঘরে অনেক বলদ। ওদের বিশ্রামের সময় গেলে দেখা যেত কেউ শুয়ে কেউ দাঁড়িয়ে জাবর কাটছে। খড় বিচালী আর খৈ এর মিশ্রিত মাটির গামলা ভর্তি খাদ্য তাদের সামনে। তাদের পুষ্ট দেহ দৃষ্টি নন্দনও ঈর্ষনীয় ছিল। এরাই জোড়ায় জোড়ায় জোয়াল কাঁধে গাড়ী টেনে নয়, প্রতি হাট বারে, নিকটবর্তী বাজারে।

কালা মিঞা কবে উদয়পুরে এসে বাড়ী ঘর করেন, তা কেউ বলতে পারেন না। ১৯৫৫ /৫৬ সালে, কি কারণে শকট মালিক কালামিঞা উদয়পুর ছেড়ে গেলেন তার কারণও

অজানা। ঐ সময়েই বর্তমান গোমতী বিশ্রামাগারের ফাঁকা জায়গা, নিশিকান্ত সরকার সত্য সরকার দুই ভাই কিনে নেন। একটি ধান ভাঙার মিল চালু করেন। নিশিবাবু একাধিক বার ত্রিপুরা বিধান সভায় মাতাবাড়ী কেন্দ্র থেকে (তখন উদয়পুরে দুটিই নির্বাচন কেন্দ্র একটি মাতাবাড়ী, অপরটি শালগড়া) নির্বাচিত হয়েছিলেন। কালামিঞার বাড়ীর উত্তরের একটি অংশ নিশিবাবু কিনে নেন। সেখানে তিনি পাকা দেয়ালের টিনের ছাউনিযুক্ত একটি বড় ঘর তুলে ছিলেন। ঐ ঘরেই উদয়পুরের প্রথম বি, ডি ও অফিস কাজ চালু করে। ঐ ঘরটি ব্লক অফিস মাতাবাড়ী সংলগ্ন কল্যাণ সাগরের পাড়ে টিলা ভূমিতে চলে গেলে খাদ্য দপ্তরের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। নিশিবাবুর মিল সংলগ্ন একটি ঘরে সমবায় দপ্তরের সহকারী নিয়ামকের অফিসও ছিল।

তো, কালা মিঞা ছাড়া আরো অনেক গরুর গাড়ীর মালিক ছিলেন। শহরেই খাউল্লার বাপ আর মুর্কী মিঞার একটি করে গরুর গাড়ী ছিল। ওদের বাড়ী ছিল বর্তমানে জেলা হাসপাতালে উঠার মুখে রাস্তার ডান দিকে বাঁদিকে। তবে কালা মিঞা দুই কারণে বিশিষ্ট ছিলেন। প্রথমত তিনি সম্পন্ন ধনী গৃহস্থ। গরুর গাড়ী তার বাড়তি আয়ের উৎস এবং সংখ্যায় ৭ / ৮ টি। এই ব্যবসা মুসলমানদের একচেটিয়া ছিল। শহরের বাইরে অনেকেই গরুর গাড়ীর ব্যবসা করতেন। অভ্যন্তরীণ পণ্য বহনের ঐটিই তো একমাত্র ব্যবস্থা।

গো-শকট কেবল বাণিজ্যিক কারণে ব্যবহৃত হত তা নয়। সম্পন্ন গৃহস্থরা সম্বৎসরের ধান, চাউল, জ্বালানী সংগ্রহ করে রাখতেন। তাদেরও বাহন বান্ধব ঐ গরুর গাড়ী। গর্জি, পেরাতিয়া, চন্দ্রপুর থেকেই তো তা সংগ্রহ করতে হবে। তুলনামূলক দামও কম ঐসব বাজারে। আমন মরশুমে ধান চাউল, আর ঐ সময়েই জ্বালানী কাঠও পাওয়া যেত; কাজেই সুদিন কালেই এই সব সব সংগ্রহে তারা তৎপর হতেন।

গাড়ীর মালিকেরা ছিলেন খুবই বিশ্বস্ত। যারা গর্জি, পেরাতিয়া চন্দ্রপুর যেতে পারতেন না, তারা গাড়োয়ানদের মারফৎই তা ক্রয় করাতেন। দাম দস্তুর ওরাই করত। ওদের হাতে গৃহস্থ টাকা গুঁজে দিতেন। ওদের বলা দামই ছিল বিশ্বাসের শেষ কথা। তখন টাকার দাম বেশী ছিল কিন্তু ধানের দাম ছিল ৬ থেকে ৮ টাকা মন। বা এমনও হয়েছে ওদের ট্যাকে টাকা আছে সেই টাকায় অমুক বাবুর জন্যে পছন্দের সওদা করে আনলেন, ধান, চাউল থেকে সব্জি পর্যন্ত যা কিছু। গৃহস্থের রাগ হত না। বরং খুশী হতেন। দাম চুকিয়ে দিতেন। কুমড়ো, খারকোন, চাউল কুমড়ো, ছড়া, কাঁচা কলা ভাল পাকা কলা খুচরো সওদার মধ্যে ঐসব স্থানীয় উৎপন্ন থাকত।

সব চাইতে আকর্ষণীয় জ্বালানী কাঠ ছিল কাঁকড়া গাছ। গাছ খুব বড় হত। প্রকান্ড মোটা কান্ড। কান্ড থেকে সরু ডাল সবই উৎকৃষ্ট জ্বালানী। বড় বড় গাছ বোঝাই করে, সার বাঁধা গরুর গাড়ী ক্যাচ ক্যাচ্ শব্দে যখন পথ চলত, তা দেখার জন্যে, শব্দের ছন্দ উপভোগ করার জন্যে ছোটরা রাস্তায় বেরিয়ে আসত। কাঁকড়া কাঠের চাহিদা আরো একটি কারণে ছিল, তা হল সহজে চেড়াই করার সুবিধা। মজুরীর ও তারতম্য ছিল। গাড়ীর মালিক আর গাড়োয়ান আর ব্যবসায়ী আর গৃহস্থ এদের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিল মধুর। বিশ্বাসের বললে অপূর্ণ হয়, সে ছিল অন্তরের সখ্যতা।

হেমন্তের ধান কাটা শেষ হলে বাজার চালু হয়ে যেত। তখন তো দেশী ধানের ফলন। ঠাকুর ভোগ, সাইল চিকন, বাজাল, মথরী, ঘিগজ, কালজিরা, গোবিন্দ ভোগ, এই সব। মথরী আর ঘিগজ ছিল উৎকৃষ্ট মুড়ির জন্যে। এতবড় বড় ও স্বাদু মুড়ি, সম্ভবতঃ গোটা ভারতেই এখন নেই। এখন তো মুড়ির দেহ মোটা করতে " ইউরিয়া সারের ব্যবহার" এই নষ্ট দুষ্ট প্রক্রিয়া ও সেঁকো বিষ খাওয়ার চিন্তা, দুঃসাহস ও ক্রিমিন্যাল মনোবৃত্তি সেদিন কারোর ছিল না। গোটা শীতকাল ব্যাপী ঐ পাইকারী বাজার বসত।

ফিরতি মৌসুমী বায়ু শীতকালে বৃষ্টিপাত ঘটাত কখনো সখনো। কাঁচা রাস্তা। জল জমত, কাদা হত। গরুর গাড়ীর চাকাও গরু চলাচলে পথ আরো দুর্গম হত। ঐসব দুর্যোগের দিনে গাড়োয়ান দুর্ঘটে পড়তেন। কাদায় গাড়ীর চাকা বসে গেলে, গরুর যদি সাধ্যে না কুলাত, তবে মানুষের শক্তি প্রয়োগ করতে হত। গাড়োয়ানরাও চাকা উদ্ধারে হাত লাগাতেন। কর্ণের রথের চাকা কাদায় বসে থাকার জো ছিল না। কিন্তু শহরে ফিতে রাত হয়ে যেত ।

স্বাভাবিক সময়ে গাড়ীগুলি শহরে ফিরত রাত নয়টা, সাড়ে নয়টা দশটার মধ্যে। এর বেশী দেরী হলেই শহরে সংশ্লিষ্টদের দুশ্চিন্তা শুরু হত। গাড়ীতো এখনো এলো না। গাড়োয়ানরা গুদামের বা বাড়ীর সামনেই "মাল" পৌঁছে দিতেন। ঐ রাতেই। ফলে গাড়ী ফেরা না ফেরা বিষয়ে অজানা থাকত না। শহরে দুশ্চিন্তা, অবিশ্বাসের কারণে নয়; চালক রাস্তায় জল কাদায় আটকে সঙ্কটে পড়ল কিনা তাই নিয়ে। বা বন্য জন্তুর কবলে পড়ে বিপদগ্রস্থ হল কিনা? চোর ডাকাতের ভয় তখন ছিল না। কাজেই ধান চাউল পথে লুঠ হবার কোন আশঙ্কা ছিল না। শহরেও গৃহস্থেরা নিরুপদ্রুপেই ঘুমুতে পারতেন। যেন সায়েস্তা খাঁর আমল। প্রকৃতি কোন সঙ্কট তৈরী করল কিনা তাই নিয়ে চিন্তার সংকট।

এক সময় গাড়ী আসত! হয়তো মধ্য রাত গড়িয়ে গেছে। গাড়োয়ান ক্লান্ত বিধ্বস্ত। মহাজন বা গৃহস্থ সামান্য আহার্য বা গরম চায়ে তাদের ক্লান্তি অপনোদনের চেষ্টা করত। মানুষে মানুষে সহমর্মিতা আর কি?

রোশন আলীরা চলে গেলেন

এখন যেটা উদয়পুর শহরে হাসপাতাল চৌমুহনী, চব্বিশ ঘন্টাই যানবাহন আর জনসমাগমে সরগরম ষাট পঁয়ষট্টি বছর আগে এমনটা ছিল না। অমর সাগরের পাড় ঘেঁষা বাড়ীগুলি, বড় বড় সীমানা নিয়ে গাছ গাছালির ছায়ায় ঘেরা, সামনের জন বিরল পথকে দিনের বেলাতেও আরো নির্জন করে রাখত।

এখন শহর থেকে দক্ষিণে বেরুবার প্রধান রাস্তা এটি। এখানেই হাসপাতাল, অসংখ্য ঔষধ-বিপনী, চিকিৎসকদের চেম্বার, পেট্রোল বিক্রয় কেন্দ্র; সরকারী বিশ্রামাগার '' গোমতী'' কাছেই জেলা শাসক, মহকুমাশাসক, পূর্ত দপ্তরের বড় কর্তার অফিস, ন্যায়ালয় কাজেই ভিড়তো থাকবেই। হাসপাতালের অবস্থান হেতু ভিড় রাতেও গড়ায়। মানুষ ও যানবাহনের সমাগমে চব্বিশ ঘন্টাই ছয়লাপ।

মহাদেব দিঘীর কোণ থেকে যদি -এর সীমানা ধরি, কোণের বাজার মুখী ঢালে, বাম পার্শ্বে এখন যেটা অস্থায়ী, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অফিস সে জায়গায় থাকতেন জনৈক উষা চক্রবর্তী ও তার পরিবার। এবার উপরে অমর সাগরের পাড় ধরে প্রথম বাড়ীটিই চন্দ্রাবলী মিশ্র নামে এক উত্তর প্রদেশের কুলীন ব্রাহ্মণ, এরাজ্যে পরিচয় সূত্রে ভূম্যাধিকারী, ভূমির ব্যাপারী ও কুশীদ জীবী। আম, কাঁঠাল কামরাঙা গাছের নিবিড় ছায়া ঘেরা বেটনীতে উঁচু ভিতের টিনের ছাউনি কাঁচা ঘরের রাস্তা মুখো বারান্দায় বিশাল দেহী হাতাকাটা এক বিচিত্র বুনোটের ফতোয়া গায়ে প্রবল ভূড়ির অধিকারী প্রৌঢ়ত্ব ছাড়িয়ে যাওয়া এই ব্রাহ্মণকে মোটা উপবীত শোভিত একটি প্রকান্ড কারুকার্যহীন কাঠের চেয়ারে বসে থাকতে দেখতাম। তার বাড়ীর সীমানা স্মারক এক চাঁপা গাছ থেকে ডাল ভেঙে পড়ে পরিমল নামে এক আমাদের সমবয়স্ক বালক দারুণ চোট খেয়েছিল। জীবনের আশা ছিল না। পরে অবশ্য পরিমল বেঁচে যায়। এবং তার পরিণত মৃত্যু হয়।

মিশ্র মশাইয়ের ঘরের ভিতরেও আসবাবের বাহুল্য ছিল না। একটি বিশাল খাট, সাধারণ বিছানা, আর বিশাল সাইজের একটি কাঠের সিন্দুক, যার উপরে বিছানা পেতে দু'জন শুতে পারে এত প্রসস্ত। দেশ থেকে পরিবারের মহিলারা এসেছেন, এমন কখনো আমাদের নজরে পড়ে নি। সত্তরের দশকের গোড়ায় যখন তিনি তার সমস্ত ভূসম্পত্তি বিক্রী করে চলে যান তখন ঐ কাঠের সিন্দুক তিনি দিয়ে যান গোপাল ভদ্র নামীয় এক সম্পন্ন ব্যবসায়ীকে। ঐ ব্যবসায়ীই বর্তমানে তাঁর মূল বাড়ীর মালিক। সেখানে এখন ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা নিগমের অফিস, ব্যবসা কেন্দ্র ইত্যাদি। আর ঢালু অংশ কিনে নেয় বিধু সিং-এবং পঙ্কজ বিহারী সাহা নামে দুই ব্যবসায়ী। এই সব সাম্প্রতিক কথা। তবে মিশ্রই সম্ভবতঃ এই তল্লাটে এসে সর্বপ্রথম বাসা বাঁধেন। কারণ তার বাড়ীটাই ছিল বিজয় সাগরের একেবারে কাছে এবং পশ্চাৎভাগে ছিল অমর সাগর। সামনে পেছনে এমন মনোরম আকর্ষণ সকলকেই আকৃষ্ট করবে কাজেই এখানে নীতি হবে। '' ফার্ষ্ট কাম ফার্ষ্ট সার্ভ' আসলে যে আগে আসবে সে ঐ জায়গা দখল করবে। চন্দ্রাবলী মিশ্র তার সমস্ত জায়গা বাড়ী বিক্রী করে সত্তরের দশকের গোড়ায় উত্তর প্রদেশে তার দেশে চলে যান।

তারপর যতই আমরা অমরসাগরের পাড় ধরে এগুতে থাকব সেই পথে পর পর বাড়ীগুলি সাজালে এই রকম। চন্দ্রাবলী মিশ্রের পর ফাঁকা জায়গা, কারণ তখনো "শম্ভুর মিল" চালু হয় নি। এখন সেখানে এক দাঁতের ডাক্তার আর রেস্তোরা, তাও অনেক হাত বদলের পর। তার পরেই ছিলেন নগেন্দ্র মজুমদার, টেলু ঠাকুরের বাড়ী, মূর্তি কারিগর বিষ্ণুপাল নারায়ণ পালদের বাড়ীও শিল্প শালা (এখন তারা এখানে নেই; সোনামুড়া গ্রামে তাদের উত্তর পুরুষেরা রয়েছে)। যথাক্রমে শশী বৈদ্য, যোগেন্দ্র দাস, গঙ্গাগতি দত্ত, বিলাস দেব -দের (তাঁর দ্বিতীয় পুত্র সুব্রত দেব উদয়পুর নগর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন চেয়ার পার্সন) বাড়ী। তারপর ফাঁকা। পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি ঐ ফাঁকা জায়গা নিশিকান্ত সরকার কিনে নেন। বর্তমানে সেখানে সরকারী " গোমতী" বিশ্রামাগার। তারপর বাড়ীঘর খুবই কম। রাস্তার বামপার্শ্বে কেবল কালা মিঞার বিশাল চৌহদ্দীর বাড়ী। চন্দ্রাবলী মিশ্রের পরেই এই এলাকায় সবচাইতে পুরনো গঙ্গাগতি দত্ত। ব্রজেন্দ্র দত্তের উদয়পুর বিবরণীতে (১৯৩০ সালে লেখা) গোলা বারুদ ব্যবসায়ী হিসেবে গঙ্গাগতি দত্তের নাম রয়েছে। বর্তমানে যেটা পূর্ব বাজার সেখানে ততদিনে ব্যবসায়ীরা আসতে শুরু করেছেন। বাড়ী ঘর করছেন। কালাচাঁন রায়ের নিজস্ব ব্যবসা কেন্দ্র বড় ঘর গড়ে উঠেছে। এই বড় ঘরের পেছনেই গোমতী। এর পাশ দিয়েই নদী পেরোবার খেয়া ঘাট আর গোমতী নদীপথে কুমিল্লা যাওয়ার গয়না ঘাট। বর্তমানে বৃহৎ বাঁশ বাজার, " বড় ঘরটি' উদয়পুরে একটি ঐতিহাসিক বাড়ী। একে কেবল ব্যবসা কেন্দ্র বললে ভুল হবে। আসলে এটি ছিল কমিউনিটি হল। শহরের সব চাইতে বড় ঘর বলেই এর নাম হয়ে যায় " বড় ঘর" কালাচাঁন রায়ের ঐ ঘরেই নাগরিক সভা, সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ দরবার।

প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে নাগরিক সমাজের মত বিনিময়ের জায়গা; খুচরা ভাবে বললে " দয় দরবারে" জায়গা। তাঁর উত্তর পুরুষেরা এখনো ঘরটিকে অবিকল রেখেছেন। দরবারের জায়গাও রয়েছে। ঐতিহ্যবাহী ঘর বলে এই ঘরের কোন আকৃতিগত পরিবর্তন ওরা করেন নি। সেই বিশাল টিনের চৌচালা, সেই পুরনো টিন. টিনের বেড়া অবিকল রেখে দেওয়া হয়েছে। কালাচাঁন রায় বড় ঘর তৈরী করেন টাউন হল তৈরী হয় কিন্তু বড় ঘরের গুরুত্ব কমেনি। টাউন হল ব্যবহৃত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ কোন কাজে।

হাসপাতালে উঠার মুখে রাস্তার দু'পাশের লোকগুলিরও খোঁজ নিতে হয়। ঐ জায়গায় চারটি পরিবার ছিল। তিনটি পরিবার মুসলিম সম্প্রদায়ের। একটি পরিবার ছিল প্রভাত মজুমদার নামে এক হোমিও চিকিৎসকের। পেট্রোল পাম্প থেকে কয়লার মাঠের দিকে যে রাস্তা পাবলিক হেলথ্ দপ্তরের ডিপটিউবওয়েল রয়েছে ঐটিই ছিল প্রভাত মজুমদারের বাড়ী। প্রভাত বাবুকে এই জায়গা থেকে যেতে হলেও তিনি উদয়পুরেই থেকে যান। কিন্তু মুসলমান পরিবার তিনটি ত্রিপুরা ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে (পূর্বতন) চলে গেল এবং এখানকার মানুষের মন থেকে হারিয়ে গেল।

তিনটির মধ্যে একটি পরিবারে মুকী মিঞার গরুর গাড়ি ছিল। ঐটিই ওর জীবিকা। খাউল্লার বাপ ছইয়াল (ঘর নির্মাণের কাজ) কিন্তু আজিজ মিঞা ও তার ছেলে রোশন আলীর ছিল বিচিত্র জীবিকা। মাছ ধরা। জাল দিয়ে নয়, বড়শী দিয়ে। জলের অভাব নেই। কাছেই তো সুখ সাগর, বর্তমান জেলা শাসকের সরকারী আবাসের নীচ পর্যন্ত তো সুখ সাগরের বিস্তার।

১৯৬৯ -৭০ -এ রমেশ চৌমুহনী থেকে ব্রহ্মাবাড়ী পর্যন্ত জলার মাঝ দিয়ে হাইওয়ে তৈরী হলে পর রাস্তার উত্তরে 'ব'- দ্বীপ সৃষ্টি হয় তখন থেকে এই জলার চরিত্র পাল্টে যায়। বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভরাট করে এখন শতাধিক বাড়ী, জেলা জজের কর্মচারীদের সরকারী আবাস ইত্যাদি। তখন পুরোটাই জল, বর্ষায় ডাকবাংলো রোডের ঐ অংশ জলে ডুবে যেত। জল মানেই মাছ। সুতরাং আজিজ মিঞা আর রোশন আলীদের ধরার মতন মাছের অভাব ছিল না।

বাপ ব্যাটা উভয়ের হাতেই দুটি করে ছিপ। একটি লম্বা, খুবই লম্বা ৮/৯ হাত; অপরটি ছোট; এর সঙ্গে বাঁধা বড়শীও ছোট। বড় ছিপের বড়শীও বড়, সুতার দৈর্ঘ্য ও বেশী। ছোট বড়শীর আধার (মাছের খাদ্য) ছিল কেঁচো, তবে তা অপ্রধান, প্রধান ছিল সিঁদল শুটকী। এর গন্ধে কৈ-মাছ আকৃষ্ট হত। বড় বড়শীর মধ্যে আধার হিসেবে গাঁথা হত জ্যান্ত ব্যাঙ। ব্যাঙের পিঠে বড়শী গেঁথে জলে ফেলা হত। যন্ত্রণায় ব্যাঙ লাফাত, আবার ছিপটাকেও নাচের ভঙ্গীতে নাড়ানো হত। শোল, বোয়াল - এরা লোভী মাছ, ব্যাঙ প্রিয় খাদ্য কাজেই কি করে লোভ সামলায়। ওরা কেবল সুখ সাগরে নয় বাড়ীর কাছেই জয় বাবার ঢেপা, কয়লার মাঠে যাবার পথে হাসপাতালের নীচে বর্তমানে নয়া বসতি; পাঁচ দশক আগেও তা ছিল জলাভূমি, ঐ ঢেপাতে প্রচুর মাছ। ওদের সঙ্গে থাকত মাছ রাখার জন্য এ্যালুমিনিয়ামের মাঝারো সাইজের হাঁড়ি। এক পাত্রে মাছের আধার উদাম গায়ে থাকলে কোমরে বিড়ি। হবিউল্লা বিড়ি, বা স্থানীয়ভাবে " বর্মণ দের" দ্বারা খাঁটি নেপালী তামাকে প্রস্তুত, ১নং বিড়ি, (তাও বিলুপ্ত; বহু আগেই ঐ কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে) আর দিয়াশলাইয়ের বাক্স। কোন আড়াল না রেখেই বাপ ব্যাটা এক সঙ্গে মুখ থেকে ধোঁয়া বের করত। আমাদের ভব্যতা বোধে আটকাত, কিন্তু ওদের মাছ ধরা দেখার আকর্ষণে ঐ বেয়াদপি ও অভব্যতা আমরা উপেক্ষা করতাম। বর্ষায় নূতন জলে বড়া, (ছোট কঞ্চিকে বড়শীর ছিপ করে এক মাথায় রুবি ট্র্যাপ পাতলা বাঁশের কঞ্চি ছোট করে দুটি মাথা একত্র করে, এটাই বড়শী। সূতার এক মাথায় বেঁধে; তাতে মাছের খাদ্য সিঁদলের গন্ধ মাখা কেঁচো গেঁথে দেওয়া হত। সূতার অপর মাথা ছিপ তথা কঞ্চির এক মাথায়। ঐ কঞ্চি মাটিতে পুঁতে রেখে ফাঁদ তৈরী হত) পেতে কৈ মাছ ধরত। তবে তারা কশ্চিৎ কদাচিত ব্রহ্মাবাড়ী পেরিয়ে সুখ সাগরের দক্ষিণমুখী হতেন। বড়শীতেই ওরা মাছ ধরতেন। ঘরের দরজার কাছে বাইরে বড় মাটির পাত্রে (নাইন্দা) জিইয়ে রাখতেন।

রোগীর পথ্যের জন্য জিওল মাছের দরকার বা সখ হয়েছে কাঁচা সিমের বিচি আর মাগুরের ঝোল খেতে বা সদ্য পেয়োতির দেহে রক্ত আর শক্তির যোগানে শিঙি মাছ চাই, বাজারে নেই তো কি হল। রোশনের বাপ আছে।

এখনকার বিচারে তাদের আরো মাছ ধরার জায়গা ছিল। মহাদেব দিঘী। যেত, কিন্তু কম। সেখানে তো জিওল মাছ প্রায় নেই। অমর সাগর। সেতো ব্যবহারের অযোগ্য। দুই তিনফুট বা আরো বেশী পুরো দামের আস্তরণের উপর ঘন আগাছাও তারা বন, দৃশ্যতঃ তখন অমর সাগরে তো জলই নেই। মাছ কোথায়? ধনী সাগরের দামের উপরেও তখন গরু চড়ে, মানুষ হাঁটে। নূতন বর্ষায় কৈ কানে হেঁটে পাড়ে উঠে , কেউ কোথাও দাম খানিকটা কেটে খালি হাতেই মাছ ধরে। কিন্তু বড়শী সেখানে অচল। কারণ এমনিতেই মাছের এত খাদ্য, বাইরের খাওয়ায় তাদের লোভ নেই, সুতরাং রোশনেরা খামাকা পন্ড শ্রম করবে কেন?

পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি অমর সাগরের দাম কাটা শুরু হয়। ধনী সাগর তার পরে। ঐ দাম কাটতে গাছ কাটার করাত ব্যবহার করতে হয়েছিল। অমর সাগরের দাম আর তারা বনে ছিল সাপ জোঁকের আস্তানা। মায় বৃহৎ অজগর পর্যন্ত। অজগর সাপের উল্লেখ ১৯৪৮ সালের প্রভাত রায় সম্পাদিত "চিনি হা" পত্রিকায়ও রয়েছে। ছোট্ট ঘটনার রিপোর্ট। রিপোর্ট ছিল দুপুর সময়ে তকী চৌধুরী নামে জনৈক ভদ্রলোক মহাদেব দিঘীর পাড়ের রাস্তার ঢাল দিয়ে অমর সাগরের পাড়ের রাস্তা ধরে জগন্নাথ দিঘীর পূর্বপাড়ে তার বাড়ীতে ফিরছেন। তখন অমর সাগরের দামের উপর থেকে একটি কম বয়স্ক ছেলের কান্না শুনতে পান। কান্নার উৎস খুঁজে পেয়ে দেখেন ছেলেটি পাড়ের দিকে দাম ছাড়িয়ে আসতে পারছে না। তিনি তখন ছেলেটি কে উদ্ধার করতে পাড়ের উপর উঠে যান। গিয়ে দেখেন একটি বিশাল আকারের অজগর ছেলেটিকে শ্বাসে টেনে নিচ্ছে। ছেলেটির শক্তি নেই, ঐ টান ছাড়িয়ে আসে। তকী চৌধুরীকে পুরনো লোকেরা প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি ষাট পয়ষট্টি সাল পর্যন্তও উদয়পুরেই ছিলেন। বৃহৎ অজগর প্রায় অথর্ব। তকী চৌধুরীর বিশাল দেহকে টেনে নেওয়া সেই অজগরের সাধ্য নয়। তিনি ছেলেটিকে অজগরের কবল থেকে উদ্ধার করেন। ঐ উদ্ধারের সংবাদই " চিনি হা" পত্রিকায় " উদয়পুরের সংবাদ" হিসেবে ছাপা হয়েছিল। এই একটি সংবাদ সেই সময়ের অমর সাগরের ভয়ঙ্করতা, তখনকার সময়ের অবস্থা এবং প্রাচীনত্বের দিশা দেয় । অমর সাগর নিশ্চয় বহুকাল অব্যবহৃত ছিল । না হলে এত দাম জমে? কাজেই সেখানে মাছ শিকারের অবকাশ কোথায়? রোশনরাও ওপথ মাড়াতেন না।

রোশনদের দারিদ্রতা নিয়ে ভাবতে হয়। বড়শী তাদের জীবীকা যন্ত্র। সামান্য এই পুঁজি নিয়ে জীবন চালানোর দুঃসাহস ক'জন দেখাতে পারেন? এই জীবীকা নিরূপায়ের জীবীকা ছিল না। গরুর গাড়ীর মালিক হওয়া একটি চলন সই জীবীকা ছিল। তার স্বজনেরা ঐ ক্ষুদ্র স্বাচ্ছন্দ্যের স্বাদও পেয়েছেন। ঐ জীবীকায় রোশনেরা নিশ্চয়ই আত্মীয়দের সহায়তা পেতেন। কিন্তু এই পরিবার হুইট ম্যানের " ওল্ড ম্যান ইন দ্য সী' র চরিত্র কাঠামোয় জল-মাছ- বড়শীর মমত্বে দারিদ্রতাকে মাখিয়ে নিয়ে এক ভিন্ন স্বাদের জীবনে মগ্ন রইলেন। অন্ততঃ যতদিন উদয়পুরে ছিলেন। ১৯৫৩ / ৫৪ সাল পর্যন্ত।

রোশনারা যেমন উত্তরে তেমনি রব এক ফকিরের ছেলে টিলার দক্ষিণে। আট নয় বছর বয়সের ছিপ ছিপে দোহারা। (ঘোর না হলে কৃষ্ণবর্ণ টিলার এরা থাকত দক্ষিণের অংশে। যার নাম বর্তমান শঙ্কর টিলা, তার উত্তর অংশেই তো ছিলো রোশনেরা, ঐ টিলার ই দক্ষিণ অংশের কথা, সেখানেই থাকতেন রব তার মা ফরিকনী; ফকিরের বৌ অর্থে) বাবার সঙ্গে। তার বাবা নাম মনে নেই, তিনিই ফকির এবং গাজীর দরগার খিদমতদার।

এই গাজীর দরগাই অনুমিত হয় সমসের গাজীর নির্মিত তবে কোন কালেই এই দরগার কাজ সমাপ্ত হয় নি। হাল্কা ইটের সাহায্যে মোটা গাঁথুনির দেয়াল ঘেরা ছোট্ট এক চিলতে জায়গা, গন্ডা পাঁচেক বেষ্টনী বড় জোর এর মধ্যেই দরগা। ফকির ও তার স্ত্রী এর দেখভালে। দরগার ছাউনী ছিল ছনের। বেষ্টনীর বাইরে সামনে অনেকটাই খোলা জায়গা; এখন যেটা উদয়পুরে দলিল লিখকদের ঘর ও পুলিশের ডি. আই. বি অফিস, ঐ চত্বর তখনকার শোনা কথায় দেড় কানি জমি ছিল তাদের সেবা চৌহদ্দী। যে কটা আমগাছ সেখানে এখনো, তখন,

ষাট বছর আগে, ছিল সেখানে আম্র কুঞ্জ। এক সঙ্গে বেশ কিছু আমের চারা। আমরা যখন দেখি, তখন ঐ নূতন আম গাছে সদ্য আম ফলতে শুরু করেছে। তখন থেকেই ঐটি গাজীর দরগা নামে আমরা জানি। কিন্তু সমসের গাজী যদি এর নির্মাতা হবেন তবে অসমাপ্ত অবস্থায় তা কেন রইল এবং সেই ষাট বছর আগেও দৈন্য দশায়? এই দরগার সঙ্গে সমসেরের নাম গবেষকদের অনুমানে। এখানে উৎসবের আয়োজন, তথা বাৎসরিক উৎসবের আড়ম্বর, দূর দূরান্ত থেকে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের উৎসবে অংশ গ্রহণ, এক রাত্রের সমারোহ, মোষ বলির আড়ম্বর বা মানত, অন্যকিছু ঈঙ্গিৎ দেয়।

যাই হোক সেই রবেবাও একদিন উধাও হয়ে গেল। রব সমবয়স্ক হওয়াতে সে ছিল আমাদের খেলার সাথী। যে সকালে আমরা দেখলাম তারা নিরুদ্দেশ। তার আগের বিকেলেও সন্ধ্যা অব্দি রব আমাদের সঙ্গে খেলায় অংশ নিয়েছিল। প্রথমে কেউ বুঝতে পারি নি। সেই বুঝার ইতিহাস আবার অন্য রকম।

ক'দিন আগে থাকতেই একটা রব ছিল যে ফকির পনের দিনের জন্য মাটির তলায়, ছিলায় বসবেন। অর্থি প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে কিছু জানতে চাইলে, বা কোন মনস্কামনা জানালে মাটির তলা থেকেই তিনি তার জবাব দেবেন। দক্ষিণা? খুশী হয়ে যে যা দেবেন, আর তা সংগ্রহ করবে ফকিরের স্ত্রী, রবের মা। তিনি তো আর ভূতল বাসিনী নন। ঐ পক্ষ কাল ফকির সাহেব থাকবেন নিরম্বু উপবাসে। বিশ্বাসীদের মনে ভবিষ্যৎ জানার আগ্রহীর মনের উত্তেজনা তখন তুঙ্গে। এমনিতে ফকির সাহেব তুক্ তাক করতেন। জলপড়া দিতেন। ধর্ম নিষ্ঠার আপ্লুত অমুসলিমরাও সন্ধ্যায় দরগার দরজায় বাইরের বেষ্টনী দেয়ালে মোমবাতি চড়াতেন। ফুল চড়াতেন। ছ'য় সাতটা কাঠ গোলাপের বড় বড় গাছ ঐ চত্বরে ছিল। লোক আসে; প্রশ্ন করে, মনের গোপন কথা জানায়, মাটির তলা থেকে গুরু গম্ভীর গলায় মনোমত উত্তর ভেসে আসে। নিরম্বু উপবাসী ফকির সাহেব, তাজা কণ্ঠস্বর শুনে সকলেই বিস্মিত হয় এ কি করে সম্ভব? এত দীর্ঘ উপবাসের পর?

সমাজে সব কালেই কিছু অবিশ্বাসী থাকে। তারা আড়ালে থেকে দিনে রাতে পাহারার ব্যবস্থা করলেন। একদিন রাতে ফকিরের স্ত্রী এক হাতে ভাত আর ছালনের সানকী গামছায় বাঁধা ; আর অন্য হাতে মোম দিয়াশালাই সহ, খানিক দূরে, গর্তে ঢোকার মুখে অবিশ্বাসীদের হাতে ধরা পড়ে গেলেন। তাদের জীবনে উদয়পুর গাজীর দরগার আবাসে ঐটিই ছিল শেষ রাত কাটানো। ঐ রাতেই তারা পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে যায়।

আমাদের মন বেশ ক'দিন খারাপ ছিল। রব ছিল আমাদের মধ্যে সবচাইতে শারীরিক ভাবে সক্ষম ও দক্ষ খোলোয়াড়। অধিকন্তু গল্প গুজবের অংশীদার। কখনো মনে হত, আমরা তো ছিলাম, ওরা রবকে রেখে গেলেই পারতেন। রবের সঙ্গে সখ্যতা ও মনের নৈকট্যের কারণ ছিল, ১৯৪৮ সাল থেকে ঐ টিলার উপরে দরগার সীমানা ঘেষা, টিলার সবচাইতে উঁচুতে বর্তমান যেটা উদয়পুর মহকুমা শাসকের অফিস, খাদ্য দপ্তরের অফিস ও পারিবারিক আদালত সেখানেই আমরা থাকতাম। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত। শহরের বুকে এই টিলার ভিন্ন ইতিহাস রয়েছে। এর সঙ্গে উদয়পুরের আধুনিকীকরণের সংযোগ। এমন কি নাম করণেরও ভিন্ন ইতিহাস। এই টিলার লোকমুখে নাম ছিল শঙ্কর টিলা। এখন সরকারী নথিতেও ঐ নাম।

তবে ১৯৩০ খ্রীঃ পর্যন্ত এইটি গাজীর টিলা হিসেবেই পরিচিত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। উদয়পুর শহর এক সময়ে নিম্ন জলাভূমি ছিল। বড় বড় দিঘী কেটে এর ভিত উঁচু করা হয়। এর মধ্যে একটি নাতি উচ্চ প্রসস্ত টিলা ভূমি তা তো মনোরম হবেই। এই টিলার উপর থেকে দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তরে সরোবর শোভিত সমভূমি আর পূর্বে দূর নিরীক্ষ্য দেবতা মুড়া দৃশ্যমান ফলে এর চমৎকারিত্ব পূর্বতন রাজবাড়ীর অবস্থানের চাইতেও সুন্দর। নষ্টালজিক রাজারা যারা উদয়পুরের নামেই আপ্লুত তারা, এই টিলার উপর একটি রাজকীয় আবাস করতে চাইবেন তাতে বিস্ময়ের কি! যদিও শহরের পূর্ব - দক্ষিণ কোণে '' ফুল কুমারী কুঞ্জ'' (বর্তমানের পোল্টি সংলগ্ন খাড়া উঁচু টিলা) নামে একটি সুন্দর টিলা রয়েছে কিন্তু এর চূড়া মঠের মতন খাঁড়া তীক্ষ্ণ, ফলে গৃহ নির্মাণের অনুপযুক্ত। যদিও সেখান থেকে ধনী সাগর ও সুখ সাগরের শোভা মনোরম, তবু, নির্মাণ সুবিধার জন্য গাজীর টিলাই রাজাদের পছন্দের তালিকায় ছিল। ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুর বিবরণীতে লিখেছেন '' এই টিলার উপরে রাজ পরিবারের বাসোপযোগী একটি বাড়ী নির্মাণ হইলে সুবিধা হইতে পারে বলিয়া অপর ২ / ৩ স্থানের ন্যায় এ স্থানও তজ্জন্য মনোনীত হইয়াছে।'' এই নিয়ে শহরের চৌহদ্দী দাঁড়াল, গাজীর টিলা (শঙ্কর টিলা) থেকে উদয়পুরের বর্তমান বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন ছনবনের প্রারম্ভিক প্রান্ত; পূর্ব বাজার থেকে জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়। এক সময়ে কি করে রাজকীয় শ্যান দৃষ্টিকে আড়াল করে এই টিলার বৃহদাংশ তখন শহরের লব্ধ প্রতিষ্ঠিত উকিল প্রয়াত শ্যামা শঙ্কর ঘোষ নিজের নামে খরিদ করে নেন। তা হলে উদয়পুরে বাসস্থানের নির্মাণ চিন্তা রাজারা পরিত্যাগ করেছিলেন। তা না হলে রাজ আমলে শ্যামা শঙ্কর বাবু এই টিলার মালিকানা পেতেন না।

আসলে তার অব্যবহিত পরে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকেই ত্রিপুরার রাজনীতির দ্বিতীয় আবর্ত তৈরী হয়। ১৯০২ খ্রীঃ অনুশীলন সমিতির লোকেরা ত্রিপুরায় প্রবেশ করতে শুরু করে। ১৯২৫ / ২৬ থেকে বৃটিশ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই রাজ্যেও মাটির সন্ধানে রত হয়। ১৯৩০ -৩৩ খ্রীঃ থেকে ওরা ত্রিপুরার মাটিতে পা ফেলার জায়গা খুঁজে পেলেন। ইত্যাকার ঘটনা খুব ধীরে হলেও রাজ্যের প্রজাদের প্রভাবিত করতে থাকে। সম্ভবতঃ পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে রাজারা ঐ বিলাস পরিত্যাগ করেন। যদিও তার পরে রুদ্র সাগরে নীর মহল নির্মিত হয়েছিল। তবে রাজ পরিবারের চিন্তা থেকে গাজীর টিলা মুছে যাওয়াতেই এই গাজীর টিলা ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে গেল। তিন চার জনের মালিকানা। বৃহৎ অংশ কিনে নিলেন শ্যামা শঙ্কর ঘোষ। অপর অংশ কিনলেন বকুল চৌধুরী (তিনি ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বপ্রথম, সরকারী দন্ত চিকিৎসক)। ছোট একটি অংশ এখন যেখানে হাসপাতালের লাস ঘর এবং এর নীচের সরকারী রাস্তা, তার মালিক হন যোগেন্দ্র দাস।

১৯৪৭ সালে শ্যামা শঙ্কর ঘোষ তার অংশ বেচে দেন। তার অংশ কিনে নেয় তারক ভৌমিক ও চন্দ্রমোহন ধর। হাসপাতালের পুরনো অংশের পর ডাক্তারদের কোয়ার্টাস পর্যন্ত অংশ ছিল তারক বাবুর। তারপর দক্ষিণের পুরো অংশের মালিক হন চন্দ্রমোহন। মূল হাসপাতালটির জমি সর্বশেষ বেসরকারী মালিক ছিলেন বকুল চৌধুরীরা। ১৯৫৫ সনে সরকার পুরো শঙ্কর টিলাই অধিগ্রহণ করে হাসপাতাল ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ শুরু করে।

টিলার পূর্ব দিকে রাজ কুমারী ফুলকুমারীর স্মৃতি বিজড়িত ফুলটুঙ্গী ও শ্যামা শঙ্কর

ঘোষের মালিকানায় চলে যায়। তার কাছ থেকে কিনে নেয় আসলাম দেববর্মা, নিকট অতীতে তার মেয়ের জামাই-এর হাত হয়ে হস্তান্তরিত হয়ে ফুলটুঙ্গী নূতন মালিকের হাতে তিন চতুর্থাংশ ভরাট হয়ে প্লটে বিক্রী হয়ে বাড়ী ঘর উঠে গেছে। একে সংরক্ষণের জন্য সরকারও উদ্যোগ নেয় নি। এখন গভীর জলের বিশাল নির্মলতা উধাও হয়ে এটি মধ্য বিত্তের বস্তি।

দুটি জোঁক ও যামিনী ডাক্তার

স্তন চূড়া ইবঃ। উদয়পুর শহরের বুকে তাদৃশ এক মালভূমি। পূর্বাশ্রম গাজীর টিলা। চারের দশকের শেষ থেকে শঙ্কর টিলা এখন জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্র। এই টিলা সম্পর্কে সাতকাহন এই জন্যে যে ১৯০১ খ্রীঃ থেকে, উদয়পুর যখন বিভাগীয় প্রশাসন কেন্দ্রে রূপান্তরিত হয়, তখনো এর কোন গুরুত্ব ছিল না, কিন্তু ১৯৫৪ / ৫৫ সালে এসে হঠাৎ ই তার গুরুত্ব বেড়ে যায়। এই গুরুত্বের কারণেই এর উল্লেখ। এর সঙ্গে উদয়পুর শহরের আধুনিকীরণের সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৬০ সালে লক্ষণমাণিক্যের পৃষ্ঠপোষকতায় সমসের গাজীর উৎপাত মহারাজ কৃষ্ণমনি (কৃষ্ণ মাণিক্য) ১১৭৫ বছরের রাজধানী চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করে আগরতলায় স্থানান্তরিত করেন। দীর্ঘ বছর পর ১৯০১ খ্রীঃ উদয়পুর বিভাগের প্রশাসন কেন্দ্র করে দীর্ঘ অবহেলার উদয়পুর ফের পাদ প্রদীপের তলায় আসে। এর আগে মহারাজ কাশীমাণিক্য অবশ্য রাজধানী উদয়পুরে পুনরায় নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কিন্তু তা কার্যকরী হয় নি। এখন, ১৯৫৪ -৫৫ সালে এই শঙ্কর টিলা, পূর্বতন গাজীর টিলাকে কেন্দ্র করে উদয়পুর শহরের মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা চলতে থাকে। এখানেই এই টিলার গুরুত্ব।

১৭৬০ খ্রীঃ কৃষ্ণমনি (কৃষ্ণমাণিক্য) উদয়পুর থেকে রাজধানী তুলে নেওয়ায় রাজ আনুকূল্য বন্ধ হয়ে যায়, উদয়পুর অবহেলার শিকার হয়। অনেকেই সমতল ত্রিপুরায় চলে যান। কেউ দুই নৌকায় পা রাখেন। কুমিল্লা ও উদয়পুরে। উদয়পুর বাড়তি উপার্জনের উপায়। ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজারীরা তখন কুমিল্লার উপকণ্ঠে বাড়ী নির্মাণ করেন। কুমিল্লা হল তাদের পরিবারের নিরাপদ ও শহুরে জীবন আর উদয়পুর হল উপার্জনের উপায়, কারোর কারোর বাড়তি উপার্জন। জীবীকার আশায় উকিল মুক্তাররা উদয়পুরে যাতায়াত শুরু করেন। তাদের এক পা রইল কুমিল্লায়, ঢাকায়। অনেকটা বাঙলা মুলুক থেকে রোজগারের চেষ্টায় পশ্চিম ভারতে পাড়ি দেওয়ার মতন। এরা পূর্ব মুখী হলেন।

অফিস আদালত বসে গেল ৫০০ বর্গ মিটার জমিতে। জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড় হল প্রশাসন কেন্দ্র। খানিকটা দক্ষিণে হেঁটে তহশীল আর থানা। থানার হাতাতেই রাজার প্রতিষ্ঠা হল। উকিল বাবুরা জায়গা নিলেন দিঘীর পূর্ব পাড়ে। বড় হাকিম ছোট হাকিম উত্তর পাড়েই থিতু হলেন। উত্তর পাড়ের কোণ ঘেঁষে পশ্চিম পাড়ে সামান্য গেলে রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য, খাদাঞ্চীর বাড়ী। শরদিন্দুর ভাষায় " ইহাই শহরের ভদ্র পল্লী।"

উদয়পুরে তখনো পাকা রাস্তার দেখা নেই, প্রায় গোটা রাজ্যেই নেই। জগন্নাথ দিঘীর চার পাড় থানার সম্মুখ থেকে বর্তমান নিউটাউন রোড, বর্তমান সেন্ট্রালরোড, পূর্ব উল্লিখিত চন্দ্রাবলী মিশ্রের বাড়ীর পাশ দিয়ে বর্তমান ডি. এম. এর বাংলোর নীচ থেকে ডাক বাংলো রোড আর উদয়পুর সাব্রুম রোডের অন্তবর্তী অংশে যে রাস্তা বর্তমানে পশু চিকিৎসালয়ের সামনে উদয়পুর সাব্রুম রোডে মিশেছে শহর থেকে বেরিয়ে দক্ষিণে সে মাতাবাড়ীই হোক বা কর্তার বাজার, বিলোনীয়া সাব্রুম যাওয়াই হোক বেরিয়ে যাওয়ার এক মাত্র রাস্তা সর্বই পুরো বালুর আস্তরণে ঢাকা। শহর চৌহদ্দীর রাস্তায় সর্বত্রই বালুর রং ছিল সাদা। শরৎ জ্যোৎস্নায় শহরের এ সব পথের মায়াবী আকর্ষণ ছিল। সব চাইতে প্রশস্ত পথ ছিল বর্তমান সেন্ট্রাল রোড, চল্লিশ হাত চওড়া। পল ভাইদের গাড়ী, সকালে উদয়পুর থেকে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে আর সন্ধ্যায় কুমিল্লা থেকে উদয়পুর শহরে, এই পথেই এসে মোটর স্ট্যান্ড পৌছাত। গাড়ীগুলির রাতের আশ্রয় ছিল বর্তমান সুপার

মার্কেটের সামনে। ১৯৫৫ সালে এটিই সরকারি নটিফিকেশনে স্থায়ী মোটর স্ট্যান্ড হয়ে যায়। পরে বহু আইনী ও রাজনৈতিক যুদ্ধের পর বামফ্রন্ট সরকার রাজারবাগে বর্তমান জায়গায় স্ট্যান্ড স্থানান্তরিত করে। সব চাইতে আকর্ষক রাস্তা ছিল শহরে ঐটিই। সবচাইতে প্রশস্ত ও চল্লিশ হাত অন্ততঃ ছয় ইঞ্চি সাদা বালুর আস্তরণ মাঝখানে সবুজে হলুদে মাঝামাঝি ঈষৎ লম্বা ঘাসের গুচ্ছের দীর্ঘ সারি। বর্তমানের চকবাজারের কোণ থেকে দক্ষিণে চোখ ফেরালে বাধাহীন চোখ চলে যেত মহাদেব বাড়ী ছাড়িয়ে। রাস্তার দু'পাশ্যে ব্যবসায়িক কেন্দ্র এবং ব্যবসায়ীদের অপেক্ষাকৃত শক্ত পোক্ত, সুদৃশ্য চৌচালা টিনের ঘর সমূহ। জ্যোৎস্নায় জনবিরল ঐ পথ, তখন আমরা যারা দেখেছি তা এই জীবনের ওপ্রান্তেও আমাদের মনে তা নষ্টালজিক আবহ তৈরী করে। তখনো এই গান রচিত হয়নি " মায়ারী চাঁদের সনে, চামেলী খেলিছে বনে, এ জীবনে কোন কিছু নাহি ভুলিবার।" গাঢ় নীচের মসৃণতা ও দুই পাশে গজিয়ে উঠা সুদৃশ্য মহার্ঘ্য হর্ম রাজি ও ধনীর বিত্ত প্রদর্শনী ও কিন্তু ষাট বছর আগের ঐসব জ্যোৎস্না রাতের মায়াবী হাত ছানি আমাদের ভুলতে দেয় নি। অতি তুচ্ছ, কিন্তু এটাই চিরন্তন যে এ জীবনে কোন কিছু ভুলবার নয়। আমরাও ভুলিনি। ভুলতে পারিনি। জ্যোৎস্নারাতে অমলধবল পালে এক ঈশ্বরীয় আবহাওয়া খেলে বেড়াত শহর-চৌহদ্দীর সবকটি রাস্তায়। এর থেকে জ্যোৎস্নায় মরুভূমির রূপ বুঝবার চেষ্টা করতাম। মরুভূমি তখন পাঠ্য বইয়ে!

বালুর এই আস্তরণ একদিন ঢেকে গেল জল-কাদা মাখানো সুড়কী আর পীচের আস্তরণের নীচে। তখন উদয়পুরের প্রসব যন্ত্রণা। পুনঃজন্মের তাড়না। গর্ভ সঞ্চার তারো আগে। ১৯৫৬ সালে তৎকালীন ত্রিপুরার চীফ কমিশনার, তাঁর স্ত্রী ললিতা, উদয়পুরে এলেন। উদয়পুর মহকুমা হাসপাতালের দুয়ার আম জনতার জন্যে খুলে দিলেন। টানা লম্বা, পেছনে লম্বা বারান্দা যুক্ত উপরে টিনের চাল, হাসপাতাল গৃহ। হাবুল ব্যানার্জী নামে এক ঠিকাদার এর নির্মাণ কাজের বরাত পেয়েছিলেন। নারকেল ভাঙা হল, ফিতা কাটা হল, আমজনতা সংখ্যায় খুবই কম, তখন ১৯৫৬ সালে; উদয়পুর শহরে লোক সংখ্যাই বা কত, হাততালি দিল। এর মধ্যেই সাধারণ বেড দুটি, প্রসূতি বিভাগ আর আউটডোরের জায়গা হল।

এ হল উন্নতির বা নবরূপায়ণের তৃতীয় সরকারী পদক্ষেপ। মহকুমা অফিস তখনো ঢাউস চৌচালা টিনের ঘরে জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ে। শঙ্কর টিলায়, পাকা ঘর তৈরী হয় নি। নির্মাণ কাজের হদিসও নেই। জগন্নাথ দিঘীর পাড়ের ঐ প্রশাসন গৃহেও স্কুল ফেরৎ কতিপয় কৌতূহলী আমরা ঢুকে যেতাম। হাকিমের মাথার উপর রঙিন কাপড়ের হাতে টানা পাঙ্খা দেখার জন্যে। আর সম্ভ্রমে তাকিয়ে থাকতাম, বেড়ার ওপাশে টুলে বসা উর্দ্দী গায়ে " পাঙ্খা পুলারের" দিকে। হাকিমের মাথায় যে " হিমানী কেশ তৈল" বাতাসের বায়বীয়তায় যোগান দিয়ে চলেছে যাতে তাঁর শীতল মস্তিষ্ক সরকারের কাজ যথাযথ করতে পারে। দুইয়ের মাঝখানে হাকিমবাবু আর পাঙ্খা পুলারের মাঝে একটি বেড়া, সম্ভবত হাকিমের একক অভিজাত্য যেন ভাগ না বসায়। ঐ বেড়ার ফাঁক গলিয়ে লম্বা দড়ি যার এক মাথা কুচি মারা লম্বা রঙিন কাপড়ের পাখায় আর অপর প্রান্ত বেড়ার ওপারে পাঙ্খা পুলারের হাতে।

তবে এ মহার্ঘ হলেও তা ছিল আমাদের বাড়তি পাওনা। এই পথে স্কুল ফেরৎ হওয়ার মুল আকর্ষণ ছিল ফিরতি পথ যতটা সম্ভব দীর্ঘ করা, বন্ধুদের সান্নিধ্যের সময় বাড়িয়ে নেওয়া, জগন্নাথ দিঘীর সৌন্দর্য দেখা, পশ্চিম পাড়ের বৈকালিক ছায়া উপভোগ করা, এবং অবশ্যই দিঘীর উত্তরপাড়ে, দক্ষিণ পাড় থেকে আসা ঢেউ যে সৃষ্ট রাশি রাশি সাদা ফেনায় হাত গলানো। তার

স্পর্শ পাওয়া। জলের গভীরতা কমে যাওয়ায় জগন্নাথ দিঘীতে ফাল্গুন চৈত্রে এখন আর তেমন ঢেউ ওঠে না। ঢেউ ভেঙে ফেনারও সৃষ্টি হয় না। অনেক বিলুপ্তির মধ্যে এটিও একটি। দক্ষিণা বাতাস কিন্তু বয়!

জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ে, হরি মন্দির পেরিয়ে বর্তমানে যে ক্ষুদ্র সেচ দপ্তরের অফিস, সেখানে, ছোট্ট এক চৌচালা জগন্নাথ দিঘীর দিকে মুখ করা বারান্দা যুক্ত টিনের ঘরে এর আগে হাসপাতাল ছিল। আমরা ছোট সময়ে যামিনী সরকারকে (প্রাক্তন জেলা জজ প্রদীপ সরকারের বাবা) ঐ হাসপাতালে ডাক্তার দেখেছি। খোলা বারান্দায় বিভিন্ন বড় কাঁচের পাত্রে রঙিন তরল ঔষধের সাজানো শৃঙ্খলা সেখানে দেখেছি। এবং একবার যামিনী বাবুর, অদ্ভুত চিকিৎসাও আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

উদয়পুর থেকে গাড়ী চলাচল কুমিল্লা পর্যন্ত তখনো চালু আছে। একদিন ভাঙারা পাড়ে কুমিল্লাগামী বর্তমান রমেশ স্কুলের পরের বাঁক) একটি গাড়ী দুর্ঘটনায় পড়ে। ঐ গাড়ীতে রাধা কিশোরপুর থানার দারোগা ফনী সেন আর তার সহগামী কনেস্টবল ফনী সিং-ছিলেন। গাড়ী ধান ক্ষেত কাত হয়ে পড়েছিল। কনষ্টবল ফনী সিং গাড়ীর তলায় চাপা পড়েন। বেঁটে খাটো; কিন্তু সবল, গাট্টাগোট্টা। গাড়ীর তলা থেকে যখন তাকে উদ্ধার করা হল তখন সে অজ্ঞান, মৃত প্রায়। দুই চোখের চার দিকে রক্ত জমে ঢোল। কেবল শ্বাস প্রশ্বাস তখনো চলছে। তাকে হাসপাতালের বারান্দায় শুইয়ে রাখা হল। শহরে রটে গেল এবং গাড়ীর সবচাইতে মর্যাদাবান দুই সওয়ারীর একজন দারোগা ফনী অক্ষত রয়েছেন। কিন্তু কনেস্টবল ফনী মরেই গেছে। কিন্তু মরার খবর সত্যি নয়। যামিনী বাবু দেখলেন, তার সবল দেহ সব চোট সামলালেও কিন্তু চোখের কোলে ইস্তক কপাল পর্যন্ত জমে যাওয়া রক্তই বিপজ্জনক। এই রক্ত সরাতে হবে। অস্ত্রোপচারের উপকরণ নেই। হয় তো ছুরি কাচিতে তিনি অপারগ, ফলে তিনি নিজস্ব উদ্ভাবনী নিয়ে মাতলেন। সুখ সাগর জলা থেকে বড় জোঁক দুটি ধবে আনা হল। জোঁক দুটিকে ফনী পুলিশের জমে যাওয়া রক্ত এলাকায় কপালে বসিয়ে দেওয়া হল। পরদিন স্কুলে যাওযার পথে আমাদের নজরে এল ভীম সদৃশ ফনী পুলিশকে হাসপাতালের বাবান্দায় শুইয়ে রাখা হয়েছিল। মৃত্যু বা রোগীর ব্যাপারে আমাদের কোন কৌতূহল তখনো জন্মায়নি। তবে ফনী পুলিশের দেহের বড় নিয়ে আমাদের কৌতূহল ছিল। বারান্দায় পাকা ভিটেয় পা রেখে, রেলিং ধরে উঁকি মেরে ফনী পুলিশ ও দুই জোঁকের মাখামাখি আমরা বেশ উপভোগ করলাম। পরের তিন দিন স্কুল থেকে ফেরার পথও আমাদের পাল্টে গেল। তিন দিন পর্যন্ত ফনী পুলিশ অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে বারান্দাতেই পড়েছিলেন। এক প্রস্থ জোঁকের রক্ত খেয়ে যখন পেট পুরে যেত তখন নূতন এক জোড়া তার চোখের তলায় কপালে বসিয়ে দেওয়া হত। ফনী সিং বেঁচে গেলেন। এক সময়ে তার পূর্ব বিবাহিত স্ত্রীকে তাড়িয়ে দিয়ে বর্তমান জেলা শাসকের অফিসের সামনে যে অবাঙালী বাড়ীতে ভাড়া থাকতেন বাড়ীর এক জনকে নিকাহ্ করে বেঁচে থাকার প্রমাণও দিলেন। তিন দিনের শর শয্যায় ফনী সিং (মণিপুরের লোক ছিলেন) আমাদের মনে দাগ কেটেছিল। যামিনী ডাক্তারের অভিনব শল্য চিকিৎসার বিকল্প ও আর সারা জীবনে দেখিনি। অবশ্য এতদিনে হাসপাতালেরও কাঁচা ঘর থেকে পাকা ঘরে বন্ধনমুক্তি ঘটে। আরও বড় ঘরে হাসপাতাল এলো, বড় ডাক্তারারাও (এম. বি. / এম. বি. বি. এস) হাসপাতাল আলো করে বসতে থাকেন। পরের উন্নত পরিসেবায় ফনী সিং-এর দুটি চোখই রক্ষা করা যেত কিনা কে জানে। যামিনী ডাক্তার ছুরি কাঁচি ছাড়াই জলৌকার সাহায্যে ফনী সিং-এর জীবন অক্ষত রাখতে জলবৎ চিকিৎসায় জীবন ও চোখ দুইই অক্ষত রেখেছিলেন।

বিহঙ্গ মুক্ত

বিপিন দত্ত হাকিমই মহকুমা প্রশাসক হিসেবে মুখ্য ভূমিকায় নামলেন। ১৯৫৪ সালেই তৎপরতা শুরু হল। ভূম্যাধিকারীদের উৎখাতে কত নম্বর নোটিশের প্রয়োজন হয়েছিল, তখন তা জানার বয়স নয়। একদিন দেখা গেল অভিভাবকদের বিকল্প বাসস্থানের জন্য বিকল্প জমি সংগ্রহের তোড়জোড়। শঙ্কর টিলা ছাড়তে হচ্ছে। বকুল ডাক্তারদের জায়গায় যেখানে রোশন আলী, মুর্কী মিঞা, আজিজ মিঞারা আর খাউল্লার বাপেরা থাকছেন। তারা তাদের বাড়ী ঘর ভাঙছে। এরা মাসিক খাজনার বিনিময়ে (এই ধরণের জমি ভাড়া দেওয়া নেওয়ার প্রথা উদয়পুরে চালু ছিল) বকুল ডাক্তারদের জায়গায় থাকতেন। সেখানে হাসপাতাল তৈরীর কাজ শুরু হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, শ্রমিকদের অস্থায়ী ছাউনী তৈরী হয়েছে। মাঝে মধ্যে এক দীর্ঘ দেহী, বিশালাকায় এক ব্যক্তিকে কাজের তদারকীতে দেখতাম। ঐ দীর্ঘ দেহ ভয়ের ছিল বলে তিনি ছিলেন দূর নিরীক্ষ্য। পরে জেনেছি তার নাম হাবুল ব্যানার্জী। আগে কুমিল্লায় থাকতেন। আরো বড় হয়ে জেনেছি এই হাবুল ব্যানার্জী ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর বড় ভাই ডাক্তার নন্দ চক্রবর্তীর বড় মেয়ের জামাই। হাকিম বিপিন দত্ত আর ঠিকাদার হাবুল ব্যানার্জীর যুগলবন্দীতে উদয়পুরেরর তৃতীয় পর্যায়ের আধুনিক উত্তরণ শুরু হল। ৫৯০ খ্রীঃ জুঝার ফা রাঙামাটি (উদয়পুর) দখল করে প্রথম নবযাত্রার সূচনা করেছিলেন। দ্বিতীয় বাঁকে পৌছায় ১৯০১ খ্রীঃ পরিত্যক্ত রাজধানী উদয়পুরকে বিভাগীয় প্রশাসন কেন্দ্র নির্বাচন করে। বিপিন দত্তের হাত দিয়ে শুরু হল তৃতীয় পর্যায়।

তারক ভৌমিকের জায়গায় থাকতেন তার ছোটভাই যজ্ঞেশ্বর ভৌমিকের পরিবার। তারক বাবুর দ্বিতীয় ছেলে হরিপদ ভৌমিক (এখনো বেঁচে, আগরতলা জয়নগরে উপেন্দ্র বিদ্যাভবনের কাছে থাকেন)। তাঁরাও পালগুটালেন। ১৯৫৬ সালের শুরুতে টিলায় আরো একটি একতলা পাকা বাড়ী তৈরী হল (তখনকার আগরতলার এক ঠিকাদার জনৈক দেবনাথ, পুরো নাম মনে নেই)। ঐ দালানেই উদয়পুরে সর্বপ্রথম ষ্টেট ব্যাঙ্ক কাজ শুরু করে। উদয়পুর জেলা সদর হওয়ার পর দীর্ঘদিন এটি ছিল ট্রেজারী বিল্ডিং। এখন অন্য কিছু। তখনো দু'একটি পরিবার শঙ্কর টিলায়। এর কিছু দিন পরে ওরাও শঙ্কর টিলার বন্ধন মুক্ত হলেন। টিলা ছেড়ে সমতলে নামলেন। রাজন্যযুগে রাজ বিলাস পূর্ণ না হলেও গণতন্ত্রে চারশত টাকা কানিদরে গণ ইচ্ছাকে সরকার কিনে নিয়ে নাগরিকদের পথে নামিয়ে দিল। এর মধ্যেই হাকিম সাহেব সদলবলে গোমতী আর জগন্নাথেব (দিঘীর) মায়া কাটিয়ে শহরের দক্ষিণ অংশের নাতি উচ্চ মালভূমিতে উঠে বলেন। নব যুগ আনলেন। অন্ততঃ সূচনা করলেন। এবপর দ্রুত শুরু হল শহর সম্প্রসারণের কাজ। প্রশসনের তখন পাখা বিস্তার ঘটছে। নগরালয়, পূর্তদপ্তর, বনদপ্তর, পশু চিকিৎসালয়, খাদ্য গুদাম, জেলখানা, নাগরিক শাসনের যাবতীয় অস্ত্র তূনে জুড়ে দেওয়া শুরু হল। এবার শঙ্কর টিলার ছোট্ট চৌহদ্দীকে প্রশাসনের পক্ষ বিস্তারে অপ্রতুল বিবেচিত হল। ফলে সরকারের শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য জায়গা চাই, আরো জায়গা চাই। কাছেই ধনী সাগরের উত্তর পশ্চিম কোণ ধরে ফুলকুমারীর দিকে শুরু হল সরকারের ভূমি আগ্রাসন

পরিকল্পনা।

ঐ কোণটাই, বেছে নেওয়া হল জেলখানার জন্যে। পূর্বে ধনী সাগর, সামনে পশ্চিমে অমর সাগর, পশ্চিম দক্ষিণে সুখ সাগর। দারুণ সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর জায়গা। সংশোধনগারের আবাসিকদের জন্য এটাই তো আদর্শ জায়গা। জমির মালিক উপেন্দ্র চন্দ। তার দশকানি জায়গা সরকার নিয়ে নিল। ১৯৭১ সালে এই জেলখানার দেয়াল টপকেই নক্সাল নেতা সুব্রত বল ধনী সাগরের উত্তর পাড় দিয়ে বদর মোকাম খেয়া ঘাট পেরিয়ে একেবারে বাংলাদেশে আত্মগোপন করেন। সুব্রত ঢাকা জেলে বসে একটি মূল্যবান বই লিখেছিলেন " উপমহাদেশ সমকালীন সমস্যাবলী" আরেক সুব্রত চক্রবর্তী মারফৎ তার এক কপি আমাকে পাঠিয়েছিলেন।

জেলখানা উদয়পুর মাতাবাড়ী রাস্তা থেকে ৩ / ৪ শত গজ পূর্বে [illegible] দু' বিঘার' জমিদারের মতো দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান করতে, আসলে মূল রাস্তা পর্যন্ত [illegible] নিরুপদ্রপ রাখতে সামনের জায়গাটাও সরকারের প্রয়োজন হল অর্থাৎ উপে[illegible] বাগানটি চাই। বাস্তবেও বর্তমানে চিফ কনজারভেটর অব ফরেষ্ট ও ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসের জায়গাটি উপেনের (উপেন্দ্র চন্দ) ছোট ভাই নগেন্দ্র চন্দর ছিল। তিনি জায়গা ছাড়তে অস্বীকার করায় দত্ত হাকিমের হাতী একদিন তার বাড়ী ঘর ভেঙ্গে দিল। সরকারী পেয়াদারা বাড়ীর জিনিষ পত্র লোকজন সহ সকলই রাস্তায় ছুড়ে দিল। তখনকার কম শিক্ষিত কম জানা, রাজ অনুগত প্রজারা রাষ্ট্রের আসল শক্তি মালুম করল। সরকারী হাতী দিয়ে প্রজার ঘর ভাঙা সেই প্রথম, সেটা ১৯৫৫ সন।

দ্রুততার সঙ্গে সরকার উদয়পুরের আধুনিকীকরণে কোমর বাঁধলেন। নগেন্দ্র চন্দের বাড়ীতে হাতীকে চড়াও করিয়ে নাগরিক প্রতিরোধের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে দেওয়া হল। হাতী নাগরিকদের কাছ থেকে নাগরিক আনুগত্য বিনাশুল্কে ক্রয় করেছিল। সরকার এবার আরো দক্ষিণমুখী হলেন। ভগবান দে, হরেন্দ্র দে দুই ভাইয়ের ধান জমি, যেখানে বর্তমানে পশু হাসপাতাল, পশুকল্যাণ দপ্তরের জেলান্তরের কার্যালয় এবং কর্মীদের সরকারী কোয়ার্টার্স, অনায়াসে এই বিশাল ভূখন্ডে সরকার পা রাখলেন। আর ধনী সাগরের উত্তর পাড়ের অর্দ্ধেকেরও বেশী অধীগৃহীত হয়ে গেল। ১৯৫৪ থেকে ১৯৫৭ সালের মধ্যেই বহু সংখ্যক নাগরিকের জোত জমি সরকারের অনুকূলে দখল হল, যৎকিঞ্চিত বিনিময় মূল্যে। এপর্যন্ত আর কোন বাধা এলো না। বাধা এল ১৯৬১-৬২ সালে সনাতন দে'র (নিশি মহারাজের ঠাকুদা) ছোট ছেলে বিলেত ফেরৎ বার এ্যট -ল নারায়ণ দে'র কাছ থেকে। মানিক গাঙ্গুলী তখন উদয়পুরে মহকুমা শাসক। তার সঙ্গেই জমি অধিগ্রহণ নিয়ে নারায়ণ দে র সংঘাত বাঁধে। হাকিমের হুকুম অকেজো হয়ে গেল বার এ্যাট -ল এর তর্জনীতে। ব্রহ্মাবাড়ীর সামনে উদয়পুর সাব্রুম রাস্তার প্রসার সেই থেকে এখনো এক জায়গায় থমকে। এমনকী আম গাছগুলিও একই জায়গায় মুক্ত বাতাসে অক্সিজেন নিচ্ছে। কোন্ আইনী প্যাঁচে মানিক গাঙ্গুলীর মতন দুঁদে হাকিম হাত গুটালেন তা এখনো বিস্ময়ের।

ঐ একই সময়ে অমর সাগরের পাড়ের বেশ খানিকটা জায়গা বর্তমানের ডি. এম.-এর সরকারী আবাস থেকে দক্ষিণে মুন্সেফের সরকারী আবাস পর্যন্ত, সরকার অধিগ্রহণ করে নেয়। ঐ জায়গা বহুবার হস্তান্তরিত হয়েছে। সনাতন দের হাত থেকে ১২৭ টাকায় বিংশ

শতাব্দীর গোড়ায় কিনে নেন চন্দ্রাবলী মিশ্র, তিনি ছোট প্লটে বিক্রী করেন কিছু লোককে। তারপরে সরকার নিয়ে নেয়। অমর সাগরের পূর্ব পাড়েই এখন শহরের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। জেলা জজ, জেলা শাসক অতিরিক্ত জেলাশাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনীয়ার ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার, মুন্সেফ, মহকুমা পুলিশ অফিসার সহ জেলা প্রশাসনের পদস্থ আধিকারিকদের আবাসিক এলাকা এটি এবং সার্কিট হাউসও।

ঐ জায়গা অধিগ্রহণের পাশাপাশি জেলখানা, মধুর সম্বোধনে সংশোধনাগার এর লাগোয়া আইন দপ্তরের জন্য জায়গাটিও অধিগ্রহণ করা হয়। হরেন্দ্র নন্দীর জায়গায় মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ও অধীনস্থ ন্যায়ালয়গুলি। সংলগ্ন নাতি উচ্চ টিলার উপরে যে জেলা জজের আদালত ঐ টিলাভূমি অধিগ্রহণ করা হয় অনঙ্গ চৌধুরী নামে এক ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের কাছ থেকে। অনঙ্গ বাবুর জমি অধিগৃহীত হয় সামান্য পরে।

এই বিশাল চৌহদ্দীর মধ্যে সব চাইতে আগে অধিগৃহীত হয়েছিল শঙ্কর টিলা। তখনও শহর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার রাস্তা শঙ্কর টিলার পাশ দিয়ে হয় নি। পথ ছিল চন্দ্রাবলী মিশ্রর বাড়ীর সামনে দিয়ে বর্তমান গোমতী রেষ্ট হাউসের পাশ দিয়ে যে ডাক বাংলা রোড এই পথ দিয়ে এগিয়ে জেলা জজের সরকারী আবাসের তিন রাস্তার মোড় থেকে ডাক বাংলা রোড আর উদয়পুর সাব্রুম রাস্তার মাঝ বরাবর যে বর্তমানের সরু রাস্তাটি একটু দক্ষিণে গিয়েই উদয়পুর সাব্রুম রাস্তায় মিশেছে ঐটি। শঙ্কর টিলা অধিগ্রহণের পর টিলার ধার ঘেঁষে টিলা কেটে রাস্তা তৈরী হল। বন দপ্তরের পাশ দিয়ে তা বর্তমান প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের সামনে উদয়পুর সাব্রুম রাস্তায় মিশিয়ে দেওয়া হয়।

এই নূতন পথ আরেকটি অধিগ্রহণের পথ খুলে দেয়। বর্তমান পূর্ত দপ্তরের যে কমপ্লেক্স সেখানে বেশ ক'ঘর কুমোর পরিবার থাকতেন। ঐ জমি ছিল চন্দ্রাবলী মিশ্রের, পরিবারগুলি মাসিক খাজনার বিনিময়ে সেখানে থাকত। এদের তুলে দিয়ে ঐ জায়গার দখল নিল পূর্ত দপ্তর। ওরা অমর সাগরের দক্ষিণ পাড়ে চলে গেল। সব কটি পরিবার স্থায়ীভাবে ওখানেই গুচ্ছ পাড়া তৈরী করেছে। জাতিগত বৃত্তিতে নেই। শিক্ষক, কেরানী, অফিস কর্মী, কৃষিজীবী হিসেবে ওরা নূতন জীবিকা বেছে নিয়েছেন।

পূর্ত দপ্তর মানেই হল সরকারী নির্মাণ, সে সড়ক ই হোক আর অফিস বাড়ী সুতরাং ইট চাই। রাস্তায় বিছানো বা পাকাবাড়ী সবার জন্যেই ইট। উদয়পুরে ইট তৈরী হয় না। কারণ ইটের প্রয়োজনই হয় নি। যাদের প্রয়োজন হত তারা কারিগর এনে ছোট ছোট ইটের পাঁজায় কাঠ দিয়ে পুড়িয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় ইট তৈরী করে নিতেন। তখনো তেমন প্রয়োজন কারোর হয় নি। ১৯৫৫ সালে এক ব্যবসায়ী জনৈক লাল মোহন সাহা (বহুকাল আগে প্রয়াত) তিনি বর্তমান নিউটাউন রোডস্থ বসত বাড়ীতে, ব্যক্তিগতভাবে দালান নির্মাণ করেন। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ঐটিই বিংশ শতাব্দীর উদয়পুরে প্রথম পাকাবাড়ী। লাল মোহন বাবুর বড় ছেলে সুনীল আমার সহপাঠী ছিলেন। তার সুবাদে, আমি এক রাত্রি বাসে ঐ দালানের উষ্ণতা পেয়েছিলাম।

এবার তো সরকারী চাহিদা। পূর্ত দপ্তর ঐ উদ্যোগ নিল না। গণেশ সিং-উদয়পুরে সর্বপ্রথম বন দুয়ারে বর্তমান কুঞ্জবন গাঁও সভায় ইট ভাট্টা দিলেন। ঐ ভাট্টা গণেশ সিংরা পরে

যখন ত্রিপুরা রাজ্য ছেড়ে চলে যান তখন, রমেন্দ্র রায় (রাম বাবু, উদয়পুরের ষ্টেট ব্যাঙ্ক তারই পাকা দ্বিতল দালানে) কিনে নেন। তার ছেলেরা এখন ঐ ব্যবসা চালাচ্ছেন। দেশী পদ্ধতিতে পোড়ানো ইট গুণমানে ভাল হয় না, কয়লায় পোড়ানো ইটের গুণমান ভাল ঐ ধারণা থেকে, কয়লা সরবরাহের দায়িত্ব নিল পূর্ত দপ্তর। কয়লা ট্রাক বোঝাই হয়ে এলো। কোথায় রাখা হবে? এবার জায়গার সন্ধান। পূর্ত দপ্তরের কাছেই জায়গা দপ্তর খুঁজে নিল। পূর্ত দপ্তরের সম্মুখ থেকে শঙ্কর টিলা আর আদালত টিলার মাঝখান দিয়ে যে রাস্তা বর্তমানে বদর মোকামে গিয়ে মিশেছে ঐ পথে শঙ্কর টিলার পূর্ব পার্শ্বে টিলা লাগোয়া চন্দ্রাবলী মিশ্রের খানিকটা সমতল জায়গা পাওয়া গেল। পূর্ত দপ্তর মিশ্রের কাছ থেকে তা অধিগ্রহণ করে নিল। ঐ মাঠেই কয়লা রাখা শুরু হয়। পূর্ত দপ্তরের সুবিধা হল। সঙ্গে নাম হীন ঐ জায়গার লোকেরাও নিজেদের পরিচয় পেয়ে গেলেন। জায়গার নাম হয়ে গেল কয়লার মাঠ। কয়লার মাঠ উদয়পুরে একটি বিশেষ স্থান। কয়লা নেই, কিন্তু " কয়লার মাঠ" স্থায়ী হয়ে গেল। এখানে শঙ্কর টিলা ঘেঁষে, হাসপাতালের লাস ঘরের কাছ পর্যন্ত একটি ঘন বসতি গড়ে উঠেছিল সরকারী জায়গা দখল করে, ১৯৮১ সালে মহকুমা শাসক সুয়েল আখতার বস্তি উঠিয়ে সরকারী জায়গা দখল নেন এবং ঐ জায়গায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, সমবায় দপ্তর, পঞ্চায়েৎ দপ্তর ও অন্যান্য কয়েকটি দপ্তরের মধ্যে বন্টন করে দেন। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের জায়গাও সেখানে আছে, মাঠের সামান্য অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট জায়গায় পূর্ত কর্মীদের জন্য ত্রিতল আবাস গড়ে তোলা হয়েছে।

১৯০১ খ্রীঃ জগন্নাথ দিঘীর উত্তরপাড়ের প্রশাসন কেন্দ্র ১৯৫৫ / ৫৬ সালে দক্ষিণ মুখী যাত্রা শুরু করে। প্রথমে মহকুমা অফিসটিকে সরিয়ে আনা হল। এই দক্ষিণ যাত্রা এখনো অব্যাহত। এখন এক শঙ্কর টিলা আর তার গা ছুয়ে রয়েছে জেলা শাসকের অফিস, মহকুমা শাসকের অফিস, খাদ্য, শ্রম, রেজিষ্ট্রেশন, জেলা ইনফরমোট্রিকস সেন্টার, জেলা হাসপাতাল, ট্রেজারী, উপজাতি কল্যাণ, জেলা জজ, পূর্ত দপ্তরের মূখ্য কার্যালয়, সমবায়, বন, বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস, মহকুমা পুলিশ অফিস, খাদ্য গুদাম, সরকারী আবাস, পশু কল্যাণ দপ্তর, পূর্ত দপ্তরের বাড়তি দুটি ডিভিশন অফিস, নির্মাণ কাজ চলছে পঞ্চায়েৎ, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, উপশিক্ষা অধিকর্তার (জোনাল অফিস) অফিসের। ব্যাঙ্ক, জীবন বীমা, পরিবহন দপ্তর, পূরাতত্ত্ব বিভাগের দপ্তর সবই এখন দক্ষিণে। তার কারণ দুটি হতে পারে (এক) দক্ষিণে সম্প্রসারণের জায়গা পাওয়া গেছে (দুই) উত্তরের বিশিষ্ট জনেরা সম্মিলিত প্রতিপত্তির জোরে নিজেদের বসতবাড়ী অক্ষত রাখতে পেরেছেন। একমাত্র এস, পি অফিসটি জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ে, উত্তর পাড়ের ডেপুটী অফিস দক্ষিণে আসার অপেক্ষায়, পূর্বতন সরকারী খাসে ছিল বলে জেলাপরিষদের অফিস, জেলা পাঠাগার, থানা, ফরেষ্ট রেঞ্জারের অফিস আর পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং ও ক্ষুদ্রসেচ দপ্তর, ফায়ার ব্রিগেড পূরাতন প্রশাসন কেন্দ্রের আবর্তে। তৃতীয় একটি কারণ হতে পারে, গোমতী নদী প্রাকৃতিক ভাবেই সীমানা সংকীর্ণ করে দিয়েছিল। কিন্তু সুভাষ সেতু থেকে গোটা রাজারবাগ, পঞ্চায়েতের গোমতী ও মরা গাঙ আবেষ্টনী ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত জন বিরল ছিল। ১৯৬৪ সালের ঢাকার বায়স ঐ শূন্যতা পূর্ণ করে। তবে কী রাজকীয় বাসস্থান বিলাস তৎকালীন আমলাদেরও টিলা বিলাসী করেছিল,

প্রথমে টিলার দখল নিয়ে ক্রমশঃ সমতলে তীর ছুঁড়তে শুরু করেন?

যে গণেশ সিং-এর উল্লেখ করা হল তাঁর সমকালীন উদয়পুরে উদয়পুর গড়ার কাজে অবদান ছিল। গোমতী নদী পারাপারের সব কটি খেয়াঘাট, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল, ধোপাই ছড়া, (বর্তমান সুভাষ সেতু), কাকড়াবন প্রধান। এরাই সরকার থেকে বাৎসরিক বন্দোবস্ত নিতেন। ধোপাইছড়ি এবং কাকড়াবন খেয়া দিয়ে গাড়ী পাড়াপার করত। দুই খেয়া ঘাটেই এরা মোটর গাড়ী বহনক্ষম জুড়িন্দা নৌকা ও লোকজন সহ কাছি, দড়ি সব উপকরণ মজুত রাখতেন। গণেশ সিং, চিন্তা সিং, ধন সিং তখন উদয়পুর মহকুমায় খেয়া ঘাট মানেই সিং-এর উপস্থিতি।গণেশ সিং রা ঠিকাদারী ব্যবসাও শুরু করেন, " রিসোর্সফুল" বলে ইঞ্জিনীয়ারা বেশী টাকার কাজের বরাত ওদেরই দিতেন। উদয়পুরের ফুটবলের ইতিহাসের সঙ্গে গণেশ সিং ওতপ্রোত জড়িত। ঐ ইতিহাস গণেশ সিং-কে বাদ দিয়ে লেখা যাবে না। গণেশ সিং-দের উল্লেখ ব্রজেন্দ্র দত্তের উদয়পুর বিবরণীতে রয়েছে " শ্রীযুক্ত হরিভক্ত সিং গং — ইহারা নেপালী ক্ষত্রিয়। ফুলকুমারী মৌজায় তাদের কায়েমী তালুক অবস্থিত। জমির পরিমাণ ৭৬ দ্রোণ, জমা ৪৮৮ টাকা। ইহা ১০ নং কায়েমী তালুক, ১৫ নং কায়েমী তালুকও ইহাদের। তাদের একটি জি, এম, সি গাড়ীর ড্রাইভার ছিলেন রামদীন। ৭০ /৭৫ বছর বয়সেও সবল সুস্থ, দক্ষ ও দুঃসাহসী চালক। রামদীনও তার দক্ষতা ও সততার জন্যে সম্ভ্রম পেতেন।

১৯৫৯ -৬১ সাল পর্যন্ত উদয়পুরে একটি নূতন ধারা বেশ উন্মাদনা ও চাঞ্চল্য এনেছিল। সে হল স্বেচ্ছা শ্রমে পাড়ার রাস্তা তৈরীর জোয়ার। আজকের অনেক বয়স্কই ঐ সময়ে ঐ কাজে হাত লাগিয়েছিলেন। বড় রাস্তার বাইরে পাড়ায় বা জনবসতিতে যাওয়ার প্রায় সব রাস্তাই পায়ে হাঁটার। মানুষ জমি ছেড়ে দিল। যুবকরা কোদাল নিল, বয়স্করা দড়ি ফিতা নিয়ে রাস্তায় নামলেন, যার জায়গা কম তার মনোকষ্ট, পাড়ার মাতব্বরেরা মনোকষ্ট দূরীকরণে ব্যস্ত রইলেন। ক্লাব গুলিকে সবাই সমীহ করতে শুরু করল। কারণ যুবক কিশোরদের ঐ আখড়াগুলিই শ্রমের যোগান দিচ্ছে। এই পাড়ায় রাস্তা হয়ে গেল তো ওই পাড়া কাজ আরম্ভ করে দিল। মধ্য পাড়ার রাস্তা, পেট্রোল পাম্প থেকে কয়লার মাঠ হয়ে ধনী সাগরের উত্তর পাড় হয়ে পূর্ব রাধা কিশোরঋপুরের রাস্তা, সেখান থেকে বদর সাহেবের বাড়ী পর্যন্ত আবার আধান কলোনী, গিরিধারী পল্লী, শান্তি পল্লী, মাচ্ছা পট্টির রাস্তা গোতোমুনীর চর পর্যন্ত (তখনো রামঠাকুর আশ্রম গড়ে উঠে নি। ঐ জায়গা কালাচাঁন রায়ের দৌহিত্র্য রঞ্জিৎ সিংহ রায় পরে আশ্রমকে দান করেন। পঞ্চাশের দশকে ঐটি ছিল উদয়পুরে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ফুটবল মাঠ। জ্যোতি গোস্বামী, ক্ষেত্র মন্ডল, হরলাল গোস্বামী, প্রাণ গোপাল গোস্বামী প্রভৃতি তখনকার দিকপাল ফুটবলাররা ওখানেও বসবাস করতেন। সংস্কৃতিমনা প্রশান্ত সাহা ও ফুটবলার। টাউনহলের মাঠে গোল কীপারী করতে গিয়ে তাঁর পা ভাঙ্গার পর; ফুটবল খেলা ছেড়ে দেন)। বদর মোকামের কিছু রাস্তাঘাটের সংস্কার সেই উন্মাদনার ফসল।

ডাক বাংলোর নীচে জেলা শাসকের আবাসের কাছ থেকে হাইওয়ে ব্রহ্মাবাড়ী হয়ে যে ব- দ্বীপ, যেখানে নিবিড় বসতি, সেই জায়গায় একটি সুদৃশ্য বিশাল উদ্যান, ছেলে বুড়োদের হাঁটা চলার জায়গা, একটি ষ্টেডিয়াম, শহরের ভিতরে ক্রীড়া উদ্যান, সেখানে মানুষ হাঁটছে, খেলছে। রাজ্য ভিত্তিক খেলা সমূহের আয়োজন হচ্ছে এই কল্পনা বাস্তব হলে কেমন হত?

আসলে তা বাস্তব হতে যাচ্ছিল। ১৯৭৮-৭৯ সালে তৎকালীন জেলা শাসক এম. দামোদরণ এমনই একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছিলেন। তাঁর কথায় ঐ আর্থিক বছরে তার তহবিলে নয় লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। ঐ সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারের ঐ স্কীম ঘোষিত হয়, তাদের জায়গার প্রয়োজন। দামোদরন ভাবলেন ঐ স্কীমকে এখানে কাজে লাগানো যাক। তিনি জায়গাটা অধিগ্রহণের কথা ভাবলেন। দ্রুত জরিপ করালেন। বহু কানি জমি দেখা গেল সরকারের খাসে। অধিগ্রহণের খরচ কমে গেল। তিনি আরো উৎসাহিত হলেন। কিন্তু বাধা আসল রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে। দামোদরণকে থামিয়ে দেওয়া হল। অক্ষম জেলা শাসকদের টাকা খরচের সস্তা উপায় এইভাবে তাকে মানসিক ভাবে হেনস্থা করা হল। এক আলাপচারিতায় তিনি আমাকে বলেছেন '' আমি ভিন্ন রাজ্যের মানুষ। কাজটা করে যেতে পারলে আপনাদের শহর সমৃদ্ধ হত। কিন্তু তা হল না। দেখবেন একদিন এই জায়গা বস্তিতে রূপান্তরিত হবে। কার্যতঃ কাঁঠালের কোঁয়ার মতন গাথা ছোট্ট ছোট্ট বাড়ীঘরে, এই এলাকাতো বাস্তবিকই এখন একটি উন্নত বস্তি। এখানেই শেষ নয় দামোদরণ জেলা ছাড়তেই ঐ এলাকার খাস জমি রাতারাতি জোত হয়ে গেল।

উদয়পুরের জনবসতির চরিত্র পাল্টাতে থাকে দেশ বিভাগের পর থেকে। যারা ছিল পরিযায়ী তারা পূর্ব পাকিস্তানের নিজেদের নিরাপদ ভাবলেন না। তারা চলে এলেন। তাদের পূর্ব চিহ্নিত জায়গাও ছিল। আবার নূতন করেও লোক এলো। তবে শহরের অধিকাংশ এলাকাতেই ১৯৫০ সাল এবং তার পরে বসতির ঘনত্ব বাড়তে থাকে। স্থায়ী পুরনো বসতি বলতে জগন্নাথ দিঘীর পূর্বপাড়, পশ্চিম পাড়, উত্তর পাড় আর দক্ষিণ পাড় ব্যবহৃত হচ্ছে সরকারী প্রয়োজনে। উত্তর পাড়ে প্রশাসন কেন্দ্র। দক্ষিণ পাড়ে কীরিট বিক্রমের নামে স্কুল। প্রথমে তা ছিল মধ্য ইংরেজী স্কুল। আর বাজার সংলগ্ন এলাকায় কতিপয় বাড়ীঘর। আর বসতি ছিল অমর সাগর আর বিজয় সাগর পাড়ে, বদর মোকাম হয়ে, ফুলকুমারীর বর্তমান শহর সংলগ্ন অঞ্চল, মাতঙ্গিনী হাজরা বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত। তার দক্ষিণে খুবই বিরল বসতি। তখনো পর্যন্ত ফুলকুমারীতে বিখ্যাত বাড়ী, সনাতন দের বাড়ী। ওনার ছেলে মহিম দে, শিক্ষক মহিম মাষ্টার। এরা তখন প্রচুর জমির মালিক। সনাতনদের ছোট ছেলে নারায়ণ দে বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার। বর্তমান যে ব্রহ্মাবাড়ী, ব্রহ্মাপূজা ওদেরই বাড়ীর পূজা ছিল। সেই সূত্রে জায়গাটির নাম পরিচিতি হয় ব্রহ্মাবাড়ী। মহিম মাষ্টারের বড় ছেলেই বর্তমানে গৌড়ীয় মঠের নিশি মহারাজ।

ব্রহ্মাবাড়ী বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিস থেকে জেলাশাসকের বাড়ীর নীচে সুখ সাগর ভরাট করে যে বসতি গড়ে উঠেছে তা একেবারেই নূতন, ১৯৮০ সালের পরে এই জলাভূমির উত্থান ও বসতি বিস্তার শুরু। কয়লার মাঠ সংলগ্ন যে ভদ্রপাড়া, ফুলটুঙ্গীর পাড় পর্যন্ত এও ছিল নিম্ন জলাভূমি কেবল মহাদেব দিঘীর দক্ষিণ পাড়, ধনী সাগরের উত্তর পাড় আর ফুলটুঙ্গীর পশ্চিমপাড় জেগে ছিল। দু'চারটা হাতে গোনা বাড়ী ছিল মাত্র। ১৯৫০ - এর পরে ধীরে ধীরে, জলাভূমি ভরাট হতে থাকে। ১৯৬০ -৬৫ সালে গিয়ে পরিপূর্ণ পাড়ার রূপ পায়। মহাদেব দিঘীর দক্ষিণ পাড়েও বসতি শুরু হয় ১৯৫০ ও তার আশ পাশে। মহাদেব দিঘীর পশ্চিম পাড় জুড়ে লম্বায় বেশ খানিকটা নিয়েছিল জয় বাবার আশ্রম। ত্রিপুরার বিদ্যুৎ দপ্তরের

চীফ ইঞ্জিনীয়ার চিত্ত ভট্টাচার্য, এম. বি. বি কলেজের অধ্যাপক সত্য ভট্টাচার্য (উভয়েই প্রয়াত) জয় বাবা তথা নিশিকান্ত ভট্টাচার্য মশাইয়ের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র। সৌম্য দর্শন ঐ ব্রাহ্মণের আশ্রম ছিল আসলে দেশভাগের অব্যবহিত পরে আগত কতিপয় উদ্বাস্তু পরিবারের আশ্রয় স্থল। সুতরাং ঐ বসতির শুরু ও ১৯৪৭ সালে বা তার পরে। আশ্রম এবং হাসপাতালের নীচের মধ্যবর্তী অংশ, পেট্রোল পাম্পের পর থেকে ট্রান্সপোর্ট অফিস পর্যন্ত ছিল জলাভূমি। ১৯৯০ সালে তা ভরাট হয়, এই বসতির বয়স কুড়ি বছরের বেশী নয়। পূর্বেই বলা হয়েছে চন্দ্রাবলী মিশ্রের বাড়ী থেকে বিলাস দেবের বাড়ী (বর্তমানে সুব্রত দেবের বাড়ী) হল পুরনো বসতি। তার পরের অংশ, এখন ঘনবসতি কিন্তু তার শুরু ও ১৯৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে।

অমর সাগরের পশ্চিম পাড়ের বসতির বয়স নিয়ে সংশয় রয়েছে। ১৭০৯ খ্রীঃ থেকে ১৭১৫ খ্রীঃ সময়ে আসামের রাজদূত রত্নকন্দলী শর্মা এবং অর্জুন দাস বৈরাগী এই অমর সাগরের পাড়েই রাজধানীর নাগরিক বসতি প্রত্যক্ষ করে ছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ কৃষ্ণমনি (কৃষ্ণ মাণিক্য) উদয়পুর থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। তারপর ঐ জনবসতির কি হল তার ইতিহাস নেই। কিন্তু একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন কিন্তু তৈরী হয়েছিল। ১৯৫৫ সালের পরেও অমর সাগরের বুক ছিল আড়াই তিন ফুট পুরো দাম, দামের উপর আগাছা ও তারাবন। তার অর্থ হল দীর্ঘ দিন অমর সাগরের জল ব্যবহৃত হয় নি। যদি এর পাড়ে পূর্বতন জনবসতি টিকে থাকত, তারা অমর সাগরের জল ব্যবহার করতেন। সাগরের বুকে " অজস্র শৈবাল দাম" জমে জমে পাহাড় হত না। এতে অনুমিত হয় ১৭৬০ সালে সমসের গাজী কেবল রাজকোষ লুঠ করেনি প্রজাদের সর্বস্বও লুঠ করেছিল এবং নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ছিল যে রাজধানী ছেড়ে নাগরিকরাও পালিয়ে যায়। অতীতে দেখা গেছে অবস্থা বিপাকে রাজারা রাজধানী ত্যাগ করেছেন। প্রজারা রাজধানী ত্যাগ করেনি। রাজারাও আবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু এবার তা হল না। অথচ রত্নকন্দলী শর্মা আর অর্জুন দাস বৈরাগীর বিবরণে " অমর সাগরের পূর্ব পাড়ে দুই জন ঠাকুর লোকের ইট, কাঠ ও বাঁশের তৈরী বাড়ী ছিল। উক্ত ঠাকুর গণ পদস্থ রাজ পুরুষ কারণ তাদের বাড়ীতে প্রহরা, নাকাড়া ও নিশানের ব্যবস্থা ছিল। অমরসাগরের চার পাড়ে বাস করত নানা জাতের মানুষ। তাদের মধ্যে তাঁতী, সোনার (স্বর্ণকার) , কামার, কুমোর, চর্মকার, ছুতোর, ধোবা বারুই প্রভৃতি প্রধান।" বিজয় সাগর তথা মহাদেব বাড়ীর দিঘীর কথা লিখেছেন " এই দিঘীর চার পাড়ে নগরীর লোকেরা বাস করত। বিজয় সাগর ও অমর সাগরের মাঝের জমিতে ব্রাহ্মণ , কায়স্থ, বৈদ্য, দৈবজ্ঞ ও মালাকার প্রভৃতি বর্ণের লোক বাস করত।" ঐ বসতি গেল কোথায়? কেনই বা চলে গেলেন? এই জন শূন্যতার কারণ ও কি তবে সমসের গাজী " Who emerged out of a revolutionary change" এবং যিনি " Initiated the dawn of political consciousness" এবং যিনি " Representative of the peasents and workers" ছিলেন অধিকন্তু যিনি " Installed democratic consciousnes for the first time in Tripura"? লুঠ এবং খুন খারাপি তার গণতান্ত্রিক সচেতন তরবারীর মুখে এতটাই হয়েছিল যে রাজধানী জনশূন্য হয়ে গেল?

যদি তাই না হবে রাজধানীর সবচাইতে জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল মরুভূমি হয়ে গেল, এবং নিশ্চিত ভাবেই দীর্ঘদিন; শতাব্দীরও বেশী; অমর সাগরের পাড় জনশূন্যই রইল। অব্যবহারের ফলেই তো জঞ্জালের, দামের, তারাবনের, আগাছার সৃষ্টি।

তবে অমর সাগরের পশ্চিম পাড়ে শতাব্দীর প্রাচীন (বর্তমান সময় থেকে পেছনে) কিছু মুসলমান এবং মালাকার (মালী) পরিবারের বাস ছিল। ষাটের দশকের পর থেকে জনবসতির চরিত্র বদল হতে শুরু করে। এখন খুব কম সংখ্যকই মুসলমান পরিবার সেখানে আছেন। যে কটি মালাকার পরিবার সেখানে আছে তাদের একটি ভিন্ন ষ্টেটাস রয়েছে। তাদের কোন কোন পরিবার, এরাই আদি হবে, রাজার সনদে খাটনি বিনা সম্পত্তির মালিক। তাদের কর্ম যুক্ত ছিল ত্রিপুরা সুন্দরী কালীবাড়ীর সঙ্গে। সমসের গাজীর তাড়ায় তারাও নিশ্চই পালিয়েছিলেন। পরে ফিরে এসেছেন। মুসলমান পরিবারগুলিও ফিরে এসেছিল। কিন্তু কবে একথা বলার মতো কেউ নেই। তবে অমর সাগরের পাড় যে নিশ্চিত ভাবেই শতাব্দীরও বেশী কাল একেবারে জনশূন্য ছিল তার সাক্ষী হয়ে অমর সাগর বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও মানুষকে জানান দিয়েছে। অন্ততঃ অমরসাগর পরিপূর্ণভাবে অব্যাবহার্য হওয়ার দীর্ঘ সময় পর্যন্ততো বটেই।

মধ্যপাড়া, ছনবন, টাউন ছনবন, শান্তি পল্লী (কাশি মাণিক্যের শ্মশান) রাজারবাগ, এলাকার বসতির ঘনত্ব শুরু হয় উত্তর ষাটের দশকে। টাউন ছনবনে শেষ বাড়ীটি ছিল দুলাল রায় চৌধুরী শান্তি রায় চৌধুরী, ডাঃ গৌতম রায় চৌধুরীদের বাড়ী। ছনবন কো-অপারেটিভ থেকে তিন / চারটি বাড়ী উত্তরই ছিল ষাটের দশকের গোড়ায় শেষ বসতি। পরবর্তী অংশ, ধোপাই ছড়ি গুদারা ঘাট পর্যন্ত ছিল ধূ ধূ মাঠ। ১৯৬০ - এর পর থেকে দ্রুত বসতি নির্মাণ শুরু হয়। একই অবস্থা ছিল সুভাষ ব্রীজ থেকে হাইওয়ে এবং গোমতীর মধ্যবর্তী অংশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যা মরাগাঙ এর পার ছুঁইয়ে খিলপাড়ার প্রান্তসীমা দিয়ে মরাগাঙ যেখানে গোমতীতে মিশেছে সেই মরাগাঙ গোমতীর বেষ্টনীর বিশাল মধ্যবর্তী অংশ। ষাটের পরে ধীরে ধীরে ১৯৬৪ সালে ঢাকা রায়টের পরে দ্রুত এখানে বসতি গড়ে উঠে। এই বিশাল জমি মুসলমানদের সম্পত্তি ছিল। বেশ কিছু আমবাগান ছিল, চাষবাস নদীর লাগোয়া অংশ ছাড়া হত না। ১৯৬২ সালে হাকিম মানিক গাঙ্গুলীর প্রশাসনিক তৎপরতায় অমরপুর মহকুমা থেকে বহু সংখ্যক মুসলমান বিতাড়িত হলে, মুসলমানরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে পূর্ব পাকিস্তানের তপ্ত কড়াইতে ফুটছে সাম্প্রদায়িক বিষ; সেখানে হিন্দুরা অসহায় হয়ে পড়ে। দুই দেশের ঐ আবহ এক নূতন সুযোগ সৃষ্টি করল উভয় দেশের মানুষের পরিত্রাণের। শুরু হল সম্পত্তির এওয়াজ বদল। এই সম্পত্তি বদল দুই দেশের সরকারও ভিন্ন ভিন্ন কারণে মেনে নিল। এর ফলে কেবল উদয়পুর শহরেই নয়, গোটা উদয়পুর মহকুমার জনবসতি চরিত্রই পাল্টে দিল। পাল্টে ছিল জনসংখ্যা চরিত্রও। অপেক্ষাকৃত বিত্তবান আগন্তুকদের পুঁজির ধাক্কায় মহকুমার অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল আদিবাসীদেরও আঘাত করে, অর্থেরও প্রতিপত্তির আগ্রাসনে এবং প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্বে উপজাতিরা সমতল ও সমতল নিকটবর্তী জমি ছেড়ে গভীর জঙ্গলের দিকে চলে যেতে শুরু করেন। ষাটের দশক ছিল এক উত্তেজনার দশক।

জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ের প্রশাসন ভবন কিন্তু ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে উঠেনি। ১৯০১-এ শহর উপকন্ঠ খিলপাড়াতে কাজ চালানোর মতন দপ্তর খোলা হয়। স্থায়ী কোন কাঠামো নয়। হয় তো তখনো ঠিক ছিল প্রশাসনের স্থায়ী কাঠামো খিলপাড়াতে নির্মিত হবে। তার কারণ হয়তো ছিল খিলপাড়ার প্রাকৃতিক অবস্থান। সমতল ভূমি; একদিকে নয়ন মুগ্ধকর সুখ সাগরের বহু বিস্তীর্ণ হ্রদের শোভা, গোমতী নদীর নৈকট, সমৃদ্ধ জনপদ এবং বহু প্রাচীন পরিবারের আবাস সর্বোপরি রাজধানী আগরতলা থেকে সড়ক পথে উদয়পুরে আসার পথে। খিলপাড়াতে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর পূজারীদের নিষ্কর দেবোত্তর ভূমি দিয়ে বসতি গড়ে দিয়েছিলেন ধন্য মাণিক্য, খিলপাড়ার কাজী পরিবার এরাও বহু প্রাচীন পাঠান বংশের, পরে অবস্থান বৈগু ন্যে বাঙালী, সুলতানী আমলে হয়তো এদের পূর্ব পুরুষেরা রাজধানী উদয়পুরে এসেছিলেন, হয় তো সুলতানের আনুকূল্যে সিংহাসনে কায়েমী করতে অথবা মুঘল বাহিনীর সঙ্গে উদয়পুর লুঠ করতে, উদয়পুর তাদের মুগ্ধ করে, এখানকার জল হাওয়া, কৃষি ক্ষেত্র, সহজ জীবীকা, সৈনিক বৃত্তিতে অনীহা এনে দেয় এবং বহু ভূসম্পত্তির অধিকারী হয়ে খিলপাড়াতে বসতি স্থাপন করেন। বিশ বছর আগেও যারা ইসলাম মিঞা কাজীর বলিষ্ঠ, দীর্ঘ উন্নত শরীর কাঠামো প্রত্যক্ষ করেছেন এই ইতিহাসের সঙ্গে তারা মিল খুঁজে পাবেন। ইসলাম মিঞা কাজীর অনুজ বায়োজিদ আমার সহপাঠী সেও দীর্ঘ দেহী কিন্তু কৃশ। এখন আর তাদের মধ্যে পাঠানত্ব প্রায় নেই একে বারেই ভাতে জলে বাঙালী। অপর এক কাজী গোলাম হুসেন সেও আমার সহপাঠী। এরা এখানে কয়েক শত বছরের পুরনো। এই খিল পাড়াতেই বসতি দেওয়া হয়েছিল রাজাদের হস্তী সংরক্ষকদের। খিলপাড়া মৌজার হস্তী মর্দনের পুষ্করিনী ঐ তথ্যের সাক্ষী দেয়। ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন " ইহা একটি ছোট পুকুর। খিলপাড়া মৌজায় অবস্থিত। ইহার নাম ব্যক্তি বিশেষের বীরত্ব ব্যাঞ্জক এবং তদীয় বংশধর, খিলপাড়ার পালোয়ানদের পক্ষে গৌরব জনক। প্রবাদ আছে যে ইহাদের পূর্ব পুরুষ হস্তীর সঙ্গে লড়াই করিয়া জয়ী হওয়ার পর মহারাজ প্রদত্ত " হস্তীমর্দন" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ছড়ি বরাদের পুকুর খিলপাড়াতেই। এছাড়া রাজ পুরোহিত ও সভাসদদের (ত্রিপুরা বু-রুঞ্জী) অনেকেই রাজ আমলের বসতি। ফলে খিলপাড়া প্রাচীন সমৃদ্ধ ও সম্পন্ন নাগরিকদের পুরনো বসতি অঞ্চল। " নবসাকের" অনেক শাখাও সেখানেই পুনর্বসতি প্রাপ্ত।

খিলপাড়া সুখ সাগরের পাড়ে। পার্শ্ববর্তী গ্রাম সোনামুড়া। সুখ সাগরের দক্ষিণ পাড়ে চন্দ্রপুর গ্রাম। এই চৌহদ্দীর প্রাচীন জনবসতির রেখা চিত্র হল " চন্দ্রপুর মৌজার লস্কর" রাই পুরাতন " বাঙ্গালী হিন্দু প্রজা"। " কয়েক ঘর কায়স্থ, শূদ্র ও শীল জাতীয় হিন্দুও বহুদিন যাবৎ পুরুষানুক্রমে এখানে বাস করিতেছে" খিলপাড়া নিবাসী বারুইগণ খন্ডল হইতে এই স্থানে আসিয়া বহুকাল যাবত বাস করিতেছেন।" " চন্দ্রপুর মৌজার মসুলমান চৌধুরী বংশ সর্বাপেক্ষা পুরাতন। ইহাদের আদি পুরুষ আদি রত্ন মাণিক্যের সময়ে লাহোর দেশ হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের পূর্ব পুরুষের নাম " পরতাল মজলিস্" বলা হয়। ছামুদুল্লা চৌধুরী, আলাবদ্দী চৌধুরী ঐ বংশের লোক। উত্তর চন্দ্রপুরের কাজী বংশও পুরাতন ও বিশেষ সম্মানিত। বুগদাদ্ শহর হইতে ইহাদের পূর্ব পুরুষ আসিয়াছিল বলিয়া এই বংশকে 'বুগদাদী কাজী' বলা হয়। খিল পাড়া কাজীরাও এদেরই স্বজন। এদের জমিজমা এখনো চন্দ্রপুরেই বেশী, সেখানেই

খামার বাড়ী।

উত্তর চন্দ্রপুর নিবাসী ক্ষিরোদ আলী সর্দার ও সোনামুড়া নিবাসী আলীমিঞা প্রভৃতির বংশকে পুরাতন মুসলমান অধিবাসীগণ " কুকী বংশ" বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া থাকে। কুকির উরসে ও মুসলমান স্ত্রী লোকের গর্ভে ইহাদের পূর্ব পুরুষের জন্ম হইয়াছিল বলা হয়।

খিলপাড়া নিবাসী আম্বর আলী সর্দারের বংশও পুরাতন ও সম্ভ্রান্ত। ইহাদের পূর্ব পুরুষ ও লাহোর দেশ হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের আকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। খিলপাড়ার মহম্মদ হাদিমের পুত্র জমসের আলী জমাদার ও তৎপুত্র ইউসুফ আলী। তাহারাও লাহোর হইতে আসিয়াছিল। ইহাদের আকৃতিতে স্বাতন্ত্র্য আছে। সোনামুড়ার হাসন আলী সর্দারের পূর্ব পুরুষগণ হস্তী দন্ডের কার্য করিত। এই কারুকার্যের যন্ত্রাদিও ইহাদের ঘরে ছিল। কুকি আক্রমণের সময় ঐ সব যন্ত্রাদি অপহৃত হইয়াছে। উদয়পুরের স্ত্রীলোকগণ পূর্বে হাতীর দাঁতের অলঙ্কার করিত। খিলপাড়া নিবাসী আশ্রবলী সর্দাদেরর বাড়ীতে উদয়পুরে নির্মিত একটি হস্তীদন্ডের চিরুনী আছে। কাছিমালীর নিকট উদয়পুরে নির্মিত হাতীর দাঁতের তৈরী যে "চুরী" ছিল তাহা শিবচতুর্দশী মেলা সংশিলষ্ঠ প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হইত। ত্রিপুর রাজ রত্নমাণিক্য হস্তী ও হস্তীদন্ড নানা প্রকার দ্রব্য উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন।

সোনামুড়া নিবাসী খাদিমগণ নরসুন্দর আতারাম ও বুধিরামের বংশধর। ইহারাই বদর মোকামের খাদিম। সোনামুড়ার পালোয়ান বংশ ও প্রাচীন।"

একশত বছর আগে ব্রজেন্দ্র দত্ত মশাইয়ের এই জনরেখাচিত্রটি এই চৌহদ্দীতে এখনো অবিকল। কেবল কালের পরিবর্তন ঘটেছে। চিরতরে হারিয়ে গেছে সুখ সাগরের চারপাশ থেকে - হাতিজলা, বারখাটিয়া, পুটিয়াজরী, লাঙ্গঁল ধোয়া, নয়ন সুখের মাঠ, সোলইক্যার হাওর, ছেনাার ঘাটি, পদ্মবিল, নিলক্ষ্যা পাথর, নলগইর পাথর, চাড়াল পাড়া, মালী পাড়া, ডোমপাড়া, ঈশ্বরীতলীর নাম।

সুতরাং খিলপাড়া এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলে যে অতিপ্রাচীন জনবসতি ছিল তা প্রমানের অপেক্ষা রাখে না আর প্রশাসনিক কেন্দ্র তো আর মরুভূমি বা অরণ্যে গড়ে উঠে না। তবে সোনামুড়া এবং চন্দ্রপুরের ক্ষেত্রে অসুবিধা ছিল রাস্তাঘাটের অপ্রতুলতা। বিশেষ করে তখনকার সময়ে চন্দ্রপুরে তো বটেই। আর সোনামুড়া গ্রামের অবস্থান যদিও খিলপাড়া সংলগ্ন তবু দক্ষিণ পূর্বে গ্রামটি রাস্তা থেকে অনেকটা ভেতরে, সেই সময়ে তো বটেই, সুতরাং কুমিল্লা উদয়পুর আসার পথের পার্শ্বে খিলপাড়াই ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপনের আদর্শ।

তাহলে জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ে প্রশাসনিক কেন্দ্র কবে স্থানান্তরিত হল? ১৯০২ খ্রীঃ বা তার পরে। জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের পেছনে একটি কারণ ছিল। ব্রজেন্দ্র দত্ত সেই কারণ উল্লেখ করেছেন তাঁর উদয়পুর বিবরণীতে।

" মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ১৩১২ ত্রিং সনে (১৯০২ খ্রীঃ) উদয়পুরে শুভাগমন করার সময় পথিপার্শ্বে কাকড়াবনস্থিত পুরাতন রাজবাড়ী নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিয়াছিলেন। সেই স্থানের একদিকে এখনো মাটির উচ্চ প্রাচীরের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যুবরাজ গোস্বামী শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর ও মহারাজ কুমার শ্রী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর তখন পিতা সমভিব্যবহারে উদয়পুরে আসিয়া ছিলেন। উদয়পুরে আসিয়া মহারাজ যে স্থানে

অবস্থান করিয়াছিলেন ঐ স্থানেই বর্তমান বিভাগীয় অফিস গৃহ।" তাহলে জগন্নাথ দিঘীর উত্তরপাড়ে প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্তটা হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে গৃহনির্মাণ ও স্থানান্তর।

সদ্য সদ্য এই স্থানান্তরের প্রশ্ন কেন এলো? খিলপাড়া কেন পছন্দের ছিল তার সম্ভাব্য কারণ বলা হয়েছে। লক্ষ্য করার বিষয় উদয়পুরের সেরা শোভন স্থানে রাধাকিশোর মাণিক্যের অবস্থান স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। একদিকে গোমতী নদী। সামনে উত্তর-দক্ষিণে সুবিস্তার বিশাল জগন্নাথ দিঘী। সামনে দিগন্ত প্রসারিত সুবজ নীলের মাখামাখি; দক্ষিণামলয়ে বীচি ভঙ্গের অতিমৃদু নিঃশব্দ-শোভনতা। পেছনে গোমতীর ওপাড়ে অপ্রসস্ত সমতলে শস্য ক্ষেত্রের সবুজের ঢেউ পাহাড় সান্নিধ্যে আছড়ে পড়েই পাহাড় চূড়ার হাতছানি। এখানে প্রকৃতি নিজেই রাজকীয়। দুদিন পর যার নামে এই জায়গার নাম চিহ্নিত হবে তিনি তো প্রশাসন কেন্দ্রের জন্য সব চাইতেই সেরা জায়গাটাকেই পছন্দ করবেন। পরে তার চাইতেও সেরা জায়গার সন্ধান দিলেন বিপিন দত্ত হাকিম ১৯৫৪ ইং সনে।

মরা গাঙ

উদয়পুর শহরের উপকণ্ঠে কাশি মাণিক্যের শ্মশান তথা বর্তমান শান্তি পল্লীর দক্ষিণ ধার দিয়ে খিলপাড়া রাজারবাগের সীমানা বরাবর রাজধনগরের প্রান্তে গোমতী পর্যন্ত একটি দীর্ঘ জল ধারা রয়েছে। রহিরাগতের জন্য সহজ চেনার উপায় হল জগন্নাথ বাড়ী থেকে যে রাস্তা শান্তি পল্লী হয়ে রাজারবাগ মোটর স্ট্যান্ড পর্যন্ত গেছে সেই রাস্তার ডান পার্শ্বে দ্বিতীয় মোড় থেকে ঐ জলধারার শুরু। রমেশ স্কুলের পেছন দিয়ে খিলপাড়া গ্রামের বাজারের ধার দিয়ে সোজা গোমতী নদী। মরা গাঙের ডান পার্শ্বে রাজারবাগ।

" মরা গাঙ" এই নাম থেকেই বুঝতে কষ্ট হয় না পূর্বে এই জলধারা 'গাঙ'ই ছিল। 'গাঙ' মানে নদী। আর 'মরা' শব্দ থেকে বুঝা যায় নদীটি এক সময়ে জীবন্ত ছিল। এখন মরে গেছে। কবে মরে গেছে ঐ তথ্য কেউ দিতে পারে না। তবে এক সময়ে 'গয়না নৌকা' বরযাত্রীবাহী নৌকা খিলপাড়া বর্তমান অনাথ আশ্রমের পেছনে এসে ভিড়ত এমন তথ্য বলার মতন দুই একজন প্রাচীন লোক এখনো বেঁচে রয়েছেন। তবে গাঙ তখনো মরা। গোমতীর আর মরা গাঙের মোহনা ধরে 'গয়না' খিলপাড়ার ঘাটে ভিড়ত। খিলপাড়া তখন এলাকার অতি সমৃদ্ধ জনবহুল অঞ্চল। সঙ্গের বর্তমান সোনামুড়া গ্রাম।

প্রশ্ন হল মরা গাঙের প্রশ্ন এলো কেন? এই মরা গাঙের সঙ্গে উদয়পুর শহরের পূর্বতন ভূমি বিন্যাসের সম্পর্ক রয়েছে বলেই " মরা গাঙ" কে আবার জীবন্ত করার প্রশ্ন এসেছে। " মরা গাঙ" কে চিহ্নিত করা না গেলে উদয়পুরের ভূ-বৃত্তান্ত অপূর্ণ থেকে যায়। বর্তমান উদয়পুর শহর অন্ততঃ ৭৫০ / ৮০০ বছর আগে এমনটা ছিল না। কর্দমাক্ত ভূমি যার বিস্তার পূর্বে পশ্চিমে গোমতীর পাড় থেকে সুখ সাগরের গভীর অংশ পর্যন্ত। আর সুখ সাগর ছিল গোমতীর ব্যাক ওয়াটার পুষ্ট জলধার বা হ্রদ যে হ্রদে অন্ততঃ আটটি ছড়াও তাদের জল ঢেলে দিয়েছে।

১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রত্ন মাণিক্য, ত্রিপুরার সিংহাসনে আসীন, জবর দখলদার, ভাই রাজাফা এবং অন্যান্য ভাইদের বাঙলার শাসনকর্তা তুঘ্রল খাঁর সহায়তায় পরাস্ত করে ত্রিপুরার সিংহাসনে বসেন। তিনিই প্রথম রাজধানী রাঙামাটিতে (১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উদয় মাণিক্য রাঙামাটির নাম রাখেন উদয়পুর) সমৃদ্ধ জনপদ গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তুঘ্রল খাঁর কাছ থেকে ১০,০০০ বিভিন্ন বৃত্তি ধারীদের ত্রিপুরায় নিয়ে আসেন এবং দুই হাজারকে রাঙামাটিতে বসতি দেন। কিন্তু ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ সময়ে অর্জুনদাস বৈরাগী এবং রত্নকন্দলী শর্মা অমর সাগর ও বিজয় সাগর এর পাড়ে আরো অধিক সংখ্যকের বসতি দেখেছিলেন। রত্নমাণিক্য ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে গোমতীর বাম তীরে দুই হাজারের বেশী লোকের বসতি দেবার মতন জায়গা পান নি বুঝা যায় এবং খিলপাড়ার জনবসতির প্রাচীনত্ব দেখে মনে হয় ঐ খানেই রত্ন মাণিক্য (১ম) এর নগর পত্তন শুরু হয়েছিল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুরের প্রথম বিভাগীয় কেন্দ্রও কিন্তু খিলপাড়াতেই গড়ে উঠেছিল। ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দ (১ম রত্নমাণিক্যের সময়ের পার্থক্য ৪২৭ বৎসর। ঐ সময়ের মধ্যেই অমর মাণিক্য, অমর সাগর, ধন্যমাণিক্য ধন্য বা ধনী সাগর, বিজয় মাণিক্য বিজয় সাগর বা মহাদেব দিঘী

এবং পুরান দিঘী এই ১ম রত্নমাণিক্য পরবর্তী রাজার কীর্তি। রত্নকন্দলী অর্জুন দাসেরা তা দেখেছেন এবং উদয়পুরের জনবসতি প্রত্যক্ষ করেছেন অমর সাগরের পশ্চিম পাড় ও উত্তর পাড়ে আর বিজয় সাগরের পাড়ে। অর্থাৎ শহর বা বসতি ক্রমশঃ দূর থেকে রাজ বাড়ীর ঘনিষ্ঠ হয়েছে ক্রমশঃ।

গোমতীর বাম পার্শ্বের উৎলা জমি দিঘী কেটে উচু হয়েছে আর শহর পশ্চিম থেকে পূর্বে বিস্তার লাভ করেছে। প্রথম রত্ন মাণিক্যের নগর পরিকল্পনার সর্বশেষ রূপটিই রত্নকন্দলীরা প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। জমি যদি বসতির উপযোগী থাকত তবে রত্নমাণিক্য (১ম) এত দূরে বসতি স্থাপন করতেন না। শুরুতেই অমর সাগর বিজয় সাগরের পাড়েই করতেন। কিন্তু তখন তো এই জায়গা জলে ডুবে আছে। অথবা বৎসরের বেশীর ভাগ সময় জলে ডুবে থাকে ফলে বসতির অযোগ্য। কাজেই উদয়পুরের দিঘী খনন আসলে বৃহত্তর নগর পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল। এবং বসতি স্থাপনের জন্য উচুঁ ভূমির প্রয়োজনেই এই বড় বড় জলাশয় খননের পরিকল্পনা। উদয়পুরের বর্তমান শহর-বিন্যাসটি ঐভাবেই দিঘীর পাড়ে পাড়ে।

মনে হতে পারে ধান ভানতে শিবের গীত গাওয়ার চেষ্টা। কিন্তু পশ্চাৎপদ প্রকট না করলে মূল জায়গায় চট্ করে প্রবেশ কেন তার ব্যাখ্যাটি কষ্ট কল্পিত ও জটিল মনে হতে পারে। কৈলাশ সিং-এর রাজমালায় উল্লেখ রয়েছে রাজারা দুই জায়গায় গোমতীর গতি পরিবর্তন করেছিলেন। কে কোথায় করেছিলেন তার উল্লেখ নেই। তবে পশ্চিম জেলার (বর্তমান) বিজয় নদী বা বুড়িমা নদীর বাঁক যে মহারাজ বিজয় মাণিক্য একাধিক জায়গায় পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন তার নির্দিষ্ট উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু সেখানেও রাজা তথা খননকারীর নাম থাকলেও কোন স্থানে তার উল্লেখ নেই। তা খুঁজে বের করা গবেষণা সাপেক্ষ। তেমনি উদয়পুরে কোথায় নদীর বাঁক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছিল সেই জায়গাটি যুক্তির মাধ্যমেই খুঁজতে হবে। কে করেছিল ঠিক কখন হয়েছিল তা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। কিন্তু স্থান সনাক্তকরণ অসম্ভব নয়।

রাইমা ও সরমা দুই ধারার মিলন স্থল অমরপুর মহকুমার ডম্বুর। ডম্বুর থেকে দুই স্রোতের একীকরণ এবং নামের পরিবর্তন। গোমতীর উৎপত্তি। সেই থেকে উদয়পুর শহর উপকণ্ঠে বনদুয়ার পর্যন্ত গোমতী পাহাড়ের বুক চিরে প্রবাহিত। যদিও ভূগোলের ভাষায় গোমতীর সমতল প্রবাহ ডাক মুড়ার নীচ মহারানী থেকে। কিন্তু মহারানীর নিম্ন প্রবাহে হীরাপুর, লক্ষ্মীপতি ও ফোটামাটির সংকীর্ণ সমতল ছাড়া বনদুয়ার পর্যন্ত গোমতীর বাম তীরে পাহাড়ের ঠেক। আর দক্ষিণ দিকে ধোপাই ছড়া তথা সুভাষ ব্রীজ পর্যন্ত টিলার দেয়াল। কাজেই অন্ততঃ বনদুয়ার বা তার খানিকটা নিম্ন প্রবাহ কুঞ্জবন পর্যন্ত নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রশ্ন নেই। সম্ভবও ছিল না কারণ এই প্রযুক্তি তখন ছিল না। কাজেই সমতলে কোথাও গতি পথ পরিবর্তন করা হয়েছিল।

প্রশ্ন হবে কেন গতিপথ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছিল? দুটি কারণে হতে পারে (১) নদীর গতি পথ পরিবর্তন করে ভিন্ন প্রয়োজন মেটাতে জমি উদ্ধার (২) বন্যার হাত থেকে শস্য ক্ষেত্র রক্ষা করে প্রজাও অর্থনীতি দুইয়ের পুষ্টি বিধান। গোবিন্দ মাণিক্যের পরে এই কাজ হয়েছিল নিম্ন প্রবাহ শালগড়ায়, শালগড়া বাঁধ তৈরী করে। কিন্তু প্রথম প্রয়োজন অর্থাৎ জমি

উদ্ধার এর জন্য কোথায় বাঁক পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে?

ইতিহাস বলে ১ম রত্নমাণিক্যের সময়ে, ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুর নগরবিস্তারের উদ্যোগ শুরু হয়। ১৮০৯-১৫ খ্রীঃ এসে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজধানী শহরের রূপ নেয়। শহর গড়ার জন্যে জায়গার প্রয়োজন। আবার রাজধানীর নিকটেও হতে হবে। সমতলেও হওয়া চাই কারণ বঙ্গের সমতলবাসীরা এসে পাহাড়ে থাকতে চাইবে না। ঐ জায়গা তৈরী হয়েছে বড় বড় জলাশয় খনন করে, প্রাপ্ত মাটিতে নীচু জায়গা ভরাট করে। আরো জায়গার প্রয়োজন কিভাবে তা পাওয়া যাবে? গোমতীকে যদি খানিকটা দূরে সরিয়ে দেওয়া যায় তা হলে কিছু জমি পাওয়া যাবে। এখন যদি রাজারবাগ আর ছনবন কে ঐ ভাবে উদ্ধারিকৃত জমি বলা হয় তাহলে তার সম্ভাব্যতাকে যুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হয়। রাজারবাগ বা রাজার বাগান না হয়ে যদি তাকে আমরা রাজার বাঁক বলি তা হলে তা হয় কোন রাজার সৃষ্টি বাঁক। আর এই বাঁক তৈরী হয়েছে গোমতীকে সরিয়ে।

এবার বনদুয়ার থেকে রাজবাড়ী এবং রাজবাড়ী থেকে গকুলপুর ধোপাইছড়া গোদারাঘাট (পূর্বতন; বর্তমানে সুভাষ ব্রীজ) পর্যন্ত নদীর প্রবাহ ডানদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে। আর নদীর বাম পার্শ্বে বদরমোকাম ঘাট থেকে রামঠাকুর আশ্রম পর্যন্ত রয়েছে তিন / চারশ মিটারের নদীর পাড় ঘেঁষা একটি খাড়া টিলা ভূমি, সাহেবের টিলা। আশ্রম থেকে বামপার্শ্বে বহুদূর পর্যন্ত সমতলভূমি; তা হলে রামঠাকুর আশ্রম থেকে নিম্ন প্রবাহে নিকটবর্তী কোন এক স্থান থেকেই গোমতীর গতি ফেরানো হয়েছে নিশ্চিত। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে মূল নদীর প্রবাহ কোথায় ছিল তা জানতে হবে। এখনই প্রয়োজন 'মরা গাঙ'-কে বাঁচিয়ে রাখা। এ যুক্তি সঙ্গত প্রতিষ্ঠা যে " মরা গাঙ" গাঙ বা নদী ছিল। সে স্রোত হারিয়েছে।

আগেই বলেছি ' মরা গাঙে'র শুরু কাশি মাণিক্যের শ্মশান বা শান্তি পল্লী থেকে। শান্তি পল্লী সমতল ভূমি। নদী উৎপত্তির প্রশ্ন এখানে নেই। নদী উৎপত্তির প্রাকৃতিক সম্ভাব্যতা হল পাহাড়, হ্রদ বা বড় নদী থেকে শাখা নদী। এর কোনটাই শান্তি পল্লীতে নেই। 'গাঙ' এর অভ্রান্ততাকে যেহেতু অগ্রাহ্য করা যাবে না সেইহেতু এটাই হবে গোমতীর আদি মূল প্রবাহ। এবার প্রশ্ন তা হলে মূল গোমতী কোন জায়গা থেকে পথ পরিবর্তন করল? গাত মণির চর থেকে তার নিম্নপ্রবাহে কোন এক জায়গায়। জায়গাটা জগন্নাথ দিঘী। বর্তমান উদয়পুর বাজারের পাশ থেকে পূর্ব গকুল পুরের চর ভূমির কিঞ্চিৎ আগে এই ডাইভার্সান। তাহলেই নদী গকুল পুরের পাহাড় সংলগ্নতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। আবার যে অনুকূল কারণে অল্পায়াসে অমর সাগর, মহাদেব দিঘী, ধনী সাগর, কুমারী ঢেপা, বুইড়া দিঘী, চন্দ্র সাগর খনন সুবিধা হয়েছিল, নদীপথ পরিবর্তন ঘটায় জগন্নাথ দিঘীর খননের মতন উৎলা জমি (মার্সি ল্যান্ড) সৃষ্টি হয়ে গেল। এবং দিঘী খনন হয়ে পাড় বাঁধিয়ে বসতি স্থাপনের জমি উদ্ধার হল। এবং মরা গাঙও জীবন্ত হল। জগন্নাথ দিঘীর সঙ্গে গোমতীর জলের চলাচল রয়েছে দিঘীর তলদেশ দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক বাস্তুকার প্রণব রায় বলেছেন।

উদয়পুর শহরের বর্তমান ভূ-পরিবেশ এবং জনপদের বিন্যাস ও সেই কথাই বলে। উদয়পুর শহর জগন্নাথ দিঘীর পশ্চিম পাড় থেকে হাইওয়ে অতিক্রম করে গোমতীর পাড় পর্যন্ত, এই ভূখন্ডে রয়েছে ছনবন, রাজারবাগ। গোমতীকে বাজার সংলগ্ন স্থান থেকে পাহাড়ের

দিকে ঠেলে দেওয়ায় এই বিস্তৃর্ণ ভূমি উদ্ধার হয়েছে। আবার জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড় থেকে অমর সাগরের পশ্চিম পাড়, পূর্ব ও উত্তর দক্ষিণ পাড় এবং বিজয় সাগর তথা মহাদেব দিঘীর চার পাড়। দক্ষিণে ফুলকুমারী হয়ে বুইড়া দিঘী হয়ে মায়ের বাড়ীর দক্ষিণে চন্দ্র সাগর পর্যন্ত। এই বিস্তৃর্ণ ভূমি উদ্ধার হয়েছে বৃহৎ জলাশয়ের মাটিতে নিম্নভূমি ভরাট করে আর উত্তরের ছনবন, রাজারবাগ এর জমি পাওয়া গেছে গোমতীর পথ পরিবর্তন ঘটিয়ে 'মরা গাঙের' জন্ম দিয়ে। প্রকৃতি যে বর্তমান শহরের মধ্যে স্তন-চূড়া সদৃশ দুটি উঁচু ভূমি দিয়েছিল তা হল নদীর পাড়ে সাহেবের টিলা আর বর্তমানে প্রশাসন কেন্দ্র শঙ্কর টিলা।

'মার গাঙ' সরকারের সম্পত্তি। দুই পাড়ের মানুষ তা ভরাট করে জোত করছে, এখন আবার পুরো মরা গাঙের উপর ব্যক্তিগত মালিকানা অর্জনের জন্য একজন আইনী লড়াই করছে। আসলে এই "মরা গাঙ" ১৯৪৮-৫০ সন নাগাদ শহরের তৎকালীন সময়ের কিছু লোকের গর্বিত এক মৎস্য সমবায় ছিল। পরে তার প্রাকৃতিক মৃত্যু ঘটে। ঐ ফিসারী কোম্পানী পরে জগন্নাথ দিঘী আর মহাদেব দিঘীতেই সীমাবদ্ধ হয়। তৎকালীন সময়ে শ্যামা শঙ্কর ঘোষ, রামবাবু বা রমেন্দ্র রায়, সুধীর ঘোষ প্রমুখদের প্রতিষ্ঠান। ঐ সংস্থানেরও প্রাকৃতিক বিলয় ঘটে। কিন্তু " মরা গাঙ" যা আদি গোমতী তা এখনো অস্তিত্ব নিয়ে ঐটিকে এখন ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা। রমেন্দ্র রায় বা রামবাবুর উত্তরাধিকারীরা ঐ চেষ্টা করেছেন। ১৯৮৮-৮৯ থেকে শুনা যাচ্ছিল এই মরা গাঙকে মুখ্য করে উদয়পুর শহরের জলনিকাশী ব্যবস্থার জন্যে একটি মাষ্টার প্ল্যান তৈরী করা হচ্ছে। মরা গাঙের বিলুপ্তি ঘটলে উদয়পুর শহরের ইতিহাসের একটি লুপ্ত অধ্যায় সম্পূর্ণরূপে অন্ধকারে চলে যাবে। মরা গাঙের ঐতিহাসিক মর্যাদা ও ভূমিকা রয়েছে।

শহরের প্রাকৃতিক জল নিকাশী ব্যবস্থা ছিল তখন অন্যরকম। মধ্য শহরের জল তালতলী পুকুর থেকে সোজা চলে যেত অমর সাগরে। নিকাশী নালটি ছিল বর্তমান নিউ টাউন রোডে মিলন এন্টারপ্রাইজের ঠিক উত্তর ঘেঁসে নিউ টাউন রোডের বুক চিরে কিরণ মাইক -এর জায়গা ধরে অমর সাগর। শহরে উন্নয়ন হচেছ। অমর সাগরের দাম পরিস্কার করে বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের গোড়ায় উত্তর পাড় উচু করা হল, জল নিকাশী পথটি তখনো ছিল। দুই পাশের মানুষ দুই পাশ থেকে নালা দখল নিতে থাকে। এবং ঐ দখল পাকা করতে তারা উন্নয়ন পন্থী হয়ে সরকারী অভিভাবকদের যোগসাজসে নালার নিউটাউন রোডের অংশ মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়। পুরো জল নিকাশী গোপাট জনগণের দখলে চলে গেল। সরকারী গোপাট ব্যক্তিগত জোতে পরিণত হয়ে গেল। আবার তালতলী দিঘীর চারদিকের অংশও সঙ্কুচিত হল জবর দখলের ফলে দিঘীর নিজস্ব জল ধারণের ক্ষমতাও কমে গেল। এই অঞ্চল, বাটার গলি ধরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমের বসতির জন্য বর্ষায় কলঙ্ক চিহ্ন। জল জমে বাড়ী ঘর ও যাতায়াতের বিঘ্ন স্থায়ী রূপ পেল।

প্রসঙ্গত এই যে বাটার গলি যা নিউটাউন রোড কে সেন্টাল রোড-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেছে, ৬০ / ৫৬ বছর আগে এই গলি দিয়ে মানুষের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যায় গরু মোষ যাতায়াত করত। শহরের লোক সংখ্যা কম বলে বরং তুলনায় গরু মোষের চলাচলই ছিল সংখ্যায় বেশী। সোনামুড়া গ্রামের গো-সম্পদের মালিকেরা তাদের গরু নিয়ে অমর সাগরের

পশ্চিমপাড় হয়ে চিত্র ঘর সিনেমা হলের পাশ দিয়ে নিউটাউন রোডে উঠে ডাইনে বাঁক নিয়ে এই গলিতে ঢুকতেন। তখনো এই গলির নাম বাটার গলি হয় নি। বড় ঘরের পাশ দিয়ে চালতাতলী বর্তমান বাঁশ বাজারের ঘাট দিয়ে গোমতী পেরিয়ে গরু চড়ানোর জন্যে পূর্ব গকুলপুর রাজনগরে জঙ্গলে চলে যেত। সকাল সন্ধ্যায় এই গরু মোষের ছন্দবদ্ধ চলা ফেরা বেশ দৃষ্টি নন্দন দৃশ্য ছিল। সন্ধ্যায় পর্যন্ত আহারে পুষ্ট গবাদি পশুর ঘুনসুটি আর পশ্চাতে ক্লান্ত পদে রাখালের দল বাড়ী ফিরছে, এই দৃশ্য এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। গো-চলাচলের কারণে বর্ষায় এই পথে এত কাদা, প্রায় হাঁটু সমান জমত যে নেহাত প্রয়োজন বা তাড়া না থাকলে এই সংকীর্ণ পথে কেউ পা বাড়াত না।

শহরের বুকে আরেকটি গো- চলাচলের গোপাট ছিল উদয়পুর গার্লস স্কুলের পার্শ্বে জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পূর্ব কোণে এখন যে স্বাস্থ্য দপ্তরের অফিসারদের আবাসিক এলাকা তার ধার দিয়ে গোমতী পর্যন্ত ছোট্ট রাস্তাটি। খিল পাড়ার গো-সম্পদের মালিকেরা জগন্নাথ দিঘীর পশ্চিম পাড় হয়ে এই পথে গরু নিয়ে নদী পার হতেন।

নিকাশী খালের অস্তিত্ব বিলুপ্তি ঘটেছে আরো অনেক জায়গায়। জগন্নাথ দিঘীর দক্ষিণ পাড়ে মসজিদ এবং কে, বি, আই এর মাঝখানের নালা। প্রয়োজনে তা বন্ধ হয়েছে। কারণ কে, বি আই-এর খেলার মাঠ এবং মাঠের পর দক্ষিণে জাতীয় সড়কের প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত জনপদ রক্ষার কারণে। ধনী সাগরের পশ্চিম পাড়ের মাঝ বরাবর একটি জল যাওয়ার নালা ছিল যা ব্রহ্মাবাড়ীর পাশ দিয়ে (মহিম মাস্টার (দে) র বাড়ীর পাশ দিয়ে প্রবাহিত। মহিম দে গৌড়ীয় মঠের নিশি মহারাজের পিতা, সুখ্যাত সজ্জন, সমাজ সংস্কারক এবং শিক্ষক) সুখ সাগরের সঙ্গে যুক্ত। মহিম বাবুর বাড়ীর পশ্চাতে ধনী সাগরের পাড় পর্যন্ত বিস্তীর্ণ আবাদী নিম্নভূমি যার দক্ষিণ পাশ দিয়ে বর্তমানের উদয়পুর - অমরপুর সড়ক, বর্ষায় সেই নিম্নভূমির উদ্বৃত্ত জল ধনী সাগরের উদ্বৃত্ত জল এই নালা দিয়ে সুখ সাগরে এসে পড়ত। এখন সুখ সাগরের বুক চিরে জাতীয় সড়ক তৈরী হওয়ায় ডাক বাংলো পর্যন্ত বিশাল মনুষ্য সৃষ্টি ব-দ্বীপটি ঘনবসতি পূর্ণ উন্নত বস্তি। ফলে এই জলাধার বন্ধ হয়ে গেছে। প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ধনী সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম কোনের নিকাশী খালটিও। তেমনি আগ্রাসনের কারণে গুরুত্বহীন করা হয়েছে বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের পশ্চাতে অমর সাগরের দক্ষিণ - পুর্বের নিকাশী খালটি যা শহরের জল অমর সাগর হয়ে সুখ সাগরে চলে যেত। নদীই তো গিলে খাচ্ছে মানুষ!

দিগন্তে আলো

উদয়পুর প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার ইতিহাস এই রকম। চাকলার ম্যানেজার কেম্পবেল সাহেব কুমিল্লার সাব রেজিষ্টার নীলমণি দাসকে উপযুক্ত বিবেচনার সুপারিশ করে ত্রিপুরার মহারাজের কাছে পাঠান। মহারাজ নীলমণি দাসের সার্ভিস পরিবর্তন করে ত্রিপুরার মহারাজের অধীনে আনতে চেয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে লিখলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যায় ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে আগষ্ট সরকারী আদেশবলে। নীলমণি দাস সর্বপ্রকার ক্ষমতাযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত হলেন।

রাজ্যের শাসন সংস্কারের অভিপ্রায় নিয়েই কেম্পবেল সাহেব নীলমনি দাসকে মহারাজ সমীপে পাঠিয়েছিলেন। পদও ক্ষমতা প্রাপ্তির পর তিনি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সিদ্ধান্ত নেন। উত্তর বিভাগের মতন দক্ষিণেও শাসন শৃঙ্খল দৃঢ় করার জন্য রাজ্যের দক্ষিণ অংশ কে নিয়ে একটি নূতন বিভাগ স্থাপন করলেন। নাম হল " উদয়পুর বিভাগ"। উদয়পুর বিভাগের প্রথম শাসনকর্তার পদ দেওয়া হল উদয়চন্দ্র সেনকে।

কিন্তু সেই সময় বর্ষাকালে উদয়পুর খুবই অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠত। ঐ সময়ের পঁচাত্তর বছর পরেও বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়েও উদয়পুরে বর্ষায় ম্যালেরিয়ার তান্ডব ছিল। ক্যুইনাইন এবং সিঁদল শুটকীর অনুপানকে তখন ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক মনে করা হত। এখনো দক্ষিণ মহারানী, তৈনানী, ওয়ারেং বাড়ী এলাকায় প্রতি বছরই ম্যালেরিয়ার লোক মারা যায়। এই অবস্থায় উদয়পুরে শাসন কর্তারা থাকতে চাইতেন না। ফল হল উদয়পুর বিভাগের " সদর স্টেশন হল সোনামুড়া" নামক স্থানে। নূতন কেন্দ্রে শাসন ভার দেওয়া হল ঠাকুর ধনঞ্জয় দেববর্মাকে। ঐ সময় উদয়পুর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিল সোনামুড়া বিভাগ, বিলোনীয়া বিভাগ ও সাব্রুম বিভাগ। আর অমরপুর জুড়েছিল উদয়পুরের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে। এই হল প্রথম পর্ব।

দ্বিতীয় পর্বে দেখা গেল মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের ভূমিকা। ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে (১৯০১ খ্রীঃ) তিনি দক্ষিণ বিভাগকে এর বিশালত্ব এবং চলাচলের দুর্গমতার জন্যে বীরগঞ্জে, বর্তমানে অমরপুর মহকুমার সদর, একটি উপবিভাগের প্রশাসন কেন্দ্র করতে চাইলেন। কিন্তু বাস্তব কারণে, প্রশাসন কেন্দ্রের সঙ্গে দূরত্ব ও দুর্গমতা, এখানে প্রতিবন্ধক হল। সিদ্ধান্ত হল উদয়পুরকে প্রশাসনিক কেন্দ্র করে উদয়পুর বিভাগই গঠিত হবে। এর ফলে সোনামুড়া বিভাগীয় শাসন কেন্দ্রে গুরুত্ব হারাল। উদয়পুরই উদয়পুর বিভাগের শাসন কেন্দ্র হল এবং ১৩১১ ত্রিপুরাব্দের ৫ই অগ্রাহায়ন (১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের ১৯ / ২০ তারিখ) থেকে কাজ শুরু হল। ঐ সময়ে অমরপুরকে উদয়পুরের সঙ্গে জুড়ে রাখা হয়েছিল। এর ১৬ বছর পরে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অমরপুর উদয়পুর থেকে বিযুক্ত হয় এবং মহকুমায় উন্নীত হয়। ১৯০১ সালে, উদয়পুর থেকে রাজধানী চলে যাওয়ার ১৪১ বছর পর উদয়পুর তার আংশিক গৌরব ফিরে পেল।

বর্তমানে উদয়পুর দক্ষিণ জেলার প্রশাসন কেন্দ্র। এই জেলায় অমরপুর সাব্রুম বিলোনীয়া প্রাথমিক পর্যায়ে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাবে যে সব অঞ্চল উদয়পুর বিভাগে যুক্ত ছিল তার থেকে সোনামুড়া বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অমরপুর, সাব্রুম, বিলোনীয়া দক্ষিণ জেলায় রয়ে গেল। বিলোনীয়াকে সদর করে, সাব্রুম ও অমরপুরের অংশ নিয়ে একটি নূতন জেলা গঠনের নেপথ্য চেষ্টা সাম্প্রতিক অতীতে শোনা গিয়েছিল। বাস্তব কারণে তা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ঐ ভাবনার পশ্চাৎ কারণ হয় তো ছিল দক্ষিণ জেলা গঠনের সময়ে তার প্রশাসনিক কেন্দ্র কোথায় হবে তা নিয়ে একটি আবেগ তাড়িত রাজনৈতিক বিবাদ। তখন দাবী ছিল দক্ষিণ জেলার প্রশাসন কেন্দ্র শান্তির বাজারে করতে হবে। এনিয়ে আন্দোলন এবং রাজনৈতিক বাদানুবাদও চলেছিল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সুখময় সেনগুপ্ত তাঁর সিদ্ধান্ত অবিচল থেকে উদয়পুরকেই ঐ মর্যাদা দেন।

উদয়পুর এর আগে থেকেই মর্যাদার প্রতিযোগিতায় ময়দানে ছিল। দক্ষিণ জেলা সৃষ্টির আগে রাজ্যে তিনটি আঞ্চলিক শাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়। সদর, কৈলাশহর এবং উদয়পুর। কাছাকাছি মহকুমাগুলিকে জোনাল অফিসের শাসনাধীনে নিয়ে আসা হয়েছিল। আসলে রাজ্যকে একটি জেলা থেকে তিনটি জেলায় বিভাগের প্রশাসনিক উদ্যোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তীকালেও আমরা তাই দেখি। সদর মানে আগরতলা কেন্দ্রিক, সেটি হল পশ্চিম জেলা, কৈলাশহরকে কেন্দ্র করে হলো উত্তর জেলা, (পরে উত্তরে আমবাসাকে কেন্দ্র করে ধলাই জেলা হল) আর উদয়পুরকে কেন্দ্র করে হল দক্ষিণ জেলা। উদয়পুর জেলা সদর হবে তা আগে থাকতেই প্রশাসনিক স্তরে স্থির হয়ে গিয়েছিল। বিতর্ক চলাকালে উদয়পুরে জোনাল এস. ডি.ও ছিলেন সচ্চিদানন্দ ব্যানার্জী। তিনি দক্ষতার সঙ্গে সরকারী সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করেন। দক্ষিণ জেলার প্রথম জেলা শাসক গঙ্গাদাসকে অফিস করার জন্যে এক অংশ ছেড়ে দেওয়া হল।

১৯৭০ সালে ত্রিপুরাকে তিনটি জেলায় বিভক্ত করা হয়। উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম জেলা। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে দীর্ঘ এক বৎসর দক্ষিণ জেলার জেলা প্রশাসনের কাজ চলে আগরতলা থেকেই। বটতলার জনৈক রমেশ ব্যানার্জীর বাড়ীতে জেলাশাসক অফিস হয়। প্রথম জেলা শাসক ছিলেন অশোক নাথ আই. এ. এস। ১৯৭১ এ কুলেশ প্রসাদ চক্রবর্তী, নমিনেটেড্ আই. এ. এস উদয়পুরে এসে দক্ষিণ জেলার জেলা প্রশাসনের কাজ শুরু করেন। শঙ্কর টিলায় মহকুমা শাসকের অফিসের একটি অংশ জেলা শাসকের অফিসের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে ১৮৭৩ সন থেকে যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৯৭১ সালে এসে তা স্থায়ী রূপ পেল। রাজধানীর গৌরব উদয়পুর ফিরে পায়নি কিন্তু পূর্বতন উদয়পুর বিভাগ বর্তমানে দক্ষিণ জেলার প্রশাসন কেন্দ্রের গৌরব উদয়পুর অর্জন করে।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তার মূল্যবান গ্রন্থ " উদয়পুর বিবরণী" লেখেন। তিনি তার পুস্তকের পরিশিষ্ট "ক'-তে প্রথম পর্যায়ের উদয়পুর মহকুমা শাসক কতিপয়ের নামও কার্যকালের উল্লেখ করেছেন। ১৩১১ ত্রিপুরাব্দ (১৯০১ খ্রীঃ) থেকে ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ (১৯২৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত ধারাবাহিক ছাব্বিশ বছরের কার্যকারকদের নাম।

ক্রমিক নং	কার্যকাল	নাম
১।	১৩১১- ১৩১৭ ত্রিং ১৩১৯ - ১৩২৫ - ১৩২৭ ত্রিং ১৩৩৫ - ১৩৩৬ ত্রিং	শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্র দত্ত
২।	১৩১৭, ১৩১৮, ১৩২৫ ত্রিং	শ্রীযুক্ত রামকমল চক্রবর্তী
৩।	১৩১৮ ত্রিং	,, প্রমদারঞ্জন ভট্টাচার্য, বি.এ
৪।	১৩১৯, ১৩২০ ত্রিং	,, ঠাকুর রেবতী মোহন দেববর্মা।
৫।	১৩২০, ১৩২১ ত্রিং	,, বঙ্গচন্দ্র দেববর্মা (দেওয়ান)।
৬।	১৩২২, ১৩২৪ ত্রিং	,, মহিম চন্দ্র দত্ত, এম. এ; বি. এল।
৭।	১৩২৭, ১৩২৮, ১৩২৯ ত্রিং	,, ঠাকুর তারিনী চরণ দেববর্মা।
৮।	১৩২৭, ১৩২৮ ত্রিং	,, বিশ্বেশ্বর গুহ, বি. এ
৯।	১৩২৯, ১৩৩০, ১৩৩৩ ত্রিং	,, কুঞ্জ বিহারী চক্রবর্তী, এম. এ. বি.এল।
১০।	১৩৩০, ১৩৩১ ত্রিং	,, ঠাকুর কামিনী কুমার সিংহ।
১১।	১৩৩১ ত্রিং	,, হৃদয় রঞ্জন দেববর্মা।
১২।	১৩৩১ ত্রিং	,, জ্যোর্তিময় ঘোষ, এম. এ।
১৩।	১৩৩২ ত্রিং	,, কুসুম কুমার সেন; বি.এল।

উদয়পুরের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠার ব্যাপারটি একটি দীর্ঘ পরিক্রমা। যার শুরু হয়েছিল ১৮৭৩ খ্রীঃ নীলমনি দাস, দেওয়ানের হাত ধরে। তারপর হয়েছে নানা পরীক্ষা। এলেন উদয় সেন, ধনঞ্জয় ঠাকুর, তারাও পরীক্ষাই চালালেন। রাধা কিশোর মাণিক্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে উদয়পুর - এ স্থির হলেন। হয়তো উদয়পুরের নাম রাধা কিশোর করার ভিত্তি স্থাপনই করে গিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর উদয়পুরের নাম রাধাকিশোর পুর করেছিলেন। এখন জেলা সদর রাধাকিশোরপুর মৌজার অন্তর্গত। তারপর পঞ্চাশের দশকে বিপিন দত্ত হাকিম, শহর সম্প্রসারণের উদ্যোগ শুরু করেন। সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত।

(এরাজ্যে পুলিশ ও তহশীল কার্যাদি পুলিশ কর্মচারী দ্বারা নির্বাহ হইত। তৎপর হইতে থানা ও তহশীল কাছারী পৃথক করা হইয়াছে।'')

উদয়পুর বিভাগ

আমরা ১১০ বছর আগের উদয়পুর বিভাগের চতুঃসীমার উল্লেখ পাই উদয়পুর বিবরণীতে '' অমরপুর উপবিভাগ সহ বর্তমান উদয়পুর বিভাগের পশ্চিমে সোনামুড়া বিভাগ, দক্ষিণে বিলোনীয়া বিভাগও সাব্রুম বিভাগ, পূর্বে চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশ ও লুসাই পার্বত্য প্রদেশ এবং উত্তরে ধর্মনগর, কৈলাশহর খোয়াই ও সদর বিভাগ।'' ''স্থূলত!'' শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন। বর্তমানে উদয়পুর মহকুমার সীমা হল দক্ষিণে বিলোনীয়া সাব্রুম, মহকুমা, উত্তরে বিশালগড় মহকুমা পূর্বে অমরপুর এবং পশ্চিমে সোনামুড়া মহকুমা। আমরা শতাব্দী প্রাচীন উদয়পুর বিভাগের খোঁজ নেই।

সার্ভে জেনারেল অব ইন্ডিয়ার ১৯০৮ সালের মানচিত্র ভিন্ন বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে

ভিন্ন কোন মানচিত্র তখনো লব্ধ ছিল না (ব্রজেন্দ্র বাবুর সময়ে)। ব্রজেন্দ্র বাবু বলেছেন "এরাজ্যের ও ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের টপগ্রাফিক্যাল ম্যাপ প্রস্তুত করার সংকল্প স্থির করতঃ এতৎ সম্পর্কে কোন কোন বিভাগে কতক কতক কার্যও আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু এই অত্যাবশ্যকীয় কার্যটি এ যাবত সম্পন্ন না হওয়ায় ১৯০৮ ইং সনের নক্সা ভিন্ন স্থানীয় বর্তমান অবস্থা বুঝিবার ও বুঝাইবার অন্য নক্সা নাই।" ব্রজেন্দ্র দত্ত তার উদয়পুর বিবরণী ছাপেন ১৯৩০ ইং (১৩৪০ ত্রিং) সনে।

১৯১৬ খ্রীঃ অমরপুর আলাদা মহকুমা হয়ে যায়। তখন অমরপুরে রাজস্ব ও রেজিস্ট্রেশন সম্পর্কিত কিছু কাজ হত কিন্তু বিচারও ট্রেজারীর কাজ উদয়পুর বিভাগীয় অফিসেই সম্পন্ন হত। পৃথক উপবিভাগ তথা মহকুমা হওয়ার পরে সীমানা বিভাজনের প্রয়োজন হয়। ফলে বিভাজন রেখা বা সীমারেখা নির্দিষ্ট করতে হল। উত্তরে দক্ষিণে বিস্তৃত দেবতামুড়াই হল দুই মহকুমার সীমানা রেখা। এখনো তাই। ব্রজেন্দ্র বাবু মন্তব্য করেছেন — " এলাকার বিস্তৃতি অনুসারে অমরপুর উপবিভাগের অনেক কার্য সেখানেই নির্বাহ হইতে পারে। অমরপুরের সমতল স্থানে পার্বত্য প্রজা দিগকে স্থায়ীভাবে বসত করাইবার ও রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের সংস্থান ইত্যাদি কার্যের উপযুক্ত অনুষ্ঠানই প্রধান কার্য গণ্য হইতে পারে।"

তখন উদয়পুরে বিভাগে রাধাকিশোরপুরে একটি থানা এবং শালগড়া ও রাধাকিশোরপুরে দুইটি তহশীল কাছারী ছিল। ব্রজেন্দ্র বাবু লিখেছেন —" শ্রীযুক্ত কালী কিশোর চৌধুরী তালুকদার মহাশয়ের কাকড়াবনস্থিত ১নং কায়েমী তালুক ট্রাষ্ট সূত্রে শ্রী শ্রী যুত সরকারের তত্ত্বাবধানে আনীত হওয়ায়, তহশীল সংক্রান্ত কার্যের জন্য সেখানেও একটি তহশীল কাছারী আছে।" ১৩১৫ ত্রিং সনের (১৯০৫ খ্রীঃ) পূর্ব পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে তহশীল অফিসের দায়িত্ব পালন করত পুলিশ তথা থানাগুলি। ১৯০৫ খ্রীঃ থেকে পৃথক তহশীলদার নিযুক্ত হয়, দপ্তর ও পৃথক হয়ে যায়।

১১০ বছর আগে এই তো ছিল উদয়পুরের প্রশাসনিক কাঠামো। তখন উদয়পুর বিভাগ বলতে উদয়পুর অমরপুরের যোগফল। স্বাভাবিকভাবেই অমরপুরের দিকেও উঁকি মারতে হয়। উদয়পুরের পূর্বের এই ভূখন্ড পর্বতময়, অরণ্যসঙ্কুল। তখনো পর্যন্ত পর্যাপ্ত পথ চলাচলের ব্যবস্থা রহিত দুরাধিক্রম্য, দুর্গম অঞ্চল। আসলে উদয়পুরের অধীন এটি উপবিভাগ। তখনো অবশ্য অমরপুরে তিনটি তহশীল কাছারী ছিল। দূরত্ব এবং দুর্গমতার কারণে নাগরিক চলাচলের সুবিধার কথা বিচার কারে তহশীল কাছারির স্থান নির্বাচিত হয়েছিল। এর একটি বীরগঞ্জে, বর্তমানে অমরপুর মহকুমার মুখ্য প্রশাসনিক কেন্দ্র; অপর দুটি দু'ছড়ি এবং অম্পিতে। দু'ছড়ির তহশীল কাছারি এখন নেই; ১৯০৫ খ্রীঃ স্থাপিত ঐ তহশীল কাছারীটি রাস্তার " দুর্গমতার বশতঃ কিছুকালের জন্য দু'ছড়ি তহশীল কাছারী নূতন বাজার নামক স্থানে নামাইয়া আনা হইয়াছিল কিন্তু সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে ডম্বুরের রাস্তার কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই, এই জন্য বীরগঞ্জ তহশীল এলাকায় নূতন বাজার নামক স্থানে অদ্যাপি দুছড়ি তহশীল কাছারী অবস্থিত আছে। ঐ এলাকার কার্য নূতন বাজার হইতেই করা হইতেছে (ব্রজেন্দ্র দত্ত)।" একজন ছড়ি তহশীলের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল স্থানটি দুটি ছড়া, রাইমা ও সরমার সংযোগস্থল হিসেবে জলপথে যাতায়াতের সুবিধা হবে ভেবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি।

আবার যে নূতন বাজার এর কথা সে এখন অমরপুর বিভাগের সমৃদ্ধ জনপদও ব্যবসা কেন্দ্র ডম্বুর বা তীর্থমুখ যাতায়াতের পথে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। তবে জায়গাটির নাম নূতন বাজার হলেও বাজারটির নেহাত নূতন নয় তা বুঝা যায়, আজ থেকে অন্ততঃ দশবছর আগেও ঐ জায়গার নাম নূতন বাজারই ছিল। সময়ের দৈর্ঘ আরো বড় হওয়ার কথা কারণ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগেও ঐ নামই ছিল। তহশীল স্থানান্তরের সময়ের আগে থাকতেই। ডম্বুর প্রপাতের জল যে জনহিতে, আসলে বিদ্যুৎ বা সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে ঐ সম্ভাবনার উদ্রেক শতাব্দী প্রাচীন। উদয়পুর বিবরণীতে ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এই সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন। রাইমা- সরমার মিলিত স্রোতই গোমতী নদী। এটিই রাজ্যের বৃহত্তম নদী। এবং বাংলাদেশের মেঘনায় মিলে পদ্মায় সংযুক্ত হয়ে সমুদ্র সান্নিধ্যে। এই গোমতীর পাড়েই ত্রিপুরার রাজবংশের রাজারা ১১৭০ বছর রাজধানী স্থাপন (উদয়পুর) করে রাজ্য করেছেন। পার্বত্য ত্রিপুরার তখনো, রাজধানী বলে উদয়পুর এবং গোমতীর নিম্ন অববাহিকা সোনামুড়া (সমতল ত্রিপুরার সংলগ্ন) সহ জন সমৃদ্ধ অঞ্চল। প্রতিরক্ষা, যাতায়াত, বাণিজ্য, কৃষি সব দিক থেকেই গোমতীর গুরুত্ব। গোমতীর তীরে রাজধানী থাকায় গোমতীর ও বহু উত্থান পতনের ঘটনার সাক্ষী।

গোমতী বিধৌত উদয়পুর যেমন তেমনি গোমতীও উভয়ে উভয়ের সখ্যতায় মাখামাখি। কাজেই গোমতী ও তার অববাহিকা অঞ্চলের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, অধিবাসী, কৃষি, বাণিজ্য সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অমরপুর গোমতীর সমতল নিম্ন অববাহিকা। উদয়পুর, আরো নিম্নে। অধিকতর সমতল ও সমৃদ্ধ। কিন্তু উভয়ের মিলিত অবস্থানেই সার্বিকতা। কাজেই উদয়পুরের সঙ্গে, গোমতীর অরস্থানও গুরুত্বের প্রশ্নে সময়ের অমরপুরকেও আলোচনায় রাখতেই হয়। প্রায় সোয়াশ বছরের পূর্বের অবস্থান উদ্ধারে আমাদের স্মরণ নিতে হবে ব্রজেন্দ্র দত্ত মহাশয়েরই, যিনি ১১০ বছর আগে নিজে উপস্থিত থেকে যাবতীয় বিষয় পর্যবেক্ষণ ও অনুধাবন করেছেন, নিকট অতীতের বিষয়াবলী ও টাটকা ভাবেই লোকশ্রুতি ও প্রবীনের অভিজ্ঞতা থেকে লব্দ হয়েছেন এবং নিজে প্রশাসক ও বিজ্ঞান মনষ্ক হওয়ার সত্য উদ্ধারে তৎপর থেকেছেন। তাঁর দীর্ঘ উদ্ধৃতি আমাদের সামনে সোয়াশ বছর আগেকার সময়কে আমাদের সামনে জীবন্ত করে তোলে।

" সর্দিং ও ঝাড়িমুড়ার (কালাঝড়ি ও ধলাঝড়ি) মধ্যস্থিত কমলাখাস্থাত্তর নামক স্থানের যথাক্রমে দক্ষিণও উত্তর দিকে দিয়া রাইমা ও সাইমা (সরমা!) নামক দুটি বড় ছড়া দু'ছড়ি নামক স্থানে মিলিত হয়েছে (দুটি ছড়ার মিলন স্থল বলে হয়তো জায়গাটির নাম দুছড়ি)। এই স্থানে পূর্বে কাশীরাম নামক একজন চাকমা ব্যবসায়ীর বাড়ী ছিল, এই জন্যে দুছড়ি নামক স্থানকে " কাশী রামের আদান" অর্থাৎ বাড়ী বলিত। ইহাই পূর্ব কথিত দু'ছড়ি থানা বা তহশীল কাছারির জন্য নির্দিষ্ট স্থান (থানার লোকেরাই কাছারির কাজও করিত) এ স্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কমলা খা ও একজন চাকমার নাম ছিল বলিয়া কথিত আছে। যে সমতল স্থানে চাকমাগণ বাস করিত তাহাই হাওর বলিয়া পরিচিত হইতেছে। পূর্বে ঐ প্রদেশ গভীর অরণ্যময় ছিল। সাগরের অপভ্রংশ " হাওর"। এই জন্য এই "হাওর" বলিতে জলাভূমি বলিয়া লোকের মনে স্থান সম্পর্কে ভ্রম হইতে পারে।

রাইমা ও সরমা ছড়াকে স্থানীয় লোকে " ডাইন" ও " বাম" ছড়া বলিয়াও অভিহিত

করিয়া থাকে। এই ছড়া দুইটি একত্র মিলিত হইয়া আরো কয়েকটি ছড়ার সহিত মিলিত হওয়ার পর, ঝাড়িমুড়া অতিক্রম করিয়া তীর্থমুখ স্থান পর্যন্ত আসিয়া গোমতী নদীর আকার ধারণ করিয়াছে। ছোট ও বড় সাতটি জলপ্রপাতকে "ডম্বুর" বলে। এই স্থান হইতেই গোমতীর নামকরণ হইয়াছে। বিশেষতঃ অতিবৃষ্টি হইলে জলপ্রপাতগুলিকে স্থানীয় কথায় জলের " কিল্লা" বলা হয়, যথা — ছোট কিল্লা, বড় কিল্লা। ডম্বুরের অর্ন্তগত প্রধান প্রধান স্থানগুলির নাম যথা — ১) তীর্থমুখ; ২) চাইলতাতলী; ৩) ঘোড়দৌড়; ৪) কাটুয়াকুন্ড; ৫) সহস্র নালা; ৬) গোপাল চাঁদের নালা; ৭) কড়ি ছড়া, ৮) ইটের মুড়া; ৯) বেকা নাল; ১০) আমতলী মুড়া; ১১) সহস্র ধারার শেষ; ১২) বড় কিল্লা, ১৩) ঋষি মুড়া; ১৪) ছোট কিল্লা; ১৫) খই ফুইট্যা; ১৬) তিন তলিয়া; ১৭) চৌপুর দোয়ার এবং ১৮) মৎস্য তীর্থ।" মৎস্য তীর্থ নামের কারণ ছিল ঐ তীর্থে চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনেক মহাশৌল মাছ একত্রিত হত। সেখানে একটি স্থানের নাম " সাহেব ঘাট' ছিল বলেও ব্রজেন্দ্র বাবু উল্লেখ করেছেন। পলিটিক্যাল এজেন্ট পাওয়ার সাহেব এই পর্যন্ত এসেছিলেন বলে এই নাম হয়েছে, এটাই একশত বছর আগের লোকশ্রুতি।

রাইমা ও সরমার সঙ্গে অনেক ছোট ছোট ছড়া এসে মিলিত হয়েছে যেমন " শুকরাই, তকরাই, কৈলাংসিং, মৈলাংসিং কমলাখা ছড়া, পটাছড়া। "ওয়ানিথাং" পর্বত শ্রেণীর পূর্ব দিকে মাইনী নদী, কাছলং নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া কর্ণফুলী নদীতে পতিত হইয়াছে। পূর্বে এই সমস্ত স্থানও এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল (ব্রজেন্দ্র দত্ত)।"

দু'ছড়ির ভাটিতে সোনামুড়া পর্যন্ত, গোমতী নদীতে পড়েছে এমন উল্লেখযোগ্য ছড়াগুলি হল (১) বেগুন ছড়া, ২) হাজাছড়া, (ব্রজেন্দ্র বাবু জনশ্রুতির উল্লেখ করে বলেছেন এই ছড়ার উজানে লবনের খনি আছে বলে অনুমান), ৩) কড়ি ছড়া (এ ছড়ায় কড়ি পাওয়া যেত), ৪) একছড়ি (এর পার্শ্ববর্তী উচ্চ টিলায় এ রাজ্যের জঙ্গীগারদ শীতের সময় পূর্ব সময়ে স্থাপিত হইত (ব্রজেন্দ্র দত্ত)। ৫) কুর্ম্ম ছড়া, ৬) ডালাক ছড়া (এই ছড়ার পাড়ে পূর্বের বীরগঞ্জ থানা ও বাজার স্থাপিত ছিল। ৭) চেলাগাং ছড়া (এই ছড়ার পাড়ে রিয়াং সর্দার ভগীরথ চৌধুরীর বাড়ী ছিল), ৮) মৈলাক ছড়া, ৯) রাজকাং ছড়া; ১০) সর্বং ছড়া; ১১) ছনগাঙ্গ; (এটি একটি বড় শাখা । গোমতীর সঙ্গে মিলন স্থলকে ছনগাঙ্গ মুখ বলে) ছন গাঙ্গে তৈদু, জম্বুক, অম্পি, মিলছি; মাতৈকা, ফাতেকা, হালফা, সোনাছড়া প্রভৃতি ছড়া ছনগাঙ্গ এ মিলিত হয়েছে)। ১২) মহারানী ছড়া, ১৩) হীরাপুর ছড়া; ১৪) শিংলুং ছড়া, ১৫) পিত্রা ছড়া, ও দেওয়ান ছড়া (ব্রজেন্দ্র দত্ত উল্লেখ করেছেন উভয় ছড়ার উত্তর পাড়ে জমাতিয়া শ্রেণীর পার্বত্য প্রজার বাস। এরা কৃষি কাজ করেন। মৌজার নাম ব্রজেন্দ্র নগর) ১৬) ধোপাই ছড়া, (একে দুভাই ছড়াও বলে), ১৭) কুমুদানের খাল (ব্রজেন্দ্র দত্ত এর নামের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করে বলেছেন সর্দার খাঁ নামে একজন কমান্ডার ছিলেন। কমান্ডারের অপভ্রংশই কুমুদান। এখানেই গোমতী নদীর পথ পরিবর্তন হয়। এর ফলে উদয়পুরের উন্নয়নের সূচনা হয়), ১৮) জামজুড়ি ছড়া, এটি সুখ সাগরের জলার জল বহির্গমনের 'জুড়ি'। এটিই সুখ সাগরের জল গোমতীতে নির্গমণের পথ। ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন — " শালগড়া খাল কাটাইয়া গোমতী নদীর গতিপরিবর্তনের কার্য হওয়ার পূর্বে এই নালা দিয়া গোমতীর জল সুখ সাগরে প্রবেশ করিয়া ফসল নষ্ট করিত।

এখন আর সেরূপ না হওয়ায় উক্ত খাল দ্বারা স্থানীয় বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।" ১৯) হুদ্রা ছড়া; ২০) আমতলী ছড়া; ২১) শিলাটি ছড়া। এই ছড়া সম্পর্কে ব্রজেন্দ্র দত্তের সংযোজন হল " এই টিলার নিকট খাল কাটাইয়া গোমতী নদীর গতি পরিবর্তন করিয়া দিলে ছুরিজলা প্রভৃতি বহু স্থানের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়া যথেষ্ট আয় বৃদ্ধি হইতে পারে। কুমুদানের খাল এবং শালগড়া খালের ন্যায় এই শোষাক্ত খাল কাটাইবার প্রস্তাবও অনেককাল যাবতই চলিতেছে।" ২২) রানী ছড়া; ২৩) কানি ছড়া; ২৪) কামরাঙ্গাতলী ছড়া; ২৫) কাচি নদী। কাচি নদীর উৎপত্তি উদয়পুরে বারভাইয়া, পদ্মপুকুর, কমলা সাগর প্রভৃতি অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান সোনামুড়া মহকুমায় গোমতীর সঙ্গে মিলেছে। ১২ নম্বর মহারানী ছড়া থেকে সবগুলি ছড়াই উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত। ডম্বুর থেকে উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত জল পথের বিবরণের অর্ন্তভুক্ত রয়েছে বর্তমানের অমরপুর উপবিভাগের ভূখন্ডও। গোমতীর জলপথ, তার সম্পদ এর সঙ্গে ক্যাচমেন্ট এলাকার দৃঢ় সংযোগ, এই অবিচ্ছিন্নতা নিয়েই গোমতীর গুরুত্ব, একে কেন্দ্র করে জনপদ গড়ে উঠার কারণ, অঞ্চলের কৃষি উৎপন্ন, নাগরিকের অর্থাগম, ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনীতি।

একশ সোয়াশ বছর পূর্বেকার আর্থ-সামাজিক মানচিত্রের এটিই সংহত রূপ রেখা। এই জন্যেই ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুর অমরপুরকে এক বন্ধনীতে এনেছিলেন। আবার এও মনে করার কারণ রয়েছে গোমতী ও তার উপনদী সমূহ তথা গোটা গোমতী অববাহিকা গ্রন্থিত অর্থনীতির বিষয়টি বিবেচনা করেই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণেরও এই ব্যবস্থাই হয়। এবং দক্ষিণ বিভাগ সৃষ্টি হয় যখন তখন উদয়পুর নামক বিভাগীয় প্রশাসন কেন্দ্রের ভৌগোলিক চৌহদ্দীতে অমরপুর কেও জুড়ে রাখা হয়েছিল। আসলে উৎপন্নের দিক থেকে, পাহাড়ী অঞ্চল হলেও অমরপুরের পাহাড়ী উপত্যকাগুলি অধিকতর উর্বর। ফলে অধিক উৎপাদনক্ষম। আর কৃষিই তখনো, এবং বর্তমানেও সর্বাধিক অর্থকারী এবং বাণিজ্যিকর উপকরণ এই অঞ্চলে।

" এই বিভাগ হইতে তিল, কার্পাস, ধান, চাউল, সরিষা ও পাট প্রচুর পরিমাণে রাজ্যন্তরে রপ্তানী হইয়া থাকে; পক্ষান্তরে বাজে জিনিষ যথা ডাল, তামাক, মরিচ, লবন, বস্ত্রাদি ভিন্ন রাজ্য হইতে আমদানী হইয়া থাকে। উদয়পুর ও অমরপুরের রপ্তানীকৃত তিল, কার্পাস, সরিষা ও বনজ বস্তুর মাশুল সোনামুড়া ঘাটে আমদানী হইয়া ঐ বিভাগের আয় গণ্য হইয়া থাকে। অমরপর বিভাগের কতক তিল, সরিষা, কার্পাস চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশস্থ শিলাছড়ী ও পানছড়ি বাজারে রপ্তানী হইয়া থাকে (শিলাছড়ী, ত্রিপুরার অর্ন্তগত তখন স্থল বন্দর)। সরকার হইতে ঐ সকল মালের মাশুল আদায়ের উপযুক্ত বন্দোবস্ত নাই। তজ্জন্যও খুচরা মালের স্থানীয় মাশুল আদায় হয় বলিয়া এই বিভাগের সামান্য আয় হইতেছে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে।"

ব্রজেন্দ্র দত্তের এই বিবরণ থেকে জানা গেল সোনামুড়া সেই সময়ে ছিল গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর। জলপথই সর্বাধিক তখন গুরুত্বপূর্ণ বা বলা যায় একমাত্রও। গোমতীর বিশাল অববাহিকা অঞ্চলের কৃষিজ ও বনজ বস্তু নদীবাহিত হয়ে রাজ্যন্তরে যাচ্ছে। শিলাছড়ি পানছড়ি অমরপুর এবং তৎসন্নিহিত হওয়া সত্বেও, স্থলপথ ছাড়া বিকল্প ছিল না বলে, নিকটবর্তী অঞ্চলে জনবসতিরর অস্তিত্ব সত্ত্বেও বৃহৎ বাণিজ্য কেন্দ্র (স্থল বন্দর) হতে পারে নি। সোনামুড়ারও সেই কৌলিন্য আর নেই। যদিও বর্তমানে আইন অ-সিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে সোনামুড়া

অখ্যাতি অর্জন করেছে।

অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতার বৃহত্তর সংযোগ হইতে অনুষ্ঠান ভিত্তিক তিনটি জনজমায়েত বা মেলাকে কেন্দ্র করে। এর মধ্যে উদয়পুরে দুটি মেলা এর একটি শিবচর্তুদশী উপলক্ষ্যে এবং দ্বিতীয়টি হত ত্রিপুরা সুন্দরীর বাড়ীতে পৌষসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে। ১৯৩১ খ্রীঃ থেকে ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ীর মেলার সময় পরিবর্তিত হয়। তখন থেকে ঐ মেলা বসছে প্রতিবছর দীপাবলী উৎসবকে কেন্দ্র করে। তখন ছিল একদিনের মেলা। এখন ঐ মেলা দুদিনের টেনেটুনে তিনদিনও কখনো গড়ায় এবং এই মেলা হড়কা বানের মতো দুই দিনের লক্ষ লোকের জমাযেত ঘটে। এটিই এখন রাজ্যের বৃহত্তম মেলা। এই কৌলিন্য তার সাম্প্রতিককালের। ১৯৪৮ সাল থেকে শিবচতুর্দশী উপলক্ষ্যে মহাদেব বাড়ীর মেলা দেখছি। আমাদের শৈশবে মেলা গড়াত পনের দিন বা তারও বেশী সময়। মহাদেব বাড়ী এবং ষ্টেটব্যাঙ্ক মুক্ত মঞ্চ হয়ে মেলা গোটা সেন্ট্রাল রোড জুড়ে বিলাস চন্দ্র দেবের চন্দ্র তারা স্টোর্স পর্যন্ত দোকান পাট বসে যেত। দৈনন্দিন ব্যবহারের স্থায়ী অস্থায়ী জিনিষ থেকে মাছ সব্জির বাজারও মেলার অংশ হয়ে যেত। দূর দূরান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা আসতেন। সারা বছরের প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর জিনিষ ঐ মেলা থেকেই লোকে কিনত। সেই রকম এখন নেই; নেই সেই অযোধ্যাও, এখন অত্যুৎসাহীদের কতিপয়ের মনের উত্তেজনার সঙ্গে ধর্মীয় বাধ্যবাধতায় মেলা চললেও, সময়ের দৈর্ঘ্যে এবং গুরুত্বে এখন এই মেলা বামনাকৃতি। এখন ঘরের কাছেই পন্য হাঁটছে। তখন পণ্যের সন্ধানে বৎসরে একবার ঐ মেলায়। কাজেই ঐ তিন মেলা, অমরপুরের চন্ডীমঙ্গল বাড়ীর শ্রীপঞ্চমীর মেলা সমেত, সবকটি মেলারই বাণিজ্যিক গুরুত্ব যেমন ঠিক তেমনই সামাজিক গুরুত্বও ছিল। গৃহস্থলী ও সমাজের চাকায় ঐ মেলাই তেল যোগাত, দীর্ঘকাল। বৈশ্য সমাজ, পুঁজি, সামন্ত ব্যবস্থা ভাঙ্গছে, অর্থনীতি পাল্টে দিচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রেও বিবর্তন আনছে। এখন উদয়পুর সে জায়গায় পড়ে নেই। অমরপুরও না, সোনামুড়াও না। সর্বাধিক উত্থান উদয়পুরে, সোনামুড়া নদী বন্দরের গুরুত্ব হারিয়েছে। আর অমরপুরে উন্নয়নমুখী গ্রাম্য ধীরলয়ে হলেও উর্ধ্বমুখী।

১৩১৩ ত্রিং সনে (১৯০৩ ইং সনে পটাছড়া ও দোছড়ার মুখে একটি বাজার বসে (অমরপুরে) খুব অল্প সময়েই তা স্থানান্তরিত হয়ে ডম্বুরের ভাটিতে লেবাছড়ায় এটি চলে আসে। এটিই নূতন বাজার এবং তৎকালে বড় ব্যবসায় কেন্দ্র। উর্বর রাইমা ভ্যালীর কৃষিজ উৎপন্নের বড় ক্রয় বিক্রয় কেন্দ্র। অমরপুরে আরেকটি বড় বাজার ছিল অম্পি বাজার। ছনগাঙ্গ ও অম্পিছড়ার সংযোগ স্থল। এরও প্রতিষ্ঠা ১৯০৩ খ্রীঃ। তখন ত্রিপুরায় ৮০ তোলায় সের, মাপের ঐ মান নির্দিষ্ট ছিল।

বাজার স্থাপন মানে জীবন যাত্রার জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন। ঐ সময়ে এর প্রভাব সমতল অংশে কেমন পড়ে ছিল তা দেখা যাক। শ্রমমূলক বা কায়িক শ্রমের কাজে তখনই অনীহা দেখা দিচ্ছিল। ফলে মজুরের অপ্রতুলতা দেখা দেয়। কারণ " স্থানীয় লোক শ্রমজীবীর কার্য করে না। তাহা করা সম্মানহানিজনক মনে করে। ফসল উৎপাদন ও সংগ্রহের সময় ভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক আমদানী করা হত। তখন শ্রমিকের মজুরীর পরিমাণ দৈনিক দাঁড়াত এক টাকা থেকে দেড় টাকা। অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন ব্রজেন্দ্র দত্ত। এই এলাকায় ২ /

১ ঘর কুম্ভকার আছে। কাঠের কাজ করার লোক নাই। এরজন্যে বৃটিশ এলাকা থেকে লোক আনতে হয়। করাতি নেই। কাঠ সংগ্রহের জন্যও ভিন্ন রাজ্যের মুখাপেক্ষী। এমনকী অপর্যাপ্ত বনজ উপকরণ থাকা স্বত্ত্বেও ধারী, টুকরী প্রস্তুত করার লোক নেই। তা খরিদ করতে হয় কুমিল্লা থেকে। প্রয়াত দত্ত দেখেছেন —" সম্প্রতি কয়েকজন বাঙালী প্রজা ও মগ প্রজা টুকরী প্রস্তুত করে বাজারে বিক্রী করছেন। কাঠের সিন্দুক, টিনের বাক্স তাও আসে বৃটিশ এলাকা থেকে"। উদয়পুর অমরপুরে ধাতু দ্রব্য প্রস্তুতকারী তথা কর্মকার, স্বর্ণকার নেই। সিলেট থেকে কতিপয় কর্মকার স্থানীয় বাজারে এনে তা বিক্রি করতেন। পরে আমরা ও দেখেছি গুটি কয় পরিবার শ্রীহট্ট জেলার শায়েস্তাগঞ্জ থেকে উদয়পুরে দা টাক্কল কুড়াল তৈরীর কারখানা চালু করেছেন তাদেরই কতিপয় আত্মীয় বা পরিচিত অমরপুরেও তা চালু করেন। আসলে তখন মেলায় বা গ্রাম্য হাটে তামা, পিতল কাঁসের তৈরী গৃহস্থলী জিনিষও বাইরের ব্যবসায়ীরা এখানে এনে বিক্রি করতেন। ব্যবসাটা মন্দ লাভজনক ছিল না। আমরাও ১৯৪৮-৫০/৫২ সালে একজন শাঁখা বিক্রেতাকে দেখেছি এক নাগাড়ে ২/৩ মাস অমরপুরে গাওয়াল করতেন। ঐ ইন্টারভেলে উদয়পুরে এসে উদয়পুরে সধবাদের ধর্মরক্ষা করতেন এবং বিয়ের শাঁখের যোগান দিতেন। সমাজে তার সম্ভ্রম দেখে, সমাদর থেকে মনে হত তিনি সফল ব্যবসায়ী, এবং শ্রদ্ধেয়। স্থায়ী দোকানী নেই বলে ভ্রাম্যমান ব্যবসা। সে ষাট বাষট্টি বছর আগের কথা। ব্রজেন্দ্র দত্ত যখনকার কথা বলেছেন, সে সময়ে একশত দশবছরের পুরনো, মানে আরো পঞ্চাশ বছরের আগেকার কথা। অমরপুর ষাট বছর আগেও পায়ে হাঁটা পথেও দুর্গম। উদয়পুর যখন ব্যবসা কেন্দ্র হিসেবে স্থায়ী রূপ পাচ্ছে, আধুনিক যুগের সূচনা হচ্ছে তখন, উদয়পুরের মজুত থেকে মজুতদার ব্যবসায়ীরা তাদের ভ্রাম্যমান পাইকারদের মারফৎ ভাড়ে করে ডাকমুড়ার পথে পায়ে হাঁটিয়ে অমরপুরের গ্রামে সওদা পাঠাতেন। গৃহস্থালী তৈজস; সঙ্গে বের্মা বা সিঁদল শুটকী। তেল, নুন, মুদী সামগ্রী যেত, পাট, তিল, সরষে বয়ে আনা নৌকার ফিরতি যাত্রায়। ভ্রাম্যমান ব্যবসায়ীরা বা ফেরীওয়ালাও কখনো নৌকা ব্যবহার করতেন। তবে পয়সা বাঁচানোর জন্য এরা দলবদ্ধভাবে পদব্রজে যাওয়াই পছন্দ করতেন। ডাকও যেত হাঁটা পথে, পাহাড়ী পথের উদয়পুর সীমায় ডাকমুড়াতে হকারদের বিশ্রাম হত, ডাকের অদল বদল হত। ভল্ল সাঁটা শক্ত লাঠির বিপরীত দিকে ডাকের থলি বেঁধে সমপদও অস্ত্রের যৌথ পথ চলা। দল বেঁধে সঙ্গবদ্ধ চলায় গল্পে গুজবে পথের শ্রান্তি ওরা ভুলে যেতেন।

১৯৩০ খ্রীঃ ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, সর্বশেষ উদয়পুর বিভাগের প্রশাসনিক দায়িত্ব ছেড়ে যান। ঐ বৎসরেই আদম সুমারী (১৯৩০ খ্রীঃ) কাজ শেষ করেন ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা; এম, এ (হাভার্ড)। ঐ সেন্সাস রিপোর্টে কৃষি এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বি বরণে, উদয়পুরের উল্লেখও পৃথক ভাবে রয়েছে। ১৯৩০ খ্রীঃ উদয়পুর মহকুমার মোট আয়তন ছিল ২৯২ বর্গমাইল। জুম এবং সমতল চাষ সম্ভব এমন ভূমির সম্ভাব্য পরিমাণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন মোট ১৯৫ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে জুম চাষ উপযোগী স্থানের পরিমাণ ১৫০ বর্গমাইল আর সমতল চাষেব জন্য সম্ভাব্য জমির পরিমাণ ৪৫ বর্গ মাইল। এর সঙ্গে ৩৫ বর্গমাইল পাহাড়ের উপরের সমতলভূমি তথা মালভূমিতে চাষ কম সম্ভব বলে পরিসংখ্যান বলছে। মালভূমিকে বাদ দিলে ১৯৫ বর্গ মাইল পরিমাণ ভূমি প্রায় ৬৬ শতাংশ ভূমি জুম এবং

সমতলে চাষের উপযুক্ত ছিল। ফসলের বিভিন্নতা ছিল যেমন ধান, পাট, ইক্ষু, সরিসা, চা এবং অন্যান্য ফসল। তবে উদয়পুরে চায়ের বাগান নেই, চায়ের চাষ হত না। এখনো হয় না। ১৯৩০ খ্রীঃ উদয়পুর মহকুমায় ৩৫ বর্গমাইল এলাকায় ধান, ২.০ বর্গমাইলে; পাট ০.৫ বর্গমাইল এলাকায় ইক্ষু ০.৫ বর্গমাইলে সরিষা, তিল ইত্যাদি এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদিত হয়েছিল ২ বর্গমাইল এলাকায় মোট ৪০ বর্গমাইল এলাকা। পূর্বের যে এলাকা তা ছিল সর্বাধিক সম্ভাব্য এলাকার মোট পরিমাণ। পরবর্তী স্তরে দেওয়া হল প্রকৃত পক্ষে কত জমিতে ১৯৩০ খ্রীঃ সব ধরণের ফসল উৎপাদিত হয়েছে তার পরিমাণ মাত্র ১৪% ভূমি। এখানে গোটা রাজ্যের সঙ্গে একটি তুলনা করা যাক। মোট আয়তন ৪১১৬ বর্গমাইল। জুম চাষের উপযুক্ত জমি ২০০০ বর্গমাইল, নিম্ন সমতল ভূমির পরিমাণ ৫৪৫ বর্গমাইল আর মালভূমির পরিমাণ ৪০১ বর্গমাইল। পক্ষান্তরে মোট কর্ষিত হয়েছে এমন জমির পরিমাণ হল ৪৭১ বর্গমাইল ভূমি। সুতরাং এই রাজ্যের সম্যক ভূমির সঙ্গে তুলনায় হাল চাষ উপযোগী ভূমির পরিমাণ ২৩.৬%। কিন্তু বর্তমানে (১৯৩০ খ্রীঃ) হাল চাষ দ্বারা ফসল উৎপন্ন হচ্ছে ১১.৭% এ মাত্র। জুম কৃষি উপযোগী স্থানের পরিমাণ সম্যক আয়তনের তুলনায় ৫০% এর মধ্যে ২২.৭% প্রতি বর্ষে জুম কৃষি হচ্ছে (সূত্র ঃ সেন্সাস বিবরণী - পৃঃ ৯৯)। ১৯৩০ সনে এসে উদয়পুরে জুম চাষের উপযুক্ত জমির পরিমাণ কমতে থাকে। এ বৎসর ত্রিপুরায় ১১৪ বর্গমাইল জায়গায় জুমচাষ হয়েছিল। ঐ চাষ থেকে ধান উৎপাদন হয়েছিল দশ লক্ষ মন, কার্পাস (বীজ ছাড়ানো) ১৭৫৮৩ মন এবং তিল ২৩,২১০ মন। অন্যান্য ফসলের হিসেব রাখা হয় নি (সূত্র ঃ সেন্সাস রিপোর্ট, পৃঃ ১০০)।

উদয়পুর বিভাগে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিযুক্তদের পরিসংখ্যানের উল্লেখে দেখা যায় ১৯৩০ খ্রীঃ জুমিয়ার সংখ্যা ছিল ১৩৭৫ জন; হাল চালনাকারী কৃষকের মোট সংখ্যা ছিল ৬০১১ জন; এর মধ্যে জমির মালিক নিজে হাল চাষ করতেন এমন লোকের সংখ্যা ছিল ৫০৬৩ জন; রায়তীর সংখ্যা ছিল ২৬৮ জন। কৃষি মজুরের সংখ্যা ছিল ৬৮০ জন। ঐ রিপোর্টে দেখা যায় অমরপুর বিভাগে জুমিয়ার সংখ্যা ছিল সাধারণ চাষীর চার গুণেরও বেশী। সেই সময় সমগ্র রাজ্যে প্রতি ৫ জন কৃষকের মধ্যে ২ জন ছিল জুমিয়া অর্থাৎ শতকরা ৪০ জন। কৃষি উৎপাদনের বাইরেও বনজ সম্পদ ও উদয়পুর বিভাগ থেকে ব্রিটিশ ভারতে রপ্তানী হত। এর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল বহুল পরিমাণে মূল্যবান কাঠ এর মধ্যে শাল, গামাই অন্যতম। এছাড়া ছন, বেত, জ্বালানী কাঠ ও প্রভুত পরিমাণে রপ্তানী হত। ১৯৩০ খ্রীঃ জুম মূল্য কৃষি জীবীকায় ছিলেন ৮৮৯ জন পুরুষ, মহিলা ৪৮৬ জন।

উদয়পুর মহকুমায় আটটি (৮) বাজারের উল্লেখ করেছেন ব্রজেন্দ্র দত্ত। (১) গোলাঘাটি বাজার, (২) শালগড়া বাজার, (৩) জামজুড়ী বাজার, (৪) আমতলী বাজার, (৫) কাকড়াবন বাজার, (৬) হুরিজলা বাজার, (৭) পিত্রা বাজার, (৮) মহারানী বাজার। সে ১৯০১ খ্রীঃ বা তৎপরবর্তী কালের উল্লেখ। আবার ১৯৩০ খ্রীঃ সেন্সাস রিপোর্ট উদয়পুরে নয়টি বাজারের উল্লেখ রয়েছে। ১৯০১ এর ৮ টি বাজার ঠিকই রয়েছে। কেবল দুটির নাম পরিবর্তন হয়েছে। যেমন — গোলাঘাটি বাজার হয়েছে রাধাকিশোরপুর বাজার, এর বর্তমান নাম উদয়পুর বাজার। নূতন সংযোজন হল লোলঙ্গা। অপর হুরিজলা বাজারের নাম হয়েছে মির্জা বাজার।

লোলঙ্গাকে যদি আমরা নূতন সংযোজন বলি তবে অবশিষ্ট আটটি বাজারই বেশ প্রাচীন। এবং প্রত্যেকটিই প্রয়োজনেই গড়ে উঠেছিল। খুব সংক্ষেপে ঐ সব বাজার স্থাপনের পশ্চাৎ কারণ ব্রজেন্দ্র দত্ত ব্যাখ্যা করেছেন। বর্তমান উদয়পুর বাজারের নামই ছিল গোলাঘাটি বাজার। এই নামে বর্তমানে বিশালগড় এলাকায় একটি বাজার আছে। উদয়পুর বাজারের গোলাঘাটি নামাকরণের একটি কারণ ছিল। ব্যবসায়ীরা উদয়পুরকেই অমরপুর উদয়পুরের উৎপন্ন কৃষি পণ্য ব্যবসায়িক কারণে উদয়পুরেই মজুত করতেন, এখান থেকে বাইরে চালান দিতেন। প্রত্যেক বড় বড় দোকানের পেছনেই ছিল কৃষি উৎপন্নের গোলা। ব্রজেন্দ্র দত্ত বলেছেন — বহু সংখ্যক গোলার অস্তিত্বের কারণেই এর নাম হয়েছিল গোলাঘাটি। বর্তমানে যেটা সেন্ট্রাল রোড তা প্রস্থে ছিল ৪০ চল্লিশ হাত বা ষাট ফুট। ঐ রাস্তার দুই পার্শ্বেই ছিল গোলবাজার বর্তমান পরিচয়ে পূর্ব বাজার। " এই বাজারের পশ্চিম প্রান্তে সাপ্তাহিক হাট প্রতি রবিবার ও বুধবারে মিলিত হয়। প্রত্যহ প্রাতে দুধ তরকারী ইত্যাদিও এই স্থানে বিক্রয় হইয়া থাকে (ব্রজেন্দ্র দত্ত)।" ঐ চক বাজারের বাজার বার রবি বুধ এখনো রয়েছে তবে কার্যতঃ চকবাজার মূল বাজারেরই অংশ এখন এবং এটিই প্রাত্যহিক জমজমাট বাজার।

শালগড়া বাজার প্রতিষ্ঠা হয় ১৩১৪ ত্রিং তথা ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে শনি মঙ্গল বারে হাট বার। গরু, মোষ ও বিক্রী হয় সে বাজারে। বড় ধান চাউলের বাজারও। জামজুড়ী বাজার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তালুকদার দ্বারকানাথ বন্দোপাধ্যায় এবং প্যারীকিশোর দাসগুপ্তরা। আমতলী বাজার, কাকড়াবন, হুরিজলা, পিত্রা বাজারও সংশ্লিষ্ট তালুকদার যথাক্রমে মহেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী, কালী কিশোর চৌধুরী, উপেন্দ্র নাথ বসু, রজনী কান্ত ভট্টাচার্য (T.T.C -এর সদস্য কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্যের যিনি মেঘু ভট্টাচার্য নামেই সমধিক পরিচিত, ওনার বাবা। পেশায় উকীল)।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দেও সেন্সাস কর্তা সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ও উদয়পুরের সীমানা এবং জনসংখ্যার উল্লেখ করেছেন। তখনো দেখা যায় উদয়পুরের প্রশাসনিক সীমানার কোন পরিবর্তন হয় নি। তখনো উদয়পুরের আয়তন দেখা যাচ্ছে ২৯২ বর্গমাইল। সীমানা পূর্বে অমরপুর, দক্ষিণে বিলোনীয়া, পশ্চিমে সোনামুড়া, উত্তরে সদর বিভাগ। জনসংখ্যার তুলনা মূল পরিসংখ্যান দিয়েছেন। ১৯৩০ ইং (১৩৪০ ত্রিং) এবং ১৯২০ ইং (১৩৩০ ত্রিং) সনের তুলনা। ১৯৩০ ইং সনে উদয়পুরের জনসংখ্যা ছিল ৩৪,৩৯০ জন। ১৯২০ ইং সনে ছিল ২৭,২৫১ জন, বৃদ্ধি ৭,১৩৯ শতকরা বৃদ্ধি ২৬.২% । ১৯১০ ইং সনের জনগণনা অমরপুরের সঙ্গে একত্রে হয়েছিল। কারণ অমরপুর তখন উদয়পুর বিভাগের অর্ন্তগত। ১৯১৬ ইং সনে অমরপুর উদয়পুর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ থেকে পৃথক হয়ে যায়। দশ বছরে বৃদ্ধি ২৬.২ তা হলে বাৎসরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.৬% । স্বাভাবিকের চাইতে বেশী। এর থেকে এই অনুমিত হয় যে বৃটিশ ভারত থেকে বসতি স্থাপনে ইচ্ছুক মানুষ, ত্রিপুরায় এবং উদয়পুরে তখনো বসতি বিস্তারে সীমান্ত অতিক্রম করছিল। সংখ্যায় কম হলেও করছিল।

কিন্তু একটি একটি সংশয় হল উদয়পুর বিভাগে তহশীল অফিস কয়টি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা তার সেন্সাস রিপোর্টে বলেছেন উদয়পুরে দুটি তহশীল কাছারি। ব্রজেন্দ্র দত্ত বলেছেন তিনটি। ব্রজেন্দ্র দত্ত তিনটি নামও দিয়েছেন (১) রাধাকিশোরপুর ও (২) শালগড়া; (৩) কাকড়াবন। সোমেন্দ্র চন্দ্র সংখ্যার উল্লেখ করেছেন কিন্তু কোন নাম উল্লেখ

করেন নি। তবে অনুমান করা যেতে পারে সেন্সাস রিপোর্টে প্রথম দুটির কথাই অব্যাক্তভাবে রয়েছে। তৃতীয় কাকড়াবনের উল্লেখ হয় নি। কাকড়াবন সম্পর্কে ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন —"কাকড়াবনস্থিত ১নং কায়েমী তালুক ট্রাষ্ট সূত্রে শ্রী শ্রী যুত সরকারের তত্ত্বাবধানে আনীত হওয়ায় তহশীল সংক্রান্ত কাজের জন্য সেখানেও একটি তহশীল কাছারী আছে।" ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুরে সেন্সাস রিপোর্টও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী সুতরাং এই রহস্যের কারণ বুঝা গেল না। সেন্সাস রিপোর্টের ৩৮ পৃষ্ঠায় লেখা বিবরণই রহস্য সৃষ্টি করেছে।

বসতি বিন্যাসের আলোচনার আগে ভূ-মানচিত্রের একটি ধারণা আবশ্যক। উদয়পুরে পাহাড়, সমতল ও জলাভূমির সমন্বয় ঘটেছে। সমতলে যেমন বসতি গড়ে উঠেছে তেমনি পাহাড়ে ও। আর নয়া বসতিগুলিও গড়ে উঠেছে পাহাড়ী জনপদের ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন ছোট বড় স্রোতাস্তিনীর পাড়ে পাড়ে। বহু সংখ্যক ছড়া এই মহকুমায়। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া বৃষ্টির জল তাদের গতিপথ তৈরী করেছে। এক ছড়ার জল আরেক ছড়ায় মিলিত হয়ে জলধারাকে পুষ্ট করেছে, প্রসস্থ করেছে। আর পাহাড়ের মধ্যবর্তী অংশে কোথাও সমতল উপত্যকা কোথাও বৃহৎ জলাশয় গড়ে উঠেছে। কাজেই পাহাড় সমতল আর জলাভূমি নিয়েই উদয়পুর শহর। উদয়পুর, খিলপাড়া, জামজুড়ী, ছাতারিয়া, শালগড়া, আমতলী গোমতীর উভয় পার্শ্বের এই অঞ্চলটুকু বাদ দিলে উদয়পুরও নাতি উচ্চ টিলা পাহাড়ের অলঙ্কার ধারণ করে রয়েছে এই পাহাড়গুলিই ছড়ার সৃষ্টি করে দুটি বৃহৎ জলাধার সৃষ্টি করেছে। একটি সুখ সাগর, অপরটি হুরীজলা। হদ্রা জলা, আমতলী জলা, কুশামারা নিম্নভূমি কিন্তু এগুলি মরশুমী জলাধার। ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন — " গোমতী নদীর উভয় পার্শ্বে অনেকগুলি গাঙফিরা বা মরা গাঙ ফিরা দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল গাঙ ফিরা ও গাঙ আইল দ্বারাই পূর্বকাল হইতে অতিবৃষ্টি বন্যার সময় নদীর উভয় তীরবর্তী স্থানের ফসল বন্যার জল প্রবাহ হইতে রক্ষা পাইয়া আসিতেছে। শালগড়া খাল ও কুমুদানের খালের পরিকল্পনাও এই ভাবে করা হইয়াছিল (উদয়পুর বিবরণী পৃঃ ১৬)।" ডাকমা জলা, হদ্রাজলা, আমতলী জলা জামজুড়ী গাঙফিরা এগুলি গোমতীর উদ্বৃত্ত জলাধার। এরা দধিচী ছিল। নিজে আত্মদান করে অপরকে রক্ষা করত। গোমতীর জল মহকুমার দুটি বৃহৎ জলাধারেও বর্ষায় সঞ্চিত হত। এর সর্ববৃহৎটিই সুখ সাগর। এই প্রাকৃতিক হ্রদ বেশ কটি ছড়ার জলে পুষ্ট আর দ্বিতীয়টি হুরিজলা, এটিও বেশ কয়েকটি ছড়ার জলে পুষ্ট। তবে জামজুড়ী খাল দিয়ে সুখ সাগরে এবং রানী ছড়া বা খাল বা রানী নদী দিয়ে বর্ষায় গোমতীর জল ঐ দুটি জলাধারে ঢুকে। আবার অন্য সময়ে এই দুটি জলার জল উল্লিখিত নালা পথে গোমতীতে গিয়ে পড়ে। সুখ সাগরের জল নির্গমন করে ব্রহ্মাছড়া, সোনাই ছড়া, মুরগা ছড়া, পাইয়াছড়া, বাঙ্গাল ছড়া। আর হুরিজলা শামুকছড়া, তারপাদুম ছড়া, গঙ্গাছড়া, ইচাছড়া, মির্জা ছড়া, খালমাই ছড়া। জামজুড়ী খাল আর রানী ছড়া দিয়ে এই দুই জলাশয়ের গোমতীর সঙ্গে সংযোগ।

এবার পাহাড় পর্বত। উদয়পুর বিভাগে চারটি পর্বত শ্রেণীর উল্লেখ করা হয়েছে বিবরণীতে —(১) সদিং পর্বত শ্রেণী; (২) ঝারিমুড়া, (৩) দেবতা মুড়া; (৪) কাকড়াবন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত শ্রেণী। এই বর্ণনা সংহত উদয়পুর বিভাগের যখন অমরপুরও এর সঙ্গে জুড়ে ছিল।

আসলে দেবতামুড়া ও কাকড়াবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় ইতস্ততঃ এমনভাবে ছাড়ানো যে ২৯২ বর্গ মাইলের বেশীর ভাগই টিলা বা পাহাড় আর ঝাড়িমুড়ার দক্ষিণ দিকের নামই বড়মুড়া এবং এক অংশ দেবতামুড়া নামে চিহ্নিত। উত্তর দিক হল আঠার মুড়া। সেই অর্থে ঝাড়ি মুড়াকে কেন্দ্রে রাখতে হয়। ব্রজেন্দ্র দত্ত লিখেছেন — " ১৯০৮ ইং সনের জরিপ নক্সায় ত্রিকোনমিতি জরিপ স্তম্ভগুলির স্থান নির্দিষ্ট আছে। এই জরিপ ষ্টেশনগুলি প্রতিবৎসর বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ব্যয়ে এ রাজ্যের পলিটিক্যাল বিভাগের যোগে মেরামত হইয়া থাকে।

উত্তরে লুসাই প্রদেশ ও দক্ষিণে চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের পর্বত শ্রেণীর সহিত বর্তমান উদয়পুরের উপরোক্ত পর্বত শ্রেণীর সংযোগ আছে। বর্তমান সীমানা মতে ত্রিপুরা রাজ্যের চতুঃসীমা যেরূপ খর্ব করা হইয়াছে, পুর্বে সীমানা তাহা অপেক্ষা বহু বিস্তৃত ছিল। প্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথ তীর্থেও ত্রিপুরেশ্বরের পূর্ব কীর্তি বিরাজমান আছে। স্বাধীন ত্রিপুরেশ্বর গোবিন্দ মাণিক্য ১৩১২ খ্রীঃ এই তুঙ্গ পর্বত শৃঙ্গে চন্দ্রনাথদেবের প্রাচীন মন্দির নির্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন (পৃঃ ১৯)।"

মহকুমার পাহাড় ও টিলাভূমি থেকে নির্গত জলস্রোতগুলির গুরুত্ব কেবল মহকুমার দুটি বৃহৎ জলাশয় বা হ্রদের পুষ্টি বিধান নয়, আসলে জনবসতিও গড়ে উঠেছে এদের পাড়ে পাড়ে। এরাই জুগিয়েছে পানীয় জল, সেচের জল, মাটির উর্বরতা, অর্থনীতির ভিত্তি কৃষির আনুকূল্য। হুরিজলায় এসে যে সব ছড়া পড়েছে এর মধ্যে শামুক ছড়ার দৈর্ঘ্য এগার কিলোমিটার; তারকপাদুম ছড়া বাইশ কিলোমিটার, গঙ্গাছড়া সাত কিলোমিটার। এদের সঙ্গে মিশেছে ছোট ছোট বহু স্রোতস্বীনী। মাইক্রোসা, রামছড়া, কুকীছড়া, পিপারিয়াখলা ছড়া, গর্জি ছড়া, ইচাছড়া, এদের শাখা প্রশাখা ছড়িয়ে আছে তিন মহকুমা জুড়ে, উদয়পুর, বিলোনীয়া, সোনামুড়া। এদের অর্ন্তবর্তী ভূমিতে রয়েছে তেত্রিশটি গ্রাম পঞ্চায়েত। এবং দুই লক্ষাধিক লোকের বসতি। গ্রাম পঞ্চায়েত গুলি হল — ১) গর্জিছড়া; ২) তৈনানী; ৩) গুরুভক্ত পাড়া; ৪) দাতারাম জোলাইবাড়ী; ৫) কালাবন, ৬) সীমসীমা; ৭) গঙ্গাছড়া; ৮) ধূপতলী; ৯) যশমুড়া; ১০) পিপারিয়া খলা; ১১) তূলামুড়া; ১২) উত্তর তূলামুড়া; ১৩) হোলাক্ষেত; ১৪) পতিছড়ি (বিলোনীয়া মহকুমায়); ১৫) গারো কলোনী; ১৬) উত্তর তাকমা ছড়া; ১৭) দক্ষিণ তাকমাছড়া ১৮) কাঁঠালিয়া; ১৯) বীরচন্দ্র, ২০) মনু উঃ ২১) মনু দঃ; ২২) কাকড়াবন; ২৩) রানী, ২৪) মির্জা; ২৫) উপেন্দ্র নর; ২৬) জিতেন্দ্র নগর; ২৭) শামুকছড়া; ২৭) মাইক্রোসা; ২৮) সুন্দুল; ২৯) মোহনভোগ; উঃ ; ৩০) মোহন ভোগ দক্ষিণ; ৩১) তৈবান্দাল / সোনামুড়া) ৩২) মগপুষ্কুরুনী; ৩৩) দুধ পুষ্কুরুনী। এহল বর্তমান কালের কথা।

এর থেকে মালার মতন ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য স্রোতস্বীনীর গুরুত্ব বুঝা যায়। ওদের রসে মাটি সরস; আর মাটির সরসতা মানুষ নিংড়ে নিয়ে বাঁচে বাড়ে। কেবল সমতলে নয়, পাহাড়েও। ১৯০১ - এ ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ছিল ১,৭৩,৩২৫ জন। ১৮৭২ - এ ছিল ৩৫,২৬২ জন। পার্বত্য ত্রিপুরার জনসংখ্যা। ১৯০১-এর হিসেবে বিভাগগুলির পৃথক জনসংখ্যা জানা যাচ্ছে না। সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা মহাশয় তার সেন্সাস রিপোর্ট পূর্ববর্তী সময়ের হিসেব দেখাতে যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন তাতে বিভাগের পৃথক সংখ্যা নেই। বা অন্য কোন সূত্রেও তা সংগ্রহ করা গেল না। তবে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিটি বিভাগের পৃথক হিসেব রয়েছে। জনসংখ্যা,

জীবীকা, শিক্ষিতের সংখ্যা, ধর্ম সব বিষয়ে পৃথক পরিসংখ্যান। অতএব ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের, ঐ নিরিখে উদয়পুরের জন চরিত্র এবং জনসংখ্যার উল্লেখই মাত্র তার আগে হান্টারের 'Statistical Account of Bengal'1874-75 - এর একটি পরিসংখ্যান, সোমেন্দ্র চন্দ্র তার সেন্সাস বিবরণীতে ব্যবহার করেছেন এর পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি ঐ একই উদ্দেশ্যে দেওয়া হল-

সারণী — নং ২

জাতি বা উপজাতির নাম	সংখ্যা		
পার্বত্য জাতি			
১। টিপরা	২৭,১৪৮	৭। হিন্দু	৪,৩৩৯
২। জমাতিয়া	৩০০০	৮। মুসলমান	১৪,২২৮
৩। নোয়াতিয়া	২১৪৪	৯। মণিপুরী	৭,০৪৫
৪। রিয়াং	২,৪৩৫	১০। খৃষ্টান	১১২
৫। হালাম	৫,৫৭৭	১১। অন্যান্য	৬,১৭৩
৬। কুকি	২০৪১	অনুপজাতির মোট সংখ্যা	৩১,৮৯৭
মোট পার্বত্য জাতি	৪২,৩৪৫		

ত্রিপুরার মোট জনসংখ্যা ৭৪,২৪২ জন।

দেখা যাচ্ছে রাজ্যের পার্বত্য উপজাতি জনসংখ্যা, ৪২,৩৪৫ - এর পরেই রয়েছে মুসলমান জনসংখ্যা ১৪,২২৮ জন। একজন গবেষক সমসের গাজীর সেক্যুলরিজমকে উর্দ্ধে তুলতে গিয়ে ত্রিপুরায় রাজাদের সাম্প্রদায়িক বলেছেন। জনসংখ্যার এই বিন্যাস ঐ অনুমানকে আদৌ সমর্থন করে না। যদি তেমনটাই হত হিন্দুর তুলনায় মুসলমানদের জনাধিক্য পার্বত্য ত্রিপুরায় হতে পারত না।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের সোমেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মার দ্বারা প্রস্তুত পরিসংখ্যান থেকে ঐ বছরে উদয়পুরের জনচিত্রের রূপ রেখাটি এরকম। উদয়পুর মোট উপজাতি জনসংখ্যা ৯৭০৫ জন। এর মধ্যে পুরাণ ত্রিপুরীর সংখ্যা ৬৯০ জন, তাদের ২১ জনের মুখ্য জীবীকা জুম। প্রত্যক্ষ কৃষিতে ১১৯ পরোক্ষ জুম এবং কৃষিতে সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৮ এবং ২০ জন। শিক্ষিতের সংখ্যা ৪৫ জন। ঐ সম্প্রদায়ের কাছে তাঁত ছিল ১৪৩ টি চরকা ছিল ১১৬ টি।

পুরো বিষয়টিকে ভিন্নভাবে দেখানো যায়।

ক্রমিক নং	উপজাতি	মোট	মুখ্য পেশা জুম - কৃষি	অন্যান্য	গৌন পেশা জুম - কৃষি	অন্যান্য	শিক্ষিত	তাঁত	চরকা
১।	পুরাণ ত্রিপুরী	৬৯০	২১-১১৯	৮	১৮-২০	৫১	৪৫	১৪৩	১১৬
২।	দেশী ত্রিপুরী	১৪২	— ১১৯	৪	৪ - ১	১	১৫	—	—
৩।	জমাতিয়া	৫০২৮	১৫৯ -১০৬৩	২০	১৭৬ - ৩৯৫	৭১৮	১৫৯	১১৬১	১০১৩
৪।	রিয়াং	২১৫১	৫৮০ -৯১	২৬	৩৫৯ - ১৮	২২২	১১	১৯৭	২৩৪
৫।	নোয়াতিয়া	১১৭৭	৮০ -২১২	২৮	৫১ - ১১২	৮৮	৫৪	২১৫	১৬৫
৬।	হালাম কলই	৫৭৭	৯০ -২০	১০	২৬ - ৭	১৫১	০	১২৩	১১৮
৭।	হালাম মলসম	১৮৬৫	৪৬২ -১০৪	৮০	১১৩ - ৮৩	৩৭৩	৩	৩৮৫	৩৯৪
৮।	লুসাই	৭৫	২১ -০	০	১২ - ০	১৪	২	২২	২২

প্রভিন্সিয়াল টেবল — ২ অনুযায়ী মুসলমানের সংখ্যা ১৯৩১৯ জন, তাদের ৮৮ জন পুরুষ শিক্ষিত ৩ জন মহিলা শিক্ষিত। হিন্দুর সংখ্যা ১৪,৯৯৫ জন ৫০ জন স্ত্রী এবং ১৩৭২ জন পুরুষ শিক্ষিত। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা ছিল ৭৬ জন। এদের মধ্যে কেউ শিক্ষিত ছিল না। উভয়ের যোগফল একত্র করলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুর মহকুমার মোট জন সংখ্যা ছিল ৪৪০১৯ জন। এর মধ্যে উপজাতি ৯,৭০৫ জন, হিন্দু, ১৪,৯৯৫ জন এবং মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১৯৩১৯ জন। এ সমসের গাজীর উদয়পুর লুটের ফলে নয়। শ্রমের সচলতার কারণেই মুসলমান প্রজাদের এরাজ্যে বসতি বিস্তার।

এই তথ্য থেকে জানা গেল উদয়পুরে পুরাতন ত্রিপুরা, দেশী ত্রিপুরা, জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, কলই, মলসম এবং লুসাই এর বসতি ছিল পার্বত্য উপজাতিদের মধ্যে। তবে বর্তমানে কোন লুসাই উদয়পুর মহকুমায় নেই। ঠাকুর সোমেন্দ্র চন্দ্র তার সেন্সাস রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন ইদানীং উদয়পুর বিভাগে ইহারা বসতি স্থাপন করিতেছে (পৃঃ ৯৩)। সে ১৯৩০ খ্রীঃ এর কথা। কিন্তু বিস্ময়কর ভাবে ঐ পরিসংখ্যানে কুকীরা বাদ গেছেন। উদয়পুর মহকুমার তুলামুড়া ও মির্জার অর্ন্তবর্তী স্থলে এখনো একটি কুকী কলোনী রয়েছে, ধূপতলীতেও কিছু সংখ্যক কুকীর কলোনী রয়েছে। এরা সাম্প্রতিক বসবাসে আছেন এমনটা নয়। যেভাবেই হোক এরা কাব্যে উপেক্ষিত থেকে গেছেন। মোদ্দা কথা হল বর্তমানে উদয়পুর মহকুমায় স্বল্প সংখ্যক কুকীর বাস আছে। ব্রজেন্দ্র দত্ত ও কুকীদের কথা উল্লেখ করেছেন। তার বিবরণীতে (৭৩ পৃষ্ঠায়) দেখা যায় " পূর্বে উদয়পুরের দেবতামুড়া ও তন্নিকটবর্তী স্থান সমূহে অনেক কুকীর বাস ছিল। তবে সেখানে এখন কুকী নেই। উত্তর চন্দ্রপুর মৌজায় কুকী পাথর একটি জায়গার নাম এখনো ঐ নাম।

শতাব্দীকাল আগেও কুকীদের সম্পর্কে উদয়পুরবাসীর ভয় ভীতি ছিল। তার কারণ বার বার কুকীদের নরহত্যা ও নৃশংস ভাবে উদয়পুর লুঠ করার ঘটনা। " ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে একদল কুকী উদয়পুর লুন্ঠন করিয়া এবং কয়েকটি গ্রাম ও বাজার ভষ্মীভূত করিয়া কতগুলি লোকের প্রাণ বধ করতঃ চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তথায় চাকমা সর্দার কালিন্দা রানীর অধিকৃত কয়েকখানা গ্রাম অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করার পর গর্ভণমেন্টের একদল পুলিশ সৈন্যের সহিত তাহাদের একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। কুকীগণ তাহাতে পরাস্ত হইয়া পর্বতে পলায়ন করিয়া ছিল। দারপাই, দুথাঙ্গা, লাহুয়া প্রভৃতি কুকী রাজাদের সঙ্গেই হার যোগ ছিল।"

১২৬৬ সনে শ্রী পঞ্চমী দিবস উদয়পুর খন্ডল পরগণার কোলাপাড়া, কেতরঙ্গ, খেজুরিয়া, টেটেশ্বর প্রভৃতি মৌজা আক্রমণ ও লুঠ করিয়াছিল। মুন্সী আব্দুল লতিফ কর্তৃক বিরচিত "কুকী উপদ্রব বা কুকী নামা" গ্রন্থে এই ঘটনার বিষয় বিবৃত আছে। ১২৮০ ত্রিং সনেও (১৮৭০ খ্রীঃ) উদয়পুরে একবার কুকীগণ উদয়পুরবাসীদিগের ত্রাস জন্মাইয়া ছিল। ত্রিপুরার সৈন্যা ধক্ষ্য গুর্খা জমাদার, দুলংবাড়ী নামস্থানে দুঃসাহসিকতার সহিত কুকী দিগকে বাঁধা প্রদান করিয়া ছিলেন।

১২৩৭ ত্রিং সন (১৮২৭ খ্রীঃ) শম্ভু চন্দ্র ঠাকুর কুকীদিগের সাহায্যে উদয়পুরে পুনঃ পুনঃ উৎপাৎ আরম্ভ করিয়াছিলেন (কৈলাশ সিংহ-রাজামালা)।" উত্তর

১৯৩০ খ্রীঃ ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুরে ১৫টি পার্বত্য প্রজাগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ করেছেন। এরা হলেন জমাতিয়া, রিয়াং, নোয়াতিয়া, পুরান, ত্রিপুরা, মলছুম, কলই, কাইপেং, বোম, বেথু, রূপিনী, কুকী, চাকমা, মগ, মুড়াসিং ও তোতারাম। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত লিখেছেন — " পার্বত্য প্রজাগণ অপেক্ষাকৃত জঙ্গলাকীর্ণ নির্জন বাসস্থানে বাস করাই অধিকতর পছন্দ করে, আবাদ এবং বাঙ্গালী প্রজার বিশেষত মুসলমান শ্রেণীর প্রজার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ক্রমশঃ সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহারা নদী বা ছড়ার জলস্রোত ব্যবহার করিতেই অধিক ভালবাসে। অধুনা কোন কোন শ্রেণীর পার্বত্য প্রজা চাষ আবাদ কার্যে মনোযোগ দিতেছে। পক্ষান্তরে অনেকে পুষ্করিনী খনন করাইয়া ব্যবহার উপযোগী জলেরও সংস্থান করিতেছে। কিছুকাল পূর্বে তাগাবী ইত্যাদি অনুষ্ঠান দ্বারা ইহাদের উন্নতির চেষ্টা চলিতেছে। অর্থাৎ উপজাতিরা একশত বছর আগে থাকতেই সমতল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে উদয়পুর শহরে মাত্র দুটি উপজাতি পরিবার আমরা দেখেছি। একটি দেববর্মা পরিবার বর্তমান নিউটাউন রোডে শিশুমঙ্গল হোমিও হল এবং ইন্দুভূষণ রায়ের বাড়ী অর্থাৎ তালতলী দিঘীর পশ্চিম পাড়ে। আর একটি রিয়াং পরিবার কৃষ্ণ চৌধুরী দারোগার বাড়ী, চকবাজার থেকে অমর সাগরের পশ্চিম পাড়ে যেতে বাজার সংলগ্ন ঢালু জায়গার ডান পার্শ্বে। প্রথমোক্ত বাড়ীটি ছিল জনৈক দেববর্মার।

১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রত্ন মাণিক্য সিংহাসনে আরোহন করেন। রত্নমাণিক্যের সময় হতেই মুসলমানদের সঙ্গে ত্রিপুরার সংস্রব শুরু হয়। এজন্যে পার্শি ও বাঙ্গালী ভাষায় রাজকার্য নির্বাহ আবশ্যিক হয়েছিল। বাঙ্গলার শাসন কর্তা তুঘ্রল খাঁর সহযোগিতার জন্যে —

" দশহাজার ঘর বঙ্গ দিতে আজ্ঞা হইল।
বঙ্গে আসি সেনা চারি হাজার পাইল।।
ভদ্রলোক প্রভৃতি যতেক, নব সেনা।
স্বর্ণ গ্রামে পাইল শ্রীকর্ণ কত জনা।।
সে সব সহিতে রাজা রাজ্যেতে আসিল।
রাঙামাটি দুই হাজার ঘর বসাইল।।
রত্নপুরে বসাইল সহস্রেক ঘর।
যশপুরে বসাইল পঞ্চ শত ঘর।।
হীরাপুরে পঞ্চশত ঘর বসাইল।
এই মতে রাঙামাটি নব সেনা গেল।।

সামন্ত বিকাশ ঘটানোরা উদ্যম। পুঁজি যেমন সাম্যকে বিনষ্ট করে তেমনি এই নবসেনা সমৃদ্ধিকে আবহন করল কিন্তু ভূমিপুত্রদের আরো গভীরে ঠেলে দিল।

১৯০০ সালের গোড়া থেকে বাইরের পুঁজি উদয়পুরে আসতে শুরু করে। এই এলাকার কৃষি পণ্য বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে পুঁজির অনুপ্রবেশ। নক্ষত্র মাণিক্য, গোবিন্দ মাণিক্য বা তারো আগে ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ শতকে ও ত্রিপুরার উৎপন্ন বাইরে যেত। জুমের কার্পাস এতটাই উৎকর্ষ ছিল যে ত্রিপুরার কার্পাস সুদুর জাপানেও রপ্তানী হত। দীর্ঘ আঁাস, মসৃণতা আর প্রাকৃতিক রং বেবানা কাপড়ে প্রাকৃতিক রং-এর ছায়া ফেলত ফলে বাইরের রং-এর ব্যবহার

প্রয়োজন হত না। টার্ভানিয়েরের বর্ণনায় নক্ষত্র মাণিক্যের সময়ের বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় আসামের রাজদূত রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুন দাস বৈরাগী তাদের ত্রিপুরায় আসা যাওয়ার পথে ত্রিপুরার কতিপয় বাণিজ্য কেন্দ্র প্রত্যক্ষ করেছেন। ঐ সব বাণিজ্য কেন্দ্রে পন্য আমদানী এবং ক্রেতা বিক্রেতার বিষয়ও এবং চীন পর্যন্ত বানিজ্য প্রসারের চাক্ষুস বিবরন লিপিবদ্ধ কররেছেন দুই দূত। ঐ সব বানিজ্য কেন্দ্রে সরাসরি উৎপাদকরা আসতেন, বহিরাগত ব্যাবসায়ীরাও আসতেন। পন্যের আদান প্রদান হত সরাসরি। গোবিন্দ মানিক্যের সময়ের যে বানিজ্য বিবরন তাতে মনে হয় বাজারের উপর সরকারের নজর ছিল। বিশেষ করে স্বর্ন এবং সিল্ক এই দুই পন্যের ক্ষেত্রে।

কিন্তু পুঁজি নিশ্চল, স্থবির নয়, জল ও বায়ুর মতনই তার ভেদ ক্ষমতা। কাজেই বিংশ শতাব্দার গোড়ায় ব্যবসা বানিজ্যের চরিত্র বদল হতে শুরু করে উৎপাদন এবং ক্রেতার মধ্যে মধ্যস্তকারবারী অনুপ্রবেশ ঘটে। বাজার ধীরে ধীরে তাদের হাতে গেল। উৎপাদনের উপর এরা নিজেদের নিয়ন্ত্রন নিয়ে এলো। জুমিয়ারা আর্থিক দিক থেকে দুর্বল। তাদের অর্থের প্রয়োজন দেখিয়ে মহাজন বা মধ্যস্থ কারবারীর হাতে অসহায় আত্মসমর্পনে বাধ্য করাল। এখন শুদ্ধভদ্র বানিজ্যিক ভাষায় যাকে ফরোয়ার্ড সেল বলে তা আসলে দাদন। মহাজন অগ্রিম টাকা জুমিয়ার হাতে দিয়ে তার পছন্দ মতো দামে উৎপন্ন ফসল বিক্রী করতে জুমিয়াদের দায়বদ্ধ করল। ধর্মরক্ষার ত্রাতা যাবতীয় ছলাকলার প্রয়োগ হল। সৃষ্টি হল মহাজনা প্রথা অগ্রিম ক্রয় দাদন, পণ্যের মূল্যের উপর মহাজনের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রন, এবং মধ্যস্থ কারবাধীদের মধ্যে নিজেরাই অঘোষিত সিন্ডিকেট তৈরী করে মনোপালি বা পণ্য মূল্যে নির্ধারনের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা অর্জন করে বসল। যে শোষণ শব্দটা এই রাজ্যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অপরিচিত ছিল। তার মার্তন্ড প্রহারে উপজাতি জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই এই বীজরোপিত হতে শুরু করল। ২৫/৩০ বছরের মধ্যে তা মহীরুহের রূপ ধারণ করল। মহাজনরা সবাই ছিল বহিরাগত, শোষণের অর্থ কুমিল্লায় নিয়ে যেত তবে কতিপয় স্থায়ী পুঁজিপতি শহরে কুশীদজীবী উদয়পুরে থেকে তাদের ব্যবসা চালাচ্ছিল। এরা চিহ্নিত হল সুদখোর মহাজন হিসেবে। খাতকদের অসহায়তায় এরা নিজেদের মান্যতা ক্রয় করতেন। অর্থাৎ দুই শ্রেণীর মহাজন পণ্যের দাদনদার, আর শহরে সুদখোর মহাজন। উদয়পুর বিবরণী এ এর জীবন্ত বর্ননা লিপিবদ্ধ রয়েছে। এদের ধর্ণাঢ্য হওয়ার মূলেও দাদন ও সুদের কারবার।

"এই বিভাগের (উদয়পুর) অধিবাসীদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন ব্যবসায়ী এবং লগ্নীকারী নাই। তিল, কার্পাস পাট, সরিষা, ধান চাউল, বনজ দ্রব্যাদি প্রায় সমস্ত ব্যবসাই ব্রিটিশ এলাকাবাসীদের হস্তগত। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী সংরাইস নামক স্থানের সাহা মহাজনগণ এবং অন্যান্য স্থানের মহাজনগণই রাধাকিশোরপুর, শালগড়া, কাকড়াবন, অমরপুর, অম্পি নূতনবাজার, প্রভৃতি স্থানে দোকান স্থাপন করিয়া কাজকারবার করিতেছে। তন্মধ্যে শ্রী কালাচাঁদ সাহা, শ্রী হরিশ্চন্দ্র সাহা, শ্রী নীলকৃষ্ণ সাহা, অপর শ্রী হরিশ্চন্দ্র সাহা শ্রী পূর্ণচন্দ্র সাহা শ্রী কালীচরন মন্ডল, শ্রী মহানন্দ কৈবর্ত দাস, শ্রী হরিমোহন সাহা, শ্রী নীলাম্বর দে, শ্রী রোহিনী কান্ত দে প্রভৃতির না এ স্থলে উল্লেখ করা যায়।

রাধাকিশোরপুর বাজারে কতিপয় তালুকদার যৌথ ভাবে " তালুকদার কোম্পানী" নাম

দিয়া কাপড় ইত্যাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছিল। ইহাই যৌথ কারবারের জন্য শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তিদের একমাত্র নূতন প্রচেষ্টা। রাধাকিশোরপুর বাজারে "গঙ্গাগতি দত্ত প্রতিষ্ঠিত একটি বারুদ ও বন্দুকাদি বিক্রয়ের অনুমতি প্রাপ্ত দোকান আছে। উদয়পুর ও অমরপুরে ইহা ভিন্ন এরুপ অন্যকোন দোকান নাই।

এই বিভাগে কোন বড় ধনী বা লগ্নী কারবার নাই। পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায়ীগণের অন্যান্য কারবারের ন্যায় সকলেরই অল্পাধিক লগ্নী কারবার আছে। এই বিভাগে রোক্কর প্রথা প্রচলিত থাকায় তমঃ সুক আদান প্রদানের প্রথা যথোচিতভাবে চলিতেছে না। ষ্ট্যাম্প এবং রেজিষ্ট্রেশনের ব্যায় অধিক দিতে হয় বলিয়াই এইরূপ চলিতেছে। মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধির ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। রেজিষ্ট্রেশন ও ষ্টাম্প আইন সংশোধনের দ্বারা রোক্কার প্রথা যথাসম্ভব রহিত করাই আবশ্যক। নতুবা রোক্কামূলীয় নানা রূপ উৎপীড়ন ও প্রবঞ্চাদি সহজে নিরাবিত হইবে না।

এই বিভাগে লগ্নী কারবারের মূলধন দুই লক্ষ টাকার কম হইবে না। নিম্নে কয়েকজন ব্যবসায়ীর নাম উল্লেখ করা হইলঃ-

শ্রীযুত সতীশ কুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র কুমার বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য (উনার সুযোগ্য পুত্র নরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ত্রিপুরার প্রথম প্রধান বন সংরক্ষক ছিলেন) শ্রীযুক্ত যুগলকিশোর মিশ্র (চন্দ্রাবলী মিশ্রের বাবা এখন এই পরিবারের কেউ এই রাজ্যে নেই, সত্তরের দশকেই ওরা দেশে মানে উত্তর প্রদেশে চলে গেছেন) শ্রীযুক্ত হরিশ্চরন বর্মন, শ্রীযুক্ত মুন্সী সমসের আলী, শ্রীযুক্ত চারুগাজী, শ্রীযুক্ত দৌলত মিঞা কাজী প্রভৃতি।

শ্রীযুক্ত ফজলদ্দিন আহাম্মাদ সর্দার, মোবারক আলী ভূঞা, মহম্মদ মুছু মিঞঃ প্রভৃতি কতিপয় যুবক স্থানীয় ও সামাজিক উন্নতি বিষয়ে আগ্রহশীল ও যত্নপরায়ন দেখা যাইতেছে। শেষোক্ত যুবকদ্বয়ের একজন Matriculation ও I.A পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছে।

ব্রিটিশবাসীদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় এ রাজ্যবাসীগণ এই বিভাগেও রাজকার্য লাভে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিতেছে না (উদয়পুর বিবরণ ব্রজেন্দ্র দত্ত পৃঃ ৯৭-৯৮) ।"পুঁজির বিকাশ ও সমাজ বিবর্ত্তনের প্রারম্ভিক বাস্তব ছবি।

তিতুমীরের কেল্লা

প্রায় দুই মানুষ সমান উঁচু আস্ত মুলি বাঁশের ঘেরে এক বিরাট চৌহদ্দী। মুলি বাঁশের উপর দিক বল্লমের মতো। এর ভেতরে কি? কেন এই ঘের? কাঠ বিড়ালীও এই অবরোধ অক্ষত রেখে ডিঙোতে পারবে না। নিত্যহরি, নিত্যহরি সাহা আর তার দুই সঙ্গী, চিন্তা দাস আর অঙ্গদ এভাবে দুর্গের মতন কোন জায়গা সংরক্ষিত হয় তা ইতিপূর্বে দেখেনি। এলাকার বিশালত্ব ও শক্ত পোক্ত বাঁধুনী দেখে তারা 'থ'।

তিন জনেই এখানে, হিন্দুস্থানে, ত্রিপুরার, উদয়পুরে জীবনে প্রথম এলেন। তিন জনের তিনটি যন্ত্র-যান, রিক্সা, ঐ রিক্সা চালিয়েই তারা সুদুর কুমিল্লা থেকে এই প্রথম ত্রিপুরার উদয়পুরে। ১৯৫১ সাল। উদয়পুর তখনো গ্রাম, উন্নত গ্রাম। কুমিল্লা শহরের মতো পাকা পীচের রাস্তা নেই, বড় বড় দালান কোঠার সার নেই; জনবসতির ঘনত্ব নেই, বড় সরকারী বাড়ী নেই, জমজমাট বাজার নেই। এ যদি কেল্লা হয়; তো বাঁশের কেল্লা। কে থাকে ঐ কেল্লার ভেতরে? কোন রাজপুরুষ?

শহরে ঢোকার মুখে বিশাল জলাশয়, জগন্নাথ দিঘী তাদের অবাক করে দিলো। অবশ্য কুমিল্লা শহরের বুকে, কান্দির পাড় আর রাজগঞ্জ এলাকা সংলগ্ন ধর্ম সাগর নামে বিশাল দিঘী তারা দেখেছেন। ধর্মসাগর ত্রিপুরার রাজা ধর্মমাণিক্য খনন করেছেন, কুমিল্লা তথা চাকলা রোশনাবাদ তখন ত্রিপুরার রাজাদের শাসনাধীন জমিদারী। রাজাদের মূল রাজ্যে এসেও নিত্য হরিরা আবারো বিশাল জলাশয় দেখলেন। এরা উদয়পুরের জলাশয় সম্পর্কে অল্পই আভাষ পেয়েছিলেন। তবে উদয়পুরে এটিই একমাত্র বৃহৎ জলাশয় নয়, নিকট ভবিষ্যতেই তাঁদের জন্যে আরো বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। নিত্যহরিরা যখন এলেন তখনো উদয়পুরের সর্ববৃহৎ জলাশয় অমর সাগর ধন্য সাগর ভারী দামের আস্তরণ আর তারা বনের আচ্ছাদনের ঢাকা। সে দৃশ্য জমা রইলো আগামী দিনের জন্য।

শহরে ঢোকার মুখে দিঘীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে তারা একটি দেবালয়, আংশিক ভগ্ন, দেখে এসেছে। জগন্নাথের মন্দির। সেখানে আম গাছের ছায়ায় তারা বিশ্রামও নিয়েছে এবং দিঘীর সৌন্দর্য দেখেছে প্রাণ ভরে। দিঘীর পাড় ছাড়িয়ে উত্তরে পাহাড়ের গা বেয়ে সুবিস্তৃত সবুজের দীর্ঘ দ্রাঘিমা ও তাদের মুগ্ধ করেছে। ফলে প্রয়োজনের বেশীই তারা সেখানে বিশ্রাম নিয়েছে। কুমিল্লা শহর ছাড়িয়ে বিবির বাজারের মুখে কুমিল্লাতেও জগন্নাথ বাড়ী রয়েছে। জগন্নাথপুর, সেই মন্দির ও মূর্তি প্রতিস্থাপন তাও ত্রিপুরার রাজাদেরই কীর্তি। বিশ্রামান্তে ওরা শহরে ঢোকে নিত্যহরির এক আত্মীয়ের সন্ধান করবেন, সেখানেই দু চার দিন থেকে আবার রিক্সা নিয়ে কুমিল্লা ফিরে যাবেন এমনটাই তাদের কর্মসূচী। কিন্তু বাঁশের কেল্লা তাদের দিঘীর পূর্ব পারেই পা আটকে দিলো। এবং এক সময়ে তারা তিন বন্ধুই উদয়পুরেই আটকে গেলেন। তাদের আর দেশে ফেরা হলো না।

যদি তারা কুমিল্লায় ফিরে যেতেন তবে পরের ফাল্গুনে, বদর মোকাম ঢোকার মুখে, বর্তমানে যেখানে ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক, তার পূর্ব পার্শ্বে রাজকুমার ঠাকুরের বাড়ীর আঙ্গিনায়

পলাশ গাছে 'আগুন জ্বালা' রূপটি তাদের দেখা হতো না। অনুভব হত না মহাদেব বাড়ীর অঙ্গনে চাঁপা ফুল গাছ গুচ্ছের সুগন্ধ ছড়ানো আমোদিত বাতাসী আহ্লাদ। চাঁপা ফুল আর বকুল ফুলের প্রাণ ভরা সুবাস, জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ে গন্ধ বিহীন অশোকের লালিমা। এর কোনটাই আজ আর উদয়পুরে নেই।

এক সময়ে লক্ষ্য করলেন কেল্লার দরজাটি খুলে গেল। দু'জন লাঠি ধরা উর্দ্দীধারীর মধ্যবর্তী হয়ে ৮/৯ জনের একটি দল ভাঁড় কাঁধে কেল্লা থেকে বেরিয়ে এলো। গায়ে তাদের বিচিত্র রকমের ফতুয়া। এসে, সার বেঁধে জগন্নাথ দিঘী থেকে জল নিয়ে আবারো কেল্লার ভেতরে ঢুকে গেলো। এতো কয়েদীর পোষাক গায়ে। তা হলে এই বাঁশের কেল্লা জেলখানা। তাদের অনুমান নির্ভুল। এটিই উদয়পুরের জেলখানা। পরে এই বাঁশের কেল্লার বিলুপ্তি ঘটে। ধনী সাগরের পশ্চিম পাড়ে উপেন্দ্র চন্দ্র মশাই এর বাড়ী জমি অধিগ্রহণ করে পাকা অবরোধে জেলখানা চলে গেল। কেল্লা দখল করল অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র।

শহরে তখন খুবই কম সংখ্যক লোকের বাস। নিত্যহরিরা জগন্নাথ বাড়ীতে বিশ্রামের সময়েই জেনে এসেছেন দিঘীটার নাম জগন্নাথ দিঘী। আর যে পাড়ে এই সময়ে ওরা দাঁড়িয়ে এটা জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়। ভিতরের রহস্য উন্মোচনের জন্য নিত্যহরিরা মানুষের প্রতীক্ষা করেছিলেন। যেহেতু সদর রাস্তা লোক চলাচল হবেই। এরা দিঘীর দিকে মুখ করে বসে রইলেন। কান খাঁড়া রাখল লোক চলাচলের সাড়া যদি পাওয়া যায়। তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার রহস্য ভেদে মনোযোগী হলেন।

কার্ত্তিকের প্রথমার্ধ। হেমন্ত প্রকৃতিতে পা ফেলতে শুরু করেছে। জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব দক্ষিণ কোণে পদ্মবনে পাতার রং পাল্টাতে শুরু করেছে। শীতে পদ্মবন মরে যাবে। হিমালয়ে শীতের ভয়ঙ্করী শুরু হয়েছে। জগন্নাথ দিঘীতে পরিযায়ী পাখীরা আসতে শুরু করেছে। দিঘীর উত্তর অংশ ইতিমধ্যেই তাদের দখলে চলে গেছে। একই কর্মের পৃথক ফল। জগন্নাথ দিঘীতে পদ্মবন মরতে শুরু করেছে। আর পরিযায়ী পাখীরা এই শীতল জলেই গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের জন্য মাথা গুঁজেছে। হিমালয়ের মানস সরোবর থেকে উড়ে আসা পাখীর ঝাঁক। নিত্যহরিরা এদের বালি হাঁস নামেই চেনেন।

" সহসা কঠিন শীতে, মানসের জলে / পদ্মবন মরে যায়। হংস দলে দলে / সার বেঁধে উড়ে যায়, সুদূর দক্ষিণে / কাশফুল্ল নদীর পুলিনে।" মানসের পদ্মবনে শীতের নিষ্ঠুরতা। এত শৈত প্রহার যে পদ্মবন মরে গেছে, পাখীরাও সে শীত সহ্য করতে না পেরে উষ্ণতার সন্ধানে দক্ষিণ মুখী। সেই উত্তরের পাখীরা এখানে, এই উদয়পুরে, কাশফুল্ল নদীর পুলিন কোথায় পাবে, এরা আরেক মৃতপ্রায় পদ্মবনে, জগন্নাথ দিঘীতে এসেছে উষ্ণতার সন্ধানে। উদয়পুরে এখন হৈমন্তিক আরামের শৈত্য। জীবনানন্দের ভাষায় — নিত্যহরিরা, কার্ত্তিকের মিঠে রোদে পিঠ পুড়াচ্ছেন। পরিযায়ী পাখীর মতোই তাদের পিঠে মিঠে রোদ। তখনো অমর সাগর আর ধনী সাগর দামে ঢাকা। কাজেই পরিযায়ী পাখীদের আদর্শ আস্তানা ওরা নয়। হিমবাহ ও কর্কট ক্রান্তির প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য; শীত গরমের লীলা মাধুর্য নিত্যহরিরা জানে না। কেন শীত এখানেও জাঁকিয়ে বসার আগেই পরিযায়ারীরা এখানে আসে তার ব্যাখ্যাও তাদের কাছে নেই, এরা কেবল জানে শীতের আগে বালিহাঁস উত্তর দিক থেকে দক্ষিণে আসে। কুমিল্লায় ধর্ম

সাগরেরও এরা প্রতি বৎসর এই সময়ে বালি হাঁস আশ্রয় নিতে দেখেছেন। এখানেও সেই পাখী। তবে ধর্ম সাগরে পদ্মবন নেই।

আগের রাত নিত্যহরিরা কাটিয়েছে জামজুড়ী বাজারে এক পরিত্যক্ত বাচাই -এ (খড়ের ছাউনীর তিন দিক খোলা ছোট্ট ঘর। ঐঘরে দিনের বেলা দোকান বসে। জামজুড়ী সমৃদ্ধ জনপদ, তালুকদার বড় জোতদারদের বাস এই গ্রামে তখন)। সন্ধ্যার আগে পৌঁছে রাতের অন্ধকারে, ছয় মাইল দূরে আর শহরে প্রবেশ না করে, বাজারে কোন এক পরিত্যক্ত বাচাই-এর বাঁশের মাচায় রাত কাটানোই তারা স্থির করেছিলো। খোঁজ নিয়ে জেনেছে নিশি কুটুম্ব নেই তাদের যন্ত্র-যান বা সঙ্গের জিনিস পত্র কেড়ে নেওয়ার কেউ নেই। কাজেই নিশ্চিন্ত। তালুকদারদের খনন করা এক নাতি বৃহৎ জলাশয়ের উত্তর পাড়ে হাট বসে। জামজুড়ী বাজার এখনো সেখানেই এবং একই রকম রয়েছে। জনসংখ্যা বেড়েছে বাজারের আয়তন বেড়েছে, সমৃদ্ধি বেড়েছে এই যা কিন্তু গ্রাম্যতা, প্রাচীনত্ব ও কালের ছাপ এখনো তার দেহ জুড়ে। জামজুড়ী বাজারে বসেই উদয়পুর শহর ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ীর খোঁজ খবর সংগ্রহ করেছিলেন ওরা।

পথচারী পাওয়া গেল। হৃদয় বর্মণ। কাছেই বাড়ী। হরিশ বর্মণের ছেলে। বাঁশের দুর্গের আবছা সংবাদ পাওয়া গেল। কয়েদীরা ভোরে মাঠে ফসল ফলায়, সেচের জল, নিজেদের ব্যবহারের জল ওরা জগন্নাথ দিঘী থেকেই সংগ্রহ করে। এখানে জেলার আছেন, জমাদার সাব আছেন। আসার পথে ওরা খিলপাড়ার জনপদ দেখে এসেছে। দেখে এসেছে জামজুড়ী বৈষ্ণবী চর পর্যন্ত ক্ষেতে পাকা ধান - হেমন্ত বিছায়ে আছে মাঠের উপর।

১৯৫১ সাল। উদয়পুরে তখন গরুর গাড়ীর যুগ। মুখ্যত পণ্য পরিবহন, প্রয়োজনে সেই গাড়ী নর বহনকারীও। একদিন উদয়পুরের লোক মহাবিস্ময়ে দেখল উদয়পুরের রাস্তায় একটি ত্রি-চক্র যান। রিক্সা। তখন সাইকেল তথা দ্বিচক্রযানই হাতে গোনা এবং মালিক এবং আরোহী উভয়েই সম্ভ্রম উদ্রেককারী। সব চাইতে বড় কথা তখন উদয়পুরে কারোর নূতন সাইকেল ছিল না। কুমিল্লা থেকে পুরনো সাইকেল, তাও সংখ্যায় ৫ / ৬ টার বেশী নয়, যা বর্তমানে কেউ চড়বেই না, এমনই লড়ালক্কা অবস্থায়। যতটা মনে হয় ১৯৫৩ -৫৪ সালে জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ের বাসিন্দা, কেবি, আই-এর শিক্ষক শশী কুমার ভদ্রের তৃতীয় ছেলে বেদানা ভদ্র সর্বপ্রথম সবুজ রং-এর ফুল চেইন কভার নূতন সাইকেল উদয়পুরে নিয়ে আসেন। বেদানা ভদ্র, তার ডাক নাম, ভাল নাম ভুলে গেছি ভারতীয় নেভিতে চাকুরী করতেন। বোম্বাই -এ থাকতেন চাকুরী সূত্রে। তার পোযাক আসাক একে বারেই ছিল স্বতন্ত্র। ধূমপানে অভ্যস্থ, ক্যাপ্টেন তামাক - আর সিগারেট তৈরীর কাগজ আর পঞ্চাশ ষ্টিকের ক্যাপ্টেন সিগারেটের কৌটা ছুটিতে আসার সময়ে নিয়ে আসতেন। তার সুদৃশ্য পোষাকের সঙ্গে সুন্দর রং-এর নূতন সাইকেল আর ক্যাপ্টেনের গন্ধে জারিত সুগন্ধের মৌতাত তাকে আমাদের কাছে ক' দিন বিশিষ্ট করে রাখত। আত্মীয়তার সুবাদে আমাদের শঙ্কর টিলার বাড়ীতে ঐ সাইকেলে চেপেই জগন্নাথ দিঘীর পাড় থেকে আসতেন। তিনি ছিলেন মহার্ঘ আত্মীয়। তার পোষাকের চমৎকারিত্বের আকর্ষণের বাইরেও ক্যাপ্টেন সিগারেটের গন্ধ লেপ্টে থাকা সুঠাম শরীর বাড়তি আকর্ষণ ছিল। আমরা উদয়পুর আর বোম্বাই -এর বৈপরীত্যের হিসাব কষতাম। বালু

ঢাকা কাঁচা রাস্তায় যখন দুই চাকার সাইকেলই আমাদের সর্বোচ্চ আকাঙ্খার বস্তু ঠিক সেই সময়ে উদয়পুরে এলো তিন চাকার গাড়ী। সামনে এক চাকা। পেছনে সমান্তরাল চাকা দুটি। সাইকেলের মতোই চেইন -এর বাঁধন এবং চালাতেও হয় একইভাবে প্যাডেল চেপে। পেছনের দুই চাকার উপর কাঠের বাক্স তার ভেতর বসার আসন। দুজনের মতো বসার জায়গা। বসা আরাম দায়ক করতে ছোট্টগদি। সাইকেলে ও সামনে পেছনে চালক সহ তিনজন যাওয়া যায়, জনৈক লালু মজুমদার, জগৎ মিস্ত্রির ছেলে সেতো সাত জন নিয়েও সাইকেল চালিয়ে করসৎ দেখাত, কিন্তু রিক্সা তো দেখি ভিন্ন গড়ন। এবং পয়সার বিনিময়ে সওয়ারী নিয়ে যাওয়ার উপযুক্ত।

তখন উদয়পুর শহরে যারা নাগরিক তারা প্রায় সকলেই কুমিল্লার লোক, শহর বা সংরাইস গ্রাম থেকে এসে বসতি গড়েছেন অল্প সংখ্যক নোয়াখালীয়। সাইকেল রিক্সা তারা কুমিল্লা শহরে আগেই দেখেছেন। কিন্তু যারা পুরনো বাসিন্দা, জন্মও এই রাজ্যে তারা রিক্সা আগে দেখে নি। সুতরাং তারা বিস্মিত হবেন, কৌতূহলী হবেন স্বাভাবিক। কাজেই বিশেষ করে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা চালু রিক্সার পেছনে ছুটবে কৌতূহল মেটাতে তা স্বাভাবিক। জামজুড়ির কানু ঘোষের স্মৃতিতে সেই বালক বয়সের রিক্সার পশ্চাৎ দৌড় এখনো মনে আছে। এবং সহাস্যে তা সবিস্তারে আড্ডায় বসে রসিয়ে এখনো তার নির্বোধ কৌতুকের কথা চমৎকার উল্লেখ করেন। তখন উদয়পুরে জনসংখ্যাই বা কত!

কানু ঘোষের ঐ দৌড়ের গোড়ার কাহিনীর মধ্যেই ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। ১৯৫১ সাল। তখনো ভারত পাকিস্তান পাসপোর্ট চালু হয় নি। তা চালু হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫১-এর অক্টোবর দেওয়ালী উৎসবের আগের দিন জামজুড়ির মানুষ লক্ষ্য করল এক আজব যান। একটি নয় তিনটি, পর পর সার বেঁধে চলেছে। একেক জন সাইকেলের মতো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মনুষ্য চালিত এমন আধা যন্ত্রের যান বাহন তারা আগে কখনো দেখেনি। কাজেই রাস্তার দুই পার্শ্বে কৌতূহলী মানুষ দাঁড়িয়ে গেল। বাচ্চারা ছুটতে শুরু করল এদের পেছন পেছন। বাচ্চাদের এই পেছন তাড়া রিক্সা চালকদের দেহে যেন উৎসাহ ও শক্তি যোগাল। চালকরা রিক্সাকে দ্রুতগামী করলেন। এবং এক সময়ে ছুটে চলা বালকদের দেহের বল পড়ে এলো। ওরা থেমে গেল, ক্লান্ত পদে বাড়ীর পথ ধরল। আর রিক্সা তিনটি উদয়পুরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুমান করতে অসুবিধা নেই এমন দৃশ্য রিক্সা চালকেরা সোনামুড়া থেকে উদয়পুর পর্যন্ত দীর্ঘ পথে বহু জায়গায় উপভোগ করেছেন। হয় তো তা তাদের ক্লান্তি অপনোদনের ও তা উদ্দীপক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

কারা এই তিন রিক্সা চালক? এই তিনের সর্দার ছিলেন নিত্যহরি সাহা। আর তার দুই অনুসারী অনুগামী হলেন চিন্তা দাস ও অঙ্গদ দাস। এরা কুমিল্লা থেকে রিক্সা নিয়ে উদয়পুরে চলে এসেছিলেন দেওয়ালী মেলায় যাত্রী টেনে রোজগার করে আবার কুমিল্লায় ফিরে যাবেন। কিন্তু ঐ তিনজনের কেউ আর ফিরে যেতে পারেন নি। উদয়পুরেই রয়ে গেলেন। চিন্তা আর অঙ্গদ কোথায় হারিয়ে গেছে! কিন্তু ইতিহাস গড়ে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে উদয়পুর শহরেই স্থায়ী হলেন ইতিহাস স্রষ্ঠা নিত্যহরি সাহা। এই শহরেই তিনি প্রয়াত হয়েছেন। তার ছেলেরা রয়েছেন। নিত্য হরি ইতিহাস শ্রষ্ঠার সম্মান পেয়েছেন। নাগরিকদের আদর ও সম্ভ্রম পেয়েছেন।

এবং পুরনো মানুষের মনে এখনো বেঁচে আছেন। উদয়পুরে যান বাহন বিবর্তনে গরুর গাড়ীর মালিক/ চালক কালা মিঞার যেমন ভূমিকা রয়েছে তেমনি উন্নততর যান বাহন নিয়ে এসে গরুর গাড়ী বিদায় দিয়ে নিত্য হরি বাবুও ভূমিকা নিয়েছিলেন। উদয়পুরে নিত্যহরি সাহা সাধারণ বা নিছক রিক্সা চালক নন। ইতিহাস স্রষ্ঠা হিসেবে স্মরণীয়। পর্যায়ক্রমে যেমন পল সাহেব এবং উদয়পুর জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ের হরিশ বর্মণ।

কালা মিঞাদের গরুর গাড়ীর দৌড় ছিল দক্ষিণে চন্দ্রপুর, পেরাতিয়া, গর্জি আর উত্তর পশ্চিমের সীমানা ছিল বাগমা, জামজুড়ী পর্যন্ত। পল সাহেবদের আরো ছিল লম্বা দৌড়। কুমিল্লার কান্দির পাড় থেকে উদয়পুর মহাদেব বাড়ীর মাঠ। নিত্যহরিরা দখল নিলেন শহর সীমানায়। দক্ষিণে তাদের দৌড় মাতাবাড়ী পর্যন্ত। আর হরিশ বর্মণের কালো রঙ-এর ডজগাড়ী শহরেও চক্কর খেত। হরিশ বর্মণের ছেলে পাখী বর্মণ কিংবদন্তী ড্রাইভার। উত্তেজক রিক্সা বাহন শহরবাসীকে আভিজাত্য দিল। যেমন অবাক ও বিস্মিত করেছিল। কিন্তু কুমিল্লা থেকে যাত্রা শুরু করে নিত্যহরি বাবুরা নিজেরাও পদে পদে কম বিস্ময়ের সম্মুখীন হন নি; কম প্রতি বন্ধকতার মুখে পড়েন নি। বিবির বাজার হয়ে সোনামুড়া শহরের প্রান্তে গোমতীর ধার পর্যন্ত সরল যাত্রা। ভাঙাচুড়া হলেও বাঁধানো সড়ক। পাসপোর্ট তখনো চালু হয়নি। ফলে সীমান্ত পেরোতেও কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু গোমতী না পার হতে পারলে সোনামুড়া শহরে প্রবেশ এবং মেলাঘর কামরাঙাতলী, ঘিলাতলী কাকড়াবন জামজুড়ী হয়ে উদয়পুরে পৌছবেন কি করে? সুতরাং গোমতী পার হতে হবে। মুসকিল আসান করে রেখেছিল পল ভ্রাতৃদ্বয়। তাদের গাড়ী পার করার জন্যে জুড়িন্দা নৌকা; (বড় দুটি নৌকা জুড়ে একটি ভাসমান পাটাতন) তৈরী করে গোমতীর ঘাটে ভাসিয়ে রেখেছিলেন ঐ ঘাট প্রতি বছর সরকার থেকে ডাক হত। উদয়পুর থেকে সোনামুড়া পর্যন্ত নদীর ঘাটের ইজারা তখন গণেশ সিং, চিন্তা সিং ধন সিং - ভাই ভাতিজাদের একচেটিয়া। সুতরাং সোনামুড়া ও কাকড়াবনের নদী পেরুবার প্রতিবন্ধকতা দূর হল। কিন্তু আশ্বিনের মেঘ দীপাবলীর আগে ঢেলে দিয়ে গেল কালাপানিয়াতে। খাড়া টিলা থেকে সমতলে নামা, কর্দমাক্ত পিচ্ছিল মাটি, পা রাখাই দুষ্কর, পা কাদায় ডুবে যায়। গাড়ীর চাকা আটকে পড়ে। প্যাডেলে রিক্সা চালানো কর্দম সাঁতরানো অসম্ভব। এক রিক্সা তিন জনে ধরাধরি করে কর্দম মুক্তি। তারপর কাকড়াবন উদয়পুর সড়ক, তিন জনেরই যান জেরবা র। এমনও মনে হয়েছিল শেষ কালে না ঐ মরুভূমি পেরুতে গিয়ে জল তেষ্টায় কেষ্টা মরে যায়! কিন্তু না, কেষ্টারা শেষ পর্যন্ত মরুভূমিও অতিক্রম করল। পথের যেখানে জনপদ সেখানেই চলমান যানের পেছনে বালক বালিকাদের ভিড়।

সামনে নিত্যহরি। জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড় প্রায় অতিক্রম করে জামতলী (টাউন হলের সামনে তেরাস্তার মাঝখানে মধ্যমণি হতে একটি জামগাছ ছিল। সড়ক সাচ্ছন্দ্যের কারণে তা নব্বই এর দশকের গোড়ায় কেটে ফেলা হয়। কিন্তু বহু প্রাচীন "জামতলী" নাম রয়ে যায়।) হয়ে শহরে ঢোকার মুখে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিল অতি-বিস্ময়। আস্ত মুলি বাঁশ। উপরের দিকে বর্শা ফলার মতো ধারালো, তাই অপূর্ব কৌশলে বেঁধে বেড়া তৈরী করে ঘেরা একটি বড় সড় জায়গা। মনুষ্য বিহীন নয়, এক সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দীর্ঘ দেহী, ফর্সা এক প্রৌঢ় দরজায় বসে। মুখে লম্বা দাঁড়ি। বাঁশের ঘেরের মতনই ঐ প্রৌঢ় ও নিত্যহরিদের বিস্ময় মুগ্ধ

করে। খানিকক্ষণ দাঁড়া লেন, খোলা আকাশের তলায় মাত্র দেড়শ হাত পেছনে ফেলে এসেছেন মেঘু ভট্টাচার্য, বীরু ভট্টাচার্যদের বাড়ীর সামনের হরতকী আর অশোক গাছের ছায়া। এর মধ্যে দুর্গ সদৃশ্য ঐ বাঁশের কেল্লার দরজায় লটকানো কাঁসার ঘন্টায় টং ঢং করে ঘন্টা বাজল। ঘন্টা বাজিয়ে ভেতরে চলে যাচ্ছিল। কৌতূহল দমন না করে নিত্যহরিরা এগিয়ে গিয়ে ঐ লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন — " দাদা, এই ঘেরাওয়ের ভেতরে কি রয়েছে? ঘন্টাই বা কেন বাজালেন? তারা জানল এটি হল জেলখানা। আর এখানে প্রতি ঘন্টায় সময় জ্ঞাপক ঘন্টা পেটানো হয়। এখন এগারোটা বাজে। বেলা এগারটা।

এমন জেলখানা নিত্য হরি চিন্তা হরণ বা অঙ্গদ কুমিল্লায় দেখেনি। তারা কুমিল্লার জেলখানার দেখেছে ইটের দেয়াল ঘেরা। বিশেষ উর্দ্দীপরা কয়েদীদের ভেতরেই আনাগোনা? এই ভয়ঙ্কর লোকেদের জন্য পাকা ঘর ছাড়া কি করে তাদের আটকে রাখা যায়? এই ভয়ঙ্কর লোকেদের জন্য বাঁশের বেড়া? এর ভেতরে কি করে এরা পোষ মানে?

এই প্রশ্নের জবাব দিলেন সেই দীর্ঘ দেহী সৌম্য দর্শন শশ্রুমন্ডিত প্রৌঢ়, বললেন — "ওঠ দেখি এই বাঁশের বেড়া বাইয়া? উপরের চক্কাডা দেখছ, পেট এফোঁড় ওফোঁড় হইয়া যাইব। পাক্কা দেওয়ালের থাইক্যাও বহুত কামের। এই চক্কা বাঁশ পাড়ইয়া যাওনের কথা ভেতরের লোকেরা স্বপ্নেও ভাবে না। তোমাগ ভয় নাই কয়েদী পলাইত না।"

আপাততঃ এই প্রৌঢ়ই জেলখানার মালিক। জমিদার। জমিদার ফিরোজ উদ্দীন ঠাকুর। তাঁর দুই ছেলে তাহের উদ্দীন ঠাকুর আর কামাল উদ্দীন ঠাকুর। তারা পুরান দিঘীর (জগন্নাথ দিঘী) উত্তর পাড়ে কে. বি. আই. স্কুলের ছাত্র। ফিরোজ উদ্দীন নিয়ে এতটা কথার কারণ হল তার দেহ সৌষ্ঠব নয়, তাঁর বড় ছেলে তাহের উদ্দীন উত্তর কালে বড় তালেবর হয়েছিলেন। ফিরোজ উদ্দীন চাকুরী থেকে অবসরের পর পূর্ব পাকিস্তানে চলে যান। তাহের উদ্দীন পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিবের অনুগামী হিসেবে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেন। এবং স্বাধীন বাংলাদেশ শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভায় তথ্য ও প্রচার মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হন। এবং জগৎখ্যাত হন। কিন্তু জাতকের জন্ম লগ্নে রাহু। এই তাহের উদ্দীনই শেখ মুজিব হত্যার পর মুজিবের বাপান্ত করেন এবং মুজিব হত্যার অব্যবহিত পরে মুজিব হত্যার ষড়যন্ত্রীদের আজ্ঞাবহ খন্দকার এর সরকারে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে ডালিম (মুজিবের হত্যাকারীদের অন্যতম) ভক্ত হিসেবে আওয়ামী লীগ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন। এবং দেশে বিদেশে কলঙ্কিত ও ধীকৃত হলেন। অধুনা একেবারেই বিস্মৃত তাহের উদ্দীন ।

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লাকে নিত্যহরি সাহা চিন্তা হরণ দাস আর অঙ্গদ বাইরে থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে শহরমুখী হলেন। সামনে হরিমন্দির। প্রণাম করলেন, যেমনটা জগন্নাথ দেবকে করে এসেছিলেন। শহরে নিত্যহরি বাবুর এক আত্মীয় বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে ক্লান্তি অপনোদন করে তিন জনেই দেওয়ালী মেলার যাত্রী মাতাবাড়ীতে পৌছে দেবার জন্য দেহে বল সঞ্চয় করলেন। নিত্যহরি সাহা বাড়তি উপার্জ্জনের আশায় রথের সঙ্গে কলা বেচার শখ নিয়ে উদয়পুরে এসেছিলেন। স্থির ছিল দু চার দিন ঘুরে ফিরে দেশে ফিরবেন। উদয়পুর তাদের জীবীকা দিল, স্থায়ী বাসস্থান ও ছিল। বাড়তি যা, নিত্যহরি সাহার তা তিনি উদয়পুরে ইতিহাস হয়ে রইলেন। নিত্যহরি উদয়পুরেই রয়ে গেলেন।

নিত্যহরি সাহা হলেন বিলাসীদের নয়নের মণি। আর স্বল্প দূরত্বে সাধারণ পণ্য পরিবহনের বান্ধব। তারো অনেক পরে রিক্সা উদয়পুর শহরে প্রবেশ করতে থাকে। রাস্তার উন্নতির সঙ্গে সংখ্যাও বাড়তে থাকে। ব্যবসার নূতন উৎস মুখও সেই সঙ্গে খুলে গেল। নূতন জীবীকায় সাহসীদের আকর্ষণ করল। পাল্লা দিয়ে বাড়ল সাইকেলের সংখ্যা। এখন স্কুটার আর বাইক। ১৯৬৩ সালে ২৭০০ টাকায় প্রথম বাজাজ স্কুটার দু'চাকার অটো কিনে পূর্ব বাজারের জ্যোতিষ সাহা, অধুনা ত্রিপুরেশ্বরী প্রেসের মালিক, উদয়পুর শহরে ঈর্ষনীয় হয়ে উঠে ছিলেন। জ্যোতিষদার কাছে শুনেছি স্কুটার কেনার ব্যাপারে রাধাকিশোরপুরের তৎকালীন বিধায়ক প্রয়াত নিশিকান্ত সরকার তাঁকে সহায়তা করেছিলেন।

এবার এ্যান্টিক প্রীতির কথা বলতে হয়। শেষ বয়সে আমাদের অনাদি দার (ভট্টাচার্যের) স্কুটার চালানোর শখ হল। খানিকটা শিখলেনও। কিন্তু হাত পাকে না। খবর পেলেন কো-অপারেটিভ অফিসার মিলন দাস তাঁর পুরনো স্কুটার বেচে দেবেন। দুইয়ের সংযোগ হলো। দরদস্তুর হলো। গৃহিনী রেনুকা ভট্টাচার্যের মুখ ভারের মধ্যেই ঐ স্কুটার অনাদিদার ড্রয়িংরুমে শোভা পেতে লাগল। খুব কমই আমরা অনাদিদাকে স্কুটার চালাতে দেখেছি। কিন্তু প্রতিদিন ধূলা বালি সাফ করে, তৈল মর্দনে দেহ মার্জনা করে অতি যত্নে স্কুটারটিকে তিনি তোয়াজেই রাখতেন। আমরা বললেও তা বিক্রী করেন নি। অনাদি দা মিতব্যায়ী। কিন্তু কি এক অদ্ভুত ভাবের উদয়; তার নিজের কাছে অপ্রয়োজনীয় স্বয়ংক্রিয় দ্বিচক্র যানটিকে অর্থব্যয়ে সংগ্রহ করলেন। একজন আদরণীয় পোষ্যের সমতুল যত্নে তাকে লালন করলেন। আমৃত্যু এর সাহচার্য অনাদি দা ত্যাগ করেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর একমাত্র পুত্র অজয়, নিজে স্কুটার চালানোর সাহস অর্জন করতে না পারার কারণে বহু দ্বিধা দ্বন্ধের পর ভারাক্রান্ত মনে এই সহোদরকে ভিন্ন পাত্রে পাত্রস্থ করেন। এ সবই ছিল বাঁশের কেল্লার সঙ্গে মানানসই চমৎকার অনুসঙ্গ।

প্রসঙ্গত আরেক ভট্টাচার্যকেও স্মরণ করতে হয়। রাজেন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৯৫৫-৫৬ সালের কথা। তিনি ব্রাউন রং-এর বিশাল দেহী নেপালী গরু এনে শহরে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। এতবড় গরু এই তল্লাটে তখনো কেউ চোখে দেখেনি। আমরাও কৌতূহল মেটাতে নিত্যদিনের স্কুল ফেরতা পথ পাল্টে জগন্নাথ দিঘীর পশ্চিম পাড় দিয়ে আসতে লাগলাম। উঠানের পশ্চিম প্রান্তে দোতলা টিনের ঘরের সামনে অস্থায়ী ছাউনীর তলায় তা বেঁধে রাখা হত। আমরা প্রতিদিনই সমান উদ্দীপনায় নেপালী গরু দেখে তার দোহন কৌশল ও দুধের পরিমাণ বিষয়ে কল্পনার রং চড়াতাম। ১৯৫৯-৬০ সনে কৃত্রিম গো-প্রজনন কেন্দ্র স্থাপিত হল শহরের দক্ষিণ সীমায় ভগবান দে'র জায়গা অধিগ্রহণ করে। তখন আরো বড়, অষ্ট্রেলিয়ার "হলেষ্টাইন" জাতীয় ষাঁড় উদয়পুরে চলে এলো। প্রবাদ আছে এক বনে দুই বাঘ থাকে না। সম্ভবতঃ 'হলেষ্টাইন' আসার আগাম আঁচ পেয়েই নেপালী গরু উদয়পুর থেকে বেমালুম হয়ে গেল। শুনেছি প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ায় ও পালনের উটকো ঝামেলার কারণে রাজেন্দ্র বাবু নেপালী গরু অচিরেই বিদায় করেছিলেন। বেশ কিছুকাল ভিলেজ কী সেন্টার মাশরুমের মতো গজিয়ে শেষে রাজ্য থেকেই " হলেষ্টাইন" ও একদিন অদৃশ্য হয়ে গেল।

বর্তমান সুপার মার্কেটের সামনে পুরনো মোটর স্ট্যান্ডে জগার বাপের চা' এর দোকান আর বর্তমান চকবাজারের (যার প্রতিষ্ঠা ১৯০৪ সালে) বিশাল বটগাছ তলায় কৃষ্ণ বৈরাগীর

চায়ের দোকানে হাতে গোনা চা পিপাসুদের দু'বেলাই গুলতানী জমত। জগার বাপের খদ্দের সংখ্যা ছিল স্থানীয় পিপাসুদের সঙ্গে গাড়ীর (মুড়ির টিনের) যাত্রীরা। আর কৃষ্ণ বৈরাগীর মাধুকরীর আকর্ষণ ছিল সার্বজনীন। গরুর খাঁটি দুধ ঘন জ্বাল দিয়ে ক্ষীরের ন্যায় ঘন করে সেই দুধের চা। স্বাদ, গন্ধের প্রলোভনে কৃষ্ণ বৈরাগী ছিলেন নিজেই চায়ের বিজ্ঞাপন। কৃষ্ণ বৈরাগীও জগার বাপের পর অন্য খদ্দের ছিল স্বাস্থ্য লোভী ও ভোজন লোভীরাও। চার আনার এক গ্লাস দুধের টাটকা সরে চিনির মিশ্রণ স্বাদ সেই সময়কার আবাল বৃদ্ধ কে না নিয়েছে। আমি বাজারের পয়সা চুরি করে বহু দিন ঐ আস্বাদ গ্রহণ করেছি। আমার মতো আরো অনেকে। কখনো দুই চোরের সাক্ষাৎ ও ঘটে যেত। এমনও হয়েছে এক চোর পয়সা ম্যানেজ করে এসে দেখে, সরের শেষ গ্লাসটি তার পূর্ব সূরী চেটে খাচ্ছে। লোভাতুর দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অনিচ্ছুক পায়ে সে ফিরে যেত। খ্যাতির দিক দিয়ে জগার বাপের চাইতে কৃষ্ণ বৈরাগী বেশ কয়েক পা এগিয়েছিল তা নিয়ে কোন সংশয় ছিল না। খুব অল্প সময়েই দুই জায়গাতেই নিত্যহরি সাহারা " শ্রমজীবীর" স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়ে গেলেন। তারা ভালো খদ্দের। কারণ ঘন ঘন স্বাস্থ্য পান না করলে সওয়ারী আর মালপত্র বোঝাই রিক্সা টেনে নেবেন কিভাবে?

পুরনো মোটর স্ট্যান্ডে ছিলো বাঁশের বেড়ার ঘরে জগার বাপের চায়ের দোকান। সকাল সন্ধ্যায় চা-খোরদের জমাটি আড্ডা বসে। এক সকালে সুস্বাস্থ্যের এক উপজাতি যুবককে দোকানে দেখা গেল। এক কাপ চা চাইতে সকলের নজর গেল তার দিকে। ঐ বয়সের কেউ তখন দোকানে বসে চা খায় না। নাম জানা গেল জিতেন্দ্র। গাড়ীর হেল্পারের কাজ করে। ধীরে ধীরে জিতেন্দ্র 'আসলাম' হিসেবে পরিচিত হলেন। দোকানের নিয়মিত খদ্দের হলেন এবং জনপ্রিয়ও। গান বাজনার দিকেও তার ঝোঁক। এক সময়ে আসলাম গাড়ীর কাজ ছেড়ে পুরনো মোটর স্ট্যান্ডেই জায়গা খরিদ করে হোটেল খুলে বসল। গান বাজনার কারণে তাঁর হোটেলেই রসজ্ঞদের আড্ডা জমে বসল। পরে অনেক ভূসম্পত্তির মালিকও হন।

মোটর স্ট্যান্ড বলে হোটেল জমে উঠল। গাড়ী স্ট্যান্ডে এসে থামলেই যাত্রীদের লক্ষ্য করে হাঁক ডাক হত " ফাইদি, ফাইদি, খানানি, চুনানি। জাগা কাহাম— খাওয়া থাকার সুবন্দোবস্ত।

আসলাম, আসলাম দা হলেন, 'জিতেন্দ্র না' লোকে ভুলেই গেল তত দিনে আসলাম বিখ্যাত। আসলাম দা যুবকদের চরিত্র ও স্বাস্থ্য গঠনেও মনোযোগী হলেন। ব্যায়ামের আখড়া চালু হয়ে গেল। সকালে বিকালে শরীর চর্চা। সন্ধ্যায় সঙ্গীত, তবলা অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র বিশেষ করে সেতারের তালিম।

বদর মোকাম থেকে ফুলটুঙ্গীর বাসে চলে এলেন। এক সময় ফুলটুঙ্গী তিনি কিনেও নেন। পরে অবশ্য তা হস্তান্তরিত হয়ে যায়। সম্পন্ন বলে নয়, আসলাম কিংবদন্তী হয়ে রইলেন তাঁর সাংস্কৃতিক মনস্কতার কারণে। এখনো উদয়পুরের প্রবীনদের চিত্ত অবরোধে তিনি বন্দী। এবং রোমন্থনের বিষয়। আর নবীনদের কাছে বিস্ময় ও কৌতুহলের।

তার ভক্তদের মধ্যে তবলের যাদুকর মিহির গোস্বামী আর শরীর চর্চায় তালিম নেওয়া জয় পাল সাহা এখনো তাঁর গুণমুগ্ধ। জয় পাল সংবেদনশীল, সমাজসেবী। এর পশ্চাতে আসলাম বা জিতেন দেববর্মার প্রভাব থাকতে পারে। আসলাম বা জিতেন দেববর্মা তার

সময়ে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যেখানে শরীর চর্চা, চরিত্র গঠন, সঙ্গীত চর্চা, এবং সমাজ সেবার প্রেরণা উৎসারিত হতো। তবে আসলাম বা জীতেন্দ্র দেববর্মা বা গণেশ সিং- কে বাদ দিয়ে ষাট সত্তর বছর আগের উদয়পুরের সমাজ জীবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকবে। তেমনই অপর একটি চরিত্র, অধুনা প্রয়াত, রাজনগরের বাসিন্দা গোপাল ঢালী। ১৯৬২-৬৩ সালে মাতাবাড়ী দক্ষিণে চন্দ্র পুর গ্রামে জাতি দাঙ্গার সময়ে তাঁর বিক্রম, তেজ এবং মহত্বকে প্রত্যক্ষ করেছিল তখনকার উদয়পুরের নাগরিকরা।

তৎকালীন সময়ে উদয়পুরে সঙ্গীত চর্চার অপর অন্যতম দিকপাল ছিলেন প্রফুল্ল দেব; প্রফুল্ল ডাক্তার। তিনি এস্রাজ বাজিয়ে গান গাইতেন। তাঁর গান শুনেছি তৎকালীন এম. বি ডাক্তার ইন্দু রায়ের বাড়ীতে " মায়া লোকে এসো চক্রধারী"। আমরা দড়ি বাঁধা হাফ ইজার পেন্টের নেহাৎ নাবালক। চক্রধারী কে এবং মায়ালোকই বা কি অর্থ বহন করে তা জানতাম না। কিন্তু সুর এবং কথার মায়ায় আসরে ব্রাত্য হয়েও আমরা বাহির দুয়ারের শ্রোতা ছিলাম। তখনকার কালের উদয়পুরে সঙ্গীত চর্চার তীর্থ যেমন ছিল " আসলামের হোটেল" তেমনি খুব ঘন ঘন সঙ্গীতের আসর জমাতেন প্রফুল্ল ডাক্তার। নিজের বাড়ীতে। বন্ধুদের বাড়ীতেও। আবরণহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে বা গৃহাভ্যন্তরে সেই আসরগুলি ছিল সর্বজনীন বিনোদনের কেন্দ্র। আসলামের " কলা কেন্দ্র" ছিল শিল্পী তৈরীর তালিম খানা। একজন অধীত বিদ্যার প্রদর্শন করতেন। অপরজন মায়ালোকের কুশীলবদের লক্ষ্যে আনার কঠোর চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেন। আসলাম ছিলেন স্রষ্ঠার ভূমিকায়। প্রফুল্ল বাবুর নিজস্ব একটি টীম গড়েছিলেন। প্রফুল্ল বাবু এমন একটা আবহ সৃষ্টি করেছিলেন মনে হত " কৃষ্ণ নগর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়"।

কিন্তু নাট্যামোদীদের কথাও তো বাদ দেওয়া যাবে না। উদয়পুরে নিয়মিত নাটকের চর্চা হত। টাউন হলে স্থায়ী কাঠের নাট্যমঞ্চ ছিলো। বাৎসরিক নাটক উপস্থাপিত হত। সবই স্থানীয় মানুষ। পরিচিত কলা কুশলী। বসির ডাক্তার (১৯৬২ সালের পরে এই পরিবার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে চলে যায়। তাদের একটি পাঠ্য বই -এর দোকান ছিল, সম্ভবতঃ বর্তমান মুরারী মার্কেটে। এবং ঐটিই ছিল তখন একমাত্র পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্র।) স্বনামধন্য শীতিকণ্ঠ সেন, প্রমথ মজুমদার, (উভয়েই কে. বি. আই এর শিক্ষক শীতি কণ্ঠ সেন রাজ্যের প্রথম রাষ্ট্রপতি পদক প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, প্রমথ বাবু অতিখ্যাত ইংরেজীর শিক্ষক), প্রফুল্ল মজুমদার, নলিনী দেবনাথ, অশ্বিনী বৈষ্ণব, শচীন্দ্র ধর, অবনী সাহা, (প্রখ্যাত সেতার শিল্পী) মদন গোপাল গোস্বামী, অমূল্য খলিফা (সরকার ; পরিচয় সূত্রে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের পিতা; তিনি নারীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন), কালা খলিফা, দেবেন্দ্র দাস (হোমিও চিকিৎসক)। মুরারী দত্ত (ব্যবসায়ী) প্রমুখরা ছিলেন অভিনেতা। প্রফুল্ল মুজমদার উইন্ডস্ক্রীনের ছবিও আঁকতেন। এরা তখন সমাজে অগ্রনী, আবার শিল্পী হিসেবেও বাড়তি সম্ভ্রমের অধিকারী। যন্ত্র সঙ্গীতে অবনী সাহা (সেতার); ডাঃ প্রফুল্ল দেব (এস্রাজ); আসলাম তখন বিশিষ্ট। রাজা মহারাজার অভিনয়ে যাকে বলে ষ্টেজ ফিটিং সে দশাসই দীর্ঘ দেহী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

শহরের বাইরে উপজাতি অঞ্চলে তখন যাত্রা পালা খুব জনপ্রিয়, অশ্বিনী বৈষ্ণব যাত্রা দলের কুশীলবদের পোষাক আর বাদ্য যন্ত্রের দোকান খুলে বসলেন। অশ্বিনী বাবু নেই, সেই

দোকান এখনো রয়েছে। ছেলেরা দেখভাল করেন। মুখ্যত উপজাতিরা ছিলো তার দোকানের খদ্দের।

১৯২৫ - এ মহারাজ বীরবিক্রম উদয়পুরে এসেছিলেন। তাঁর সম্মানে টাউন হলে নাটকের আয়োজন হলো। ফরিদ মিঞা নামে জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব পাড়ের এক কিশোরের অভিনয় দেখে, তার দেহ সৌষ্টব ও দেহ দ্রাঘিমা দেখে নাটকের পর মহারাজ ও মহারানী তাকে ডেকে নিলেন। খুব পছন্দ হলো। রাজা ফরিদ মিঞার বাড়ী গেলেন। ফরিদ মিঞাকে তার মা বাবার কাছ থেকে চেয়ে নিলেন। আগরতলায় তার শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। পরে রাজার সৈন্য বাহিনীতে উঁচু পদে বসান। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ দেহী ফরিদ মিঞাকে রাজা তাঁর নিজস্ব দেহরক্ষী নিযুক্ত করেন। এই কাহিনী ফরিদ মিঞার ছোট ভাইয়ের ছেলে ফিরোজ চৌধুরীর (তিনি এখনো জীবীত) কাছে শুনা।

আমরা ছোট বেলায় বিশাল দ্রাঘিমার ফরিদ মিঞাকে অনেকবার দেখেছি। আমাদের কাছে ঐ দেহটাই ছিলো বিস্ময়ের এবং আকর্ষণের। খিলপাড়ার কাজীরা যেমন — " বুগদাদী (বাগদাদ থেকে আগত অর্থে) কাজী এই সংশয় ফরিদ মিঞাকে যারা দেখেছেন তাদের হতেই পারে। বংশের ইতিহাস যদি ফিরোজ বাবুদের পরিবারে থেকে থাকে এই অনুমানের সত্য মিথ্যা তাঁরাই বলতে পারবেন। অনাদি ভট্টাচার্য লিখেছেন — "প্রাচীন শহর উদয়পুরে প্রাচীন মুসলমান পরিবারের বাস। ঐ পরিবারে দু চার জন জীবন্ত ইতিহাস ছিলেন। তাদের ঐতিহ্য বড়ই বিচিত্র।" তবে দেহ গঠনে ফরিদ মিঞাদেরও 'পাঠান' বা 'বুগদাদী" ভাবাই সঙ্গত বোধ হবে। " যেমন চন্দ্রপুর মৌজার মুসলমান বংশ তাদের আদি পুরুষ প্রথম রত্নমাণিক্যের সময়ে লাহোর দেশ হইতে আসিয়াছিলেন বলে (ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ও উদয়পুর বিবরণ, পৃঃ ৫৭) আমরা জানতে পেরেছি।"

নাটক প্রসঙ্গে আরো যে কথা তা হল কতিপয়ের অভিনয় ক্ষমতা। অধিকাংশই হত ঐতিহাসিক নাটক। রাজা জমিদারের পাঠে অশ্বিনী বৈষ্ণব। (নিজেকে পরিচয় দিতেন B.K.S. A.K. Baishnab; এতবড় নাম রহস্য নিজেই সহজ করতেন " অধীনের নাম বৈষ্ণব কূল শিরোমণি অশ্বিনী কুমার বৈষ্ণব) অনবদ্য আবার দর্শকরাও কম রসিক ছিলেন না। ছোট খাট সুন্দর সুশ্রী চেহারার হোমিও ডাক্তার দেবেন্দ্র দাস মেয়েদের পাঠ নিতেন। তার বুকে লোম ছিলো। একবার অভিনয়ের সময় তাঁর বুকের লোম বেরিয়ে পড়ে। পর দিন বাজারে পোষ্টার পড়ল " রানীর বুকে পশম কেন? জবাব চাই।" এই জবাব কি দেওয়া যায়? আবার অভিনেতারাও কম হাসির সৃষ্টি করতেন না। এক পৌরাণিক নাটকে মহাদেবের পাঠ করছিলেন শচীন্দ্র ধর। ষ্টেজে এসে ষ্টেজে সজোরে ত্রিশূল খাড়া দাঁড় করিয়ে মহাদেবতো আর্বিভূত হলেন। দর্শক লক্ষ্য করল মহাদেবের নড়াচড়া নেই, স্থাযুর মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে সংলাপ আওড়াচ্ছেন। দর্শক তা মেনে নিল। কিন্তু বিপত্তি হল প্রস্থানের সময়। ষ্টেজের কাঠের ত্রিশূলের গোড়া গভীর ভাবে গেঁথে গেছে মহাদেবের সাধ্য কি তা তুলে নেয়। প্রথমে এক হাতে পরে দুই হাতের শক্তিতেও ত্রিশূল তুলতে না পেরে বিপর্যস্ত মহাদেব ঘর্মাক্ত দেহে ষ্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। বিষয়টা এতটাই হাস্যকর হয়েছিলো যে একে দর্শক কমিক রিলিফ বলেই মনে করে। নাটকের রস গ্রহণে তা বিঘ্ন বলে মনে করে নি।

নাটককে উদয়পুরে একটি সামাজিক উৎসবে পরিণত করা হয়েছিলো। উদ্যোক্তারা নাটক দেখার জন্য বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসতেন। শহরের দক্ষিণ ব্রহ্মাবাড়ী পর্যন্ত তাদের নিমন্ত্রণ সীমা ছিলো। টাউনহলে শেষ ঐতিহাসিক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিলো " টিপু সুলতান"। নাটকটি টাউনহলেই মঞ্চস্থ হয়েছিল।

আমরা কতিপয় স্কুল পড়ুয়া ছোটদের শীতের দুপুরে টাউন হলের ময়দানে একটি অন্যতম আর্কষণ ছিল। শীতে কলকাতা থেকে যাত্রা পার্টি আসত। নট্ট কোম্পানী, বীনাপানি অপেরা, রয়েল বীনাপানি অপেরা , শ্রী দুর্গা অপেরা , রঞ্জন অপেরা এবং তরুণ অপেরা; আরো অনেক। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হলে স্কুলে কেবল যাওয়া আসা। টাউন হলের মাঠ দিয়ে আমরা ঘুরে আসতাম। যাত্রা অভিনয় দেখা আমাদের জন্য নিষিদ্ধ। কিন্তু মধ্যরাতে ঘুম ভাঙলে নট নটীর উচ্চ গ্রামের সংলাপ আর কখনো যুযুধান দুই পক্ষের অসির ঝন্‌ঝনির আর সংলাপ আর যুদ্ধের তালে আবহ বাদ্য ড্রুম্ বালিশ থেকে মাথা তুলে আমরা উৎকর্ণ হয়ে শুনতাম। ফলে নট নটীদের নিয়ে নিজেদের মধ্যে কল্পিত বিচিত্র জল্পনা চলত। আর এদের চাক্ষুস করার জন্য উৎকর্ণ থাকতাম। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটত। স্কুল ফেরৎ আমরা দরমার বেড়ার ঘরে ঢুকে যেতাম। দরজা ভেজানো থাকত। শূন্য মঞ্চের চারপাশে আমরা রাজা রানীদের দেখতাম। তবে চর্তুগুণ আকর্ষণ ছিলো এরা যখন কোমর বেঁধে নিজেদের মধ্যে আমাদের অজানা কোন স্বার্থ নিয়ে পরস্পর ঝগড়া করতেন। ভাষার মর্মার্থ কুৎসিৎ। মোটেই রাজোচিত নয়। কিন্তু আমাদের বাঙালদের কানে তাদের কলকাতার ভাষা মধু বর্ষণ করত। হয়তো বা অশালীন শব্দ ব্রহ্ম মনে ভালো লাগা উত্তেজনা সৃষ্টি করত। শান্তি গোপালের তরুণ অপেরা যখন উদয়পুরে এলো তখন আমরা যুবক এবং চাকুরিরত, বিবাহিত ও কাজেই শান্তি গোপালের লেনিন, হিটলার আর মুসোলেনী, বুক ফুলিয়ে দেখেচি সপরিবারে মানে স্বামী স্ত্রীতে মিলে।

এখন উদয়পুরে যেখানে ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক ও নবজাগরণ সংঘ সেখানে ১৯৫০ সালে ছিল সিনেমা হল। " ভারতী" সিনেমা হল। আমরা তখন শঙ্কর টিলায়। এক সন্ধ্যায় দেখলাম পূর্ব আকাশে আগুনের দাউ দাউ শিখা। উঠানে দাঁড়িয়ে আগুন দেখছি। বিকট কয়েকটা শব্দ হল। আগুন লাফিয়ে উঠল। আগুন নেভাতে কেউ এলো না। ঘন্টা খানেকের মধ্যে ভারতী সিনেমা হল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। পেছনে রেখে গেল "চন্দ্রহাস"-এর প্রেমকাহিনী আর " রঞ্জনের" তরবারী যুদ্ধের উত্তেজক স্মৃতি। সেটা ১৯৫৩ সালের শীতের সন্ধ্যা। এর অব্যহতি পরেই শুনলাম। দত্তের স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে (রমেশ স্কুল এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় রমেশ দত্ত বলে লোকে তাকে তখন দত্ত স্কুল ই বলত)। এর ক' দিনের মাথায় এমনই এক শীতের সন্ধ্যায় জগন্নাথ দিঘীর দক্ষিণ পাড়ে কে. বি. আই স্কুল পুড়ে গেল। দত্ত (রমেশ) স্কুলে অগ্নি সংযোগের কারণ পাওয়া গিয়েছিল। স্কুলটি কমিউনিষ্টদের স্কুল। রমেশ দত্তের দ্বিতীয় পুত্র ধীরেন্দ্র দত্ত, স্কুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি ছাত্র জীবনে কমিউনিষ্ট পার্টির সভ্য ছিলেন। এখানে এসেও নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠে উদয়পুরের কমিউনিষ্ট নেতা প্রয়াত নরেশ ঘোষের সঙ্গে। সেই সূত্রে বীরেন দত্ত , নৃপেন চক্রবর্ত্তী, দশরথ দেব' দের সঙ্গে। কে. বি. আই -এর আগুনের পশ্চাতে ছিল পরীক্ষা ফেলের অবসাদ। কিন্তু 'ভারতী' সিনেমা হলের আগুনের কোন 'ক্লু'

পাওয়া যায় নি। অংশীদারত্বে চলা হল টি এখানেই বিলুপ্তি ঘটে। তবে পুড়ে যাওয়া দগ্ধাবশেষ থেকে পাওয়া একটি এমপ্লিফায়ার নিয়ে এক সকালে থানা কর্ণারে উদয়পুরের লোক গজ কচ্ছপের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছিল। দুই অংশীদার নরেশ ঘোষ (আসল অংশীদার ছিলেন নরেশ বাবুর ভাই সুরেশ ঘোষ) এবং মাঘন মজুমদার। দুই জনেই ঐ এমপ্লিফায়ার দখল নেবার জন্যে টানাটানি করছিলেন। " ভারতী সিনেমা" র ঐটিই ছিল আমাদের চোখের দেখা চলমান শেষ দৃশ্য।

বর্তমান টাউন হলটি তৈরী করার জন্যে ১৯৮২ সালে জগন্নাথ দিঘীর পূর্ব উত্তর কোণার চৌচালা টিনের চাল, টিনের বেড়ার পুরনো টাউন হলটি ভেঙে ফেলা হল। টিন কাঠ বেচে দেওয়া হল। কাঠে খোদাই নির্মাণ স্মারকের সন তারিখ ঠিকাদারের কব্জায় চলে গেল। ফলে জন্ম তারিখ বিলুপ্ত হয়ে এখন শুধু গবেষণাই বেঁচে রইল। ঐ একই সময়ে নির্মিত পূর্ব বাজারের 'বড় ঘর' এর কাঠে খোদাই ঠিকুজীও এখন বিলুপ্ত। ফলে ঠিক করে উদয়পুরে টাউনহল বা বড় ঘর নির্মিত হয়েছিল তা নির্ধারণ কঠিন। উদয়পুর থেকে প্রকাশিত ছোটদের দ্বিমাসিক কাগজে দেখলাম এক প্রবন্ধে পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী লিখেছেন — " ১৯২৭ সালের আগেই টাউন হল নির্মিত হয়েছিল উদয়পুরে।" এব্যাপারে ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন চিত্ত ঘোষ। তিনি তাঁর স্বর্গীয় পিতা সুধীর ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন — ১৯২৩ সালে টাউন হল নির্মিত হয়েছে। সুধীর ঘোষ উদয়পুরে বিংশ শতাব্দীর প্রায় গোড়া থেকে ছিলেন। উদয়পুরের তৎকালীন বহু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। টাউনহলে প্রথম বারোয়ারী দুর্গা যা টাউন হলের সামনের বারান্দায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই পূজা কমিটির সম্পাদক ছিলেন। কমিটির সভাপতি ছিলেন তারা প্রসন্ন রায়। কাজেই তার কথার গুরুত্ব রয়েছে। এবার পারিপার্শ্বিকতা বিচার করা যাক।

১৯০১ - এ উদয়পুর বিভাগের সদর দপ্তর হয় উদয়পুরে। ১৯০৩ / ৪ - এ জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ে, মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্যের নির্দেশে খিলপাড়া থেকে প্রশাসন ভবন চলে আসে জগন্নাথ দিঘীর উত্তর পাড়ে। ১৯০৪ - এ স্থাপিত হয় উদয়পুর বাজার। তখনো কিন্তু টাউন হলের অস্তিত্ব নেই। ১৯২৫ এ মহারাজ বীর বিক্রমের সম্মানার্থে প্রথম দেখলাম একটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে। কাজেই ১৯২৫ - এর আগে কোন এক সময়ে টাউন হলটি নির্মিত হয়েছিল তা নিয়ে সংশয় নেই। সে দিক থেকে দেখলে সুধীর ঘোষের ১৯২৩ সালের সারবত্তা রয়েছে। বীর বিক্রমের উদয়পুর ভ্রমণ ছিল জানুয়ারী, ১৯২৫ সাল। টাউন হলের মতোই 'বড় ঘর' তা হলে ১৯২৩ সনে নির্মিত। আমরা ১৯৪৮ সালেও টাউন হলের পশ্চাতে ফুটবল ময়দান বা টাউন হলের মাঠে একটি বেশ বড় সড় কাঠ বাদামের গাছ দেখেছি। রাস্তা সংলগ্ন একটি বড় আম গাছ ছিল আর টাউন হলের মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে রাস্তা সংলগ্ন আরো একটি বড় আম গাছ ছিল। বর্তমানে ঐ আম গাছ দুটি এবং বিরল দৃষ্ট কাঠ বাদামের গাছটি নেই। ঐ সব গাছ মাঠ এবং টাউন হল প্রস্তুতির সময়কালের প্রাচীনত্ব বুঝাবার জন্যে। গাছগুলি স্মারক হিসেবে মানুষের হাতেই রোপিত হয়েছিলো। কাজেই টাউন হলের প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

চৈত্র সংক্রান্তি আর ১লা বৈশাখ দুটি দিনই ছিল বেশ জমাটি দিন। চৈত্র সংক্রান্তিতে

শিববাড়ীর মাঠে চড়ক পূজা; পূজা উপলক্ষ্যে মেলা। আর ঐ মেলার সব চাইতে আকর্ষণ ছিলো পিঠে বঁড়শী গেঁথে চড় গাছের ডগায় ভূসমতলে বাঁশ বেঁধে বাঁশের দুই মাথা থেকে মোটা শক্ত দড়ি ঝুলিয়ে বঁড়শী বেঁধে সেই বঁড়শী দুজনের পিঠে গেঁথে ঘুরানো। বা আগুনের ধূনী জ্বেলে আগুনের মধ্য দিয়ে নগ্ন পায়ে হেঁটে যাওয়া এবং অক্ষত থাকা। ঐ চড়ক গাছ বিজয় সাগর তথা মহাদেব দিঘীতে রেখে দেওয়া হত। বৎসরে একবার চড়ক পূজার আগের দিন বাদ্য ভান্ড সহযোগে পূজারী অন্য লোকদের সহায়তায় জল থেকে গাছটি তুলে মাটিতে পুঁতে কসরতের আয়োজন করতেন। ঐ চড়ক পূজার আয়োজকরা ছিলেন বিভিন্ন "ঢাকীর নাচের" দল। পূজার এক মাস আগে থাকতেই দলগুলি কালী মহাদেব সাজিয়ে বাড়ী বাড়ী ঢুকে গান গেয়ে চাঁদা আদায় করত। হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে চলত রাতভর তাদের বাড়ী বাড়ী পালা। কেউ কেউ এই ঢাকীরী নাচের দলের সঙ্গে ঘুরে রাত কাবার করে দিত। ঢাকীর নাচের দল সবকটাই তৈরী হত ফুলকুমারী গ্রামে। গোটা চৈত্র মাস জুড়ে চলত ঐ রাতের উৎসব। চড়ক পূজার আয়োজক ছিলো ওরাই।

বিতর্ক রয়েছে উদয়পুরে বারোয়ারী দুর্গাপূজা নিয়েও। কেউ বলছেন ১৯২৩ - এ টাউন হলে প্রথম বারোয়ারী পূজা হয়। এই মত গ্রহণ যোগ্য নয়। কারণ যারা ঐ প্রথম বারোয়ারী পূজার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাদের নাম সংগ্রহ করা গেছে। যেমন — তারাপ্রসন্ন রায়, সুধীর ঘোষ, অশ্বিনী বৈষ্ণব, বীরু ভট্টাচার্য, প্রফুল্ল বিশ্বাস, ডাঃ বিনয় দাস, প্রফুল্ল মুজমদার (উকীল) অশ্বিনী দে (ফুল কুমারী, হেমেন্দ্র দাস, দেবেন্দ্র দাস জামজুড়ী, হোমিও ডাক্তার, প্র্যাকটিস করতেন উদয়পুর শহরে) দেবেন্দ্র নিয়োগী (খিলপাড়া) এরা সকলেই ২০ থেকে ৩০ বছরের আগে প্রয়াত। যখন এরা পূজার উদ্যোগ নেন তখন এরা ২০ /২৫ বছরের যুবক। ওরা বেঁচে থাকলে কারোর বয়সই একশ বছরের কম হত না কারোর বেশী। কাজেই ধরে নেওয়া যায় ওদের জন্ম বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। ওদের যখন ২০ /২৫ বছর বয়স সেই সময়টা হয় ১৯৩০ /৩৫ সন। একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে উদয়পুরে কুঞ্জ চক্রবর্তী যখন হাকিম তখন ১ম বারোয়ারী দুর্গাপূজা হয়। কুঞ্জ চক্রবর্তী উদয়পুরের হাকিম ছিলেন ১৯৩০ /৩১ সালেই। উদ্যোক্তারা যুবক এই তথ্য ধরে অগ্রসর হলে উদয়পুরে পূজার সময়টা ১৯৩০ / ৩১ সালে ধরতে হয়। কারোর মতে তখন হাকিম ছিলেন প্রমোদ কর্তা (দেববর্মা) সময়টা ১৯৩৯ / ৪০ সন। তখন ঐ যুবকরা প্রৌঢ়ত্বের সীমানায়। যৌবনের দুঃসাহসিকতা হারিয়ে ফেলার বয়স। দুঃসাহসের কথাটা এলো এই কারণে যে উদয়পুরে ত্রিপুরাসুন্দরী পূজিতা হন বলে, এবং উদয়পুরে শক্তি পীঠ বলে অন্য দেবদেবীর পূজায় নিষেধ রয়েছে এমনটাই শাস্ত্রীয় বিধান ব্রাহ্মণদের। ঐ সময়ে ঐ বাঁধা অতিক্রম করার জন্য যথেষ্ট হিম্মতের প্রয়োজন ছিলো। এবং যুবকদের পক্ষেই তা সম্ভব। কাজেই উদয়পুরে প্রথম বারোয়ারী পূজা ১৯৪০ - এর আগে ধরে নিলে অযৌক্তিক হয় না। মুসকিল হলো প্রামান্য নথি পত্র নেই। সকলেই মুখে শুনছে। যারা বলছেন নিজের মতো করে বলছেন। কাজেই অসংখ্য জট। সুতরাং শক্ত যুক্তি জালের মধ্যেই সম্ভাব্যতাকে খুঁজে নিতে হবে।

টাউন হলের পূজা মানে সমস্ত উদয়পুরের পূজা। ফলে কমিটিতে প্রতিনিধিত্ব থাকত শহর, শহরের বাজার এলাকা, ফুলকুমারী, খিলপাড়া, জামজুড়ী সব জায়গারই। যেমন

খিলপাড়ার দেবেন্দ্র নিয়োগী, ফুলকুমারীর অশ্বিনী বৈষ্ণব, বাজারের তারাপ্রসন্ন রায়, অশ্বিনী বৈষ্ণব, জামজুড়ীর দেবেন্দ্র দাস, জগন্নাথ দিঘীর পাড় তথা টাউনের প্রফুল্ল বিশ্বাস, ডাঃ বিনয় দাস, প্রফুল্ল মজুমদার, বীরু ভট্টাচার্য প্রমুখ। অর্থাৎ উদয়পুর মহকুমার পূজা।

১৯৪৬ সনে কোষ বিভাজন শুরু হয়; এবং এখন অন্তহীন বিভাজনে। ১৯৪৬ সনে পূর্ব বাজারে দ্বিতীয় বারোয়ারী পূজা শুরু হয়। ১৯৪৮ সালে জামজুড়ীও বিযুক্ত হয়ে গেল। তালুকদার বিজয় লাল বন্দোপাধ্যায় তারাশঙ্কর ঘোষ জামজুড়ীতে পূজার উদ্যোগ নিলেন। প্রথম বৎসরেই এই ব্রাহ্মণ এক ঐতিহাসিক কান্ড ঘটালেন। জামজুড়ীর নিম্নবর্ণের লোকেদের তিনি পূজা মন্ডপে প্রবেশ অধিকার দিলেন। গ্রামে তখন সাত পরিবার চর্ম শিল্পীর বাস। ১৯৪৬ সালে তখনো রক্ষণশীল সমাজ, সেই আবহে এক উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণের হাতে "শাপমোচন" সকলে বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলো। তবে বিজয় লালের এতটাই প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা ছিলো যে মানুষ তাকে সমাজপতি পদে বসিয়ে রেখেছে, সমাজপতির এই সামাজিক বিধান নিয়ে তাই কোন শোরগোল উঠে নি সেদিন।

বিজয় লালের ছেলে বিমলা প্রসাদ আকর্ষণীয় হয়ে উঠলেন অন্য কারণে। তিনি নিয়ে এলেন কলের গান। এতটুকু যন্ত্র থেকে সুরেলা গান মাতিয়ে দিল জামজুড়ীকে। নিত্য দিন রীতি মতো আসর বসে যেত ব্যানার্জী বাড়ীতে। সেই সঙ্গে সাইকেল। সাইকেল কিনলেন দুই বন্ধু মিলে। সঙ্গের বন্ধু কালী শঙ্কর ঘোষ। তখন জামজুড়ীর অপর বিশিষ্ট বাড়ী। দুই বন্ধু বিমলা প্রসাদ আর কালী শঙ্কর দুই সাইকেলে উদয়পুর জামজুড়ী জয় রাইড করতেন।

উদয়পুরে দুর্গা পূজা হবে তো স্থির হলো। মনের জোরে শক্তি পীঠের বাঁধা অতিক্রম করা হলো কিন্তু মূর্ত্তি প্রতিমা গড়রে কে? উদয়পুরে প্রতিমা গড়ার কারিগর নেই। এবার বুঝি সব ভন্ডুল হয়! মুসকিল আসানে সম্পাদক সুধীর ঘোষকেই এগিয়ে আসতে হলো। ঘোষদের আদি বাড়ী ঢাকা। সুধীর ঘোষ ঢাকায় চলে গেলেন কারিগরের খোঁজে। নিয়ে এলেন লাল বিহারী পাল মৃৎশিল্পীকে। লালবিহারী পালের মনে হয় তো উদয়পুরে স্থায়ী বাসের বাসনা জেগে ছিলো। তিনি সপরিপারেই উদয়পুরে চলে এলেন। তাঁর তিন পুত্র বিষ্ণু, নারায়ণ আর গণেশ। প্রথম দুজন বিষ্ণ, নারায়ণ তার সহ-শিল্পী হলো। গণেশ তখনো নেহাৎই শিশু। অতি চমৎকার মূর্তি গড়ে লাল বিহারী সকলকে মুগ্ধ করে দিলেন। পরে তাঁর ছেলেরা বিষ্ণু, নারায়ণ উদয়পুরে শ্রেষ্ঠ মৃৎশিল্পী হয়েই ছিলেন।

লাল বিহারী তাঁর শিল্পশালা খুললেন চন্দ্রাবলী মিশ্রের জায়গায় বর্তমান শহরের পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে। সম্ভবত সুধীর ঘোষই এই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জামজুড়ী কিন্তু মজে রইল "কালার ঘাটে বাঁশী বাজে গো কমলা, আমরা জলে যাই।" ঐ সুর মূর্ছনায়, কলের গানে।

দর্পণে পুরোহিত

"রাজার নগরের দক্ষিণে গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে। উহা উচ্চতায় অনুমান ৪০ হাত হইবে। ঐ মন্দিরে ত্রিপুরা ঠাকুরানীর মূর্তি আছে (অর্জুন দাস বৈরাগী, রত্নকন্দলী শর্মা।)" ত্রিপুরা ঠাকুরানীর বিষয়ে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত লেখা হয়েছে। উপসংহারে এই সংযোজন একটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে। বিতর্কটি হল মায়ের বাড়ীর যে বর্তমান পুরোহিত কূল বর্তমানে পূজা দিচ্ছেন তাদের পূজারী হিসেবে কোন সময়ে কে নিযুক্তি দিয়েছিলেন? এবং সংশ্লিষ্ট মহারাজ কোথায় তাদের সন্ধান পেলেন? অর্থাৎ কিভাবে তাঁরা ত্রিপুরায় এলেন।

এই প্রশ্নে জন্ম দিয়েছেন প্রয়াত বিজয় চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্যকেই বহুজন ব্যবহার করেছে এবং প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে যে এই ব্রাহ্মণ কূল কান্যকুব্জ বা কনৌজ থেকে এসেছেন এবং ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দে ধন্য মাণিক্য তাদের কনৌজ থেকে পুরোহিত পদে বৃত করে এখানে নিয়ে আসেন। এবং তখন থেকেই এই মন্দিরে দেবী 'ত্রিপুরা ঠাকুরানীর' পূজা শুরু হয়। বিজয় চক্রবর্তীর দেওয়া তথ্যে তাদের আদি পুরুষ ধনঞ্জয় পান্ডাকেই মহারাজ পৃথক নিযুক্তি দিয়ে মন্দিরের দায়িত্ব দেন। তবে কেবল ধনঞ্জয় পান্ডার বংশধর তথা বিজয় চক্রবর্তীর গোষ্ঠী ভুক্তরাই তো মন্দিরে পূজা দিচ্ছেন না অপর একটি বংশও মন্দিরের পূজারী সেই প্রশ্নে তাঁর পাদ পূরণ ছিল " অপর বংশ হল গদাধর পান্ডের।" দুই পূজারী বংশ নিয়ে গোলমাল নেই। এখনো এই দুই বংশই মন্দিরের পূজারী। দুই বংশের হিস্যাতেই বছরের ছয় মাস ছয় মাস করে। প্রতি বংশের ডাল পালা যার যার বংশের ছয় মাসের অংশীদারীত্ব ভোগ করেন।

কিন্তু কান্যকুব্জের কথা কিভাবে এলো? একি কৌলিন্যের উপরে রং চড়ানোর জন্যে প্রচার? না প্রকৃতই তারা কান্যকুব্জের লোক? এখানে একটি প্রশ্ন তা হল বিজয় বাবুর বয়ান মতো তাদের আদি পুরুষের উপাধি ছিলো "পান্ডা"। পান্ডা, শব্দে বিবর্তন বা অপভ্রংশ কোন মতেই চক্রবর্তী তে পৌছাতে পারে না। সুতরাং সর্বপ্রথম উপাধিতেই সংশয় এবং বিজয় চক্রবর্তীর দাবী নস্যাৎ হয়ে যায়।

কৈলাশ সিংহ লিখেছেন —" ধন্য মাণিক্য দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। উক্ত মন্দিরের খোদিত লিপিতে লিখিত আছে যে ১৪২৩ শকাব্দে উহা নির্মিত হইয়া ছিল (১৫০১ খ্রীঃ)। রাজ মালায় লিখিত আছে, দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী চট্টলাচল মধ্যে লুক্কায়িত ছিলেন। তিনি স্বপ্নে মহারাজ ধন্য মাণিক্যের প্রতি আদেশ করেন। তদনুসারে ধন্য মাণিক্য দেবীকে রাঙামাটিয়া নগরে আনয়ন পূর্বক তাহার পূজা প্রচার করেন।

এই দেবী ত্রিপুরা সুন্দরী দ্বারা তান্ত্রিক জগতে ত্রি পুরা একটি তীর্থ (পীঠ) স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।"

কৈলাশ সিংহ রাজ পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিত ' রাজমালা'র বরাত ও রেখেছেন। আসলে মূল রাজমালা হল তাঁর " সাক্ষী"। সেই সাক্ষী মোতাবেক (১) মহারাজ ধন্যমাণিক্য দেবী ত্রিপুরা সুন্দরীরর পূজার জন্য শুরুতেই কোন বহিরাগত পূজারীকে আনেন নি। (২)

বৈদিক মতে দেবী পূজা শুরু হয় নি। দেবী পূজিতা হতেন তান্ত্রিক মতে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে বর্তমানে যে দুই পুরোহিত বংশ দেবী ত্রিপুরাসুন্দরীর পূজো দিচ্ছেন — (১) তাদের ধন্য মাণিক্য নিয়ে এসেছিলেন এই দাবী ভ্রান্ত এবং অতিরঞ্জন এর কোন ভিত্তি নেই। (২) বর্তমান পুরোহিতরা কোন এক সময়ে এই রাজ্যে এসেছিলেন আর কান্যকুব্জের তো কথাই নেই কারণ কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণরা বৈদিক ব্রাহ্মণ। তান্ত্রিক আচার অনার্যদের। আর ত্রিপুরা সুন্দরীর পরিচয় প্রাধান্য ও কৈলাশ সিংহের মতে " তান্ত্রিক জগতে"। বৈদিক ব্রাহ্মণ কেন তন্ত্র মতে পূজার বায়না নিতে যাবেন?

এ ব্যাপারে বিস্তারিত ক্ষেত্রে প্রবেশের আগে আমরা দেখবো কান্যকুব্জ থেকে ব্রাহ্ম বা ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীকে কোন রাজা পূজা আর্চনার জন্যে ত্রিপুরায় এনেছিলেন কিনা। ধনঞ্জয় গোষ্ঠীর মুখপাত্রের দাবী "কান্যকুব্জ" এবং ধন্য মাণিক্যের সময়ে এবং দেবীর পূজা পাঠ তাঁদের পূর্ব পুরুষদের দিয়েই শুরু। ইতিহাস বলে ধন্য মাণিক্য মন্দির নির্মান করেন, দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠার যে পর্ব আয়োজন তা পূজা পাঠ দিয়েই শুরু। তাহলে বলতে হয় মন্দিরে দেবী প্রতিষ্ঠার আগেই কান্যুকুব্জীয় ব্রাহ্মণদের নিয়ে আসা হয়েছিল উদয়পুরে। কিন্তু ধন্য মাণিক্য কান্যকুব্জ থেকে কোন পুরোহিত সম্প্রদায় এনেছেন এমন তথ্য রাজমালাতে কোথাও নেই। এর অর্থ দাঁড়ায় কোন বৈদিক ব্রাহ্মণ দ্বারা দেবী প্রতিষ্ঠা হয় নি। বা পুরোহিত হিসেবে কেউ নিযুক্ত হন নি। এর স্বপক্ষে বড় প্রমান হল তো ধন্য মাণিক্য ঐ যে " তান্ত্রিক পীঠ"। নিয়মিত কোন পূজকই ছিলেন না। তন্ত্র সাধকরা মর্জি মাফিক মনের টানে দুর্গম পথ অতিক্রম করে এখনো আসতেন, তন্ত্র সাধনা করতেন। অর্থাৎ মন্দির ও দেবী দুই'ই তন্ত্র সাধকদের দখলেই ছিলো। জঙ্গল বেষ্টিত প্রায় চলাচলের পথ বর্জিত কূর্মপীঠে রাজপীঠে রাজাধানী উদয়পুর থেকেও নিয়মিত পৌছানো কষ্টকর ছিলো। ফলে, বর্তমানে পুরোহিতদের উর্ধ্বতন পুরুষেরাও বহু বৎসর অনিয়মিত ভাবে পূজা দিয়েছেন। বহু দিন এরা মন্দিরে গড় হাজির থাকতেন। দুই হাতে জঙ্গল ঠেলে সাপ জোঁক বন্য জন্তুর ভয় ভাবিত মনে পূজাতেও ওরা কার্যতঃ অমনোযোগী ছিলেন। তারপরে বর্ষাকালে যাতায়াত তো ছিলো প্রায় অসম্ভব। সুখ সাগরের হ্রদ জলে টৈ টম্বুর। শীতকালে বাঘ হাতীর উপদ্রব বেড়ে যেত। এই উপদ্রব তো বিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেও দেখা যেত। ফলে ভর দুপুরে "সন্ধ্যাবাতি" মূর্তির সামনে জ্বালিয়ে দিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে সূর্য পশ্চিমে হেলে পড়ার আগেই শহরে মানে মহাদেব বাড়ী সংলগ্ন আবাসে বা খিল পাড়ায় ফিরে আসা এই কাহিনী বা ঘটনা এখনো কিছু জীবিত প্রবীণদের স্মৃতিতে। ধন্যমাণিক্য যদি পুরোহিত নিযুক্ত করে থাকতেন তবে মন্দির সংলগ্ন স্থানেই তাদের থাকার বন্দোবস্ত করতেন এবং নিয়মিত পূজার বাধ্যবাধকতা বজায় রাখতেন। এমন " উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ" অবস্থায় মন্দির পড়ে থাকত না।

এখন প্রশ্ন প্রথম পূজক তান্ত্রিক কারা? কবে থেকে মন্দিরে নিয়মিত পূজা শুরু হয়? কোন রাজা এই উদ্যোগ নিলেন? কোথা থেকে পুরোহিত তিনি সংগ্রহ করলেন?

এই সব প্রশ্নের জবাব দেবার আগে আমরা খোঁজ নিই সত্যি সত্যিই ত্রিপুরার ইতিহাসের মধ্য যুগে কান্যকুব্জ থেকে কোন পুরোহিত আনানো হয়েছিল কিনা? এবারও কৈলাশ সিং-এর স্মরণ নেব। তাঁর "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাসে"র ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন — "

মহারাজ মহামাণিক্যের মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার ধর্ম পিতার বর্তমানেই সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক তীর্থ পর্যটন করিতে ছিলেন। কুমার ধর্মদেব সন্ন্যাসী বেশে বারানসী নগরে অবস্থান কালে একদা মধ্যাহ্ন সময়ে মণিকর্ণিকাতটে নিদ্রিত ছিলেন; তৎকালে এক প্রকান্ড কাল ফনী ফনা বিস্তার পূর্বক তাহার মস্তক মন্ড দেবের প্রখর উত্তাপ হইতে রক্ষা করিতে ছিল। কান্যকুব্জ দেশীয় জনৈক ব্রাহ্মণ এই ঘটনা নিতান্ত বিস্মিত হইয়া, তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কুমার জাগ্রত হইলে বিষধর স্বস্থানে প্রস্থান করিল। তখন সেই ব্রাহ্মণ তৎসমক্ষে উপনীত হইয়া তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্রাহ্মণ বলিলেন, কুমার! আপনি স্বদেশে গমন করুন, শীঘ্রই আপনার মস্তকে রাজছত্র ধৃত হইবে। আপনি অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে আমি সপরিবারে আপনার সহিত ত্রিপুরায় গমন করিতে প্রস্তুত আছি।

সেই সময়ে ত্রিপুরা হইতে কয়েকজন লোক তাঁহার অনুসন্ধানে বর্হিগত হইয়া বারানসী নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা কুমারের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাহাকে বলিল, কুমার! আপনার পিতা বসন্তরোগে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন, সৈন্যগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, আপনার জীবিতাবস্থায় অন্যের কথা দূরে থাকুক, আপনার অনুজকেও সিংহাসনে আরোহন করিতে দিবে না।

কুমার ধর্ম এই বাক্য শ্রবণে ত্রিপুরায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন।

কান্যকুব্জ দেশীয় " কৌতূক' নামক সেই ব্রাহ্মণ সপরিবারে তাহার সহিত আগমন করিয়াছিলেন। মহারাজ ধর্ম মাণিক্য কান্যকুব্জ দেশীয় সেই ব্রাহ্মণকে স্বীয় পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন। ইনি হলেন প্রথম ধর্ম মাণিক্য, ধন্য মাণিক্যের পিতা। এর আগে রাজ পুরোহিত ছিলেন বানেশ্বর ও শুক্রেশ্বর। তারাই ছন্দে আদি রাজমালা রচয়িতা। এই হল কান্য কুব্জ থেকে পুরোহিত আনয়ন কাহিনী। কিন্তু তারা কোন মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হন নি। ত্রিপুরা সুন্দরী রাজ পরিবারের অন্যতম মান্য দেবতা হলেও চতুর্দশ দেবতাই তাদের কুল দেবতা। সেখানে পূজক "চন্তাই" অর্থাৎ উপজাতি পুরোহিত।

ত্রিপুরা সুন্দরী পূজা আয়োজন ও পূজা বিধান ও কিঞ্চিৎ আলোচনার অপেক্ষা রাখে। চন্তাই, গালিম, জোলাই। এই বিন্যাস ও পদবী উপজাতিদের। চন্তাই পূপক। গালিমের কাজ বলি দেওয়া, মায়ের উদ্দেশে যে মোষ বা পশু বলি দেওয়া হত ঐ কাজ তাদের। অমাবস্যার নিশি পূজায় মোষ বলি হত অউপজাতি ব্রাহ্মণদের দখলে মন্দির ও পূজা যাওয়ার পরেও ঐ কাজটা গালিমরাই করতেন। তারা নির্দিষ্ট তিথিতে চলে আসতেন পুরাতন হাবেলী থেকে। অমাবস্যার অন্ধকার দূর করার জন্যে যারা মশাল জ্বালিয়ে ধরে রাখতেন সেই মশালচিরাও ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায়ের। এদের বলা হত " জোলাই"। এদের বাসস্থান ছিল মন্দিরের সন্নিকটে। এখন যে জায়গার নাম দাতারাম জোলাইবাড়ী, সেখানে। জোলাইদের বাসস্থান বলে জায়গার নাম হয় জোলাই বাড়ী। দক্ষিণ জেলার বিলোনীয়ায় অপর এক জোলাইবাড়ী থাকায় সণাক্তকরণের সুবিধার জন্যে দাতারাম সংলগ্ন বলে এর নাম দেওয়া হয় দাতারাম জোলাই বাড়ী। ১৯৮০ সালের জাতি দাঙ্গার পরে সম্ভবত, ভয় ভীতির কারণে, এবং জীবীকা হিসেবে তুচ্ছ বলে ওরা আপনা থেকেই ঐ অধিকার ছেড়ে দেন। তবে তারও আগেই রাজ আমলেই তাদের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হতে থাকে। এর স্বপক্ষে প্রমাণ হল বাঙালী

পুরোহিতদের রাজন্যস্বীকৃতি। এবং সঙ্গে মন্দিরের কাজে টলুয়া, ঝাড়ুদার, মালাকারদের জন্যে মিনা সম্পত্তির বন্টন ব্যবস্থা।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হল তথাকথিত ধনঞ্জয় পান্ডার বংশধরের একজন, অধুনা প্রয়াত, বিজয় চক্রবর্তীর দাবী মতো এরা রাজা এদের দেবোত্তর সম্পত্তি দিয়েছেন। কিন্তু গদাধর পান্ডার বংশধর বর্তমানে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত বকুল চক্রবর্তী আমাকে বলেছেন — " রাজা কোন দেবোত্তর ভূসম্পত্তি তাঁদের দেয় নি। রাজা তাঁদের কর্মচারী হিসেবেও গণ্য করতেন না। তাঁরা মন্দিরের পূজার অধিকার পেয়েছিলেন। মন্দিরের আয় রাজ কোষে যেত না। পুরোটাই পুরোহিতদের প্রাপ্য ছিল। বকুল চক্রবর্তীর বক্তব্যের সাজুয্য আমরাও প্রত্যক্ষ করেছি। পুরোহিতদের কর্মচারী বানানোর প্রস্তাবনাটা অতি সাম্প্রতিক। রাজকোষ থেকে পুরোহিত বেতন দেওয়া হত না। তবে একটা সন্দেহ উঁকি দেয় মন্দিরের জন্য ব্যয় নির্বাহের জন্য বিপুল ভূ-সম্পত্তি কে কিভাবে বেহাত করেছিল? দেড় দশক আগে মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী তথা ত্রিপুরা সরকার বনাম পুরোহিত বিজয় চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় পান্ডার অধঃস্তন মামলা করেছিলেন সম্পত্তির অধিকার নিয়ে।

এক সময়ে মহাবিস্ময়ে উদয়পুরবাসী প্রত্যক্ষ করল কল্যাণ সাগর যা মায়ের বাড়ীর দিঘী নামে পরিচিত, ঐ দিঘীর পূর্ব পাড় বর্তমানে যেখানে গুণবতী বিশ্রামাগার ঐ পাড়ে উপবীতধারী বিপ্রদের যজ্ঞের ধূম লেগেছে। কেজি, কেজি ঘি, কিঞ্চিৎ চন্দন কাঠের অনুপাত মিশ্রণে যজ্ঞের কাঠে আগুনের তান্ডব। ক্রমে তা বাৎসরিক যজ্ঞানুষ্ঠানে পরিণত হল। কাঁচা যজ্ঞ বেদী, যজ্ঞের পরেই ভেঙে দেওয়া হত। এক সময়ে দেখা গেল বেদী পাকা হয়ে গেছে। তারপর শহরে রটে গেল এই জায়গা, পুরো পূর্ব পাড়ই বিজয় চক্রবর্তীর জায়গা, পুরোহিত হিসেবে মা ত্রিপুরা সুন্দরীই তাকে ঐ জমির মালিক করেছেন। এতদিন যজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে আসছিল " ভুবনেশ্বরী আলোচনা চক্র" নামক এক প্রতিষ্ঠানের নামে, বিজয় চক্রবর্তীর অনুমোদনক্রমে। এই বার বিজয় চক্রবর্তী মালিকানা দখল নিতে গেলেন। সরকার কিছুকাল চুপ রইল, অর্থাৎ পুরোহিতকে মা প্রশ্রয় দিলেন।

কিছু টাকা এলো কেন্দ্রীয় পর্যটন দপ্তরের। মোটা টাকা। পর্যটন মন্ত্রী তখন জীতেন চৌধুরী। তিনি ঐ জায়গাতেই গুণবতী বিশ্রামাগার নির্মাণে বদ্ধপরিকর হলেন। জায়গা সরকারে বেহাত হচ্ছে দেখে বিজয় চক্রবর্তী মায়ের " সেবক পুত্রের" দাবীতে আদালতের শরণাপন্ন হলেন। ত্রিপুরা সুন্দরী নিরব রইলেন বা জিতেন চৌধুরীর দিকে ঝুঁকে রইলেন। মায়ের নিরবতার কারণ ছিলো হয়তো বহু জমি তার বেহাত হয়েছে, কোন পার্থিব আনুকূল্য না পাওয়ায় তিনি ক্রমশঃ দরিদ্র হয়েছেন এবার সরকারের আনুকূল্য, বিশেষ করে পর্যটন মন্ত্রীর আনুকূল্য পেলেন। ফলে এই ভূমি খন্ড ত্রিপুরা সুন্দরী রক্ষা করতে পারলেন। ঐ মামলা সকলের চোখ খুলে দিয়েছে। মানুষ বুঝতে পারল, জানতে পারল প্রায় ২৬০ কানির মতো জমি কিভাবে বেহাত হয়েছে। ঐ মামলায় আরেকটি বিষয় উন্মোচিত হয়েছিলো, তাহল ব্যক্তিগত দেবোত্তরের বিষয়টি নেহাৎ প্রচার। মা কে দীর্ঘকাল হজম করে রাখা হচ্ছিল। প্রবাদ আছে সমসের গাজীকে মন্দির ধ্বংস করতে নাকি মা নিজেই বাহিনী নিয়ে রণ ভূমে অবতারণ হয়েছিল। মন্দির ধ্বংসের হাত থেকে মন্দির রক্ষা করেন। এবার প্রবাদ নয়, সত্যি সত্যিই মা তেড়ে ফুঁড়ে

উঠলেন এবং সরকারকে নিমিত্ত করে নিজের জমি রক্ষা করলেন। জমির বিস্তারিত বিবরণ সরকারের মহাফেজ থানায় বন্দী রয়েছে। জমি মায়ের খতিয়ানে নথিভুক্ত হলো।

আবারো পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যেতে হয়। উপজাতি পুরোহিত দের কথা। চন্তাই, গালিম, জোলাইদের অস্তিত্ব বাস্তব। তাদের ভূমিকার প্রত্যক্ষদর্শীরা আজো বর্তমান। তাহলে তাদের অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্য ইতিহাস গ্রাহ্য। কিন্তু বৈদিক পুরোহিতদের কোন ল্যাজের সন্ধান নেই। সুতরাং তাদের আর্বিভাব কাল অস্পষ্ট। উপজাতি পুরোহিতদের প্রাধান্য এবং প্রাচীনত্ব সন্দেহাতীত। " এটি তান্ত্রিক পীঠ" । পূজা হতো তান্ত্রিক মতে। চন্তাই বা উপজাতি পুরোহিতেরাই পূজা শুরু করেন। দেবীর মোঙ্গলী মুখাবয়ব, এবং দেহাকৃতি ও " উপজাতিদের দেবতা" এই যুক্তিকে প্রাধান্য দেয়। এবং তাদের প্রভাব এত প্রকট ছিলো যে এখনো যে নিত্য পূজা পদ্ধতি তা বৈদিক মতে নয় তান্ত্রিক মতেই পুজো হয়। চন্তাই গালিম এবং জোলাইদের অধিকার তো এই সেদিনের কথা। সহজ সরল তামসিক উপকরণে পূজা প্রকরণ ও চন্তাইদের দিকেই যুক্তিকে হেলিয়ে রাখে। সিঁদুর রক্তের ফোঁটা, দুর্বা , ধূপ, কলাগাছ, ধান, তিলের ব্যবহার অনার্য ধারা থেকে এবং আরো এক অদ্ভুত নিয়ম মায়ের বাড়ীতে চালু হয়েছে। দশমীর দিন নিরামিষ ভোগ। আর একাদশী দিনে বলি ও আমিষ ভোগ যা বৈদিক রীতির বিপরীত। উদয়পুরে অনেকেরই মনে থাকবে ১৯৮০ সনের মে মাসের শেষ অংশে জমাতিয়া হদা সিদ্ধি কুমার সিঁদুর রঞ্জিত খড়গ্ নিয়ে মন্দিরে ঢুকে ত্রিপুরা সুন্দরীর পূজো নিজেই দিয়েছিল। তাঁর পূজার অধিকারকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে নি।

কৈলাশ সিংহ লিখেছেন —" মহারাজা রত্ন মাণিক্যের (১ম) শাসনকালে একদল ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগকে নির্যাতন পূর্বক রাজকীয় পৌরোহিত্যে গ্রহণ করেন। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণদিগের বংশধরগণ অধুনা পার্বত্য ত্রিপুরাদিগকে যাজন করিয়া 'কথঞ্চিৎজীবীকা নির্বাহ করিতেছেন।"

এখানে আমরা একটি সূত্রের সন্ধান পাই। তা হল প্রাচীন ব্রাহ্মণদের নির্যাতন করে নূতন ব্রাহ্মণেরা রাজ আনুগত্য লাভ করেন। এই প্রাচীন ব্রাহ্মণ কারা? প্রাচীন ব্রাহ্মণ যে চন্তাইরা এই ব্যাপারে সংশয়ের অবকাশ কম। এরা রাজার অনুগ্রহ পেল, কিন্তু রাজবংশের কূল দেবতা 'চতুর্দশ দেবতার' পূজার অধিকার ছিনিয়ে নিতে পারল না। চতুর্দশ দেবতার মন্দিরের দূয়ার তাদের জন্য অবরুদ্ধই রইল। বরং সেই ব্রাহ্মণদের উত্তর পুরুষেরা যে ত্রিপুরাসুন্দরী পূজার অধিকার পরবর্তী কালে ধন্য মাণিক্যের কালে অর্জন করে ছিলেন তারও প্রমাণ নেই। এখনো পর্যন্ত চন্তাইদের স্বীকৃত অধিকার দেখে এই অনুমানই যুক্তি নির্ভর যে ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের কর্তৃক চন্তাইদের হাতেই দীর্ঘকাল ছিল। সেই রত্ন মাণিক্যের সময়ে আগত ব্রাহ্মণদের পরিণতির সূত্র ও কৈলাশ সিংহ দিয়েছেন — " পার্বত্য ত্রিপুরা দিগকে যাজন করিয়া তাহারা কথঞ্চিত জীবীকা নির্বাহ করিতেছে।" ঐ ব্রাহ্মণদের আমরাও দেখেছি। ধান কাটার মরসুমে যাজমানদের কথা তাদের মনে পড়ত। ধান চাউল সংগ্রহ করে মাস খানেক ময়াল করে ওরা সংবৎসরের ধান সংগ্রহ করে বাড়ী ফিরে গ্যাট্ হয়ে বসতেন। যে যাই হোক ঐ ব্রাহ্মণরাতো কান্যকুব্জের ব্রাহ্মণ নয়। তারা মেহেরকুল বা চাকলা রোশনাবাদের ব্রাহ্মণ।

চন্তাইরা মন্দিরে ঢুকলো কখন? তার উত্তর হল তারাই ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের আদি

পূজারী। পরবর্তী কালে অ-উপজাতি ব্রাহ্মণেরা তাদের মন্দির ছাড়া করে। কিন্তু এক পর্যায়ে তাঁদের সঙ্গে সন্ধিও করতে হল। অমাবস্যার পূজার অধিকার অমাবস্যার বলির অধিকার তাদের ছাড়তে হয়, এবং পূজার সৌষ্ঠব উপাচার ও আচার নিয়মে তাদের নিয়মকেও মানতে হল। ও জবরদস্তির তথ্য তো কৈলাশ সিংহ মশাই দিয়েছেন।

এখন প্রশ্ন হল এই সংঘাত করে শুরু হয়েছিল? কবে এসে শেষ হল? এই নিয়ে লেখ্য ইতিহাস নিরব। এবার পারিপার্শ্বিক প্রমাণের খোঁজ করতে হবে।

অর্জুন দাস বৈরাগী আর রত্নকন্দলী শর্মারা লিখেছেন —" বিজয় সাগরের পশ্চিমে রাম মাণিক্য রাজার কাটানো একটি দিঘী আছে। তাহার নাম রাম সাগর। রাম সাগর বিজয় সাগর অপেক্ষা ছোট। রাম সাগরের দক্ষিণ পাড়ে ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দির আছে (এখন নেই), সেখানে সদা শিবের লিঙ্গ আছে। এই বিগ্রহকে ব্রাহ্মণরা পূজা করে। এই দিঘীর পাড়ে রাজার পুরোহিত। সভাপন্ডিত ও অন্যান্য ব্রাহ্মণদের বাড়ী আছে। এই দিঘীর দক্ষিণে ও পশ্চিমে দুই দিকে এক প্রহরের রাস্তা পর্যন্ত উন্নত গ্রাম। সেখানে লোকেরা চাষবাস করে। বাড়ী-ঘেরাও করে এবং গরু মহিষও রাখে। তাহার দক্ষিণ দিকে জঙ্গলাকীর্ণ পর্বত।"

এই গ্রামটি চিনতে আমাদের অসুবিধা হয় না। শহর উপকণ্ঠে " খিলপাড়া"। উপরোক্ত বর্ণনা ১৭০৯ -১৫ সালের মধ্যে। সময়টা ১৫০১ খ্রীঃ থেকে ২০৮ বৎসর পরের। তখনো কিন্তু এমন তথ্য নেই যে ঐ গ্রামের পুরোহিতরাই ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের পুরোহিত নিযুক্ত হয়েছেন। এই পাড়াতেই তখন ব্রাহ্মণদের বাস। তবে তাঁদের বৃত্তি "রাজপুরোহিত্ব" করা বা সভাপন্ডিতের কাজ। কোন সরকারী দেবালয়ে পূজার্চনা করা নয়। ধন্য মাণিক্যের ২০৮ বছর পরেও ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে কোন সরকারী পূজক নেই। কাজেই ধন্য মাণিক্য বর্তমান পুরোহিত বংশকে এনেছেন তার সনর্থন নেই। কিভাবে পূজা হত তার ইঙ্গিৎ রয়েছে। চন্তাই (চিন্তন ক্ষেত্রে অগ্রসর এই অর্থে কী?) গালিম এবং জোলাইদের অস্তিত্বের মধ্যে। এর মধ্যে জোলাই রাই ছিল মন্দিরের নিকটবর্তী আবাসিক দাতারাম জোলাই বাড়ীতে। চন্তাইরা আসতেন পুরাণ হাবেলী বা পুরাণ আগরতলা থেকে। এর থেকে এই ধারণা দৃঢ় হয় যে তন্ত্র সিদ্ধ চন্তাইরা রাজ সান্নিধ্যেই রাজ বাড়ির নিকটে কোথাও থাকতেন। সেখানে থেকে তিন মাইল দূরবর্তী ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজা দিতে যেতেন। দুর্গম বনপথ অতিক্রমে স্বচ্ছন্দ যাতায়াত তাঁদের পক্ষেই সম্ভব। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে সমসের গাজীর ধাক্কায় কৃষ্ণমাণিক্য উদয়পুর ছেড়ে পুরাতন হাবেলিতে চলে যান। চন্তাই আর গালিম (হালিম > নিষ্ঠুর; ভয়ঙ্কর; পশুবলির কাজটা করতেন বলেই হয়তো ঐ নিষ্ঠুর কাজের ব্যাঞ্জনা হিসেবে ঐ শব্দের উৎপত্তি) রা ও উদয়পুর ছেড়ে চলে যান রাজ সান্নিধ্যে, পুরাতন হাবেলীতে। এখনো চন্তাই, গালিমরা পুরাতন হাবেলী থেকেই নির্দিষ্ট তিথিতে এখানে আসেন। আগেও বলেছি মন্দিরের কর্তৃত্ব চন্তাইদের হাতেই ছিল। যুক্তি হল মন্দির থেকে তাদের কখনই সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারেন নি বর্তমান পুরোহিত বংশ। দূরত্বের কারণে একটা সন্ধি বা মীমাংসার ভিত্তিতে চন্তাইরা কর্তৃক হস্তান্তরিত হয় মাত্র। অর্জুন বৈরাগী এবং রত্ন কন্দলী শর্মাদের মন্দির সম্পর্কে যৎ সামান্য উল্লেখ দেখে মনে হয় কিংবদন্তীতে এই মন্দিরের লোক গাথা যতই স্ফীত কলেবর পাক্ ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীর পূজার আড়ম্বর শুরুতে ততটা ছিলো না। যদি থাকত তবে রত্নকন্দলী ও অর্জুন দাস

বৈরাগী রাজধানীতে দেব মন্দির, পূজার ঘটা এবং রাজার দেবার্চনা বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরের উল্লেখ, মাত্র তিন লাইনে — " রাজার নগরের দক্ষিণে গোমতী নদীর অপর পাড়ে একটি ইষ্টক নির্মিত মন্দির আছে। উহা উচ্চতায় অনুমান ৪০ হাত হইবে। ঐ মন্দিরের ত্রিপুরা ঠাকুরানীর মূর্তি আছে।" ত্রিপুরা সুন্দরীর উল্লেখ শেষ করতেন না।

১৭৬০ সাল এই আলোচনায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঐ সালেই সমসের গাজীর কাছে কৃষ্ণমনি পরাস্ত হয়ে উদয়পুর ছেড়ে চলে যান। উদয়পুর শহর নিষ্ঠুর লুঠের শিকার হওয়ায় জনশূন্য হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ মাণিক্যের সঙ্গে উপজাতি পুরোহিত (অগ্রে থাকিয়া যিনি হিত করেন) চন্তাই রাও উদয়পুর থেকে চলে যান তখন মন্দিরের দেবীর পূজাও বন্ধ হয়ে যায়। এই যে শূন্যতা এর সময়কাল ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অনুমান করা যেতে পারে। এই অনুমানের পশ্চাৎ কারণ হল — " ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ (১২৮৩ ত্রিপুরাব্দ) নীলমনি দাস কার্যভার (দওয়ান) গ্রহণ করিয়া ত্রিপুরার দক্ষিণ অংশকে উত্তর বিভাগের ন্যায় উন্নত করার অভিপ্রায়ে " উদয়পুর বিভাগ সৃষ্টি করিয়া বাবু উদয় চন্দ্র সেনকে তাহার শাসন কার্যে নিযুক্ত করেন।" সমসের গাজীর উদয়পুর লুঠ থেকে সময়টা ১১৩ বছর পরের। এই সময়টাই শূন্যকাল। রাজধানী তখনো প্রায় জনশূন্য। খিলপাড়া তখন তুলনামূলক ঘন ও উন্নত বসতি। এই কারণেই খিল পাড়াতেই জোড়া দিঘীর পাড়ে ১৯০১ খ্রীঃ উদয়পুর বিভাগের প্রশাসনিক অফিস গড়ে উঠেছিলো। প্রশাসন কেন্দ্রের সুবাদেই উদয়পুর আবার জেগে উঠে। ত্রিপুরা সুন্দরী পুনরাবিষ্কৃতা হন। ভৈবব বা মহাদেব কেও জাগিয়ে তোলা হল। উপজাতি পুরোহিত চন্তাইরা তখনো উদয়পুর ছাড়া। সুতরাং শূন্য স্থানে এলেন অনুপজাতি চক্রবর্তী পুরোহিতেরা। কিন্তু এই অধিগ্রহণ সহজ হয় নি। চন্তাই দের অস্তিত্ব স্বীকারের বাধ্য বাধকতাই তার প্রমাণ। আর চৈত্র সংক্রান্তি ও ১লা বৈশাখ দুই তারিখে গড়িয়া পূজার প্রাক্‌লগ্নে অসংখ্য উপজাতি মহাদেব বাড়ীতে সমবেত হন, পূজা দেন। মহাদেব তো অনার্য দেবতা। আর্যরা তাঁর প্রাধান্য মেনেছেন। অনুপজাতি ব্রাহ্মণ বা চক্রবর্তী ব্রাহ্মণদের (ব্রাহ্মকূলের সমাজপতি) দের এই বিজয় সম্ভব হয়েছিলো মূখ্য দুটি কারণে। (১) চন্তাইরা উদয়পুর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন; (২) ত্রিপুরার রাজারা আর্যকূলোদ্ভব বলে কিছুটা প্রচ্ছন্ন রাজানুকূল্য পেয়েছিলেন। ঐ যে " রত্ন মাণিক্যের (১ম) শাসনকালে একদল ব্রাহ্মণ ত্রিপুরায় উপনীত হইয়া তত্রত্য প্রাচীন (!) ব্রাহ্মণ দিগকে নির্যাতন পূর্বক রাজকীয় পৌরহিত্য গ্রহণ করেন" তা কি রাজাদের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছাড়া সম্ভব হয়েছিলো? ঐ প্রাচীন পূজকরা উপজাতীয়। চন্তাই।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত তাঁর উদয়পুর বিবরণের ৫৭ পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন — " বর্তমান সময়ে (বইটি লেখা ও ছাপা হয় ১৩৪০ ত্রিপুরাব্দ তথা ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে) ত্রিপুরা সুন্দরী বাড়ীর পুরোহিতগণই পুরাতন বাসিন্দা দেখা যায়।" কত পুরনো তার উল্লেখ নেই। কে তাঁদের পূজক হিসেবে নিযুক্তি ছিল বইতে তার্য উল্লেখ নেই বা " ধনঞ্জয়" বা "গদাধর পান্ডার" উল্লেখ ও নেই। রত্নকন্দলী এবং অর্জুন দাস খিলপাড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ বসতির উল্লেখ করেছেন। তাদের বৃত্তির উল্লেখও করেছেন। খিলপাড়ার পুরোহিতেরাই তো বর্তমানে একমাত্র ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের পূজারী নন। উদয়পুর শহরে মহাদেব বাড়ী সংলগ্ন এক বিপ্র বংশ রয়েছেন যারা খিলপাড়া বিপ্র গোষ্ঠীর চাইতে ভিন্ন গোত্রের। তাঁদের উল্লেখ কিন্তু ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত'ও করেন

নি। অথচ এরাও বৎসরের অর্দ্ধেক সময় অর্থাৎ বৎসরে ছয় মাস পূজার অধিকারী। দেওয়ালী মেলার পূজা অধিকার নিয়ে দুই বংশের মধ্যে যে মামলা হয়েছিলো শক্তি চক্রবর্তী বনাম বিজয় চক্রবর্তীর মধ্যে। মামলায় খিলপাড়ার পুরোহিত বংশ হেরে যায়। এবং দেওয়ালী মেলার ভার বহাল থাকে শহরের বিপ্র গোষ্ঠীর অনুকূলে। অথচ কেউ তাদের উল্লেখ করেন নি। কারণ কি? এরা প্রচার বিমুখ বলেই কি তাদের এই বিপত্তি? জয় কুমার ঠাকুর, খিলপাড়া হিস্যার তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তার কারণে বাড়তি মান্যতার প্রচার পেয়ে আসছিলেন এবং মান্যতাও। আর একটা প্রক্রিয়ার চর্চা তিনি করতেন তা হল দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সমতুল্য বলে প্রচার। তিনি নাকি ত্রিপুরাসুন্দরীর সঙ্গে কথা বলতেন। কথাটা সাধারণ্যে প্রচার পেয়ে যায়, ফলে খিলপাড়ার একটা বাড়তি ধার তৈরী হয়েছিল। কালীর সঙ্গে জয় কুমার কথা বলেন! তাঁর পুত্র বিজয় কুমার চক্রবর্তী যিনি কল্যাণ সাগরের পাড়ের জায়গা দখল করতে গিয়ে মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন তাঁর প্রক্রিয়া ছিলো আবার ভিন্ন। তাঁর সংগ্রহে একটি পায়ের আকৃতি ছোট পাথর খন্ড ছিলো ঐ পাথর খন্ডটি তিনি দক্ষ কন্যা " সতীর দক্ষিণ পা" বলে প্রচার করতেন। বিশেষ বিশেষ লোকেদের তা দেখিয়ে চমকেও দিতেন। তাঁর ঐ স্নেহ ভাজন ও অনুগ্রহ ভাজনেরা এ নিয়ে প্রচার করতেন। বিজয় বাবুর অবর্তমানে "সতীর" ঐ পা এখন হয় তো দক্ষালয়ে হেপাজত হয়েছে। ইত্যাকার প্রসঙ্গ সূত্রের উল্লেখ এই কারণে যে "কান্যকুব্জ" মিথ ও যে একটা চেষ্টাকৃত প্রচার তা বুঝাতে। ঐ প্রচারের প্রয়োজন হয়েছিলো নিজেদের প্রাচীনত্ব বুঝাতে। তবে উভয়েই জনচিত্তে শ্রদ্ধেয়। কিন্তু মিথ সৃষ্টির চেষ্টা প্রচার সাফল্য পায় নি। ফলে মানুষ এখন তা ভুলতে শুরু করেছে।

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের দেওয়া একটি তথ্য হলো — " কুকী উপদ্রবের সময় এবং তৎপূর্বক হইতে ইহাদের পূর্ব পুরুষগণ কুমিল্লার নিকটবর্তী পাঁচথুপি কালিয়াজুরী প্রভৃতি স্থানে কেহ কেহ বসত বাড়ী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এখনো তাঁহারা ঐ স্থানে ও উদয়পুরে উভয় এই বাস করিতেছেন।" অর্থাৎ বর্তমানের পূর্ব পুরুষেরা চাকলা রোশনাবাদের অন্যতম শহর কুমিল্লার নিকটবর্তী স্থানেই ছিলেন। প্রসঙ্গত ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হল " ব্রাহ্মণ ও ভদ্রলোক দিগের বসতি বৃদ্ধি করিবার জন্য স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের বিশেষ রূপ আগ্রহ ছিল।"

এখন প্রশ্ন ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত এই প্রসঙ্গে " স্বর্গীয় মহারাজ রাধা কিশোর মাণিক্য বাহাদুর"কে টেনে আনলেন কেন? রাধা কিশোর মাণিক্য তো বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায়। তা হলে কি এই পুরোহিত কুল তত প্রাচীন নন? এটাই সত্য? ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের পরে দীর্ঘ শূন্যতার পর কোন এক সময়ে এরা মন্দিরের দখল পান তবে সেই সময়টা করে প্রশ্ন তা নিয়ে। ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্তের তথ্য অনুযায়ী যদি " কুকী উপদ্রবের" সময় থেকে বা তার আগেও এই পুরোহিত কুল কুমিল্লার পাঁচথুপি, কালিয়াজুরীতে বসতি করে থাকেন তবে হিসেব করা খুব একটা দুরূহ নয়। " দারপাই, দুথাঙ্গা, লালুয়া প্রভৃতি রাজাদিগের যোগে ১২৭০ ত্রিপুরাব্দে (১৮৬০ খ্রীঃ) মাঘ মাসে কুকীগণ উদয়পুর লুণ্ঠন করিয়াছিল (কৈলাশ সিংহের রাজমালা, পৃঃ ৩৬৭) " আবার কুকী নামা অনুসারে ১২৮০ ত্রিপুরাব্দ (১৮৭০ খ্রীঃ) " কুকীরা উদয়পুরবাসীদিগের ত্রাস জন্মাইয়া ছিল।" এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দেও এই

পুরোহিত পরিবার চাকলে রোমানাবাদের কুমিল্লাতেই ছিলেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কুমার রাধা কিশোর ১৬ই ভাদ্র, যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তা হলে কুকী আক্রমণ এবং রাধাকিশোর মাণিক্যের যৌবরাজ্যে অভিষেক প্রায় সমকালের ঘটনা। তখনো এই পুরোহিত বংশের উত্তর পুরুষগণ কুমিল্লাতেই। ঐ সময়কেই বা এর আসপাশের সময়কে যদি ধরে নিই যে এই পরিবার দ্বয় ত্রিপুরা সুন্দরীদেবীর মন্দিরে পূজক বৃত্তি লাভ করেছেন তবে এই পুরোহিত বংশের উদয়পুরে বাসের সময় দাঁড়ায় ১৪০ বছর ধরে। ব্রজেন্দ্র দত্ত উদয়পুর বিভাগের শাসক নিযুক্ত হন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে।

ব্রজেন্দ্র দত্ত " উদয়পুর বিবরণ" প্রকাশ করেন ১৯৩০ সালে। তার তিন বছর আগে ১৯২৭ সালে তিনি চতুর্থ ও শেষ বারের মতো উদয়পুরের শাসন কর্তা। চাকুরী কালীন সময়ে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। যদি তা ১৯২৭ সাল হয় তখন তিনি লিখেছেন — " এখনো তাহারা (মাতাবাড়ীর পুরোহিত) ঐ স্থানে (কুমিল্লায়) এবং উদয়পুরে উভয়ই বাস করিতেছেন। " কেউ বলেছেন সময়টা তাঁর ১ম চাকুরীকাল ১৯০১ সালও তো হতে পারে। তাহলেও কোন ইতর বিশেষ হয় না। এদের আদি বাসস্থান যে রাজার জমিদারী চাকলা রোশনাবাদের অন্তর্গত কুমিল্লায় এই সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন হয় না। " পান্ডে" "চক্রবর্তী" হয়েছেন তাও প্রমাণ হয় না। তা হলে "কান্যকুব্জ" তত্ত্ব আমাদের বাতিল করতে হয়, তৎ সঙ্গে ধন্য মাণিক্যের নিযুক্তি পত্রের গল্প; বাস্তবে যার কোন অস্তিত্বই নেই।

পক্ষান্তরে গ্রহণ করতে হয় চন্তাইদেব অস্তিত্ব ও আধিপত্য; ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরে পূজারম্ভে চন্তাইদেব একক অধিকার ও আধিপত্যের কথা। উপজাতি সমাজ মাতৃতান্ত্রিক তারা দেবী পূজা বা মাতৃপূজা করবেন, তাই তো স্বাভাবিক। চন্তাই অনার্য উপাধি। রাজ পুরোহিত ও চন্তাই।

প্রসঙ্গতঃ উদয়পুরে " চন্তাই দিঘী" চন্তাইদের অবস্থানকে প্রমাণ করে যে এঁরা উদয়পুরে এককালে ছিলেন। উদয়পুর শহরে ছনবন এলাকায়, বর্তমান হাউজিং এস্টেটের পার্শ্বের বৃহৎ জলাশয়টি চন্তাই দিঘী। চন্তাইদের ব্যবহার্য বলেই ঐ নামকরণ। ঐ জলাশয়টি হয় চন্তাই অথবা রাজা স্বয়ং চন্তাইয়ের ব্যবহারের জন্য খনন করেছিলেন এব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু আশ্চর্য উদয়পুব বিবরণের লেখক ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দত্ত উদয়পুরে, শহর ও শহরের বাইরে বহু জলাশয়ের নামে ধামে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শহরের মাঝখানে তাঁর প্রথম অফিস থেকে দেড় মাইল এবং জগন্নাথ দিঘীর পাড়ের অফিস থেকে পৌনে এক মাইলের দূরত্বে চন্তাই দিঘীর খোঁজ তিনি নিলেন না। নাকি এ ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি [illegible] প্রাধান্য প্রমাণ করা এবং চন্তাই কে বিস্মৃত করানোর জন্যে এই বিস্মরণ। কিন্তু [illegible] উদয়পুরের বুকে চন্তাইরা বেঁচে রয়েছেন ইতিহাসের উপাদান [illegible] শাসক হিসেবে রাজত্ব [illegible] পুরের নথির মালিক তিনিই ছিলেন যে নথি [illegible] সংগ্রহ করেছেন

বর্তমান পুরোহিত কুলের [illegible] চক্রবর্তী সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আমাকে বলেছেন তাঁরা [illegible]

[illegible] বা উদয়পুরে (৯০ [illegible] বংশানুক্রমিক [illegible]

১। হিমতি (যুঝারু ফা); বংশের ১১৮ তম রাজা।

২। রাজেন্দ্র (জঙ্গি ফা বা জনক ফা) ; ৩। পার্থ (দবরাজ বা দেবরায়); ৪। সেবরায় (শিরবায়); ৫। কিরীট (ডুঙ্গুরু ফা), ৬। রাম চন্দ্র, ৭। নৃসিংহ; ৮। ললিত রায়; ৯। মুকুন্দ ফা; ১০। কমলরায় ; ১১। কৃষ্ণ দাস; ১২। যশোরাজ (যশ ফা); ১৩। উদ্ধব (মোচং ফা); ১৪। সাধুরায়; ১৫। প্রতাপ রায়, ১৬। বিষ্ণ প্রসাদ; ১৭। বানেশ্বর; ১৮। বীরবাহু; ১৯। সম্রাট; ২০। চম্পকেশ্বর; ২১। মেঘরাজ; ২২। ধর্মধর (ছংকাচাগ্); ২৩। কার্তিধর (ছংথুম ফা); ২৪। রাজ সূর্য (আচঙ্গ ফা); ২৫। মোহন (খিচুং ফা); ২৬। ডাঙ্গর ফা; ২৭। রাজা ফা; ২৮। রত্ন ফা (রত্ন মাণিক্য ১ম); ২৯। প্রতাপ মাণিক্য; ৩০। মুকুট মাণিক্য (মুকুন্দ); ৩১। মহামাণিকা; ৩২। ধর্মমাণিক্য (দ্বিতীয়); ৩৩। কচুফা (গগন ফা বা পুরন্দর); ৩৪। প্রতাপ মাণিক্য; ৩৫। ধন্য মাণিক্য; ৩৬। ধ্বজ মাণিক্য; ৩৭। দেব মাণিক্য; ৩৮। ইন্দ্র মাণিক্য; ৩৯। বিজয় মাণিক্য; ৪০। উদয় মাণিক্য; ৪১। অনন্ত মাণিক্য; ৪২। জয় মাণিক্য; ৪৩। অমর মাণিক্য (রামদাস); ৪৪। রাজধর মাণিক্য; ৪৫। যশোধর মাণিক্য; ৪৬। কল্যাণ মাণিক্য; ৪৭। গোবিন্দ মাণিক্য; ৪৮। ছত্র মাণিক্য (নক্ষত্র রায়); ৪৯। জগন্নাথ ঠাকুর; ৫০। রামদেব মাণিক্য; ৫১। দুর্গা ঠাকুর; ৫২। নরেন্দ্র মাণিক্য (দ্বাকরা ঠাকুর); ৫৩। রত্ন মাণিক্য (দ্বিতীয়); ৫৪। মহেন্দ্র মাণিক্য; ৫৫। ধর্ম মাণিক্য (দ্বিতীয়); ৫৬। মুকুন্দ মাণিক্য; ৫৭। জগন্নাথ ঠাকুর; ৫৮। ইন্দ্র মাণিক্য; ৫৯। কৃষ্ণ মাণিক্য (কৃষ্ণমনি)।